ব্রহ্মানন্দচরিত

স্বামী প্রভানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিরাময়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য : ত্রিশ টাকা

যাঁহার আদেশে এই গ্রন্থের জন্ম-সূচনা

এবং যাঁহার পবিত্র প্রাণস্পর্শ

সঞ্চারিত হইয়া আছে ইহার প্রতিটি পৃষ্ঠায়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী [illegible] মহারাজকে

আমার আভূমি প্রণতি।

ভূমিকা

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন "স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণসঙ্ঘ যেরূপ নিরর্থক হইত সেইরূপই তাঁহার রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগামী না হইলে বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম্ম অসার্থক হইয়া যাইত।" তিনি আরও লিখিয়াছেন। অনেক সময় এই সকল জীবন আলোচনা করিলে ইহা আমার নিকট প্রতিভাত হয় যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সত্তার উপচ্ছায়ে বহু রূপের দর্শন আমরা পাই যাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, এবং যাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ সত্যরূপে ইহা বলা চলে না যে এইখানেই অপর সকলের সহিত বিবেকানন্দের সম্পর্ক পরিধির শেষ কিংবা ঐখান হইতে তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব পরিধির প্রারম্ভ।

ভগিনী নিবেদিতার এই অপাবৃত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়াই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলীলার তত্ত্বমাধুর্য আস্বাদন করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার জীবন ও বাণীর মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় তাহাতে সামগ্রিকভাবে তাঁহাকে বুঝা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং ব্যক্তিত্বের দিব্যালোকে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বল্পায়ত জীবনে যে কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যুগাবতারের ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইলেও তাহার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল কতকগুলি দিব্যজীবনের। বস্তুতঃ তাঁহারাই বিরাট অধ্যাত্মশক্তিতে এবং অসীম প্রেমে তাঁহাদের শ্রীগুরুর সঙ্ঘকে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের পরেই অনেকের মনেই সংশয় জাগিয়াছিল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার রাজনৈতিক কর্মপন্থার জন্য রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবিরোধীদের মনে ও লেখায় হর্ষের গুঞ্জনধ্বনিও উঠিয়াছিল যে এইবার রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ইহা ঘটে নাই। প্রত্যুত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

ইহার কারণ কতকগুলি দিব্যজীবন স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের উপচ্ছায়ে স্বচেতনায় প্রবুদ্ধ হইতেছিল। এই জীবনগুলির কথাই ভগিনী নিবেদিতা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে লিখিয়াছেন। নিবেদিতার রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ পরিচালনার যোগ্যতাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তিনি ইহা জানিতেন বলিয়াই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ যুগ্ম আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দের কথা বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহারা না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম অসার্থক হইয়া যাইত।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতৃবৃন্দের জীবন কর্মভিত্তিক ছিল না—ছিল অধ্যাত্মভিত্তিক। সেইজন্য তাঁহাদের জীবন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়াই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ অধ্যাত্মমহীরূহকে নিজেদের জীবনের অধ্যাত্মরসে পরিপোষিত করিতে পারিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ একটি সমাজকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান নয়। অবতার-পুরুষের মানবকল্যাণ-সাধনের যন্ত্ররূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবলমাত্র মানবের অধ্যাত্মচেতনার সম্যক্ বিকাশে। কিন্তু সে বিকাশ তাহার দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিতর দিয়াই আসিতে পারে। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যবাণী। সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জীবনপ্রবাহ মানবজীবনের ঐহিক উন্নতির খাতে পরিবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহ্'। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার অন্তরালে রহিয়াছে মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা যাহার ফলে যুগাবতারের আবির্ভূতি যে নতুন যুগের সূচনা করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণতার ঐশ্বর্যে মহিমময় হইয়া উঠিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার অকালে দেহত্যাগের পর তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে আটটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন সেইরূপ আরও বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহারাও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কর্মের আয়তনবৃদ্ধির পিছনে প্রচার চেষ্টা অপেক্ষা অধ্যাত্মশক্তির প্রয়োগই ছিল মুখ্য। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতৃবৃন্দের জীবন ছিল অধ্যাত্মশক্তির আধার। তাহা দিয়াই তাঁহারা সঙ্ঘগঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

যুগধর্ম প্রবর্তনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সংখ্যা ছিল পঞ্চদশ। তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুর ধর্মদেশনার প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দিব্যজীবনের অপূর্বদ্যোতনা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে

পথনির্দেশ করিয়াছে এবং পরিচালিত করিয়াছে। এই পঞ্চদশ মহাজীবন কিন্তু একভাবে পরস্পরের কর্মপ্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিচালনায় ইঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ভাবে কাজ করিয়া সঙ্ঘের পরিপোষণ এবং পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চদশ মহামানবের একজন ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ভগবান্‌-শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের ছয়জনকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া চিহ্নিত করিতেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর তাঁহারা জন্ম হইতেই মুক্ত—দিব্যজ্ঞানাধিরূঢ়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই শ্রেণীর বলিয়া শ্রীগুরুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তাহা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাকে 'মানসপুত্র'-রূপে শ্রীশ্রীজগদম্বাকর্ত্তৃক চিহ্নিত বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে জানিতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-ভূমির উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে রাখাল একটি রাজ্য চালাইতে পারে। সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই ঘটনার মধ্যেই উত্তরজীবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সঙ্ঘের পরিপ্রেক্ষিতে যে দায়িত্ব ও ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা অন্তর্নিহিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যুগপুরুষের বাণীর ব্যাখ্যাতা ও উদ্গাতা। তিনি সেই বাণীকে কিভাবে কর্মে রূপায়িত করা যায় তাহার জন্য রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাপনাও করেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন স্বল্পকালাবচ্ছিন্ন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যে বীজ তিনি রোপণ করিলেন তাহা হইতে উদ্গত তরুটিকে শৈশবাবস্থায় রাখিয়াই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। শিশু তরুটিকে পালন-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার গুরুভাইদের উপর পড়িল—বিশেষ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা নির্বাচিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে বড় বৃক্ষের নীচে ক্ষুদ্র বৃক্ষ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহাকে সরিয়া যাইতে হইবে। দেহান্তের মাধ্যমে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া লইলেন। দায়িত্ব আসিয়া পড়িল গুরুভ্রাতাদের উপর। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের। স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যদ্যুতিময় ভাস্বর ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার জীবনের দিব্যচেতনার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে যে অধ্যাত্ম-মন্দাকিনী

নামিয়া আসিয়াছে তাহা সঙ্ঘের সর্বস্তরকে অভিসিঞ্চিত করিয়া একটি বিরাট সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিল। যাঁহারা নূতন সঙ্ঘভুক্ত হইতেছিলেন তাঁহাদের জীবনগঠন, নূতন শাখামঠের স্থাপনা এবং পরিচালনার ব্যবস্থা, নূতন ভক্তগোষ্ঠির ভিতর রামকৃষ্ণ ভাবের সঞ্চারণ প্রভৃতি সব কিছুর দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এইভাবেই ধীরে ধীরে তাঁহার পরিচালনায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ শাখা-প্রশাখায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই যে দিব্য-মহাজীবন ইহা আমাদের সকলেরই আলোচনার বিষয়। কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে এ জীবন কেবল বহির্জীবনের ঘটনাপঞ্জীর উল্লেখের দ্বারাই সম্যক্ অধিগত হইতে পারে না। এজীবনের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়ানুগ ভূমি ছাড়াইয়া অধিমানস ক্ষেত্রে আস্তৃত। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ'—প্রভাতরল-জ্যোতি পৃথিবী হইতে উত্থিত হয় না। সেইজন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন মূলতঃ ধ্যানগম্য। তাহা হইলেও মনুষ্যজীবনে যে সমস্ত কর্ম এবং ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ধ্যান সম্ভব। সেইজন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রয়োজন ছিল।

স্বামী প্রভানন্দ অনেক পরিশ্রমে এবং বহু গবেষণার দ্বারা এইরূপ একটি জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাভাষী রামকৃষ্ণানুরাগীদের এবং জনসাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিলেন। এই গ্রন্থখানি স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত রূপে পরিগণিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ
বোম্বাই

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

পূর্ব-লেখ

হিন্দুধর্মকে বলা যায় যুগ-যুগান্ত প্রবাহিত সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার সুন্দর একটি দিঙ্‌নির্দেশ। বেদবাদী ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্‌ এবং বেদবিরোধী বৌদ্ধ-জৈন ও দেহাত্মবাদী বার্হস্পত্য মতবাদের পরিমণ্ডলের মধ্যেও ঐ বিশিষ্ট ধারাটি বহুবিধ সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছিল। বর্ণাঢ্যতায় ও ভাববৈচিত্র্যে বিভাসিত সেই মত-পথ কালের অগণিত সোপান বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে। অনাহত সেই গতিবেগ ইসলাম ধর্মের বিপরীত তরঙ্গের প্রবল সংঘাতে প্রতিহত হইয়াছে; পথানুসারীদের ধর্মচর্যা ও জীবনবোধে ঘটিয়াছে তাহার ছায়াসম্পাত। পরিণামে সেই ধারাটি সব কিছুই আত্মস্থ করিয়া নূতন ঐশ্বর্যে সংবিন্যস্ত ও সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কালেই পুরাণ-হাদিসকে অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-কবীর-নানক-দাদূ-মীরাবাঈ হৃদয়ের ধর্মকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। হিন্দু তাহার অবিরাম যাত্রাপথে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে বারংবার, কিন্তু পাশ্চাত্যের ক্যাতায়নী সংস্কৃতি ও খ্রীষ্টধর্মের প্রবল প্লাবন সাময়িকভাবে তাহাকে নিদারুণভাবে বিত্রস্ত ও বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত বিচারবিমূঢ় হিন্দু আশু সঙ্কটমোচনের প্রয়োজনে দেশকালের পরিবর্তমান গতিধারার সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতির সৃষ্টি করিল এবং যুক্তিবাদ, উপযোগবাদ ইত্যাদির পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আপন বীর্যবত্তায় প্রাণশক্তির প্রবল প্রাচুর্যে আত্মস্বরূপ আবিষ্কার করিয়া নব বেদান্তের সৃষ্টি করিল।

এই যুগে হিন্দুর মনোজগতে নানা কারণেই দেখা দিয়াছিল স্বতঃবিরোধিতা—একদিকে বিশুদ্ধ তত্ত্বের জন্য অভীপ্সা, অপরদিকে ব্যবহারিক জীবনচর্যাতে আসক্তি; একদিকে নিস্পৃহ তত্ত্ববোধ ও নির্মোহ যুক্তিবাদ, অপরদিকে কুলাচার, লোকাচার ও স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই আঘাতে ও বাহিরের আক্রমণে হিন্দুসমাজ বিপর্যস্ত, বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। জাতীয় সঙ্কটের এই চরম ক্রান্তিকালে বিশ্ববাসীর অধ্যাত্মসাধনার সারভূত ফলরূপে

আবির্ভূত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার কায়-মন-বাক্য এক সুরে গাঁথা, প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও আত্মসাধনা একই ঐকতানে বিধৃত, ফলে তাঁহার চরিত্র মহত্তম মানবতার ও অধ্যাত্ম-চেতনার আলোকে পূর্ণ-মহিমায় উদ্ভাসিত। তাঁহার জীবনে ও বাণীতে একই সঙ্গে ঐহিক ও পারত্রিক, মুমুক্ষা ও নরসেবার আদর্শ-আলোকিত সমন্বয়ে পূর্ণায়ত হইয়া উঠিল, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসেতু বিরচিত হইল, মানবের সত্যস্বরূপ যে উজ্জ্বল দৈবসত্তা তাহার উদ্বোধনের জন্য সকল জীবনপ্রয়াস ও কর্মপ্রচেষ্টা একই সঙ্গে বিনিযুক্ত হইল।

আধ্যাত্মিকতার যে অন্তহীন অমৃত-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মোচিত করিয়াছিলেন, প্রাণসঞ্চারিণী সেই পতিতপাবন শুদ্ধ গঙ্গাবারি দেশে-দেশান্তরে জীবনের ঘাটে-বাটে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন একালের ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ। এবং তাঁহাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের এক সাক্ষাৎ-উত্তরাধিকারী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। বস্তুতঃ তিনি সেই অধ্যাত্মসুধা ব্যক্তি-মানসে সিঞ্চিত করিয়া বিধ্বস্ত সগরতনয়দেরকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। কিছু উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যা ছিল সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ বাতাবরণে সঙ্কুচিত, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহাদের সহকর্মিগণ সেই শক্তিবীজকে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিলেন জনচিত্তের মাটিতে মাটিতে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ ভাবাদর্শটিকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিয়া পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলেন গ্রামে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের আবেষ্টনীতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন একটি অধ্যাত্মশক্তির বাতাবরণ। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের লক্ষ্য সম্পূর্ণ না হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে সেই সাধনার পথকে অনেকখানি সরল প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্ঘচেতনার মুখ্য আকৃতি ঈশ্বরলাভকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া-ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন উদ্যোগকে অর্থাৎ ধর্মসাধনা ও কর্ম-যজ্ঞকে বহুদর্শীর মননালোকে সম্যক্‌ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের জন্মলগ্ন হইতে যে মহার্ঘ ঐতিহ্যকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রধান প্রাণপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। উপরন্তু তিনিই এই ভাবান্দোলনের সামগ্রিক মূল্যবোধের সদাজাগ্রত নিশানা এবং সাধক কর্মিগণের নিয়ত উদ্দীপনার মূলীভূত উৎস-গোমুখী।

টি. এস. এলিয়টের উক্তি 'A lifetime burning in every moment' স্বামী ব্রহ্মানন্দের চির-আকর্ষক জীবনশিল্পখানি সম্বন্ধে খুবই প্রাসঙ্গিক। এইরূপ

পূর্ণাঙ্গ জীবনশিল্পের ইন্দ্রধনুচ্ছটার বর্ণ-বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য। উপরন্তু তাঁহার সমুজ্জ্বল জীবনালেখ্য কালের ধূলায় এমন ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে, স্তবস্তুতির ও স্রক্-চন্দনাদির আচ্ছাদনে ও জনশ্রুতির কুয়াসাতে এমন ভাবে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে যে পাঠকের কাছে তাহা অনেকটা অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার পর্দা খুলিয়া তাঁহার প্রকৃত চরিত্রচিত্রটি সর্বসাধারণ্যে উন্মোচিত করিয়া তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঐকতানটি উদ্ধার করিতে হইলে তাঁহার ছোট-বড়, ক্ষুদ্র-মহৎ ক্রিয়াকলাপ ও ধ্যানধারণা নির্বাচন করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে। সত্যকে ঢাকা চাপা না দিয়া অথচ বাহুল্য বর্জন করিয়া জীবনের বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও বিভিন্ন ব্যক্তিমানসে বিধৃত তাঁহার ব্যক্তিত্বের বহুবর্ণ দিব্যদ্যুতিগুলি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। উপাদানের কোন অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌণ, কোনটা তাৎক্ষণিক এবং কোনটা বিশেষ সময়ের সীমানা অতিক্রম করিয়া শাশ্বত প্রবহমান তাহা নৈপুণ্যের সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। তথ্য ও তাহার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিভাসিত হইয়া উঠিবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং অপরূপ চরিত্রমাধুর্য। অধ্যাত্মপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্র-বিশ্লেষণের একটি প্রধান অন্তরায় তাঁহার অভ্রভেদী অধ্যাত্মসত্তার বিদ্যুৎগর্ভরূপ। কিন্তু তাঁহার দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মসত্তাকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনসাধনা হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবপর নহে। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাঁহার জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। তাঁহার ছিল সুঠাম চেহারা, অন্তরালোকে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল, ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত বিশালতা ও তীক্ষ্ণ ঋজুতা, আবার একই সঙ্গে শিশুসুলভ সহজ সরলতা, সূক্ষ্ম কৌতুকের অনাবিল আত্মপ্রকাশ, সহজাত নেতৃত্বশক্তি, দিব্য অন্তর্দৃষ্টি এবং এ-সকলের উর্ধ্বে অধ্যাত্মশক্তির অমেয় মহিমা। তাঁহার উনষাট বছরের সুন্দর জীবন-বিচিত্রা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে তাঁহার অনুপম ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বর্ণালি। তিনি সারা জীবন ব্যাপিয়া নিজেকে উজাড় করিয়া দান করিয়াছেন। সম্পদে, সার্থকতায় ও সম্ভাবনায় সে-দান অতুলনীয়। সে-উত্তরাধিকার সত্যই দুর্লভ। যে সংবিত্তি-বারিধির মত নিরবধি অথচ যাহার বারি সুপেয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-অর্পিত উত্তরাধিকারে দেখি তাহার অভিস্ফুরণ।

চরিতকথা ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য। তথাপি ব্যক্তিজীবনের পরিমণ্ডলে আবর্তিত এবং ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত গোষ্ঠী ও সমাজের ইতিবৃত্তও জীবনচরিতে উন্মোচিত হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ ব্যক্তি ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সেখানে পরিলক্ষণীয়। আধুনিক চরিতসাহিত্যের অন্যতম প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ উদ্ঘাটন ও ব্যক্তির উষ্ণ-সান্নিধ্যের বাতাবরণে উদাত্ত সাহিত্যরসের আস্বাদন। অধিকন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনবৃত্তের শেষ পঁচিশটি বৎসর, ১৮৯৭ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তথা রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্রের অনুধ্যানের জন্যই আমরা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সমকালীন প্রেক্ষাপটের সম্যক পরিচয় প্রদান করা। উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের অপ্রাচুর্য ও নিশ্চিত তথ্যাদির অভাববশতঃ যে-সকল ঘটনার বিবরণ কতকাংশে অনুমান আশ্রয়ী হইয়াছিল, সে-সকল ঘটনা নূতন আলোকসম্পাতে কতকাংশে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন আকরগ্রন্থ ভিন্নও চিঠিপত্র, ডায়েরী, স্মৃতিচিত্র ইত্যাদির ব্যবহারে এই গ্রন্থের বক্তব্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। ঘটনালহরী-শীর্ষক অধ্যায়ে কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মধ্যে একদিকে যেমন রহিয়াছে ব্যক্তি-মানুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইতিবৃত্ত, অন্যদিকে আবার সেইসঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে তাঁহার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠী প্রসঙ্গে নানা তথ্যাবলী।

ধর্মজগতের ইতিহাসে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিবৃত্তের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভূমিকা অসাধারণভাবে অনন্যস্বতন্ত্র। তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজিত। তাঁহার অমিয় চরিতকথা অনুধ্যানপূর্বক নিজের জীবনকে ধন্য করা এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত রহিয়াছে যে-সমস্ত গৌণ অভীপ্সা তাহা পূর্বেই সংক্ষিপ্তাকারে বলা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্রহ্মানন্দজীবনী কয়েকখানিতে পরিবেশিত তথ্যের সঙ্গে মূল্যবান নূতন কিছু তথ্যাদি সংযোজন করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের একখানি পূর্ণাঙ্গ সার্বিক জীবনচরিত রচনা করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমানের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ লেখককে আদেশ করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী শুধু যে অকৃপণভাবে নিয়ত প্রেরণা দিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি গ্রন্থরচনার জন্য বিভিন্ন উপাদান, বিশেষতঃ অপ্রকাশিত ডায়েরী, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডুলিপিখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়া সংশোধনাদি

করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধক্রমে সঙ্ঘের চারজন প্রবীণ বিদগ্ধ-পণ্ডিত সন্ন্যাসী—স্বামী প্রভবানন্দজী, স্বামী সংপ্রকাশানন্দজী, স্বামী পবিত্রানন্দজী ও সঙ্ঘের তদানীন্তন অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী পাণ্ডুলিপি পড়িয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ দেন। ইঁহাদের সকলের উদ্দেশে অসীম ঋণ স্বীকার-পূর্বক সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন স্বামী নিত্যরূপানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার। লেখক তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাষ্টি ও বাগবাজার শ্রীশ্রী৺মায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এই গ্রন্থটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহাকেও নিবেদন করি আমার বিনীত প্রণাম। মূল রচনার অতি সামান্য কিছু সংযোজন-বিয়োজন ব্যতীত মূল পাণ্ডুলিপি অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। যে-সকল গ্রন্থ হইতে উপাদানাদি সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির লেখক ও প্রকাশকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই রচনা-প্রয়াস তখনই সার্থক মনে করিব যখন সুধী পাঠক সমাজ ব্রহ্মানন্দ-লীলা-রসার্ণব হইতে অন্ততঃ কিছু অমৃত আহরণপূর্বক নিজেদের জীবনকে অমৃতায়িত করিতে প্রয়াসী হইবেন।

ইতি—

বেলুড়মঠ
গুরুপূর্ণিমা
১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র

প্রথম অধ্যায় : শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র

শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে ভরপুর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবচক্ষে দেখিলেন, সুদর্শন এক বালক পঞ্চবটীর ছায়াতলে দাঁড়াইয়া আছে। এই দর্শনের তাৎপর্য কি হইতে পারে, সরলচিত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহা ভাবিত করিয়া তুলিল। তিনি বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসা করেন, সদুত্তর পান না। নির্ভরযোগ্য সেবক ভাগিনেয় হৃদয়, তাহার উত্তরেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীজগদম্বাই অপর একটি ঘটনার অবতারণা করিয়া রহস্যের সমাধান করিয়া দিলেন। সুখাসনে সমাসীন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা মনোরম-দর্শন একটি শিশুকে সহসা তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "এইটি তোমার পুত্র!" ত্যাগ-বৈরাগ্যের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার বরপুত্রকে বুঝাইয়া আশ্বস্ত করেন, সাধারণ সংসার-সম্বন্ধে পুত্র নহে; ত্যাগী শুদ্ধ এক মানসপুত্র তিনি লাভ করিবেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার অপার কৃপা চিন্তা করিয়া পুরুষোত্তম আনন্দে পুলকিত হইলেন। তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হইল, একদিন তিনিই শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট আবদার ধরিয়াছিলেন, "মা, একজনকে সঙ্গী করে দাও—আমার মত।" আরও বলিয়াছিলেন, "মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।" শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

অসীম-অনন্ত-ভাবসিন্ধু ভগবান নরলীলা করিতে পুনরায় জগৎমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধককুলের যুগযুগান্তরের সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং নারায়ণ নর-বিগ্রহে সমুপস্থিত। একই ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইলেও প্রত্যেক অবতরণেই পরিস্ফুট হয় অবতারীর এক একটি বিশেষ তাৎপর্য। লীলাসম্বরণের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করিলেন বর্তমান অবতরণের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিলেন, "যে

রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"[১] রামকৃষ্ণজীবনবেদের ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিলেন—

আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোহপ্যহ্হ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতমাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

শ্রীরামাবতারের নির্বিশেষ কারুণ্য ও শ্রীকৃষ্ণাবতারের বেদোজ্জ্বল প্রজ্ঞা—উভয়ের সুসমঞ্জস প্রকাশ একাধারে কৃপানিধিশ্রীরামকৃষ্ণাবতারে। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন, দুষ্টের শাসন ও শোধন এবং শিষ্টের পালন ও কল্যাণবিধানের জন্যই ভগবানের অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন, "অবতার—যিনি তারণ করেন।"[২] ভগবদনুরাগে আর্দ্র প্রেমিক দেখেন, ভক্তহৃদয়ের চির-অতৃপ্ত আনন্দাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতেই ভক্তনিধি ভগবানের নরলীলা। ভক্তের এই আকূতি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—"মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।"[৩] অবতার গাভীর বাঁট, অবতারের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রেম-ভক্তি মানুষ আস্বাদন করিতে পারে। অবতারের মধ্যে অনন্যসাধারণ উর্জিতাভক্তি-প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়া ভক্তহৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অপরপক্ষে সমাজবিদ্ দেখেন, প্রগতির ক্রমবিবর্তনে বিশ্ব-

১। কথামৃত ৫। পরিশিষ্ট ১০।
২। কথামৃত ৩।২০।২
৩। কথামৃত ১।১৬।৩

মানবের অফুরন্ত আকৃতি প্রকাশলাভ করিয়াছে ক্রান্তদর্শী মহামানবের মধ্যে।[১] অসীম শক্তিসম্পন্ন প্রস্রবিনীকে একত্রে ধারণ করিয়াই মহাসাগরের মহনীয়তা; তথাপি তাহার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। মহামানবের আবির্ভাব বিশ্বমানসে আনে মহা-প্লাবন; তিরোভাবের পর পশ্চাতে রাখিয়া যায় স্বাতন্ত্র্যের পদচিহ্ন। মহতের মহাপ্লাবনে সাধারণ মানুষ তাহার ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া মহতের মহত্ত্বে গর্ববোধ করে, তাহার ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মহতের বিরাটত্ব অনুভব করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে। বিশ্বমন মন্থন করিয়া এইবার অধ্যাত্ম-ভাবঘন শ্রীরামকৃষ্ণ-আধারে প্রাণদ বলদ এক মহা ভাবপ্লাবন সমুপস্থিত হইয়াছে যাহার তুলনায় প্রাচীন পুনঃ-পুনর্লব্ধ উত্থানসমূহ গোষ্পদের তুল্য। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃ-পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"[২]

মানুষ-শরীরে ভগবানের অবতরণে অনুপম লীলাবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস। এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।"[৩] তিনি আরও বলিতেন, "তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা করতে আসেন।"[৪] অতি সীমিত আধারে অসীমের আত্মপ্রকাশ, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত দ্বন্দ্বাতীতের বিকাশ। ভক্তগণ বিচিত্র ঘটনারাজিতে প্রকটিত রূপের মধ্যে অরূপকে ধরিবার চেষ্টা করে। বৈষ্ণবসাধক অধিকন্তু বিশ্বাস করেন, নিত্য সত্য এই অবতারলীলা। 'অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌররায়,/কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।'

১। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি অদ্বৈতপ্রভুর মতে অবতার-আবির্ভাবের উদ্দেশ্য 'জীব উদ্ধার', কিন্তু রায় রামানন্দের মতে 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী।' অবতারত্বের উদ্দেশ্য 'সমষ্টি-মুক্তি'র প্রচেষ্টা ইঙ্গিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্বের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ করিয়া গিয়াছেন সমষ্টিভাবে ইতিহাসপথে সমগ্র জাতির উদ্ধার।" (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ, পৃঃ ৮)

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫।

৩। কথামৃত ৩।১৭।১।

৪। কথামৃত ৪।৯।৪।

মননশীল সাধক মনে করেন, ভগবানের নিত্য লীলাব্যঞ্জনা বীজাকারে সর্বদাই বর্তমান, ভগবানের মর্তদেহধারণে উহা প্রকট হয় মাত্র। অবতারলীলা ভগবানের পক্ষে খেলা, ভক্তহৃদয়ে তাহাই বাস্তব, প্রাণদ ও বরদ। মানুষের মাঝে লীলাখেলার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হন। লীলাখেলার জন্য সঙ্গে আনেন সেই লীলা-পরিকরদের যাঁহারা তাঁহার নিজের ঘরের, স্বগোত্রের। শ্রীমাতাঠাকুরাণীও নিজ-মুখে বলিয়াছেন, "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।"[১] ঈশ্বরকোটি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ এক বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীদের সঙ্গে আনেন অবতার; যাহারা আসেন তাহারা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি পুরুষ, কাহারও বা শেষ জন্ম।[২] এইসকল সুনির্বাচিত খেলোয়াড়দের লইয়া সুপটু অধিনায়ক সংসার-ময়দানে অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন, "এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে।"[৩] লীলাবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য যে সকল অশেষগুণসম্পন্ন খেলোয়াড় আসেন তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায় একটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকের থাকে নিজস্ব একটি বিশেষ ভূমিকা। প্রত্যেক পার্ষদ তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জগৎবাসীকে নাচাইয়া কাঁদাইয়া হাসাইয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের কুক্ষী হইতে আকর্ষণপূর্বক শ্রেয়ের পন্থানুসারী করাইয়া দেন। সংসারের মানুষ রঙিন কাঁচের মোহ ত্যাগ করিয়া হীরকখণ্ডের অনুসন্ধান করে, জগতের খোলামকুচির খেলা ফেলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম আশ্রয় করে। বিভ্রান্ত মানুষের নিকট ক্ষণেকের জন্য হইলেও তাহার নিজের চৈতন্যস্বরূপ যেন ঝলক দিয়া ওঠে, সৌভাগ্যবশতঃ তাহার জীবনস্রোত ভগবদভিমুখীন হইয়া প্রবাহিত হয়—মানুষ মান-হুঁশ হইয়া জীবন সার্থক করে।

অবতারপুরুষের সঙ্গে যাঁহারা লীলাখেলা খেলিতে আসেন তাঁহারা এক ঝাঁকের। মানুষের সাজে নারায়ণকে চিনিতে পারে না অধিকাংশ লোক। "নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ।"[৪] দয়াপরবশ হইয়া তিনি ইঙ্গিত করেন

১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৫।
২। কথামৃত ২।১৬।১।
৩। কথামৃত ১।১৪।১০।
৪। কথামৃত ৪।৮।৩।

নিজের বিশেষত্ব, "এই মানুষের ভিতর মানুষ রতন আছে"।[১] সন্দিগ্ধ মানুষ সাময়িক ভাবে মানিয়া লইলেও এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে না যে নিজের মায়াশক্তিতে দেহ ধারণ করিয়া অবতারাদি পুরুষ রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভোগ করেন। পঞ্চভূতের ধাঁধায় অবতারকে সকলে চিনিতে পারে না। শুদ্ধচিত্ত সাধককয়েকজনকে মাত্র ঈশ্বর কৃপাবশে ধরা দেন। সেই সৌভাগ্যবানদের নিকট অবতার-লীলারঙ্গ অনন্ত আনন্দের আকর।

অবতারে লীলাখেলা, অতীব রঙ্গের।
যে বুঝে সে বুঝে, যে না বুঝে তার ফের।[২]

অবতার ও তাঁহার পার্ষদদের লীলাবিলাসের মধ্যে প্রেমিক সাধক লক্ষ্য করেন শ্রীভগবানের দুইটি উদ্দেশ্য। আনন্দস্বরূপ ভগবান তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বমাঝে বিশ্বজন-পরিবৃত হইয়া লীলাবিলাসের দ্বারা আনন্দসম্ভোগ করেন; লীলাসহচরগণ ইহাতে যোগদান করিয়া পরমকারুণিক ভগবানের পরিতুষ্টি বিধান করেন, নিজেরাও আনন্দের অংশভাক্ হন। অপরদিকে ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বাঁধা পড়িয়া সচ্চিদানন্দ ভগবান মর্তধামে নামিয়া আসেন; চুম্বকের প্রতি সূচের মত ভক্তহৃদয়ের টানে দয়ানিধি মর্তধামে ভক্তজনের সহিত লীলাবিলাস করেন, ভক্তদের জন্মজন্মান্তরের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করেন।

পুরুষোত্তম ভগবানের নরলীলা অভিনয়ে পরিকরগণ তাঁহার প্রধান অবলম্বন। একাকী খেলা জমে না। লীলারঙ্গে দরকার সাঙ্গোপাঙ্গ। পূর্ণকাম পুরুষোত্তম প্রেমলুব্ধ ভক্তসঙ্গে প্রেমের লীলা করেন, লীলাকরদের সাহচর্যে যেন আনন্দের পূর্ণতা সম্ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষোত্তম নিজেই ভগবান-ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে দেখাইয়া বলিতেন, "এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।"[৩] এক এক পরিকরের ভূমিকায় এক এক ভাবের প্রাধান্য। পরিকরগণের প্রত্যেকের সহিত লীলানিধির সম্পর্কও আবার বিভিন্ন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "ঠাকুর নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে 'ভাবমুখে' থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার

১। কথামৃত ৫।১১।১।
২। পুঁথি, ৫ম সং, পৃঃ ৬১০।
৩। কথামৃত ৪।২৪।৩।

সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।…ঐ সকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্নজনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। যথা, শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন… ।”[১] তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব মানসপুত্র রাখালকে লইয়া যশোদারূপী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাসে বাৎসল্যরসের সম্ভোগ ঘটিয়াছে, অপরদিকে মাতাপুত্রের এই সুমধুর সম্পর্ক মাতৃ-ভাবে প্রবুদ্ধ যুগধর্মপ্রবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল —রামকৃষ্ণ-সত্তারই প্রতিফলন; শিশিরবিন্দুতে কিরণসিন্ধু মার্তণ্ডই প্রতিবিম্বিত, তেমনি রাখাল-চরিত্রের মাধ্যমে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। জননী যশোদার নয়নের মণি রাখাল অতি সুন্দর পবিত্র শিশু, শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের ধন রাখাল চির-বালক; তিনি মুমুক্ষুজনের সদ্‌গুরু, তিনিই ত্রিতাপদগ্ধ সংসারবাসীর লোকগুরু, আবার তিনিই রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কর্ণধার।

ভোগসবস্ব সভ্যতার দীপাবলী প্রজ্বলিত হইয়াছে উনবিংশ শতকের কলিকাতা মহানগরীতে। যুবকদল শ্যামাপোকার মত ছুটিয়া চলিয়াছে ভোগের আগুনে ঝাঁপ দিতে। 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই' আর্তনাদ তুলিয়া কিছু লোক ইতস্ততঃ ছুটাছুটিও করিতেছে।

মহানগরীর উপকণ্ঠে শ্রীশ্রীজগদম্বার মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণেশ্বর তপোবন। সেই তপোবনে পুরুষোত্তম ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন মানুষের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে। দ্বাদশ বৎসরের অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যার দ্বারা তিনি সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মসম্পদসুধা আহরণ করিয়াছেন। “তাঁহার জীবন সকল জাতির সকল শাস্ত্রের জীবন্ত টীকাস্বরূপ।” তাঁহার জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের অমর্তদ্যুতি মর্তলোকে আলোড়ন তুলিয়াছে। কামকাঞ্চনে মোহগ্রস্ত কলিকাতাবাসী মুগ্ধনয়নে দেখে পুরুষোত্তমের দিব্যজীবন, শোনে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী, ক্ষণেকের জন্য হইলেও যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পায়। সত্যদ্রষ্টা পুরুষের দিব্যসঙ্গে নবীন প্রবীণ সকলে পায় অনাবিল আনন্দ! অনেকেই পায় নূতন আলোকের সন্ধান; মনুষ্যজীবন ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহার যে একটি মহৎ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬-৭।

উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে, প্রেরণা লাভ করে। মানবজীবনের বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত লাভ করিয়া যাত্রা করে সুকঠিন পথে।

লীলাময় পরমপুরুষ দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বিরাজ করেন, ঘোষণা করেন, "যারা আন্তরিক জপধ্যান করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে।"[১] নিকট ও দূর হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সাধকবৃন্দ সমবেত হন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে; সেখানে অমৃতকুণ্ডে অবগাহন করিয়া জীবনের সকল প্রয়াসের সার্থকতা খুঁজিয়া পান। শুধু যাহাদের জীবন তপস্যাপূত তাঁহারাই আসেন না, আসেন সাধারণ তাপিত-ক্লিষ্ট মানুষও। দক্ষিণেশ্বর কুঞ্জে 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' খুলিয়া বসিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুপ্রস্ফুটিত পদ্মের গন্ধে ছুটিয়া আসে মধুকর; সেইসঙ্গে আসে সেইসব মক্ষিকাদলও যাহারা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া আহার সংগ্রহের জন্য 'ফুলেও বসে আবার বিষ্ঠাতেও বসে।' অগণিত নরনারী দক্ষিণেশ্বরে জমায়েত হয় শান্তিসুধা সংগ্রহ করিতে। কিন্তু দেখা গেল, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখ নিষ্কণ্টক করিবার পথ অনুসন্ধানেই অধিকাংশ লোকের ভীড়। প্রকৃত ধর্মকামী বা ধর্মোপদেশ ধারণে সমর্থ মানুষের সংখ্যা যৎসামান্য। পুরুষোত্তমের নিকট বিষয়াসক্ত লোকের সঙ্গ অসহ্য, পীড়াদায়ক বোধ হয়। তাই তিনি ব্যগ্র হইয়া খোঁজেন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের—তাঁহার নিত্যসঙ্গী লীলাপার্ষদদের। কালক্রমে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের লীলাস্থলীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘটে, উপস্থিত লীলাপার্ষদগণ জানিতে পারেন তাঁহারা কে এবং লীলাকর প্রভুর সহিত তাঁহাদের সম্পর্কই বা কি। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা বাউলের দলের প্রধান গায়েনের সঙ্গে সুরে সুর মিলাইয়া নৃত্যের তালে তাল ঠুকিয়া লীলাস্থলী রসমাধুর্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন।

ভাবরাজ্যের সম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্রের আগমনপ্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ শান্ত এক অপরাহ্ণকাল। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে বসিয়া আছেন, ভাবসাগরে তাঁহার মনতরী পাল তুলিয়াছে। তরঙ্গে উদ্বেলিত গঙ্গাবক্ষে সহসা তিনি ভাবচক্ষে দেখেন একটি অপরূপ-শোভন বিকশিত

১। তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ভাবে বলেছি,—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।" (কথামৃত ৪।২১।৫)

শতদল কমল। শতদলের উপর আনন্দমূর্তি শ্যামল কোমল বালকৃষ্ণ, তাঁহার পার্শ্বেই নৃত্যরত তাঁহারই সমবয়সী অপূর্বদর্শন এক বালক। নয়নাভিরাম সেই অপার্থিব দৃশ্য! দিব্য শিশুদের নৃত্যলহরী ভাবের রাজাকে অভিভূত করিয়া তুলিল, আনন্দের ঢেউ দেহতট ছাপাইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল। অল্পসময়ের মধ্যেই পটের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। কোন্নগর হইতে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন ভক্ত মনোমোহন মিত্র, সঙ্গে আনিয়াছেন তাঁহার নিকট-আত্মীয় এক যুবককে। তাঁহারা দুইজন ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। যুবকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই পরমপুরুষের হৃদয়সিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল। দেখেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন সত্তদৃষ্ট কমলদলে নৃত্যরত কৃষ্ণসখা। সহজেই সনাক্ত করেন তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বটতলার বালক ও জগন্মাতা-প্রতিশ্রুত মানসপুত্রকে। কিন্তু ভাবনিধি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে কোন আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইল না। তিনি স্মিতহাস্যে মনোমোহনকে বলিলেন, "এ সুন্দর আধার।" যুবকের নাম 'রাখালচন্দ্র' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন, অস্ফুটস্বরে শুধুমাত্র বলিলেন, "সেই নাম। রাখাল—ব্রজের রাখাল।" ভাব প্রশমিত হইলে তিনি যুবককে স্নেহ-সম্ভাষণ করিলেন, পুনরায় শীঘ্র একবার আসিবার আহ্বান জানাইলেন। পুরুষোত্তমের দর্শনে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে যুবক পূর্বে অননুভূত এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেন; বুঝিতে পারেন না 'মন কেন হয় উতলা?' যুবক সেদিন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ-আবর্তে।

রামকৃষ্ণাবতারলীলায় এই 'পিতাপুত্রে'র মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মণিকাঞ্চনযোগবিশেষ। অবতারলীলায় পিতাপুত্রের সম্বন্ধের তাৎপর্য সাংসারিক বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায় না। ভক্তলেখক দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে'—মানসপুত্র। ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার, যদি একথার তাৎপর্য হয়, পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন—রাখাল আমার ছেলে।" মহান জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের নিজহাতে গড়া তাঁহার মানসপুত্রের জীবন। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ সবল সুঠাম জীবনলেখ ধর্মজগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। এই জীবনস্রোতস্বিনীর আধ্যাত্মিক গভীরতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য,

কিন্তু তাহা লীলায়িত ছন্দে বহিয়া মানুষের সাধনভজনের ইতিবৃত্তের ঘাটেবাটে যে সুখস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে তাহা চয়ন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাপ্রেরিত শুদ্ধসত্ত্ব বালকের লীলানুধ্যান কথঞ্চিৎ সম্ভব। লীলানুধ্যানে উদ্দীপ্ত হৃদয় অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইবে, লীলাসুধার রসাস্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া 'ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা' লীলার সময় যাহা করিয়াছিলেন তাহার যথাসাধ্য অনুসরণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

জেলা ২৪পরগণা, মহকুমা বসিরহাটের অন্তর্গত শিকরা একটি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন গ্রাম। কলিকাতা হইতে উত্তরে ছত্রিশ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। বিখ্যাত 'আক্‌শার ঘোষ'[১] পরিবারের আনন্দমোহন ঘোষ গ্রামের জমিদার। এই অঞ্চলে তিনি একজন খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। আনন্দমোহনের প্রথম সন্তানরূপে রাখালচন্দ্রের আবির্ভাব। ভজন-আরাধনায় তুষ্ট ব্রজবিহারী অহৈতুকী কৃপা করিয়া দেবশিশু উপহার দিয়াছেন, মাতা কৈলাসকামিনী[২] এই স্থির বিশ্বাসে পুত্রের নামকরণ করিলেন রাখালচন্দ্র। সমৃদ্ধিশালী জমিদারবাড়ীর প্রথম সন্তানের জন্ম, আনন্দচঞ্চল হইয়া উঠে গ্রামবাসী। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি দিয়া আত্মীয় পরিজন শিশুর শুভ ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানায়। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, ১২৬৯ সালের ৮ মাঘ। ইংরাজি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি।

গ্রামীন স্নিগ্ধ শ্যামলিম পটভূমিকায় পিতামাতার স্নেহপীযূষে ও স্বজন-পরিজনের আদরযত্নে কমনীয় শিশুর প্রথম কয়েক পদক্ষেপ। আনন্দ-উচ্ছল বছর কয়েকটি বড়ই দ্রুতগামী, তাহাও করাল কালের আঘাতে যেন ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইল। শিশুর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর, সেইসময় মাতা কৈলাসকামিনী অকস্মাৎ মর্তলোক হইতে বিদায় লইলেন। শিশুর জীবন পত্রিকার প্রথম পাতাতেই নশ্বর জগৎপ্রপঞ্চের বাস্তবরূপ রূঢ় আঁচড় টানিয়া দিল। সংসারী বিষয়সম্পন্ন আনন্দমোহন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী হেমাঙ্গিনী সংসারে আসিয়া মাতৃহারা বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আন্তরিক স্নেহযত্নে বালকের মনের আঘাত মুছিয়া দিতে

১। মকরন্দ ঘোষ হইতে অধস্তন সপ্তমপুরুষ সদানন্দ ঘোষ আক্‌শা হইতে আসিয়া শিকরাতে বসবাস করিয়াছিলেন। এইজন্য পরিবারটি 'আক্‌শার ঘোষ' নামে পরিচিত।

২। বসিরহাটের নিকট টঁ্যাটরা গ্রামের ভবানীচরণ গণের পৌত্রী ও ক্ষীরোদনাথ গণের প্রথম পক্ষের কন্যা।

চেষ্টা করিলেন। হেমাঙ্গিনী দেবীর গোপাল, ভূপাল ও নেপাল নামে তিন পুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল।[১]

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালকের হৃদয়স্থিত দেবদ্বিজে ভক্তি বিকশিত হইতে থাকে। বালক নিজহাতে কালীপ্রতিমা গড়িয়া সঙ্গীদের সঙ্গে পূজা পূজা খেলিতে ভালবাসে। কখনও সে পুরোহিত সাজে, কখনও বা কামার হইয়া খেলার-পাঁঠা বলি দেয়। বালক গান ভালবাসে। ভিখারী বৈরাগীর নিকট হইতে কীর্তন শুনিয়া সহজেই শিখিয়া লয়। বালকের নায়কত্বে গৃহপ্রাঙ্গণের বোধনতলায় হরিনাম কীর্তন হয়, কখনও গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে তাল, কাঁঠাল, খেজুর গাছে ঘেরা পীরের দরগায় শ্যামাসঙ্গীতের আসর জমে, কখনও বা নির্জন প্রান্তরে ধ্যান ধ্যান খেলায় বালক স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। প্রাচীন দুর্গামণ্ডপে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়; আনন্দোচ্ছল শিশুরা খেলা করে, রাখাল সেই সময়ে পূজামণ্ডপে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে পূজা দেখে, আরাত্রিক দেখে। বালক সমবয়সীদের সঙ্গে কীর্তন-ভজন করিতে যেমন ভালবাসে, আবার তাহাদের সহিত চুকপাটি, নাদন প্রভৃতি গ্রাম্য জনপ্রিয় খেলাধূলায় তাহার অসীম উৎসাহ। পরিচিত অপরিচিত সকলের আদর ও স্নেহে সুদর্শন বালক আনন্দে-স্ফূর্তিতে শশীকলার ন্যায় বাড়িতে থাকে।

এক শুভদিনে হাতেখড়ি দিয়া বালকের লেখাপড়া আরম্ভ হইল। জমিদার আনন্দমোহনের ইচ্ছানুসারে বসতবাটীর নিকটে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয়। প্রসন্ন সরকার শিক্ষক নিযুক্ত হন; সেখানেই বালকের নিয়মিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। শ্রুতিধর বালক পাঠশালার পরীক্ষাগুলিতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকিল। আনন্দিত আনন্দমোহন পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। পাঠশালাতে সহপাঠীদের অঙ্গে বেত্রাঘাতে বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, চক্ষে জল ঝরিতে থাকিত। স্নেহপরায়ণ শিক্ষক মহাশয় বালকের চোখের জলে ব্যথিত হইয়া পাঠশালায় বেত্রদণ্ড রহিত করিয়া দেন। এই সময়েই দেখা যায় কিশোর রাখালের অবসর বিনোদনের দুইটি প্রিয় সখ,—ফুলফলের বাগান করা ও পুকুরে ছিপ ফেলিয়া নিবিষ্টমনে মাছ ধরা। পরবর্তীকালে আচার্যরূপে তাঁহাকে যখন সংসার মরুস্থানে স্থানে স্থানে শান্তির নীড় রামকৃষ্ণ-লীলা-উদ্যান রচনা করিতে এবং সংসার-সরোবর

১। অরুণ প্রকাশ ঘোষ: স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকরা কুলীনগ্রাম, পৃঃ ১৯

হইতে শুদ্ধ-পবিত্র মুমুক্ষুদের গুরুশক্তির আকর্ষণে টানিয়া আনিতে দেখা যায়, তখন স্বভাবতঃই বাল্যকালের এই দুইটি সখের বিষয় মনে পড়ে। এইভাবে শিকরা গ্রামের স্নেহাঞ্চলে কিশোরের বারটি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

উচ্চতর বিদ্যাদানের জন্য আনন্দমোহন পুত্রকে কলিকাতায় আনিলেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ। উত্তর কলিকাতায় বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে আনন্দমোহনের শ্বশুর শ্যামলাল সেন মহাশয়ের বাড়ীতে কিশোরের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। বাড়ীর নিকটবর্তী বিদ্যালয় ট্রেনিং একাডেমীতে রাখাল ভর্তি হইলেন। গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে অভ্যস্ত রাখাল কলিকাতা শহরের বদ্ধ হাওয়ায় কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন। বিদ্যালয় কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়া অপেক্ষা বিদ্যালয় সংলগ্ন ব্যায়ামাগার কিশোরের মন সহজেই অধিকার করিয়া বসিল। এই ব্যায়ামাগারে 'খাপখোলা তলোয়ার' নরেন্দ্রনাথের সহিত ধীর গম্ভীর রাখালচন্দ্রের মিলন ঘটে।[১] বয়সের হিসাবে নরেন্দ্রনাথ রাখালচন্দ্র অপেক্ষা মাত্র নয় দিনের বড়। নরেন্দ্রের পৌরুষব্যঞ্জক চাল-চলন ও সুমধুর কণ্ঠস্বর স্বভাবকোমল রাখালকে তাঁহার ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল। অবতারের দুই পার্ষদ যেন স্বাভাবিক আকর্ষণে কৈশোরেই গভীর প্রেমবন্ধনে চিরদিনের জন্য পরমাত্মীয় হইয়া উঠিলেন।

তদানীন্তন কলিকাতা মহানগরী ব্রাহ্ম-আন্দোলনে আলোড়িত। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট কিশোর যুবক সকলেই ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহী। নরেন্দ্রনাথ সহজাত ধর্মানুরাগের প্রেরণায় ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করিতেন। ধর্মানুরাগে ও বন্ধু নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে রাখালচন্দ্রও ব্রাহ্ম-আন্দোলনে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি সমাজের 'ওঁ পিতা নোহসি' প্রার্থনার মধ্যে পরমকারুণিক জগৎপিতার আরাধনায় তাঁহার স্ফুটনোন্মুখ ধর্মপিপাসু মনের সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিলেন। কয়েক বৎসর পরে আনুমানিক ১৮৮১ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে একদিন নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।[২] অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহারা একমাত্র নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের

১। ইহা প্রচলিত মত। কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের আলাপ হয় উভয়ের পরিচিত 'হেমালী' নামক এক যুবকের বাড়ীতে। 'হেমালী'র বাড়ীতে গানবাজনার আসর বসিত।

২। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে নরেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাখাল ঐরূপ অঙ্গীকারপত্রে সহি করেন।

উপাসনা ও ধ্যানধারণাদি করিবেন। অঙ্গীকার রক্ষা করিতে তাঁহারা আন্তরিক-ভাবে চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবেই অধ্যাত্মভাব বিকাশের ফলে অঙ্গীকারের অতি পরিমিত ধারণা রাখালচন্দ্রের নিকট অস্বস্তিকর মনে হইল, তিনি অঙ্গীকারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এই ধর্মজীবন-সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত ক্রমে ক্রমে অনুসরণ করিব।

ঐ সময় নরেন্দ্রনাথ ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন, ভূমি বা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেন। তাঁহার ও রাখালচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন এবং নিয়মিতভাবে ঈশ্বরারাধনা করা। দুজনেই সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন এবং মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে অম্বিকাচরণ গুহ পরিচালিত কুস্তির আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করিতেন। এইভাবে সুস্থ সবল শরীর-গঠন, ব্রহ্মচর্য-পালন, সমাজের উপাসনায় যোগদান ও গৃহে ধ্যানধারণা ইত্যাদি বিষয়ে রাখালচন্দ্র যেরূপ ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তাঁহার লেখাপড়ায় ঔদাসীন্যও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সাংসারিক বিষয়ে যুবকের অপর দশজন হইতে পৃথক আচরণ দেখিয়া তাহার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু সরাসরি কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। সচ্চরিত্র বহুগুণান্বিত যুবকের মনের সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। পাঠে অবহেলা ব্যতীত যুবকের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগও ছিল না। সাধারণ সাংসারিক যুক্তিতে আত্মীয়জনেরা ভাবিলেন যে, যুবককে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলেই তাঁহার সাংসারিক দায়িত্ববোধ আসিবে, বিষয়ানুরক্তিও বাড়িবে। ইহাদের পরামর্শে আনন্দমোহন ও শ্যামলাল উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নিকটেই সিমলা পল্লীতে কোন্নগরের সম্ভ্রান্ত মিত্রবংশীয় মনোমোহন মিত্র বাস করিতেন। মনোমোহনের পিতা ভুবন-মোহন মিত্র ছিলেন সরকারী ডাক্তার। সজ্জন ধর্মপ্রাণ মনোমোহন শ্যামলালের সহিত পরিচিত ছিলেন। মনোমোহন সেই সময় তাঁহার সেজ ভগিনী বিশ্বেশ্বরীকে পাত্রস্থ করিবার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। মনোমোহনের ভক্তিপ্রাণা মাতা শ্যামাসুন্দরীও সুদর্শন সুস্থ সবল যুবককে দেখিয়া পছন্দ করিলেন। অল্প আয়াসেই পাত্রী-নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হইল। বালকস্বভাব রাখালের বৈষয়িক কোন বিষয়েই তেমন আঁট ছিল না। পিতামাতার অনুগত রাখাল বিবাহ বিষয়ে কোন

ওজর আপত্তি তুলিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এক শুভদিনে বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালচন্দ্রের পরিণয় সম্পন্ন হইল। তখন রাখালচন্দ্রের বয়স প্রায় আঠারো এবং বিশ্বেশ্বরীর এগারো বৎসর। লীলাময় ভগবানের দুর্বোধ্য কলাকৌশল। আত্মীয়স্বজন রাখালচন্দ্রের সহজাত ভগবদ্মুখী মনকে বিবাহসূত্রে সংসারের মধ্যে স্থায়ীভাবে জড়াইতে চাহিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই বন্ধনসূত্রই সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করিবার এবং জগজ্জাল হইতে চিরমুক্তি লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

মনোমোহন, তাঁহার জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী, নিকট-আত্মীয় রামচন্দ্র[১] দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ভক্ত মনোমোহন ও তাঁহার জননী শ্রীরামকৃষ্ণকে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও সেবা করিতেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত আশীর্বাদলাভের উদ্দেশ্যে ভক্ত মনোমোহন ভগিনীপতি রাখালচন্দ্রকে বিবাহের পর একদিন দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুশিষ্য ও 'পিতাপুত্রের' এই মিলন রামকৃষ্ণাবতারলীলায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রেমবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া রাখালচন্দ্র ঘরে ফিরিলেন, বিদ্যালয়েও যোগদান করিলেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বর তপোবনের নিবিড় হাতছানি তাঁহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আশৈশব প্রাণের ভিতর তিনি এক অনির্বচনীয় অভাব বোধ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাঁহার সেই অভাব-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়ে আনন্দজ্যোতির স্ফুরণ হইল। তাহা ছাড়াও তিনি অজ্ঞাত কারণে দক্ষিণেশ্বরের অতুলনীয় মানুষটির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিলেন। কয়েক-দিনের মধ্যে বিদ্যালয় হইতে বাড়ী না ফিরিয়া তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাগ্রহে তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, সস্নেহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এখানে আসতে এত দেরী হ'ল কেন?" কি আর উত্তর দিবেন তিনি? মৌন রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপানে একান্ত নির্ভরতার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীশ্রীজগন্মাতা-প্রেরিত

১। রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন মনোমোহনের পিসতুতো ভাই। এদিকে নরেন্দ্রনাথও ছিলেন রামচন্দ্র দত্তের নিকট জ্ঞাতি।

বালককে আবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিলেন "মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নে যায় গো চেনা।" উভয়ের মধ্যে যেন একটি বোঝাপড়া হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে রাখালচন্দ্র দেখিলেন একাধারে পিতা, মাতা, প্রাণের সখা ও করুণাময় শ্রীগুরু। শ্রীরামকৃষ্ণও দেখিলেন শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ এক দেবশিশু, তাঁহার একান্ত আপনার জন, নয়নের মণি, অঞ্চলের নিধি। তিনি যুবককে নহবতে শ্রীসারদাদেবীর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীমা পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "নহবতে তিনি রাখালকে নিয়ে এলেন। বললেন, 'এই নাও তোমার ছেলে।' রাখাল আমায় প্রণাম করলো। আমি রাখালের মাথায় হাত দিয়ে ও চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেয়ে বললাম—ওঁকে প্রণাম কর বাবা। রাখাল ওঁকেও প্রণাম করলে। ঘরে যা মিষ্টি ছিল রাখালকে খেতে দিলাম। আমরা যেন রাখালের চিরপরিচিত, এইভাবে সে প্রথমদিন হতেই আমায় মা বলে ডাকতো। কি সরল মিষ্ট স্বভাব ছিল রাখালের"।...[১]

এই প্রসঙ্গে কয়েকমাস পরে নরেন্দ্রনাথ ও লাটুর একটি কথোপকথন অনুবৃত্তি করা যাইতে পারে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পরদিন সকালে নরেন্দ্রনাথের গৃহে কথাবার্তা হইতেছিল

নরেন—হ্যারে! ওখানে কি রাখাল যায়?

লাটু—যায়। এমন কি দু-এক রাত সেখানে থেকেও যায়। তাকে উনি বড় পেয়ার করেন। নিজের কাছে বসিয়ে কত খাওয়ান, তার সঙ্গে কত ফষ্টিনষ্টি করেন। সে দিন তিনি ওনাকে মার কাছে নিয়ে গেলেন—বল্লেন—'এই নাও গো, তোমার ছেলে এসেছে।' মার কত আনন্দ হলো! হামাদের উনি কতো সন্দেশ খাওয়ালেন।

নরেন—রাখালকে তাঁর ছেলে বল্লেন?

লাটু—সাচ্ বলছি, তাই শুনেছি।[২]

ইহার পর রাখালচন্দ্র তাঁহার সহজাত আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয়বার আসিলেন, চতুর্থবার আসিলেন, পুনরায় আসিলেন, বারংবার আসিতে লাগিলেন। নূতন বিবাহ হইয়াছে, বাড়ীতে নববধূ, আত্মীয়স্বজন ধন-জন-ঐশ্বর্য কোন কিছুর

১। দেশ পত্রিকা ৩১।৩।১৩৪৫ সাল, 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা'
২। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা পৃঃ ১০২।

অভাব নাই ; তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে কোমল হৃদয়তন্ত্রীতে যে টান অনুভব করেন তাহাতে সব পিছুটান ফেলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অনৈসর্গিক প্রেম-পীযূষধারা পান করিয়া তাঁহার দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত তৃষিত হৃদয় এক পরিতৃপ্ত জীবনের আস্বাদ পাইল—'ধনজনযৌবনগর্ব' তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃই আত্মীয়স্বজন এইবার অধিকতর চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, যুবকের খাপছাড়া আচরণ তাঁহারা তাঁহাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যুবককে সংসারধর্মের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে বারংবার বহু বুঝাইয়াও কোন ফল হইল না। বাধ্য হইয়া অভিভাবক শ্যামলাল যুবকের পিতা আনন্দমোহনকে বিস্তারিত জানাইলেন। আনন্দমোহনের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছাড়াও লবণ ও সরিষার বিপুল কারবার ছিল, এবং বিষয়-আশয় তদারকি করিতেই তিনি সবদা ব্যস্ত থাকিতেন। তবুও সকল আশা-ভরসার স্থল পুত্রের সংবাদে, বিশেষ করিয়া পুত্র দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা সাধুর কাছে পড়িয়া থাকে শুনিয়া চিন্তিত ও আশঙ্কিত না হইয়া পারিলেন না। তিনি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রের আচরণ লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন পুত্রের মধ্যে অনন্যসাধারণ অনেক গুণ, তাঁহার মধ্যে বিসদৃশ কোন পরিবর্তনও দেখিতে পাইলেন না ; শুধুমাত্র বিদ্যার্জন, সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা আমোদ-আহ্লাদ—এইসকল বিষয়ে তাঁহার বিতৃষ্ণা পূর্বাপেক্ষা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর সঙ্গগুণে "ধর্মবাতিক" বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে করিয়া তিনি পুত্রকে নরম-গরম নানা সুরে বুঝাইলেন ; ইহা কার্যকর না হওয়াতে ভয়ভীতি দেখাইতেও কসুর করিলেন না। এইসকল শাসনব্যবস্থা নম্রস্বভাব পুত্রের নিয়মিত ঈশ্বরারাধনা ও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ আনন্দমোহন ধৈর্যচ্যুত হইয়া যুবককে একদিন গৃহমধ্যে আটক করিলেন। আনুমানিক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহা ঘটিয়া থাকিবে। আবদ্ধগৃহে রাখাল ঠাকুরের দিব্যসঙ্গের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন। এদিকে রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে না পাইয়া ঠাকুর বৎসহারা গাভীর ন্যায় ছটফট করিতে থাকেন ; ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট আবেদন জানান, "মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।"

শ্রীশ্রীজগন্মাতার উপর সতত-নির্ভরশীল ঠাকুরের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকে না। পিতা আনন্দমোহন একদিন মোকদ্দমার কাগজপত্র গভীর মনোযোগের

সহিত দেখিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নজরবন্দী রাখাল। বন্দী রাখাল একসময়ে লক্ষ্য করিলেন, পিতা কাগজপত্রের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছেন, আশেপাশে কোনদিকে তাঁহার খেয়াল নাই। সুযোগ বুঝিয়া রাখাল ধীর পদক্ষেপে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং বাড়ীর কেহ টের পাইবার পূর্বেই দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বর পৌছাইয়া রাখাল তাঁহার আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের স্বস্তি অনুভব করিলেন; কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর ঠাকুর তাঁহার স্নেহের দুলালকে পাইয়া আদরে যত্নে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

পুত্রের পলায়ন ধরা পড়িল। কিন্তু একটি জটিল মোকদ্দমায় বিশেষ ব্যস্ত আনন্দমোহন পুত্রের সন্ধানে অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিলেন না; অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন রাখাল দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। এদিকে যে মামলার জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে রায় বাহির হইল, তিনি মামলাতে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। এই জয়লাভ দৈবকৃপা ব্যতীত সম্ভব ছিল না। আনন্দমোহনের প্রত্যয় হইল, ইহা পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। স্বভাবতঃই পুত্রের সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে যে একটি বিরূপভাব তাঁহার মনে দৃঢ় হইয়াছিল তাহা কতকাংশে হ্রাস পাইল। পুত্রকে কিভাবে সংসারে ফিরাইয়া আনা যায় সে সম্বন্ধে নানা জল্পনাকল্পনা করিতে করিতে আনন্দমোহন একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ দেখি!" রাখাল লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, আগন্তুক তাঁহার পিতাই বটে। তিনি ভয়ে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "ভয় কি? বাপ-মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কি না হতে পারে?" আনন্দমোহন ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার নিকটে বসাইলেন। রাখালও শ্রদ্ধাসহকারে পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সুমিষ্ট ব্যবহারে ও পুত্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতার ন্যায় স্নেহ-যত্ন লক্ষ্য করিয়া এবং পুত্রকে হাসিখুশি দেখিয়া আনন্দমোহন তাঁহার দক্ষিণেশ্বর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য যেন সাময়িকভাবে ভুলিয়া গেলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু-

মাত্র প্রার্থনা জানাইলেন, রাখালকে তিনি যেন তাঁহার ইচ্ছামত বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন।[১]

এই ঘটনার পর রাখাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকিয়া গেলেন। কখনও কখনও ঠাকুরের আদেশে একদিন দুইদিনের জন্য বাড়ী যাইতেন। আনন্দমোহন কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন বাস করিলে রাখালও ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে বাড়ী যাইয়া দিনকয়েকের জন্য থাকিতেন। রাখালের আকর্ষণে আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাঝে মাঝে আসিতেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার একবার দর্শনের যে বর্ণনা কথামৃতকার সবিস্তারে করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ মার্চ। ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়াছেন, রাখালের পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কথামৃতকার লিখিয়াছেন, "রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা করিতে হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইত্যাদি আসেন। রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন" (আশা করিতেন)।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা—রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি)—আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখতে পাবে,

১ গুরুদাস বর্মণ রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে" ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

"কিছুদিন পরে তিনি বিপন্মুক্ত হইয়া ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার ভক্তপুত্রের সাধুসহবাস এবং সাধুসেবার গুণেই এই মহাবিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতির পক্ষে আর কোনও আপত্তি তুলিলেন না।

রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার (রাখালের পিতার) মনোভাব বুঝিয়া একদিন সুযোগমত কহিলেন, 'হ্যাগা, রাখালকে আমায় দেও না, আমি ওকে বড় ভালবাসি; আর রাখালও এখানে থাকতে বড় ভালবাসে।"

'ব্রহ্মানন্দে'র পিতা যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন, কহিলেন, "সে কি মশাই, রাখাল ত আপনারই ছেলে, আমি ত নিমিত্ত মাত্র। তা আপনার কাছেই থাকবে, এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। বেশ কথা, আমার কোন আপত্তি নেই, থাকুক না; তবে আপনার ইচ্ছা হলে এক আধবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" (উদ্বোধন ১০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা; তাই ঠোঁট নড়ে।

"এ সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমাপাখীর কথা আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়্‌তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়্‌তে পড়্‌তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়্‌তে থাকে। কিন্তু তখনও এত উঁচু যে পড়্‌তে পড়্‌তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর প'ড়ে যাব! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল। যা'তে মার কাছে পৌঁছতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া।

"এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা। কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।

"যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি—এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোলাগাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে ব'লে কি অন্য গাছ হবে?

"আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য) যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে!"[১]

অন্যান্য ভক্তদের সহিত অবাকবিস্ময়ে আনন্দমোহন শোনেন পুত্রের প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহার আশাস্বপ্ন বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়, পুত্র বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়, আশঙ্কায় বুক দুর দুর করিয়া উঠে। 'তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ', বিষয়সংসারী তিনি, সহজে হাল ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। পুত্রের ভবিষ্যতের ভাবনা লইয়া চিন্তিত আনন্দমোহন গৃহে ফিরিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তাহার (রাখালের) বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক-একবার বাড়িতে

১ কথামৃত ২।২।৬।

পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশে রাখাল কখনও কখনও বাড়ী যাইতেন। একদিন সন্দেহ উপস্থিত হইল। সরলচিত্ত রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি পিতার উচ্ছিষ্ট কি খাইতে পারেন? ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, "সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব'।"[২] এইরূপ সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও পরিবেশের মধ্য দিয়া ভক্তজনকে নিঃশ্রেয়স আনন্দমার্গে পরিচালিত করাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব।

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের নিকট আত্মীয়গণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "শ্বশুর-বাড়ির তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা-যাওয়া ছিল।"[৩] সংসারের প্রতি রাখালের প্রবল অনাসক্তি লক্ষ্য করিয়া আত্মীয়স্বজনেরা শ্যামাসুন্দরীর নিকট আক্ষেপ করিতেন; জামাই শেষে সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে পারে, এই ইঙ্গিতও দিতেন। ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী এইসকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না, বরং বলিতেন, "কি আর করব বল? জামাই সাধু হবে—সে তো ভাগ্যের কথা!" এদিকে আনন্দমোহনের শ্বশুর শ্যামলাল সেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেববাণী শুনিয়া শান্তি লাভ করেন। এইভাবে বিভিন্ন যোগাযোগের ফলে প্রধান অন্তরায়গুলি অপসারিত হইলে রাখাল নিশ্চিন্তমনে দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ীভাবে থাকিতে লাগিলেন। কথামৃতকার ৫।১।৮৪ তারিখে লিপিবদ্ধ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ। 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', ১৩৭৯, পৃঃ ৫৮
২ কথামৃত ২।১৩।৪
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ ভাগ, পৃঃ ৫৮

করিয়াছেন,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে।" স্নেহকাতর জননীর ন্যায় ঠাকুর তাঁহার রাখালকে সর্বপ্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। একদিন ভক্ত মনোমোহনের নিকট ঠাকুর শুনিলেন যে, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ পরামর্শ দিয়াছেন যে, রাখাল বাড়ীঘর বিবাহিত পত্নী ছাড়িয়া যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট রহিয়াছে এ বিষয়ে আদালতে নালিশ করা চলে। রুষ্ট জননীর ন্যায় ঠাকুর ফোঁস করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কে রে সুরেন্দ্র? তার সতরঞ্চ আর বালিশ এখানে আছে। আর সে টাকা দেয়?"[১] বলা বাহুল্য, এই কথা সুরেন্দ্রের কানে উঠিলে ঐ বিষয় সেখানেই ক্ষান্ত হয়, কোর্ট-আদালত পর্যন্ত ব্যাপার গড়ায় নাই।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তপোবন রাখালের আপন ঘরবাড়ী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কয়েকমাস সেখানে বসবাস করিবার পর দেখা গেল রাখালের শরীর ভাল যাইতেছে না। তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি কলিকাতায় ভক্ত অধর সেন বা ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবু পারতপক্ষে নিজের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে থাকিতে চাহিতেন না। দেখা যাইত, রাখাল একান্তভাবে চাহিতেন ঠাকুরের নিকট সদাসর্বদা থাকিতে, ঠাকুরও রাখালকে কাছে না পাইলে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "দক্ষিণেশ্বরে রাখাল মহারাজ যেদিন থাকতেন, সেদিন উনি ভারী খুশী হতেন।" মহাপুরুষ মহারাজও এই সময়কার তাঁহার এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন, "মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে না থাকলে ঠাকুরের খুব কষ্ট হ'ত। একদিন রাত্রে একটার সময় বারান্দায় এসে আমাকে বল্লেন, 'ওরে একটু গোপাল নাম আমায় শোনা ত'।' আমি প্রায় একঘন্টা তাই করলুম। কোন কোনদিন দুপুর রাত্রে কাকেও না পেলে, দারোয়ানকে ডাকিয়ে রামনাম শুনতেন। শুধু নাম।"[২] তাঁহাদের মধ্যে এক লোকাতীত সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, সেই কারণেই বোধকরি এত আকর্ষণ।

* * * *

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মানসপুত্র রাখালের মধ্যে যে ভাবের লীলাবিলাস ঘটিয়াছিল, তাহা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমাপরিসীমার বাহিরে। তাঁহাদের অতিমানবিক সম্পর্ক বিচ্ছুরিত হইয়াছে ঘটনারাজির বিভিন্ন উপলখণ্ডে,

১ কথামৃত ৪।১৮।৫
২ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা, তাং ২।১।১৯৩০

তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, পুলকিত হই। বিচার-বিশ্লেষণের নিরর্থক চেষ্টা না করিয়া 'মুকাস্বাদনবৎ' রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হই।

ঘটনারাজির দিকে আমরা সাধারণ বুদ্ধি লইয়া দৃষ্টিপাত করিলে উহাদের তাৎপর্যও বুঝিতে পারি না, সম্যক আস্বাদনও করিতে পারি না। এই বিষয়ে লীলাকর ও তাঁহার পার্ষদদের বিভিন্ন উক্তি অনুধ্যান করিলে সামান্য কিছু ধারণা করিতে পারা যায়। রাখালচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কোন কোন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নলিখিত বাণী লীলাপ্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন-চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না।...

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক্ হইয়া যাইত! আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি!—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না!"[১]

১।১।১৮৮৩ তারিখের একটি মনোহর ঘটনা 'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম ভাগ), ঐ, পৃঃ ৫৮-৫৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে পাই মনোরম এক বর্ণনা :

তদুপরি শ্রীপ্রভুর বাৎসল্য-সঞ্চার।
সম্বোধিয়া ডাকিতেন গোপাল আমার
রাখালবিহনে যেন গাভী বৎসহারা।
হইল রাখাল দুটি নয়নের তারা॥

*

মরি কি মধুর খেলা কি কহিতে পারি।
সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ লীলা নরদেহ ধরি॥
নূতন সম্পর্ক নয় আপ্তগণ সনে।
চিরকাল বাঁধা না চিনালে কেবা চিনে॥ (পুঁথি পৃঃ ৩১২)

বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইলেন; অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন? দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।...

"কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা, ঈশ্বরী মূর্তি। সে মূর্তিতে ঐশ্বর্যের বেশী প্রকাশ। তারপর দর্শন দ্বিভুজা—তখন দশ হাত নাই—অত অস্ত্রশস্ত্র নাই। তারপর গোপাল মূর্তি দর্শন,—কোনও ঐশ্বর্য নাই কেবল কচি ছেলের মূর্তি।"

ভগবানের অবতরণে ঐশ্বর্যের ভাগ কেন কমিয়া থাকে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারমশাইকে বলিয়াছিলেন, "যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়—চক্ষু ঝলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন।"[১]

৯।৩।১৮৮৩ তারিখের 'শ্রীম'র লিপিতে পাওয়া যায় এই ভাবেরই রেশ। "ঠাকুর আজকাল যশোদার ন্যায় বাৎসল্যরসে সর্বদা আপ্লুত হইয়া থাকেন. তাই রাখালকে কাছে সঙ্গে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের রাখালের সম্বন্ধে গোপালভাব। যেমন মা'র কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর ভর দিয়া বসিতেন। যেন মাই খাচ্ছেন।"[২]

২৯।৩।১৮৮৩ তারিখের লিপিতে আরেক অপরূপ দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। "একদিকে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বর-প্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু—সহজেই বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব! ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সব স্থির! 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির! ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস

১ কথামৃত ৩।৫।২
২ কথামৃত ৫।৪।২

বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে! আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে! এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়?"[১]

৪।৬।১৮৮৩ তারিখেও অনুরণিত হইতেছে ঐ একই ভাবের ব্যঞ্জনা। "বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্যবদন—গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন। রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।"[২]

প্রকৃতপক্ষে কথামৃতকারের দিনলিপি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় রাখালকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে উর্জিতা বাৎসল্যভাব প্রায় অব্যাহতভাবে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিয়াছে, অবশ্য রাখালকে জননীর ন্যায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতে মর্তলীলার শেষদিন পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। যে রাখালকে দেখিবামাত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঐ দেবদুর্লভ ভাবের উদয় হইত তাঁহার সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে ভক্তবৃন্দকে বলরামভবনে বলিয়াছিলেন, "মা, তোমায় বলেছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাও, আমার মত, তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ!"[৩] অপর একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মানসপুত্রের সম্পর্ক কবি-কল্পনার বস্তু নহে, অধ্যাত্ম-জগতের একটি বাস্তব ঘটনা। তাঁহাদের মধ্যে যে অমর্ত্য সম্পর্ক তাহার আভাস কথামৃতকার উল্লিখিত ৮।৬।১৮৮৩ তারিখের একটি ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভাবে রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আমি অনেকদিন এখানে এসেছি! তুই কবে এলি?' ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার—আর রাখাল তাঁহার একজন পার্ষদ—অন্তরঙ্গ?"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ জননী-যশোদার মত রাখালের মাথায় চিবুকে পিঠে স্নেহভরে হাত বুলাইতেন, আদর করিতেন, আবার কখনও বালকের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হইতেন বা কুস্তির মহড়া দিতেন। তিনি তাঁহাকে প্রেমভরে ননী-মাখন খাওয়াইতেন, সকল

১ কথামৃত ১।৫।১
২ কথামৃত ২।৬।১
৩ কথামৃত ৫।৬।১
৪ কথামৃত ২।১১।২
৫ কথামৃত ৪।৫।১

প্রকার আপদ-বিপদ হইতে তাঁহাকে আগলাইয়া রাখিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর, রাখালচন্দ্রের কুড়ি। কিন্তু ভাবরাজ্যে বয়সের পরিমাপ কোন বাধা নয়। অপূর্ব মনোহর তাঁহাদের এই অলৌকিক লীলা-বিলাস। চিরন্তন তাঁহাদের এই মধুর সম্পর্ক। রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, নিত্যদাস; শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের নিত্যপ্রভু, পরমদয়াল পিতা। উভয়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়া পুঁথিকার গাহিয়াছেন, 'সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা চিরকাল।'

ভাবরাজ্যের ক্রমিক ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে দেখা যায়, রামলীলাবিগ্রহ অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে রাজমাতা কৌশল্যার বাৎসল্যভাবের স্ফুরণ ও পুষ্টিসাধন হইয়াছিল, পুনরায় রাখালরাজকে আশ্রয় করিয়া যশোদার ভাবস্ফূর্তিতে সেই বাৎসল্যরস শতগুণে বর্ধিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের এই পর্বে বাৎসল্যভাব সন্তানভাবের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এবং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-সখা ব্রজের রাখাল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রিয় সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বজননীর চিরশরণ লইয়াছিলেন, মানসপুত্র রাখালও সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর ভাবস্ফূর্তি দেখিয়া তদ্‌গতচিত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—ভাবসমুদ্রের লীলালহরীর সুন্দর একটি চিত্রকল্প সৃষ্টি হইয়াছিল।

* * * *

ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালচন্দ্রের মধ্যে যে ব্যবহারাদি দেখা যাইত তাহারই অনুরণন চলিত সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতেও। শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নহে, শ্রীশ্রীমায়ের আচরণাদি হইতেও প্রতীতি হইত যে রাখাল মায়িক সম্পর্কের পুত্রের চাইতেও প্রিয়জন ছিলেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "রাখাল, শরৎ-টরৎ, এরা সব আপনার (আমার) শরীর থেকে বেরিয়েছে।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণির স্নেহের ধন রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিলে বা থাকিলে তাঁহার অশনবসনের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি হইত। অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বা বারান্দায় শয়ন করিতেন, রাখাল একটি ক্যাম্পখাটে ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করিতেন। অন্যেরা মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিতেন, রাখাল বসিতেন ঠাকুরের কোল ঘেঁষিয়া। রাখালের জন্য প্রসাদের

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃঃ

মিছরি-মাখন, তাঁহার প্রিয় খাদ্য খিচুড়ির ব্যবস্থা হইত।[১] তাঁহার জন্য এইসকল বিশেষ ব্যবস্থাদির বিষয় কেহ উত্থাপন করিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "রাখাল যে ছেলে।" একদিন রাত্রে পিপাসার্ত ঠাকুর রাখালকে কুঁজো হইতে জল ঢালিয়া একটি পাত্রে দিতে বলিলেন। জল দিতে পারিবেন না জানাইয়া রাখাল অর্ধ-তন্দ্রার আবেশে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে বলিয়াছিলেন, "এখন বুঝেছি রাখাল আমাকে ঠিক ঠিক বাপ বলেই জানে।"

কোন কারণে রাখালের শরীর অসুস্থ হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যধিক ব্যস্ত হইতেন, কিসে অসুখের আরাম হইবে তাহার জন্য চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন। দক্ষিণেশ্বরের এক অপূর্ব ঘটনা কথামৃতকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ। "রাখালের অসুখ। এইকথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন···'এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা'।"

"এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন!"[২] আবার কখনও ব্যাকুল হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, ৺চণ্ডীর নিকট, ৺সিদ্ধেশ্বরীর নিকট রাখালের মঙ্গল কামনায় মানসিক করিতেন।

সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতেও রাখালের প্রত্যেক আচরণের মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক বালকত্বই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং তাঁহার সকল আচরণের মধ্যে 'চিরকিশোর' রাখালরাজের বালকভাবটি উঁকিঝুকি দিত। পুঁথিকারের লিখনে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল॥ ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে। রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে॥"[৩] এই সহজ বালকভাবটি ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, "দেখছ না, রাখালের কেমন বালকভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি!"[৪]

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ
২ কথামৃত ১।৫।১
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২৭৫
৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১

বালকভাবাপন্ন রাখালের সম্পর্কে একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন শ্রীমা ঃ "ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল-টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের বড় ক্ষিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে', ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হ'তে বলরামবাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুর তো আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে আয় না রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। ক্ষিদে পেয়েছে বললি যে।' রাখাল তখন রাগ ক'রে বলতে লাগল, 'আপনি অমন ক'রে সকলের সামনে ক্ষিদে পেয়েছে বললেন কেন?' তিনি বললেন, 'তাতে কি রে, ক্ষিদে পেয়েছে, খাবি তা বলতে দোষ কি?' তাঁর ঐ রকমই স্বভাব ছিল কি-না।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইলেন।

দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের মধ্যে যে সহজ প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাহার পরিচায়ক ছোট একটি ঘটনার কথা কথামৃতকার লিখিয়াছেন। "এই সময় রাখাল ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিতেছেন। কিন্তু অনেকে ঘরে আছেন বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেন মা যশোদার বাৎসল্যভাব!

"শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—খা না রে! এরা না হয় উঠে দাঁড়াক। (একজন ভক্তের প্রতি) রাখালের জন্য বরফ রাখো। (রাখালের প্রতি) বনহুগলি তুই আবার যাবি? রৌদ্রে যাস্ নি।...

"রাখাল খাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বারান্দায় বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।"

আরেকটি ছোট ঘটনা। আপন জন রাখালের সহিত যেন একাত্ম হইয়া রহিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর। অপরাহ্নে ভক্ত বলরাম ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "হাঁ গো, ও সব মানতে হয়। এই দেখ না, রাখালের অসুখ, আমারো হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল কি জানো? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৩৯

আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য)! হাঁ গো লক্ষণ দেখতে হয়।…" বিস্মিত ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণলীলামাধুর্য আস্বাদন করিয়া ধন্য জ্ঞান করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে রাখাল সর্বদাই সরলচিত্ত এক বালক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে অধর সেনের শোভাবাজারের বাড়ীতে চণ্ডীর গানের আসর বসে; তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা যোগদান করেন। ভক্ত রামচন্দ্র দত্তকে সংবাদ জানাইবার দায়িত্ব ছিল রাখালের উপর, তিনি ভুলিয়া গিয়া সংবাদ দিতে পারিলেন না। অসন্তুষ্ট রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখাল সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "রাখালের দোষ ধরতে নাই; গলা টিপলে দুধ বেরোয়।"

দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ভগবদ্‌চিন্তা, আরাধনা, ভজন দিবারাত্র চলিয়াছিল। তপস্যা-উজ্জ্বল দিনগুলির মাঝে মাঝে তপোবনের অধিবাসীদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের উচ্ছলতা প্রকাশ পাইত; তাহাও ছিল মাধুর্যময়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ত্যাখো না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরল।…শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।"[১] বালকস্বভাব রাখালের সম্বন্ধে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার হইতে একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। একদিন মধ্যাহ্নে ঠাকুর আহারান্তে তদীয় মানসপুত্র রাখালকে পান সাজিয়া আনিতে বলিলেন—"ওগো রাখাল! পান সাজা নেই, কিছু পান সেজে আনো না।" রাখাল বলিল, "পান সাজতে ত জানি না!" রাখালের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে! পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? পান সাজা আবার শিখতে হয় না কি রে? যা, পান সেজে নিয়ে আয়।" তথাপি রাখাল সেই কার্যে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া সেবক লাটু মনে মনে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; লাটুর বিরক্তি রাখাল গ্রাহ্য করিলেন না, পুনঃ পুনঃ অবহেলা করিতে লাগিলেন। লাটু তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; ঠাকুরের সমক্ষেই বলিয়া বসিলেন, "ওকি কথা? রাখালবাবু! ওনার সামনে এমোন ভাবে কথা বলতে আছে কি? আপুনি ওনার আদেশ শুনছেন না,

১ কথামৃত ৪।২১।২

আবার তার উপর কথা বলছেন—এ আপনার কেমন ব্যাভার ?" লাটুর উষ্মাযুক্ত কথাতে রাখাল চটিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠেন, "তোর গরজ থাকে তুই সেজে নিয়ে আয় না। আমি পারবো না। জীবনে ওকাজ কোন দিন করি নি, আজ ওনার আদেশে আমি পান সাজি আর কি !" রাখালের এই কথাতে লাটু সত্য সত্যই ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং আধা হিন্দী আধা বাংলায় অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুরের খুব আমোদ হইল, তিনি রামলালকে ডাকিলেন, "ও রামনেলো ! রাখাল-লেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে।" রামলাল উপস্থিত হইয়া দেখেন তখনও বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছে। ঠাকুর ব্যঙ্গচ্ছলে রামলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ তো কে বেশী ভক্ত—রাখাল না লেটো ?" রামলাল বলিলেন, "মনে হয়, রাখালই বেশী ভক্ত।" রামলালের কথা শুনিয়া লাটু সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, উনার কথা শুনলেন না, উনি হলেন ভারী ভক্ত !" হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক বলেছিস, রামনেলো ! রাখালেরই ভক্তি বেশী। দেখ দিকিনি ! রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর ঐ দেখ কেমন রেগে গেছে ! যার ভক্তি বেশী সে কি এর (নিজের শরীর দেখাইয়া) সামনে রাগ দেখাতে পারে ? ক্রোধ ত চণ্ডাল ! ক্রোধে ভক্তি শ্রদ্ধা সব উবে যায়।" ঠাকুরের কথায় লাটু লজ্জায় অভিমানে সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "হাম্‌নে আর আপুনার সামনে রাগ দেখাবে না। হামাকে এবারের মত মাফ করুন।" তাঁহার চোখে জল দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ ! রাখাল ঠিক বলেছে রে। এটার (নিজের দেহ দেখাইয়া) পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল কি না ! তাই রাখাল সে কথা ঠেলে ফেলে দিতে পারলে। এর ভেতর যিনি আছেন, তাঁর পান খাবার ইচ্ছে হলে রাখালের সাধ্য কি তাঁর কথা ঠেলতে পারে ?[১] শেষ পর্যন্ত লাটুই পান সাজিলেন। এই ঘটনার মধ্যে রাখালের সহজাত বালক ভাবটি বিশেষ লক্ষণীয়।

রসিকচূড়ামণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রসে-বসে থাকিতেন। ভক্তিভক্ত লইয়া বিলাস করিতেন। তিনি অপর ভক্তদের বিশেষভাবে অন্তরঙ্গদিগকে বিবিধ রস পরিবেশন করিয়া আনন্দ দিতেন। কখনও বা ছোক্‌রা ভক্তদের লইয়া ফষ্টিনষ্টির ফোয়ারা ছুটাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি এদের (ছোক্‌রাদের) কেবল

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১০২-১০৪

নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁশ ধোয়া জল একটু একটু দিই।"[১] আনন্দময় পুরুষের আনন্দস্ফূর্তিদানের শক্তি উল্লেখ করিয়া রাখাল বরাহনগর মঠে লাটু প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, "ওরে! আমরা আর কি করছি? উনি (ঠাকুর) যে আমাদের চেয়েও আমুদে ছিলেন। এক একদিন এমন হাসাতেন যে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হোতো, আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করতুম, 'একটু থামুন, হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়ে গেল যে!' এক একদিন ত হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেতো।"[২] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সন্তানদের সহজ আনন্দের মধ্য দিয়া বৈরাগ্যের অভয় পথে পরিচালিত করিতেন। এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখিলে তিনি হুঁশিয়ার করিয়া দিতেন, "ওকি, শুকনো সাধু হবি কেন?" তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তানগণ 'রসে-বসে' থাকিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যাইত শ্রীরামকৃষ্ণ-মুষায়-দ্রুত চরিত্র রাখালচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্য বাহিরের আনন্দধারায় ঝরিয়া পড়িত, আনন্দপিয়াসী মানুষকে আকর্ষণ করিত, এবং শুদ্ধ ভক্তহৃদয়ে ভাবনৃত্যের নিক্কণ ঝঙ্কৃত হইত।

রাখাল কখনও বা দুইহাত কুস্তি লড়িতেন। এবিষয়ে সাকরেদ ছিলেন লাটু। ১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগের কথা। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "একদিন (হাতভাঙ্গার সময়কার ঘটনা) তিনি (ঠাকুর) রাখাল বাবুকে হামার সাথে কুস্তী লড়তে দেখলেন। রাখাল বাবু আগে কুস্তী লড়তো, বেশ জোয়ান ছিলো; অম্বু বাবুর আখ্ড়ায় যেতো। কুস্তীর সময় রাখাল বাবু হামাকে মাটীতে ফেলতে পারতো না, হামিও রাখাল বাবুকে নীচে নামাতে পারতুম না। তাই না দেখে উনি বললেন, "ওগো! তোমাদের যে গজ-কচ্ছপের মত যুদ্ধ চলছে গো। কেউ কাউকে হারাতে পারছো না, দু-জনই বরাবর যাচ্ছ।"[৩] এইভাবে সাধনভজনের সাথে সাথে আমোদ-স্ফূর্তি, খেলাধুলা চলিতে থাকিত।

*　　*　　*　　*

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে রাখালচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহার নিকট আসেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গে রাখাল আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি দিবারাত্র ঠাকুরের নিকটেই ঘোরাফেরা করিতেন, অন্যত্র

১ কথামৃত ৪।২০।৪
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃঃ ২৮৪
৩ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃঃ ১৪৭-৪৮

কোথাও যাইতেন না। তিনি কখনও ঠাকুরের পদসেবা করিতেন, কখনও স্নানের সময় তেল মাখাইয়া দিতেন, কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল—ঠাকুরের নিকট সদাসর্বদা থাকা ও ঠাকুরের ভাবাবস্থায় তাঁহার দেহ সর্বতোভাবে রক্ষা করা। ঠাকুর কলিকাতায় কোন ভক্তগৃহে বা যাত্রা-থিয়েটারে, যেখানেই যাইতেন, সঙ্গে থাকিতেন রাখাল। ভাবাবস্থায় ঠাকুর নির্দিষ্ট কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের শুদ্ধ দেহ ধারণ ছাড়াও অপর একটি কারণ ঠাকুর নির্দেশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন রাখাল। ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আমার অমনি অবস্থা যে কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে বসিয়েছিলাম।" এইভাবে দিবারাত্র বিভিন্ন পরিবেশে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য রাখালের হইয়াছিল ; স্বামী সারদানন্দও লিখিয়াছেন, "তাঁহার (রাখাল) মত অপর কেহই ঠাকুরের পূতসঙ্গ করেন নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত রাখাল ক্রমেই ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সমগ্র সত্তা রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালের যে আলাপ-পরিচয়[১] হইয়াছিল তাহা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয় দক্ষিণেশ্বর তপোবনে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে

---

১ স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে আমরা জানিতে পারি, নরেন্দ্র ও রাখাল—উভয়ের পরিচিত সমবয়সী হেমালী ও আরও কয়েকজন যুবককে সঙ্গে লইয়া মাথাপিছু চার আনা করিয়া ভাড়ায় একখানি শেয়ারের নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম আগমন।

ইহার পূর্বে রাখাল তিন-চারবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই ছিলেন দলের পথপ্রদর্শক। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহাকে একবার সুরেন মিত্রের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গানও শুনিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার গান শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা ; সেদিন গেয়েছিলে বেশ লেগেছিল শুনতে।" নরেন্দ্রনাথ গাহিলেন, 'মন চল নিজ নিকেতনে'। ভাবাবিষ্ট পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, "দেখ, কেমন সরস্বতীর আভা বেরুচ্ছে, কেমন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে।" তিনি নরেন্দ্রকে বারান্দায় লইয়া যাইয়া তাঁহার হাতে লুচি ও মিষ্টান্নাদি দিলেন। নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া সেই খাবার বন্ধুদের বন্টন করিয়া দিলেন। নরেন্দ্রকে ঠাকুর আর একদিন একাকী আসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অপর যুবকদের কালীমন্দির প্রভৃতি দর্শন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ঘরে থাকিলেন নরেন্দ্র ও রাখাল। আরও কিছু সময় অতিবাহিত হইলে রাখাল ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিলেন। পরে কাশীপুরে নরেন্দ্র একদিন কথায় কথায় রাখালকে বলেন যে ঠাকুর তাঁহাকে ঐদিন 'নারায়ণ ঋষি', 'নর-ঋষি' বলিয়া স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন।

কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ়বদ্ধ হয়; প্রেমসম্পর্ক দাঁড়ায় 'হরি-হর আত্মা'র মত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাখাল যখন কয়েক মাসের জন্য বৃন্দাবনে থাকেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় বাস করেন; সেই সময় ঠাকুরের হাড়শুদ্ধ ভক্ত বাবুরাম ঠাকুরের সেবা করিতেন। বাবুরামের সহিত রাখালের আলাপ-পরিচয় হয় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের শ্যামপুকুরস্থিত মেট্রোপলিটন (শাখা) স্কুলে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাখাল কিছুদিনের জন্য ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন। অবশ্য সেই সময়ে তাঁহার লেখাপড়ায় ঔদাসীন্য চরমে উঠে এবং কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ করিয়া দেন। রাখালই একদিন ভক্তিপ্রাণ সহপাঠী বাবুরামকে বিদ্যালয়ের ছুটির পরে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। বাবুরামকে দেখিয়াই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সনাক্ত করেন অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে; তাঁহার কার্যসাধনের জন্য কুটোবাঁধা হইয়া আছেন। রাখালের দেখাদেখি বাবুরামেরও ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হয় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিতে। অন্তরায় হয় বাবুরামের আত্মীয়গণ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামের বিষয়ে ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "আমি যখন বলি 'চলে আয় না', তখন বেশ বলে, 'আপনি করে নিন্ না।' রাখালকে দেখে কাঁদে। বলে, 'ও বেশ আছে।'" ঠাকুরের সম্মোহন আকর্ষণে বাবুরাম কিছুকাল পরে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে আরম্ভ করেন।

ক্রমে ক্রমে কলমীদলের কলমীগুলি একে একে জুটিতে থাকে। কলমীদামের জট্ বাধিতে থাকে। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।"[১] কলমীদলের লাটু ও বুড়োগোপাল আসেন, আসেন নরেন্দ্র, বাবুরাম—আসেন আরও অনেকে। আসেন চিহ্নিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বসিয়া প্রেমঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে আকর্ষণ করেন তাঁহার পার্ষদদিগকে। সকলেই অনুভব করেন তীব্র এক আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আকর্ষণের রহস্য বুঝাইয়া বলিয়াছেন, "হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্‌কী লেগে যায়!"[২]

অবতারপুরুষের লীলাবিলাসে মাধুর্যমণ্ডিত এক পর্বের সূত্রপাত হয়। বহু

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা। ২য় ভাগ। ৮৮ পৃঃ

২ কথামৃত ৪।২০।২

জনহিতকল্পে লীলাবিলাসের প্রচার হয়, প্রসার ঘটে। লোকসংগ্রহের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। নরলীলায় ঈশ্বরাবতার নিজে শুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করেন, অন্তরঙ্গ পার্ষদ-গণকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমদান করেন। পার্ষদবর্গ দিব্য প্রেমরস আস্বাদন করেন, সেইসঙ্গে লোকশিক্ষার্থে প্রেমরহস্য শিক্ষা করেন। অবতারের অবতরণে নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। অবতার তাঁহার সুমহান লীলাশক্তির সাহায্যে যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। সেই যুগধর্ম সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্টিসাধন ও সম্প্রসারণ করেন সেই আধিকারিক পুরুষগণ, যাঁহারা অবতারের পার্ষদরূপে নির্বাচিত। এই বিষয়েও জয়রামবাটীতে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর উক্তি স্মরণযোগ্য: "ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি।...তেমন প্রধান প্রধান কটি থাকে? অনেক থাকে কি? টোকো আম অনেক পাওয়া যায়, ফজলি আম কি বেশী পাওয়া যায়? সাধারণ লোক কত জন্মাচ্ছে মরছে। এই সব সর্বপ্রধান যাঁরা, তাঁরাই ভগবানের কার্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসেন।"[১] লীলাবিলাসের প্রধানদের অর্থাৎ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে যুগধর্মসংস্থাপনকার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য অবতারপুরুষ তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা দেন, যোগ্য লোক-শিক্ষকরূপে গড়িয়া তোলেন।[২] কিন্তু অবতারলীলাতত্ত্বের দৃষ্টিতে অসীম শক্তিধর মহাপুরুষদের সাধনভজন শিক্ষা-দীক্ষা লীলা বৈ ত নয়। শুদ্ধমাত্র অপরের কল্যাণাকাঙ্খায় তাঁহাদের বিশেষ ভূমিকার যে প্রস্তুতি তাহাতেও প্রকটিত হয় লীলামাধুর্য, সাধ্য-সাধনার ইতিহাসে রাখিয়া যায় এক অমর কাহিনী, ভক্তচিত্তের চিরকালের ধন 'লীলা-রস-বাখানি।'

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা। ২য় ভাগ। ১৭৯ পৃঃ

২ "কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার আত্মাকে দেখিতে পাইতেন।......অনেক সময় তিনি মানুষের মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করিতেন, যে সম্পর্কে সেই শক্তির অধিকারী বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না। আত্মার এই বিরাট নির্মাতা তাঁহার অগ্নিময় অঙ্গুলির প্রয়োগে বিবেকানন্দের ন্যায় কঠিন ধাতুকে এবং ব্রহ্মানন্দের মতো সুকোমল নবনীত বস্তুকে আপনার ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।......কোন্ মানুষ কি উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে নিয়োগ করিতেন। রামকৃষ্ণের শ্যেনদৃষ্টি কখনো ব্যর্থ হয় নাই" (রোমাঁ রঁল্যা: রামকৃষ্ণের জীবন, অনুবাদক: ঋষি দাস, পৃঃ ১৬১)

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে

লীলাগুণমণি যে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া লীলামঞ্চে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার নিজের এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরকালের এক নিবিড় সম্পর্ক। প্রেমময় লীলাগুণমণি দক্ষিণেশ্বর লীলাস্থলীতে প্রেমের দরবার বসাইয়াছেন। তীব্র মধুর আকর্ষণে পার্ষদগণ একে একে সেখানে উপস্থিত হন। স্বল্প পরিচয়েই একে অপরকে চিনিতে পারেন, অন্তরঙ্গগণ পরস্পরকে আপনার হইতে আপন বলিয়া জানিতে পারেন। লীলাময় অবতারের নির্দেশনায় অন্তরঙ্গগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানাগারে গবেষণায় নিরত হন, তাঁহারা ক্রমে আবিষ্কার করেন নিজেদের প্রকৃত পরিচয়; পরমকারুণিক ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য ধারণা করেন, বুঝিতে শিখেন অবতারের লীলাখেলায় তাঁহাদের স্বকীয় ভূমিকা।

সংসারমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া অবধি রাখালচন্দ্র তাঁহার সরলমনে বিস্ফারিতনয়নে গৃহপরিজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন সেই পরমদয়িতের সন্ধান পাইলেন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে রাখালচন্দ্র তাঁহার পরমপ্রেমাস্পদকে পাইলেন। শুধু কি তাই? প্রেমাস্পদের প্রেমদ্যুতিতে তিনি তাঁহার নিজ দৈব-সত্তাকে আবিষ্কার করিলেন। লীলাগুণমণির প্রেমস্পর্শে রাখালরাজের রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইল, প্রেমপ্রস্রবণে চতুর্দিক প্লাবিত হইল। এই প্রেম-মাধুর্যের আঙ্গিকে মহান্ জীবন-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যলীলাসহচর রাখালচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তাকে অপরূপ এক রূপ দান করিতে উদ্যোগী হইলেন।

রাখালচন্দ্রের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওদের কেমন জান ঃ—ফল আগে তারপর ফুল। আগে দর্শন,—তার পর গুণ মহিমা শ্রবণ, তারপর মিলন!"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন, "নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল, এই সব ছোকরা, এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।"[২] শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর

১ কথামৃত ৪।২৩।৮

২ কথামৃত ১।৫।২

হইতে রাখালচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত যতই বাড়িতে থাকে, মনের পটে ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি ততই ক্ষীণ হইতে থাকে, সেইসঙ্গে মনসায়রে পঙ্কজদাম ছড়াইয়া পড়ে,—অপরূপদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ-কমলকোরক প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। উহার দিব্যগন্ধ সৌন্দর্য শরীরমনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মাধুর্যমণ্ডিত দিব্যজীবনের প্রকাশ ঘটে। স্বভাবতই অন্যান্যদের দৃষ্টি পড়ে তাঁহার উপর। জন্মে জন্মে ঈশ্বরভক্ত নিত্যসিদ্ধ রাখালচন্দ্রের সামান্যতেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। ভগবদ্‌নামগুণকীর্তনে ভাবসাগর উদ্বেল হইয়া মনতটে প্রচণ্ড আঘাত করে, শরীরের বাঁধন শিথিল হয়, ইন্দ্রিয়াদি স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। সামান্য উদ্দীপনাতে তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। দক্ষিণেশ্বরের এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "এইখানে বসে পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌তে লাগল ; তারপর একেবারে স্থির !"[১]

"দ্বিতীয়বার ভাব বলরামের বাটীতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।" এই ঘটনার তারিখ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের দোলযাত্রার দিন। বলরামভবনে হরিনাম-সংকীর্তনে ভক্তবৃন্দ মাতিয়া উঠিয়াছেন, কয়েকজন ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমে সকলে শান্ত হইলে দেখা গেল ভাবাবিষ্ট রাখালচন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বক্ষে শ্রীহস্ত স্থাপন করিয়া 'শান্ত হও' 'শান্ত হও' বলিতেছেন।" অনুমান ইহার কাছাকাছি কোন সময়ে লাটু রাখালচন্দ্রকে বলরামভবনে ভাবাবেশে প্রথম নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন।[২]

রাখালচন্দ্রের মধ্যে দুর্লভ ধর্মভাবের স্ফুরণ দেখিয়া উপস্থিত সাধক ভক্ত সকলেই বিস্মিত হয়। রাখালচন্দ্রের মন যেন শুষ্ক দিয়াশলাই, সামান্য ঘর্ষণেই দপ্‌ করিয়া ভাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। আপাতরহস্যময় ভাবস্ফুরণের তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক—যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘসলেই আগুন,—আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।"[৩]

১ কথামৃত ৪।২০।২
২ লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১১২
৩ কথামৃত ৩।৯।৪

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে সামান্য উদ্দীপনাতে রাখাল ভাবাবিষ্ট হইতেন আবার ঠাকুর যেখানে উপস্থিত নাই সেইস্থানেও সামান্য উদ্দীপনাতে তাঁহার আবেশ হইত, এমনি সুনিপুণভাবে তাঁহার সাধনবীণা সাধা হইতেছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী। পঞ্চবটীতলে 'শ্রীম' (মাস্টারমশায়) "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়" গানটি গাহিতেছিলেন। শুনিয়া রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম হইল। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মনের আনন্দে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "ইনি (শ্রীম) আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।"

শ্রীহরির নাম-সংকীর্তনে যেরূপ, সেইরূপ শ্রীশ্রীজগন্মাতার অনুধ্যানে রাখালচন্দ্রের ভাবসায়র উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, ভাবের তরঙ্গ দেহ-ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য স্তব্ধ করিয়া দিয়া বদনমণ্ডলে ও দেহে রাখিয়া যাইত দিব্য আনন্দদ্যুতি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের একদিন রাত্রিবেলা ভক্ত মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহার ঘরে ব্রহ্মচক্র রচনা করিয়াছেন। সকলে ধ্যানে বসিয়াছেন। কিছুসময়ের মধ্যে রাখালের ভাবাবেশ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বুকে হস্ত স্থাপনপূর্বক জগন্মাতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার ভাবসম্বরণ হইল। ভাবরাজ্যের সম্রাট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার মানসপুত্রের এই অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে সহজ ও স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইতেন, কার্যকারণ নিরূপণ করিতে পারিতেন না। যে ভাবভক্তি, প্রেম লাভ করিবার জন্য সাধকগণ জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধ হইতে পারেন না, সেইসকল দেবদুর্লভ ভাবভক্তির ঐশ্বর্য রাখালচন্দ্রের সহজেই আয়ত্ত দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত না হইয়া পারিতেন না। ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আর নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোঁয়ারা বুজে আছে। মিস্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্ ফর্ ক'রে জল বেরুতে লাগল! নিত্য সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।"[১] গুরুরূপী মিস্ত্রী খেলাছলে স্বাভাবিক ভাব-প্রস্রবণের মুখটি খুলিয়া দিলে ভাবভক্তির অমৃত-সুধা শতধারায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

১ কথামৃত ২।৩।৪

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"[১] ঈশ্বরকোটি কাহাকে বলে এবং এই শ্রেণীর লোকের সহিত সাধারণ মানুষের প্রভেদ বা কোথায় ইহা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামমন্দিরে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বরলাভ করতে পারে, তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটি—তারা যেন রাজার ঘেটা; সাততলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে ঐ পর্যন্ত।"[২] তবুও নরলীলার পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ে, সার্থক লোকশিক্ষার জন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের লৌকিক জীবনের সকল ব্যাপারে, এমন কি সাধনভজন বিষয়েও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত ক্রমাভিব্যক্তি দেখা যায়। শ্রীগুরুর সাহচর্যে রাখালচন্দ্রের জীবনপথ বিকশিত হইতে থাকে নিজস্ব একটি ধারা অনুসারে। সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট সূত্র "নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে"[৩] স্মরণে রাখিয়া রাখালচন্দ্রের সাধনভজনের সকল প্রচেষ্টা বিচার করিতে হইবে।

ভগবদপাদপদ্মে শরণাগত সাধক ভক্তিবিশ্বাসের পাল তুলিয়া কৃপামলয়ে কখনও ধীর কখনও দ্রুতগতিতে সচ্চিদানন্দ-সাগর অভিমুখে চলিতে থাকে। সাধন-তরীর শক্তিসামর্থ্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী গুরুরূপী কাণ্ডারী সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া সাধককে পরিচালিত করেন। ভাবই ধর্মসাধনদীপের সলিতা! 'ভাবেন লভতে সর্বম্ ভাবেন দেবদর্শনম্'। ভাবের ভাব ধরিয়া সচ্চিদানন্দ গুরু ভগবদ্রসপিয়াসী সাধককে অগ্রসর করাইয়া দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ করিতেন, "রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে।"[৪] সাকার উপাসনার সিড়ি ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকেন রাখালচন্দ্র। সহজাত জ্বলন্ত বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, অটুট শ্রদ্ধা ও অকুতোভয়ে প্রাণপাতী প্রচেষ্টা রাখালচন্দ্রের অতুলনীয়

১ কথামৃত ১।৭।৬
২ কথামৃত ৩।১৪।৩
৩ কথামৃত ৩।৯।৪
৪ কথামৃত ৪।২০।২

সাধনতরীকে পরমপদসঙ্গম অভিমুখে লইয়া যায়। উপরি-উক্ত সাধনমার্গের নিশানা দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হ'য়ে ভক্তির উপদেশ দেন—শরণাগত হ'তে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়,—জ্ঞান, বিজ্ঞান সব হয়।"[১] ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন ভগবানের অবতরণে ভক্তিরই প্রাধান্য—উর্জিতা ভক্তির রসবিলাস ঘটে।

ব্রাহ্মসমাজে লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া রাখাল সাকার উপাসনা করিতেছেন জানিতে পারিয়া বন্ধুবর নরেন্দ্র তাঁহাকে একদিন তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। রাখাল চুপ করিয়া ভর্ৎসনা শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি যে অরূপ রূপের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা বন্ধুবরকে কিভাবে বুঝাইবেন? ইহার পর রাখাল তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে থাকেন। দামী গাছের চারাগুলিকে স্নেহের ও শাসনের বেড়া দিয়া আগলাইয়া রাখিতেন লীলা-উদ্যানের মালী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অগ্রসর হইয়া নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, রাখালকে আর কিছু বলিসনি।··· তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে বল?" 'রাখালের সাকারের আর নরেন্দ্রের নিরাকারের ঘর।' এই দুই দেবশিশুকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া লীলাময় ভগবান লীলাবিলাস করিয়াছেন। অখণ্ডের ঋষি বীরভক্ত নরেন্দ্রনাথ জ্ঞান-কৃপাণ লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অপরদিকে ত্রিগুণাতীত বালকমূর্তি রাখালচন্দ্র ভক্তির ফাগ্ লইয়া মাতিয়াছেন।

গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের নিকট অধ্যাত্মজীবনের গূঢ় রহস্যাদি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তাঁহার শরীর মনকে উচ্চশক্তির ধারক ও বাহক হইবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। শ্রীগুরু কখনও নিয়ম-শাসনের বাঁধনের দ্বারা, কখনও খুঁটিনাটি আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিয়া, কখনও সাধন ভজনের বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া শিষ্যের শুভ সংস্কার-রাশিকে উদ্বুদ্ধ করেন; ফলতঃ সজাগ সাধক ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করিয়া, হৃদয়করঙ্গে নির্মল কৃপাবারি ধারণ করিয়া ইষ্টাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হন।

নিখুঁত সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাধক উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না

১ কথামৃত ৫।১২।৫

থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর সবটাই ছিল নজির। তিনি পরমসত্য লাভ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব কিছু সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "সব মাকে দিতে পারলুম সত্য মাকে দিতে পারলুম না।" রাখাল যাহাতে সত্যনিষ্ঠাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সে বিষয়ে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একদিনের ঘটনা—মহারাজ[১] বেলুড় মঠে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে (ঠাকুর) বলছেন,—'কিরে, তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে—কিছু কু-কাজ করেছিস ?' আমরা তখন জানতুম,—চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ করলেই কু-কাজ হয়। বললুম—না। তিনি তখন বললেন, 'তুই কি কোন মিছে কথা বলেছিস ?' তখন মনে পড়ল—কাল হাসিঠাট্টা করতে করতে গল্পছলে একটা মিছে কথা বলেছিলুম।"[২] বিস্মিত রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "অমন কাজ আর করিসনি। কলিযুগে এই সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কায়মনোবাক্যে সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা কিরূপ দেদীপ্যমান ছিল তাহা স্মরণ করিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই না ছিল ! খেতে বসেও যদি বলে ফেলতেন 'খাব না', তবে আর খাওয়া হত না। একদিন যদু মল্লিকের বাগানে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড়ে সে কথা ভুলে গেছেন, আমিও আর কিছু বলি নি। রাত্রে খাওয়ার পর মনে পড়েছে। তখন অনেক রাত্রি, কিন্তু যেতেই হবে। আমি লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলুম—গিয়ে দেখি সব বন্ধ, সকলে ঘুমুচ্ছে। তখন বৈঠকখানার দরজা ফাঁক করে ভিতরে পা গলিয়ে দিয়ে এলেন।"[৩] সত্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সাহচর্যে রাখালের জীবনে সত্যনিষ্ঠা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি পরবর্তীকালে প্রায়ই বলিতেন, "যে মিছে কথা বলে বা মিথ্যাচার করে—তার জপ-তপ সব বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে এরূপ ধারণা করে দিয়েছেন যে, আমরা বুঝেছি অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে, কিন্তু মিথ্যাবাদীর ও মিথ্যাচারীর অপরাধের কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।" শ্রীমাতা-

১ 'রাখাল' পরবর্তীকালে 'মহারাজ' নামে রামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত হইয়াছিলেন
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৪১
৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ১৭৩

ঠাকুরাণীও বলিতেন ঠাকুরের উক্তি "যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।"[১]

বালকস্বভাব রাখাল একদিন ঠাকুরের অনুমতি না লইয়াই মা কালীর প্রসাদ নিজে হাতে লইয়া খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শাসন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহারাজ বরাহনগর মঠে শশী মহারাজ প্রভৃতিকে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বললেন, 'তোর দিকে চাইতে পারছি না। তুই কেন এ কর্ম করলি! আমি কাঁদতে লাগলুম।" এই ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, "অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখন আনিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল! তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই তো ভারী লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনিই মাখন লইয়া খাইলি?' সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনও ঐরূপ করে নাই।"[২]

রাখাল একদিন রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে একটি পয়সা কুড়াইয়া পাইলেন। সরল রাখাল তাঁহার সকল কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেন; পয়সা কুড়াইয়া পাওয়ার কথাও বলিলেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন, বলিলেন, "যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"[৩] ছোটখাট আচার-আচরণের মধ্য দিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার রাখালকে মনের মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সুদক্ষ মালী যেরূপ তাহার দামী গাছের চারাটির রক্ষণাবেক্ষণ করে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও রাখালের চতুষ্পার্শ্বে সর্বকলুষহারী স্নেহের বেড়া দিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিত না; রাখালের মধ্যে যখনই কোন অকল্যাণকর চিন্তা বা আচরণ তাঁহার নজরে আসিয়াছে অথবা অশুভ কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই উহা

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা/২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৯
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম ভাগ), পৃঃ ৫৯
৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৪৫

হইতে রাখালকে মুক্ত রাখিবার জন্য লৌকিক অলৌকিক নানা উপায়ের আশ্রয় লইয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিকে যাতায়াতকালের একটি ঘটনা মহারাজ বিবৃত করিয়াছিলেন—"এই আমারই এক সময়ে একটা মলিন ভাব এসেছিল। ঠাকুর আমাকে দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'তোর ভিতর একটা মলিনতা এসেছে দেখছি।' এই ব'লে মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় করে বললেন, অমনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কুভাব কেটে গেল।"[১] এই ধরণের কত অলৌকিক ঘটনাই দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ঘটিয়াছে, তাহার অতি সামান্যই আমরা জানিতে পারি। অপর একদিন কোন একটি অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়া বালকস্বভাব রাখাল খুবই অনুতপ্ত হইলেন। এই ঘটনার বিবরণ মহারাজ নিজেই দিয়াছিলেন, "একদিন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, তার জন্য অনুতাপও হচ্ছে। কি করি, তাঁর কাছে বলতে গেলুম। যেতেই বললেন, গাড়ু নিয়ে চল, পায়খানায় যাব। পায়খানা থেকে ফিরবার সময় নিজেই বলছেন, 'তুই কাল অমুক অন্যায় কাজ করেছিস, অমন আর করিস নে।' আমি ত শুনেই অবাক! ভাবলুম, কি করে জানলেন!"[২] বিস্মিত রাখাল অসীম শক্তিধর ঠাকুরের কৃপা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; মন হইতে সকল দুঃখ দূর হইল। রাখালের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য যে, কোন একটি বিষয়ে একবার নিষেধ বা সাবধান করিয়া দিলে ঐ দোষ সম্বন্ধে তাঁহার মন চির-নির্মুক্ত হইয়া যাইত।

বালকস্বভাব রাখাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম হইতেই অতি আপনজনের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনজনের সঙ্গেই মান-অভিমানের পালা জমে। মান-অভিমানের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে রাখালের সরলতাই প্রকাশ পাইত, অপরদিকে প্রকটিত হইত স্নেহপরায়ণা জননীর ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বতোমুখী কল্যাণচিন্তা। আমরা কয়েকটি ঘটনা অনুসরণ করিলেই ইহা বুঝিতে পারিব।

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালীন স্মৃতি রোমন্থন করিতে করিতে মহারাজ বেলুড় মঠে একদিন বলিয়াছিলেন, "তাঁর কাছে কত আবদারই না করতুম। একদিন তেল মাখতে মাখতে কি একটু বলেছিলেন, অমনি রেগে শিশি ফেলে দিয়ে হন্ হন্

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা—১০৬
২ ঐ পৃষ্ঠা —৪০

করে চললুম। কিন্তু যদু মল্লিকের বাগানের কাছে গিয়ে আর যেতে পারলুম না—বসে পড়লুম। এদিকে ঠাকুর রামলাল দাদাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ডাকতে। ফিরে আসতে বললেন, 'দেখলি, যেতে পারলি? গণ্ডি দিয়ে রেখেছিলুম।' "[১] প্রত্যক্ষদর্শী লাটু মহারাজ এই ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছিলেন, "একদিন রাখালকে ঠাকুর তেল মাখাতে বললেন। তেলের শিশি হাতে করে রাখালের মনে কি হোলো কে জানে! দেখি রাখাল বারাণ্ডা থেকে নেমে চলেছে। ঠাকুরকে বলতে শুনলুম,—'কোথা যাবি যা না দেখি, এখানকেই আসতে হবেক।' রাখাল সোজা বাহিরে যেতে লাগলো, বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে এসে তার কি মনে হোলো। অমনি ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির। রাখালকে আসতে দেখে উনি বললেন,—'কি রে! যেতে পারলি নি?' রাখাল কাঁদতে লাগলো।"[২]

সেইদিনই (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই) বিকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ছোট তক্তাপোষে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। ঘরে রাখাল ও মাস্টার বসিয়াছিলেন। আমরা কথামৃতকারের অনুলিপি অনুসরণ করিব। তিনি লিখিয়াছেন, "কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, 'মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?' ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, 'মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে'।"[৩] ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়।...'

"(মাস্টারের প্রতি) ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'রলে, তিনি না পালন ক'রলে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা—৪০

২ শ্রীশ্রীলাটুমহার'জের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১০৫

৩ স্বামী অশোকানন্দের মতানুসারে, "......he (Sri Ramkrishna) foresaw that his disciple would one day play an important part in his work, for the Divine Mother had revealed to him that She had given Rakhal a portion (one-sixteenth) of Her power for that purpose." (Swami Ashokananda-Swami Brahmananda, Vedanta Society o Northern California, San Fran.-cisco. 1970, p. 3)

জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'রতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

"রাখাল—'মন-মত্ত-করী!'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে।"[১]

অপর একদিন রাখাল কোন কারণে ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। একদিন কি দুইদিন পরে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অধর সেনের শোভাবাজারের বাড়ীতে আসিলেন। সন্ধ্যার পর অধরের বৈঠকখানায় সংকীর্তন ও নৃত্যাদিতে মাতোয়ারা হইয়া ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিলেন। কীর্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। উপস্থিত রাখালকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল খুব হুড় হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্‌লুম, মা, এর অপরাধ নিস্‌নি।"[২] বলা বাহুল্য, রাখালের অভিমান দূর হইল, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কত বিষয়েই না ঠাকুর রাখালকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছিলেন, আর কত অভিনব ছিল সে সকল শিক্ষাপদ্ধতি। লাটু মহারাজ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেনঃ "জানো! দশহরার দিন হামাদের সব উনি গঙ্গাপূজা করতে বললেন। রাখালকে বললেন—'গঙ্গামায়ী সাক্ষাৎ দেবী, আজকে তাঁর পূজা করতে হয়।' রাখাল ভাই গঙ্গামায়ীকে তখন দেবী ভাবতেন না। তাই না শুনে ঠাকুর একটি ঘটনা বললেন। একদিন তিনি পোস্তার ধারে বেড়াচ্ছেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে সন্দেহ হোলো—গঙ্গামায়ী দেবী কি না। এমন সময় তিনি শুনলেন যে, গঙ্গার মাঝে খুব শাঁকের আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। ক্রমে ক্রমে শাঁকের আওয়াজ খুব কাছে এসে গেলো, অমনি দেখলেন কি না, একটি ছেলে শাঁক বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে, আর তাঁর পিছু পিছু এক দেবী চলেছেন। এ সব দেখবার পর তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

১ কথামৃত ১।৬।৩

২ কথামৃত ৫।৭।৪।

ঠাকুরের এই কথা শুনে রাখালভাই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলো, বললেন—'আমাদের অতশত জানা নেই, আমরা জানি গঙ্গা ত নদী, স্রোতের জল, মাঝিমাল্লারা ওখানে কতো প্রস্রাব করে থাকে।' রাখালভাই-এর কথা শুনে ঠাকুর ভারী রাগ করলেন, বললেন,—'খবরদার! গঙ্গায় কখনো বাহ্যে-প্রস্রাব করবি নি।' "[১]

ঠাকুরের উপদেশ নির্দেশ ছাড়াও প্রাকৃত অবস্থার মধ্যে ঠাকুরের আচরণাদি লক্ষ্য করিয়া রাখাল অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন, ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় মহৎ গুণগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ কথামৃতকার-কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে তথায় গিয়াছিলেন। যথারীতি প্রার্থনা উপাসনাদি সাঙ্গ হইল। "রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)—কিরে কেউ ডাকে না যে রে!

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয়, চলে আসুন—দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোস্—গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে!—রোক্ করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোক্! আর এত রাত্রে যাই কোথা!

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসান হইল। স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল—ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নুন টাক্না দিয়া লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর দয়াসিন্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে।

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা ১২৭—২৮

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীভাড়া কে দিবে?...গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে।—তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দু'আনা আর দিলে না! বলে, ঐতেই হবে।"[১] অহর্নিশি ভগবদ্‌ভাবে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তবুও তাঁহার ব্যবহারে অদোষদর্শিতা, অভিমানশূন্যতা, সর্বোপরি দোষী-নির্দোষী সকলের প্রতি যে কল্যাণেচ্ছা সদা বিদ্যমান তাহা রাখালের মনে গভীর রেখাপাত করিল। এই ধরণের অনেক ঘটনাই উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনবোধে নিবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

* * *

দক্ষিণেশ্বর তপোবনে জমজমাট আধ্যাত্মিকভাব। মনে, বনে, ঘরের কোণে সেখানে গোপনে সাধনভজনে নিরত সাধকবৃন্দ। নিজেদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহারা পরবর্তী পর্যায়ের উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। রাখাল ঐসকল কথা শোনেন, ঐসকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের ইচ্ছা তাঁহারও হয়, তিনি ঠাকুরকে তাঁহার মনের ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করিয়া তিনি বিধিমত ঈশ্বর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। এই কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পরবর্তীকালে মহারাজের শ্রীমুখ হইতে জানা গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেকে ঠাকুরের নিকট গল্প করত যে তাদের নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ভাব হচ্ছে। এই কথা শুনে কোন এক বালক এইরূপ কিছু করে দিতে ঠাকুরকে বিশেষ করে অনুরোধ করে। তাহাতে তিনি বলেন, 'ছাখ, নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যানভজন করতে করতে তবে ও অবস্থা আসে। ক্রমে ক্রমে সব হয়ে যাবে।' এই ঘটনার দুই-একদিন বাদে ঠাকুর একদিন সন্ধ্যার সময় ভবতারিণীর...মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। বালক মন্দিরের কাছে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস না পেয়ে সম্মুখে নাটমন্দিরে বসে ধ্যান করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সে দেখতে পেলে যে কোটি সূর্যের ন্যায় একটা উজ্জ্বল জ্যোতি গর্ভমন্দির থেকে বের হয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। তখন সে ভয়ে নাটমন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের ঘরে পালিয়ে এল। ইহার অল্পক্ষণ পরে ঠাকুর ভবতারিণীর মন্দির হতে ফিরে এসে বালককে তাঁর ঘরে দেখতে

১ কথামৃত ৪।৪।১

পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে বসেছিলি ?' বালক উত্তর দিল 'হ্যাঁ' এবং ধ্যান করতে বসে মন্দিরে জ্যোতিদর্শন ও ভয়ে পালিয়ে আসা—ইত্যাদি ঘটনা আনুপূর্বিক ঠাকুরের নিকট বলল। এইসব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'তুই বলিস, কিছু দেখতে পাই না, ধ্যান করে কি হবে ? আবার কিছু দেখতে পেলে পালিয়ে আসিস কেন ?' "[1] বালক আর কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, কাহিনীর বালক বক্তা স্বয়ং।

রাখাল নিয়মিতভাবে ধ্যানজপ করিতে থাকেন। প্রাথমিক বাধা-বিপত্তিসকল অল্প আয়াসেই দূর হইয়া যায় ; দোলায়মান মন স্থির হইয়া যায় ; আনন্দের আস্বাদন সাধনপথের অগ্রগতিকে সহজ করিয়া তোলে। প্রথম প্রথম সাধকের জীবনে উচ্চাবচ গতি। যে মন আনন্দ-আস্বাদনে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ওঠে, তাহাই সময় বিশেষে চঞ্চল হইয়া বিমর্ষ হইয়া যায়, কখনও বা তাহা তীব্র আকার ধারণ করিয়া অশান্তির আগুনের হলকায় সাধককে অস্থির করিয়া তোলে। একদিন ভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করিতে বসিয়া রাখাল তাঁহার মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না, বিরক্তিতে ক্ষোভে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। আশ্চর্য, রাখাল দেখিলেন স্নেহশীলা জননীর সজাগ করুণা-দৃষ্টি লইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই এর মধ্যেই উঠে পড়লি ? কি হয়েছে, তোর মুখ এত মলিন কেন ?" রাখাল মনের অবস্থা অকপটভাবে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর রাখালের জিভ টানিয়া তিনটি রেখা টানিয়া দিলেন এবং বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন। মহাপুরুষের কৃপাবাতাসে দুশ্চিন্তার কৃষ্ণমেঘ অপসারিত হইল ; রাখালের মুখে হাসি ফুটিল। "যা, এখন বস গে যা" বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর তাঁহার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন রাখালচন্দ্র শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যানে তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় ভাবাবিষ্ট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ টলিতে টলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র আর ঐ দেখ তোর ইষ্ট।" সহসা শ্রীগুরুর অপার কৃপা লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল সাধক বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখেন জ্যোতির্ময় আনন্দ-

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ২৫—২৬

ঘন ইষ্টমূর্তি। আনন্দে আত্মহারা সাধক শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিয়া ইষ্টধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন।

রাখালের জপে ছিল গভীর নিষ্ঠা, তিনি সর্বক্ষণ জপে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সর্বাবস্থায় দেখা যাইত তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছে। রাখালের ন্যায় ত্রিগুণাতীত ভক্তের বালকস্বভাব। ঈশ্বরের শুদ্ধ নামগুণগান করাই তাঁহার পূজা। রাখালের জপনিষ্ঠা দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত, তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। একদিন তিনি ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রতো। আমি দেখে স্থির থাক্‌তে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।"[১] শাস্ত্রবাক্য 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। অজপা জপে সিদ্ধ মহারাজকে পরবর্তীকালে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত "খুব জপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এযুগে যোগ যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এইভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।"[২]

ইহার কাছাকাছি সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ দিয়াছিলেন, "মনে এইরূপ depression (নৈরাশ্য) আসা স্বাভাবিক। আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার ঐরূপ হয়েছিল। আমার বয়স তখন কম, আর ঠাকুরের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ। কাজেই মনের সব কথা তাঁকে বলতে লজ্জা হতো। একদিন কালীঘরে ধ্যান করছি—কিছুই হচ্ছে না—মনটা ভারি খারাপ হলো; ভাবলুম—এতদিন এখানে আছি, কিছুই ত হলো না! কি নিয়েই বা থাকা যায়? দূর ছাই, ওঁকেও কিছু বলছি না, আর দু'তিন দিন এরূপভাব থাকলে বাড়ী চলে যাব। সেখানে মন পাঁচটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এইসব ভেবে কালীঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, ঠাকুর তখন বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন—আমায় দেখে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের তখন নিয়ম ছিল, কালীঘর থেকে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জলটল খাওয়া। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন তিনি বললেন, 'ত্যাখ্, তুই যখন কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম, তোর মনটা যেন জালে ঢাকা রয়েছে।' আমি ভাবলুম, তাইত, তিমি যে সব জেনেছেন। আমি বললুম, 'আমার মন যে

১ কথামৃত ২।৬।২
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৬১—৬২

এরূপ খারাপ হয়েছে তা ত আপনি সব জেনেছেন।' তিনি তখন আমার জিভে কি একটা লিখে দিলেন, অমনি আমি আগেকার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর হয়ে গেলুম। তাঁর কাছে যখন ছিলুম, তখন সর্বদা একটা আনন্দে ভরপুর থাকতুম।"[১]

অন্য একদিন রাখাল পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বসিয়াছেন। মন ধ্যানপথে বেশীদুর অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট তাঁহার অসুবিধা নিবেদন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আসন ত্যাগ করিতে যাইতেছেন, দেখিলেন ঠাকুর দূর হইতে হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। পরে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বিঘ্ন এসে তোর মনকে অশান্ত করে তুলেছে।" রাখালের মস্তকোপরি তিনি তাঁহার শ্রীহস্ত স্থাপন করিলেন, রাখালের চিত্ত নির্মল শান্ত হইল, মন ধ্যানমুখী হইল। উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তম আচার্যের ন্যায় রাখালকে সর্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত কাহিনীর মত সাধনার আলপথে রাখালের হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখালও সদাসর্বদা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে গুরুনির্দেশ অনুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই সময়কার সুখকর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া মহারাজ পরবর্তীকালে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা করে যা না হয়, তখন তা আপনিই হতো। যদি মন কখনও একটু আধটু খারাপ হতো তিনি মুখ দেখেই টের পেতেন, আর বুকে হাত দিয়ে সব ঠিক করে দিতেন।"[২]

"অধ্যাত্মজীবনে অগ্রগতির পথে বিভিন্নধরণের বাধাবিপত্তি। সাধকের শুদ্ধ মন যেমন স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বমুখে আরোহণ করে তেমন তাঁহার মধ্যে নানারকম অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে। আপাতপ্রিয় এই শক্তিসকল সাধনপথের কন্টকস্বরূপ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকমান্য চাই না, কেবল এই কর যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।" সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে রাখালের মধ্যেও বিভূতি

---

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৩২—৩৩

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৪০

প্রকাশ পাইল। কাঁচের ভিতরের জিনিস যেমন দেখা যায় রাখাল তেমনি মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা জানিতে পারিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বরে আগত ব্যক্তিদের মনের ভাব তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিতেন এবং যাহারা যথার্থই ধর্মপিপাসু একমাত্র তাহাদিগকেই তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিলেন, রাখালকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোর এসব কি হীনবুদ্ধি? তুই কি লোকের মন পরীক্ষা করার জন্য এখানে আছিস্, বাড়ী চলে যা। বিভূতির দিকে মন গেলে ঈশ্বরলাভ হয় না। ছিঃ! ছিঃ! ও সবে কখনও মন দিস্ নি।" সেইক্ষণ হইতে রাখাল বিভূতি সম্পর্কে সতর্ক হইয়া গেলেন।"

এইভাবে সাধনপথ হইতে বাধাবিপত্তি দূর করিয়া দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্যতম প্রধান পার্ষদ রাখালচন্দ্রকে লৌকিক যুক্তিসঙ্গত পথ ধরিয়া সাধনার গভীরে লইয়া যাইতেছিলেন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও করিতে-ছিলেন। আরও দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার সন্তানদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি শ্রীমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—রাত্রিতে রাখালকে ছয়খানা, লাটুকে পাঁচখানা এবং বুড়োগোপাল ও বাবুরামকে চারিখানা করিয়া রুটি দেওয়া যাইতে পারে। শুধু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না, তিনি মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইতেন, রাত্রিতে কে কয়খানা রুটি আহার করিতেছে। অপর একটি বিষয় মহারাজ নিজেই বলিয়া-ছিলেন, "ঠাকুর রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না। তাঁর কাছে যে ছেলেরা থাকত তাদেরও রাত্রে ঘুমুতে দিতেন না। সকলে ঘুমুলে নিশীথ রাত্রে তাদের ঠেলে তুলে দিতেন। কি বলতেন জানিস?—'তোরা ঘুমুবি কি রে? ঘুমুবার জন্য এখানে এসেছিস?' সকলকে উঠিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে ধ্যান-ধারণা করবার জন্য কাউকে পঞ্চবটীতে, কাউকে মার মন্দিরে, কাউকে বা শিবমন্দিরে পাঠিয়ে দিতেন। তারাও আদেশ মত ধ্যান জপ করে আবার এসে শুয়ে পড়ত। এইরকম করে সকলকে খাটিয়ে নিতেন। তিনি আর একটি কথা বেশ বলতেন—'রাত্রে তিনজন জাগে—যোগী, ভোগী ও রোগী। তোরা সব যোগীর দলে, রাত্রে ঘুম তোদের জন্য নয়।'"[১]

অনন্ত ভাবময় ভগবানের ইতি করা যায় না, তেমনি তাঁহাকে লাভ করিবার ও

---

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮

বিভিন্নভাবে রসাস্বাদন করিবার জন্য সাধনভজনের অসংখ্য পথও বিদ্যমান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন দিব্য অনুভূতি লাভের সহায়ক নানা ভাবের ও নানা সম্প্রদায়ের সাধনভজন রাখালকে দিয়া করাইয়াছিলেন। একদিন শ্রীশ্রীভবতারিণীর সম্মুখে রাখালকে তান্ত্রিক মতে পূর্ণাভিষিক্ত করিলেন; চক্রে চক্রে কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহার গূঢ় রহস্য তাহাকে বলিয়া দিলেন।[১] তিনিও দক্ষ ডুবুরীর ন্যায় সাধন-সাগরে ডুব দিয়া আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মণিমাণিক্য সঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইলেন। অপরূপ অলৌকিক দৃশ্যাদি, জ্যোতিঃরাজ্যের রহস্য একের পর এক তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে। ঠাকুর-কথিত কাঠুরিয়ার ন্যায় "চন্দন কাঠের পরও আছে —রূপার খনি সোনার খনি—হীরে-মানিক," ইহা জানিয়া তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। পিতা তাঁহার অফুরন্ত আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠিসকল পুত্রকে দিয়াছিলেন, তিনিও অনুভূতির অলৌকিক জ্যোতির্ময় প্রাসাদে কক্ষের পর কক্ষে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাখাল দিন দিন গভীরভাবে অন্তর্মুখ হইয়া পড়িতেছিলেন, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্নপ্রায় হইল; এমন অবস্থা হইল যে ঠাকুরের নিত্যকারের সেবা কাজও ঠিকমত করিতে পারিতেন না। রাখালের এই অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন বলিয়াছিলেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! (আমার) সেবা করতে বড় পারে না।"[২] রাখালের মধ্যে তীব্র বিবেক-বৈরাগ্য প্রকট হইয়া ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "(রাখাল) এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো—তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটি অবস্থা হয়েছিল।"[৩] ঠাকুর নিজের অবস্থার সহিত রাখালের অবস্থার তুলনা করিয়া আবার বলিয়াছিলেন, "রাখাল মাঝে মাঝে বলতো বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়। আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে দরজা বন্ধ করতাম।" অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর পাদপদ্মে রাখালের আত্মসমর্পণ যত গভীর হইতে থাকিল, ততই সাধনদীপ উজ্জ্বলতর হইয়া মনের মণিকোঠা আলোকিত করিয়া তুলিল, হৃদ্‌পদ্মে আসীন বামনদেবতার স্নিগ্ধ বিমল জ্যোতিঃ ভক্তহৃদয়কে অভিভূত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার দেহমন উপছাইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৬৮

২ কথামৃত ৪।১৪।১

৩ কথামৃত ৩।১২।১

অধ্যাত্মবিজ্ঞানী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্যরসের আস্বাদন করিয়াছেন, অপরদিকে 'চির-কিশোর রাখাল' স্ব-স্বরূপকে বিভিন্নভাবে আস্বাদন করিবার জন্য সাধনভজন করিয়াছেন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে, মানবসাধারণের গ্রহণসামর্থ্য অনুযায়ী যুগোপযোগী করিয়া লোক-সংগ্রহের জন্যই এই অবতারলীলা। নরলীলায় অবতার বা তাঁহার পরিকরদের আচার আচরণের মধ্যে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা কার্যবিধি সম্যক অবধারণ করা দুঃসাধ্য। তদপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তাঁহাদের নিজ নিজ পরিচয়দানসূচক অমৃতময় বাণী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদের স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলেন, "রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্যসিদ্ধ—জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীর ধারণ।" রাখালচন্দ্রের এই যে ভূমিকা অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরী করিয়াছেন, ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সাধনভজন বা অন্যান্য লীলাকলাপ বুঝিতে হইবে। লোকশিক্ষার জন্য আচার্যের ভূমিকায় সর্ববিষয়ে ভূয়ো-দর্শনের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য, দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে মানুষের প্রকৃতির পরিচায়ক জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আচরণাদি পর্যন্ত সকল বিষয়েই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, অবতার ও তাঁহার ঈশ্বরকোটি পার্ষদদের মধ্যে চিরকালের জন্য একটি নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান,—ইহা স্মরণ করিয়া অবতার বা তাঁহার পার্ষদদের সাধনভজন বলিয়া কথিত নরলীলা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একদিন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন, ভক্ত বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। কথামৃতকার লিখিয়াছেন, "ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। বুঝি দেখিতেছেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বর মানুষ হইয়া বেড়াইতেছেন। জগৎ-মাতাকে বলিতেছেন, 'মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ। রূপ টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল খোলটা বইত নয়। চৈতন্য তোমারই।"[১] রাখালের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধ ও অলৌকিক সম্পর্ক হইতে বুঝিতে হইবে রাখাল প্রভৃতি ঈশ্বরকোটি অবতার-পার্ষদগণের ঈশ্বরারাধনাদি সাধারণ মানুষের ন্যায় এক রকমের বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন, এমন কি উহারা আকৃতি-প্রকৃতিতেও

১ কথামৃত ৫।৬।১

এক হইতে পারে না। সেই কারণে ভক্তসাধক ও অবতার তাঁহার পরিকরগণের সাধন প্রচেষ্টাদিকেও লীলাবিলাস মাত্র বলিয়া বুঝিয়াছেন, উহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। লীলাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে প্রেম বিতরণ করিতেছেন; বিভিন্ন বিতরণের আসরে উপস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ কিরূপ দিব্যপ্রেমমাধুর্য আস্বাদন করিতেন, তাহার সামান্য ধারণা হইবে অনুরূপ যে কোন আনন্দ-আসরের লীলা-কীর্তন অনুসরণ করিয়া।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেণেটির মহোৎসব ক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা ১টা হইয়াছে। আজ সোমবার, ১৮ই জুন, ১৮৮৩।

সংকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন; কেহ কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে···পেণেটির মহোৎসব ক্ষেত্রে গাড়ী পৌছিবামাত্র ভক্তেরা দেখিয়া অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন। তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তন দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন।···ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্য দশায় নাম ধরিলেন—'যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা দুভাই এসেছে রে' ইত্যাদি।···সঙ্কীর্তনতরঙ্গ রাঘব মন্দির পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া···গঙ্গাকূলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।···ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে।···

অতঃপর ঠাকুরের অন্যতম সেবক "লাটু"র স্মৃতিকথা অনুসরণ করা যাক্। "সেবার ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখে হামাদেরও ডর লেগেছিলো। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো, মুখ চোখ বুক সব একদম লাল হোয়েছিল, হাতের চেটো পর্যন্ত লাল হোয়ে গেলো। ওনার এমন ভাব দেখে সবাই তাঁর পায়ের ধূলার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, বাকী হামাদের বড় মুশকিল হোলো। ঠাকুরকে সবাই ছুঁতে চায়, হামরা তাদের ছুঁতে বারণ করি; কেউ শুনে না। এই নিয়ে বহুৎ

গণ্ডগোল লেগে গেলো।…হামি, রাখালভাই আর ভবনাথ ভাই তিন জনে মিলে ঠাকুরকে সেখান হোতে বাহিরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলুম। বাকী লোকেরা কি শোনে ?…শেষে রাম বাবু করলেন কি জানো ? একমুঠো ধূলো ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে লাগলেন।”[১]

বিশ্রাম, প্রসাদধারণ ও সৎপ্রসঙ্গাদির পর গৃহকর্তা মণি সেন অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন। ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলে চির-অপরিগ্রহ ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন না। সেন মহাশয়ের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হাতে টাকা দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিলেন, “আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি।—আমি এখন খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগ্‌গে।” ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। অবতার-লীলা-রঙ্গের অনুপম স্মৃতি চিরসঞ্চিত রহিল ভক্তহৃদয়ে।

* * *

দিব্যভাবে মাতোয়ারা অবস্থায় একদিন ঝাউতলার দিকে যাইবার পথে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে জগন্নাথের সহিত মধুরভাবে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া তারের বেড়ার উপর পড়িয়া যান;[২] তাঁহার বামহাতের একখানি হাড় স্থানচ্যুত হয়, তিনি যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে থাকেন। ঠাকুরের যন্ত্রণা দেখিয়া সেবক রাখালও অধীর হইয়া উঠেন। এই দুর্ঘটনার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নরলীলার ভাবটি প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত রাখালের লীলাখেলা যেন একটি মোড় নেয়, অপূর্ব ঘটনা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। ঘটনার বিবর্তন অনুসরণ করিবার পূর্বে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদ শ্রীম-লিখিত বিবরণ হইতে অনুবৃত্তি করা যাইতে পারে।

মধু ডাক্তার ঠাকুরের হাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবেন, মাস্টার মশাই কলিকাতা

১ লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১২৮-২৯। লাটুমহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, “রাখাল ভাই পাঁচ টাকায় এক ঝুড়ি আম আর এক-ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেলো। এই না দেখে ঠাকুর রাখালের উপর খুব গোঁসা করলেন, আউর রাখালভাইকে সাবধান করে দিলেন, বললেন, দ্যাখ! এমন কাজ আর করবি নি। তুই নিলে আমার নেওয়া হোলো। পন্থী আউর দরবেশের কিছু সঞ্চয় করতে নেই।”

২ কথামৃত ৪।২৩।৭ : শ্রীরামকৃষ্ণ—“জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, ‘তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।’ ”

হইতে বাড়্ প্যাড ব্যাণ্ডেজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মেঝেতে বসিলেন! তিনি দেখিতে পাইলেন ঃ

"ঠাকুরের বালকস্বভাব,—ক্ষুধা পাইয়াছে; মাস্টারকে বলিতেছেন, 'কৈ, কি এনেছ?' রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

"সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন,—'আমি জিলিপী খাবো', 'আমি জল খাবো'!

"ঠাকুর বালকস্বভাব,—জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন—ব্রহ্মময়ী। আমায় এমন কেন কর্‌লি? আমার হাতে বড় লাগ্‌ছে।—(রাখাল, মহিমা, হাজরা প্রভৃতির প্রতি)—আমার ভাল হবে? ভক্তেরা ছোট ছেলেটিকে যেমন বুঝায়—সেইরূপ বল্‌ছেন, 'ভাল হবে বৈ কি!'

"শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস্,—তোর দোষ নাই।—কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত ত যেতিস না।"

ঠাকুর জানিতেন তাঁহার হাতের কঠিন যন্ত্রণায় রাখাল মনে খুবই ব্যথা পাইয়াছে। তাঁহার মনের ভার লাঘব করিবার জন্যই যেন ঠাকুরের শ্রীমুখে অপূর্ব বাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল। কথামৃত অনুসরণে পাই এক অপরূপ দৃশ্য।

"ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে 'আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!' বলিয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—

'আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥'

"ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—'আমি কি অন্যায় করেছি মা? আমি কি কিছু করি মা?—তুই যে সব করিস্ মা! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী!' (রাখালের প্রতি, সহাস্যে)—দেখিস, তুই যেন পড়িস্ নে।—মান করে যেন ঠকিস্ না।

"ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—'মা, আমি লেগেছে বলে কি কাঁদছি? না।—

আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥'"

শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত তাঁহার আদরের দুলাল শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্নেহনিধি রাখাল, ইঁহাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে দিব্যভাব

ক্ষণে ক্ষণে প্রকট হইয়াছে তাহা অবলোকন করিয়া ভক্ত সাধক বিমোহিত চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন।

মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। মেঝেতে বিছানার উপর ঠাকুর শয়ন করিলে মধু ডাক্তার হাতে বাড়্ বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রসিকচূড়ামণি ঠাকুর সুর করিয়া বলিতেছেন, "রাই-এর দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে।" ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া চতুর্দিকে বসিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার গান ধরিলেন, "সব সখি মিলি বৈঠল সরোবর কূলে!" হাসির রোল উঠিল। ডাক্তার সযত্নে বাড়্ বাঁধিয়া দিলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার কিছুক্ষণ পূর্বে রাখালকে লইয়া একটু অভিনয় হইয়া গেল। ইহা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর নিজেই ভক্তদের পরের দিন বলিয়াছিলেন, "এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা!"

"রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো। তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে!' "[১]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের অতি আপনার জন, 'আত্মার আত্মীয়'। পরমহংসদেবের ভাঙ্গা হাত লইয়া নানা কথা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া রাখাল সর্বদাই উহা আড়াল করিয়া রাখিতেন, দশজনে যাহাতে না জানিতে পারে তাহার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিতেন। তাহা ছাড়াও সরলপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাঙ্গা হাত যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য হয় সেবিষয়ে রাখালের ভাবনার শেষ ছিলনা। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে রহিয়াছে, "তখন যে-কেউ দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাকে হাত দেখাতেন আর বলতেন, 'কিসে সারবে বলতে পার?' এই না দেখে রাখাল বাবু বড় বিরক্ত হোতেন। একদিন তিনি (রাখাল বাবু) ত দেবেন বাবুকে বলে দিলেন, 'দেখুন! ওনার সামনে আপনারা আর কোন ঔষধের নাম করবেন না। আপনাদের কথায় বিশ্বাস কোরে কেবল ঔষধ পাল্টাবেন। এরকম করলে ওনার হাত সারবে না। জিগ্‌গেস করলে বলবেন, যা' চলছে তাই চলুক, ওতেই সেরে যাবে।' "[২] এদিকে বালকস্বভাব ঠাকুর, দীর্ঘকাল তাঁহার হাত

১ কথামৃত, ৪।১০।৬
২ লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৪৪

ব্যাণ্ডেজ করা রহিয়াছে দেখিয়া মাঝে মাঝে অধৈর্য হইয়া পড়েন। একদিন তিনি ভক্তদের বলিলেন, "আমি এইটার জন্য এক একবার অধৈর্য হই—একে দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি, হ্যাগা ভাল হবে কি? রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না! এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক।—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়্‌তে যাবে!"[১]

কয়েক মাস পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। ঠাকুরের জন্মতিথি অনেকদিন হইল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া ভক্তবৃন্দ জন্মোৎসবের আয়োজন করিলেন। সেদিন ২৫শে মে। ঠাকুরকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কীর্তন-ভজন করিয়া ভক্তগণ ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে পরম আনন্দ লাভ করিলেন। রাখালও ইহাতে যোগ দিয়া আনন্দের অংশ গ্রহণ করিলেন।

শৈশবে মাতৃহারা বালক রাখাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মাতৃস্নেহের অফুরন্ত প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়া তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সঙ্গে রাখালের মধ্যে ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া যেন অস্মিতা ও মমতার একটি মায়াজাল বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই অস্মিতা ও মমতা কাঁচা 'আমি'-র খেলা, সাধকজীবনে অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। রাখালের মধ্যে এই ভাবটি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।"[২] রাখালের এই অবস্থার বিষয় তিনি দেড় বৎসর পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিশদভাবে বলিয়াছিলেন।

সেদিন ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৺কালীপূজার দিন। সকালবেলা শ্যামপুকুরের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, রাখালও উপস্থিত আছেন ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "খুঁতখুঁত করতো। গাড়ীতে

১ কথামৃত ৪।১১।১

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৫৯-৬০।

আমার সঙ্গে যাবে তা দেরি করতো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্‌কাতায় দেখতে যেতাম—আমায় বলতো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই দেখতে যাবেন! জল-খাবার ছোকরাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে পারলুম, ও থাকবে না।

"তখন মাকে বললাম—মা, ওকে হৃদের মতো একেবারে সরাস্ নে। তারপর শুনলাম, বৃন্দাবনে যাবে।"

"গো—যদি থাক্‌তো এই সব ছোকরাদের হ'ত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল তাই এ সব ছোকরারা আসতে যেতে লাগল।

গো (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল না।

রাম (দত্ত)—তোমার মন উনি যা বুঝবেন তা তুমি বুঝবে?

গো—চুপ করিয়া রহিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গো-প্রতি)—'তুই কেন অমন করছিস্—আমি তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি!—তুই চুপ কর না···এখন তোর সে ভাব নাই।'

"ভক্তদের সহিত কথাবার্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর গো-কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, 'তুই কি কিছু মনে করেছিস।'

গো—আজ্ঞে না।"[১]

বলিষ্ঠ-দেহ রাখালের স্বাস্থ্য ইদানীং ভাল যাইতেছিল না। কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে, কিছুদিন কলিকাতায় অধর সেন বা বলরাম বসুর বাটীতে বাস করিয়াও স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছিল না। ঠাকুর রাখালের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ কেহ কেহ দিলেন। সে সময় সুন্দর একটি যোগাযোগ উপস্থিত হইল। ভক্ত বলরাম বসু সপরিবারে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।[২] তিনি রাখালকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। রাখালের বৃন্দাবন গমন সম্পর্কে

১ কথামৃত ৩।২২।২ (এখানে গো—রাখালের ছদ্মনাম)।

২ ভক্ত বলরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "বলরামের কি স্বভাব! আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্যার কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোয়ারা বন্ধ ক'রেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, 'তুমি এখানে এসো থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর।'—তা সে শুনে নাই—আমাকে দেখ্‌বে বলে।······টাকা বাঁচবে ব'লে বৃন্দাবনে চার মাস থাক্‌বে। ছ'শ টাকা মাসোয়ারা পায়।" (কথামৃত ৪।২০।২)

ঠাকুরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি লীলাপ্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত বৃন্দাবন গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলেমানুষ; বুঝে না, তাই কখনও কখনও অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্পকাল পরেই তাহার বৃন্দাবন যাওয়া হয়।"

অনুমান করা যায়, রাখাল ভক্ত বলরামের সহিত ঝুলন যাত্রার পূর্বে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আগস্টের শেষভাগে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্ষাস্নাত বৃন্দাবনপুরী শ্যামল শোভায় সুসজ্জিত হইয়া ঘরের দুলাল রাখালকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমা বালকস্বভাব রাখালের মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর করিয়া দিল। আনন্দিত রাখাল কলিকাতায় 'শ্রীম'কে এক পত্রে লিখিলেন, "এ বড় উত্তম স্থান আপনি আসবেন,—ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ।" তাঁহার প্রায় সমবয়সী ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত নারায়ণকেও অনুরূপ একটি পত্র লিখিলেন। ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন দেবালয় রূপসজ্জায় নৃত্যগীতে আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়া বৃন্দাবনলালের নিত্যলীলা যেন প্রকট হইয়া এক কালে ভক্তহৃদয়কে আনন্দে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে, রাখালচন্দ্রও 'লীলারসপ্রেমগন্ধঘ্রাণে' আবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ভক্ত বলরামের একখানি পত্র ১১।১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌঁছাইল, তাহাতে জানা গেল রাখাল বৃন্দাবনের কুখ্যাত ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া অবধি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হইলেন, তিনি এতই ভাবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একদিন মধ্যাহ্নে হাজরা মহাশয়ের নিকট বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আদেশে অধর সেন রাখালের সংবাদের জন্য রেজিস্ট্রি ডাকে একখানি চিঠি পাঠাইলেন। উহার উত্তর আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। রাখালের আরোগ্যলাভ প্রার্থনা করিয়া তিনি মা চণ্ডীর নিকট মানত করিলেন। স্বামী সারদানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুনিয়াছিলেন, "বৃন্দাবন থাকিবার কালে রাখালের অসুখ

শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্যসত্যই ব্রজের রাখাল, সেখান হইতে সে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন।" অল্পদিনের মধ্যে অধর সেন তাঁহার পত্রের উত্তর পাইলেন। ভক্ত চুণীলালও বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৮৮৪) শ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন করিলেন এবং জানাইলেন যে, বৃন্দাবনে রাখাল সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছেন, ভাল আছেন—সংবাদ পাইয়া ঠাকুর নিশ্চিন্তবোধ করিলেন।

* * *

আনন্দপুরী বৃন্দাবনধামে ব্রজেশ্বরের লীলাপূত স্থানসকল দর্শন করিয়া রাখালের মনে এক অপূর্ব আনন্দধারা বহিতে থাকিত, আনন্দের আবেশে তিনি কখন কখন আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার মনের আনাচে কানাচে উঁকি দেয়, "কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি, বধূয়া করিলা প্রয়াণ।" সেই যমুনা, সেই গোচারণভূমি, সেই ব্রজপুরী—বিবিধ সুখস্মৃতি মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। এই আনন্দধারায় অবগাহন করিয়া রাখালের হৃদয়ের অমৃত-প্রস্রবণ শতধারে উৎসারিত হইল। লীলাময় হরির লীলামাধুরী ও দরদী ঠাকুরের অহৈতুকী স্নেহভালবাসা যুগপৎ রাখালের মনসায়র তোলপাড় করিয়া ঠাকুরের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা-জনিত যে হিংসা অভিমানের সংকীর্ণতা তাঁহার মনে দানা বাঁধিয়াছিল, তাহা ভাসাইয়া লইয়া গেল,—উহার নির্মল শান্ত প্রবাহে 'লোকহিতায়' পরিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মনকে প্লাবিত করিল ও তাঁহার বালকস্বভাবে একটি প্রশান্ত গাম্ভীর্যের তুলি টানিয়া দিল।

কয়েকমাস অতিবাহিত হইলে রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় চারিমাস অবস্থানের পর ভক্ত বলরাম কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, রাখালও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাখাল প্রথমেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। দীর্ঘদিন পরে রাখালকে সুস্থদেহে দেখিতে পাইয়া ঠাকুর খুবই খুশী হইলেন। রাখাল দেখিতে পাইলেন, নূতন অনেক ভক্ত ঠাকুরের নিকট

যাতায়াত করিতেছেন, ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গলাভে জীবনের সকল মালিন্য ধৌত করিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তি-ভক্তের মেলা যেন আরও জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তমকে অপর বহু ভক্তের হৃদয়-আসনে আসীন দেখিতে পারিয়া রাখাল এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করিলেন। 'চাঁদ মামা সকলেরই মামা' ইহা অনুভব করিয়া তিনি গর্ব ও আনন্দ লাভ করিলেন। এই উদার প্রশান্ত ভাবটি রাখালের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া তাহার বালকস্বভাবের মধ্যে কি অপরূপ এক মাধুর্য আনিয়া দিয়াছিল তাহা একটি ঘটনার উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা যাইতে পারে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের একদিনের ঘটনা। একজন অপ্রকৃতিস্থা স্ত্রী-ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে মধুরভাবে আরাধনা ভজনা করিত, সে কখনও কখনও উদ্যানবাটীতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হইত এবং হাঙ্গামাও করিত। ঠাকুরের সেবক সন্তানবৃন্দ ইহাতে বিরক্ত হইয়া পাগলীকে নিরস্ত করিবার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিত। আলোচ্য ঘটনার দিন দোতলা-ঘরে ঠাকুর পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া বসিয়াছেন, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়াছেন।

"শশী—পাগলী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (করুণামাখা স্বরে)—না, না। আসবে, চলে যাবে।

রাখাল—আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। তার পর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন,—মদগুরু শ্রীজগৎ গুরু! —উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন?

শশী—তা নয় বটে,—কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ও রকম উপদ্রব!

রাখাল—উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক করতো?

শশী—নরেন্দ্র যা মুখে ব'লতো, কাজেও তা করতো।

রাখাল—ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, সস্নেহে)—কিছু খাবি?

রাখাল—না;—খাবো এখন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে?

রাখাল—খান না, উনি বলছেন।"[১]

রাখালের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পূর্বেকার ন্যায় স্নেহ আদর যত্ন, কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সরল আচরণের মধ্যে 'বিন্দুতে সিন্ধু' দর্শন করিয়া রাখালের হৃদয় প্রেমভক্তির মাধুর্যে ভরপুর হইয়া উঠিল।

* * *

অবতারলীলার একটি বিশেষত্ব এই যে, লীলাবৈচিত্র্যের ইন্দ্রধনুতে যে অংশে দৃষ্টি পড়ে সেই অংশই সৌভাগ্যবান দর্শকের মনে আনন্দ ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব মানসপুত্রকে দিয়া সংসারলীলার অভিনয় কিছুকাল করাইয়া ধর্মজগতের ইতিহাসে লীলাবিলাসের একটি অভিনব অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "রাখাল যুগে যুগে প্রত্যেক অবতারের লীলাসহচর হয়ে এসেছে।"[২] বর্তমান লীলাখণ্ডে দেখা গেল, অবতারের সহিত লৌকিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে ঠাকুরের পদাশ্রিত এক ভক্ত পরিবারের সহিত রাখাল পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ ভক্তের জীবনে এই বিবাহ যেন বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নহে; দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে বিশেষ আমল দেন নাই, রাখালও ঠাকুরকে আপনভাবে পাইয়া ঘরসংসার সকল কিছু ভুলিয়া দক্ষিণেশ্বরে লীলাবিলাসে এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, লোকের স্বতঃই সন্দেহ জাগিত, রাখালের নব-পরিণীতা বালিকা বধূর কথা মনে আছে কিনা? এই বিষয় বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিতেন, "যে নিত্যসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা; আবার ফেল্লে কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না। যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে কর্‌লে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিক্‌রে যায়!"[৩] সেইকারণেই দেখা যায়, ছক-বাঁধা সংসার খেলায় রাখাল সহজভাবে পদক্ষেপ করিয়াছেন, সংসার-পথে নির্ভয়ে চলিয়াছেন, আবার যখন প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সকল খেলাধূলা নিঃশেষে

১ কথামৃত ৩।২৬।২
২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৮২
৩ কথামৃত ২।২২।৩

ত্যাগ করিয়াছেন। রাখাল যাহাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী, ঠাকুরের এক ভক্ত-পরিবারের কন্যা বলিলেও যথেষ্ট বুঝা যাইবে না। বিশ্বেশ্বরী ছিলেন ঠাকুরের একান্ত শরণাগত। "বিশ্বেশ্বরী ঠাকুরের কথা বলিতে এত ভালবাসিতেন যে সময় সময় আত্মভোলা হইয়া একা একাই ঠাকুরের কথা বলিয়া যাইতেন। এজন্য লোকে তাহাকে পাগলী বলিত, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।"[১] বিশ্বেশ্বরী সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত লীলাপ্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যে-দিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে লইয়া এখানে আসিল সেদিন মনে হইল, বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত'?—ভাবিয়া তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম, ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্র-বধূর মুখ দেখে।" নহবতে শ্রীমা লাটুর মারফৎ ঠাকুরের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া বিশ্বেশ্বরীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সাংসারিক লোকব্যবহার অনুযায়ী টাকা দিয়া পুত্র-বধূর মুখদর্শন করিলেন।

লীলাময় হরির অভাবনীয় লীলাখেলা, তাঁহার কটাক্ষমাত্রে আবর্তিত হয় ঘটনাপ্রবাহ। দক্ষিণেশ্বর লীলাস্থলীতে রাখালকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস ঘনীভূত আকার ধারণ করিবার পর, ঠাকুর কখন কখন রাখালকে বুঝাইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন এবং তিনিও বাড়ীতে দুই তিন দিন বাস করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিতেন। রাখালের চিরকালের বালকস্বভাব, কোন বিষয়েই আঁট বা আসক্তি ছিল না। বালক নিকটে যাহা পায় তাহার ক্ষণিক আকর্ষণে মাতিয়া উঠে; রাখালও তেমনি সংসারলীলার অভিনয়ে কখনও বা মাতিয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, সংসারলীলার অভিনয়ে অভিনেতা নির্লিপ্ত, জানেন বোঝেন—সবটাই অভিনয়মাত্র। অভিনয় করিতে যে অভিনিবেশের দরকার হয় তাহার ফলে অভিনেতা কখনও যেন লিপ্ত হইয়া যান, সাময়িকভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সেইকালে রাখালের

১ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ১৪২।

সংসারলীলার ও অভিনয় পারিপাট্য সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি উক্তি অনুধাবন করিলে ধারণা করা যাইতে পারে।

"রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে! এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা; কখনও এখানে এলি, দুই দিন থাক্‌লি।'"[১] (তাং ২৫শে মে, ১৮৮৪)

"রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, 'ও সব আলুনি লাগে!' ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বৎসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে। ও গেল না। বলে,—'আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে না।'"[২] (তাং ২০শে জুন, ১৮৮৪)

রাখাল বৃন্দাবনধামে যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সংবাদে চিন্তান্বিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন রাখাল সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, "সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রেছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগের বাকী ছিল।"[৩]

ঈশ্বরের স্তরের, ঈশ্বরের নিজের জন ঈশ্বরকোটি রাখাল পূর্ণকাম। তাঁহার "একটু ভোগের বাকী", এই বাক্যাংশের তাৎপর্য সাধারণ বুদ্ধিতে ধরিতে পারা যায় না। অবশ্য, ইহার সহিত সাংসারিক জীবের ভোগবাসনার তুলনা হইতে পারে না; কারণ সাংসারিক জীব আসক্তির সূতায় বোনা কামিনীকাঞ্চন-রূপ জালে আবদ্ধ, কিন্তু আলোচ্য মহাপুরুষের ন্যায় আধিকারিক পুরুষগণ 'পাঁকাল মাছের' মত সংসার-পাঁকে থাকিয়াও শরীরে কাদা মাখেন না—চিরমুক্ত তাঁহাদের স্বভাব।

বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিবার পর রাখালচন্দ্র কিছুদিন বাড়ীতে বাস করিতে-ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চাকুরীর বন্ধনে জড়াইতে চেষ্টা করিলেন। এই খবর শ্রীরামকৃষ্ণের কানে উঠিল। সাংসারিক সম্পর্কে রাখালের সম্বন্ধী, ভক্ত মনোমোহন, দক্ষিণেশ্বরে দোলযাত্রা উপলক্ষে উপস্থিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ

১ কথামৃত ৪।১৩।২।
২ কথামৃত ৪।১৪।১।
৩ কথামৃত ৪।২০।২।

তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি রাগই কর আর যাই কর—রাখালকে বল্লুম ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ এ কথা বরং শুনবো ; তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস, এ কথা যেন না শুনি।"[১] (তাং ১লা মার্চ, ১৮৮৫)। রাখাল কোন মতেই চাকুরী গ্রহণ করিবে না ইহা জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তদের নিকট রাখালের সম্বন্ধে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন পেনসান্ খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে। বাড়িতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না।"[২] (তাং ৭ই মার্চ, ১৮৮৫)। ইহার প্রায় মাসখানেক পরে ঠাকুর একদিন বলিলেন, "...একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম।"

আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বারংবার শুনিয়া রাখালের একদিন মনে হইল, "তাইতো, আমার পরিবারের কি হবে?" তিনি চিন্তিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন, গম্ভীর হইয়া গেলেন। রাখাল গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নীরবতা তাঁহাকে বিমনা করিয়া তুলিল। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের এই দুশ্চিন্তার বিষয় উল্লেখ করিয়া ভক্তদের বুঝাইয়া বলিলেন যে, জ্ঞানের পাশেই অজ্ঞান থাকে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে না যাওয়া পর্যন্ত এইসকল বৃত্তিজ্ঞান হইতে নিস্তার নাই। এদিকে বাড়িতে রাখাল চিন্তার গভীরে ডুবিয়া রহিলেন, নানা ভাবনা ভীড় করে মনের আকাশে। অকস্মাৎ একদিন বিষাদের কালো মেঘ অপসারিত হইল, চিরভাস্বর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-মধুর মূর্তি হৃদয়পটে অপরূপ বিভায় প্রকাশ পাইল। তিনি সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন। তিনি এক তীব্র আকর্ষণে বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। এ সম্পর্কে ঠাকুরের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য—"তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কানামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাক্‌লেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইস্ক্রুপ দিয়ে বাঁধা।"[৩] অবতার সম্বন্ধে এই উক্তি তাই পার্ষদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অবতার-পার্ষদ রাখালচন্দ্র

১ কথামৃত ২।২৩।২।
২ কথামৃত ৩।১২।১।
৩ কথামৃত ৫।৬।৪।

এই কারণে সংসার অভিনয়কালে যে তাঁহার সাময়িক আবেশ ঘটিয়াছিল তাহা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।

কাশীপুর বাগানবাটীতে মনোমোহন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলেন, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। লীলা-অভিনেতা রাখাল নির্বিকার চিত্তে এই সংবাদ শুনিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকদিন পরে ভৈরব-ভক্ত গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা; অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকালমাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই।"[১]

ভক্ত মনোমোহনের মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের পুত্রলাভের খবর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "মায়ের ইচ্ছেয় রাখালের ভোগ সব কেটে গেল।" লীলানাট্যের একটি রহস্যপূর্ণ অঙ্কের যবনিকাপাত হইল; নূতন দৃশ্যের অবতারণা হইল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। উহা ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকিলে ভক্তগণ আশঙ্কিত হইয়া ওঠেন; কলিকাতার কয়েকজন চিকিৎসকের উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে। বেশী কথা বলিলে বা পুনঃ পুনঃ সমাধিস্থ হইলে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে, চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেও আনন্দময় পুরুষ ভক্ত-সঙ্গে সংপ্রসঙ্গ করিতে থাকেন; ভগবৎ-সঙ্গীত শ্রবণে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতে থাকেন। দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি, আনন্দময় ঠাকুরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, ভক্তগণের কল্যাণচিন্তাতেই তিনি ব্যস্ত।

আগস্টমাসের ১১ তারিখ, মঙ্গলবার একটি ঘটনা ঘটিল। কথামৃত-অনুসরণে উহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।...তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা

১ কথামৃত ২।২৬।৩।

কাঁদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও (গোলাপ-মা) ঐ সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন? শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না'। নারায়ণ আসিয়াছেন, বেলা ৩টার সময়, ঠাকুর নারায়ণকে বলিতেছেন, 'মা তোর ভাল করবে।'

"নারায়ণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দিলেন, 'ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।' রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালাদি ভক্তদের প্রতি)—'মা' দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সবই মায়া! তিনি সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য।

"আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।

"নারাণাদি ভক্ত—আচ্ছা, কার কতদূর হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদের সব দেখ্‌লাম—নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পূর্ণ, মহিমা চক্রবর্তী প্রভৃতি।"[১]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৺শ্যামাপূজার রাত্রিতে সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে অপরূপ দৈববাণী শোনা গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "সব দেখ্‌লুম—কার কত দূর এগিয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম!...সবাইয়ের হয়ে যাবে দেখলুম। সব দেখ্‌লুম ঘুপটি মেরে রয়েছে!"[২] মধ্যে মধ্যে এইরূপ দর্শনের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভক্তদের অগ্রগতি মাপিয়া দেখিতেন। রাখাল সম্বন্ধে তাঁহার বহু দর্শনাদির অতি সামান্যই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী সারদানন্দকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

আকারে ইঙ্গিতে স্ব-পরিচয় দেওয়া ভিন্নও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ রাখালের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে। ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের

১ কথামৃত ৫।১৮।১।
২ কথামৃত ২।২০।৩।

ঘরে বসিয়া আছেন রাখাল, মাস্টার ও মহিমাচরণ। মহিমাচরণ ঠাকুরকে একজন সিদ্ধপুরুষমাত্র জ্ঞান করিতেন। অপার করুণাসিন্ধু ঠাকুর মহিমাচরণকে শিক্ষা দান করার ছলে নিজের প্রকৃত স্বরূপ বলিতে লাগিলেন। শাস্ত্র, যুক্তি অনুভব প্রমাণাদি উল্লেখপূর্বক তিনি বলিলেন যে, তাঁহার অবস্থা সিদ্ধপুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, তা নয়। এতে কিছু বিশেষ আছে।

"কথা কয়েছে—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে।...তিন দিন করে কেঁদেছি, আর বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

"মহামায়ার মায়া যে কি তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো।...আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন।...তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হ'লো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জ্বল জ্বল করতো। বুক লাল হয়ে যেত! তখন বললুম, 'বাইরে প্রকাশ হ'য়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও।' তাই এখন এই হীন দেহ।

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য। এর ভিতর একজন আছেন। তা না হলে সমাধির পর ভক্তিভক্ত লয়ে কেমন করে আছি।" মাস্টার শুনিয়া বিস্মিত হন, রাখাল প্রেমাস্পদের স্বরূপ-বাণী শুনিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া পড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে, ইহা তিনি অন্তরঙ্গদের নিকট কতভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন। অবতারলীলায় গূঢ়তত্ত্বের গভীরতার অবধি নাই। একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই মার্চ, অপরাহ্ণ ৩৷৪টা। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। ভক্তদের বলিতেছেন, "এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই, তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট কতবারই না তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে চারিজন অন্তরঙ্গ—রাখাল, ভবনাথ, যোগীন ও লাটু উপস্থিত। সে দিনের অভিজ্ঞতা লাটু বর্ণনা করিয়াছিলেন, "হাম্‌নে ত এতবার

ঠাকুরের সমাধি দেখেছে, বাকী একদিনের সমাধিতে তাঁর যা মূর্তি দেখেছি, তার সঙ্গে অন্য কোন মূর্তির তুলনা হয় না। সেদিন ঠাকুরের গায়ের রঙ্ বদ্‌লে গেছিলো! মুখখানিতে এমন অভয় ও করুণা মেশান ছিল, কি বলবো! এখনো ত হামি সে মূর্তি ভুলতে পারে নি। তোমরা যে ছবিখানি ছাপিয়েছ তার চেয়েও সুন্দর সেই মূর্তিখানি! সে-মূর্তি হামরা চারজন দেখেছি।"[১] এই ধরণের অসংখ্য আনন্দস্মৃতি-বিজরিত দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি, অকস্মাৎ যেন তাহাতে ছেদ টানিয়া দিলেন ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ মহাকাল।

হঠাৎ একদিন ঠাকুরের কণ্ঠদেশ হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত ভক্তগণ ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। ঠাকুরও প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। কলিকতায় ৫৫, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুল ভট্টাচার্য মহাশয়ের বৈঠকখানা ভবন ভাড়া লওয়া হইল।[২] ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর লীলাপর্ব সমাপন করিয়া কলিকাতায় ঐ বাড়ীতে আসিলেন দুর্গাপূজার পূর্বেই। খ্যাতনামা চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা ২১১।

২ শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' (পৃঃ ১৭৩-৭৫) হইতে জানা যায়:

"আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষণ্ণভাবে একাকী বসিয়া আছেন।......তিনি আপনি কহিলেন, গতকল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত উঠিয়াছিল। সে সময়টী শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল।......আমরা কহিলাম যে, 'দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যদ্যপি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়।'...... এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বাগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটী বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকাইয়া তখন পঞ্জিকা দেখিতে বসিলেন। শনিবার বেলা তিনটার পর দিন স্থির হইল। সেদিন বৃহস্পতিবার, সুতরাং মধ্যে একটী দিন রহিল। আমরা......বাগবাজারের রাজার ঘাটের পূর্ব গলির ভিতরে একটী নূতন দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গমন পূর্বক কহিয়াছিলেন, 'আমাকে কি এরা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারিব না।' কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি তখনই বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।

"......বলরাম বাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না। তিনি (পরমহংসদেব) তন্নিবন্ধন শ্যামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্যের বাটীতে আসন পরিবর্তন করিয়াছিলেন।"

লাটুমহারাজের স্মৃতিকথায় (পৃঃ ২৩৪) আছে ঠাকুর বলরামভবনে সাতদিন বাস করিয়া 'দানাকালি' শ্যামপুকুর পল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই বাড়ীতে যান।

পথ্যাদি প্রস্তুতির জন্য শ্রীশ্রীমা ঐ বাড়ীতে বাস করিতে আসিলেন ; রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন প্রভৃতি যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ঐ বাড়ীতেই থাকিলেন ; নরেন্দ্র প্রভৃতি যুবক ভক্তদল বাড়ী হইতে নিত্য যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর তাঁহার এই দুরারোগ্য ব্যাধির অন্যতম তাৎপর্য নিজমুখেই বলিয়াছেন, "এই ব্যারাম হয়েছে কেন ?—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।"[১] শুদ্ধ ভক্ত বাছাই-এর জন্যই যেন ব্যাধিকে আশ্রয় করিয়া ঠাকুর কলিকাতায় ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের এক আসর বসাইলেন। অনেকের ধারণা হইল ভক্তদিগকে প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্যই ঠাকুর স্বীয় দেহে ব্যাধি বরণ করিয়াছেন।[২]

কিন্তু চিকিৎসকগণ নির্ণয় করিলেন, ব্যাধি দুরারোগ্য কর্কটরোগ (Cancer)। ভক্তদের অনেকেই ভাবিলেন, অবতারপুরুষ কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িকভাবে তাঁহার দেহে এই কালব্যাধিকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ যুবক ভক্তেরা প্রাণপ্রতিম ঠাকুরের দেহের যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় প্রাণমন অর্পণ করিলেন। এই কঠিন ব্যাধি সত্ত্বেও ঠাকুরের লোক-শিক্ষাদান অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে ; উপরন্তু কলিকাতায় তিনি থাকাতে যাহাদের দূরে দক্ষিণেশ্বর যাইতে অসুবিধা ছিল তাহারাও আসিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে ঠাকুরের গলযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইলে নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা দরজায় পাহারা বসাইলেন ; সুপরিচিত ভক্ত ব্যতীত অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু যাঁহার দেহের কষ্ট লাঘবের জন্য ভক্তগণ এত ব্যস্ত, তিনি অবিশ্রান্ত অমৃতোপম দিব্যলীলা করিয়া চলিয়াছেন।[৩]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর। ৺কালীপূজার দিন। ঠাকুরের নির্দেশে ভক্তগণ পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর

১ কথামৃত ৪।২৪।৩।

২ এই প্রসঙ্গে কথামৃত ৪।২৯।১ অনুসরণযোগ্য :
মণি বলিলেন, "আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে ব'লে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে।"
শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, "ভূপতি বলে, রোগ না হ'লে শুধু বাড়ী ভাড়া করলে লোকে কি ব'লত ?"

৩ পুঁথিকার লিখিয়াছেন : কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল।
প্রতিকারে রোগ করে দুগোণগুণে বল॥
ইহাতেও তিল নাই প্রহর বিশ্রাম।
তত্ত্বকথা নৃত্যগীত চলে অবিরাম॥ (পৃঃ ৫৮৪)

ঠাকুরের আদেশে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাবস্থ হইতেছেন। একটি জমাট আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবেশ রচিত হইয়াছে। সহসা দেখা গেল, ভক্তবর গিরিশ পুষ্পপাত্র হইতে একগাছি পুষ্পমাল্য লইয়া 'জয় মা' 'জয় মা' উচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। মাস্টার মশাই গিরিশবাবুকে অনুসরণ করিলেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা রাখাল গন্ধপুষ্প গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-পদ্মে অর্পণ করিলেন। নিরঞ্জন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 'ব্রহ্মময়ী' 'ব্রহ্মময়ী' উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন। ভাবের উত্তাল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। ভক্তেরা সকলে 'জয় মা' 'জয় মা' ধ্বনিতে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অভূতপূর্ব রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ, বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন! বিস্মিত আনন্দিত ভক্তবৃন্দ জগন্মাতার স্তবস্তুতি ভজন করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ী ধ্বনিতে চতুর্দিক পূরিত, কেহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, কেহ করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আনন্দ বিহ্বল রাখালও বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন এই অপার্থিব মনোহর দৃশ্য।[১] তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে অপার মাতৃস্নেহ আস্বাদন করিয়া তিনি সদাতৃপ্ত হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে উহা স্বয়ং জগন্মাতার দিব্যস্ফুরিত মাতৃশক্তি।

ঠাকুরের গলব্যাধি প্রশমিত হইল না, বরং তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকিল। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে ঠাকুরের থাকিবার জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি উপযুক্ত বাড়ীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ভক্তদের চেষ্টায় কাশীপুরে রাণী

১ এই দিব্য ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্তের জবানীতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রভুর ভাবাবসানপ্রায় বলিয়া আমি ভোজ্যপাত্রগুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম। দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের পীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্য কোন কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। অদ্য সে ব্যাধি কোথায় গেল! যে গলদেশ দিয়া ক্লেশে দুগ্ধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি গেল। পরে সুজির পাত্র ধরিলাম, তিনি তাহাও প্রীতিপূর্ণভাবে ভক্ষণ করিলেন। পরিশেষে তাম্বুলগুলিও দুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন। আনন্দের আর অবধি রহিল না। সেই মূর্তি, সেই দিনের ঘটনা, এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।" (মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, প্রথম ভাগ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪১)।

কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী মাসিক ৮০্ টাকায় ভাড়ার বন্দোবস্ত হইলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ঠাকুর তথায় আসিয়া উঠিলেন।

ভক্তসকলের প্রাণের প্রাণ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কামধেনু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রকৃতই তাঁহার জীবন-বীণাতে বিদায়ের পূরবী-সুর তুলিয়াছেন ইহা কেহ যেন মানিতে চাহিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গগণ জমায়েত হইলেন কাশীপুর-লীলা-ক্ষেত্রে। সেবক লাটু মহারাজ স্মৃতিচারণ করিয়াছেন, "ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাশীপুরে যেতে হোলো। (শ্রীশ্রী) মা'ও গেলেন। সেখানে লোরেনভাই, রাখালভাই, শরোটভাই, শশীভাই, (বুড়ো) গোপাল দাদা, ছোটগোপাল, নিরঞ্জনভাই, কালীভাই, বাবুরামভাই—এরা সব বাড়ী ছেড়ে রয়ে গেলো। আর রাম বাবু, সুরেন্দর বাবু, মাষ্টার মশায়, বলরাম বাবু, গিরিশ বাবু, কালী বাবু—এনারা সব খরচখরচা করতে লাগলেন। সুরেন্দর বাবু বাড়ীভাড়া দিতেন, বলরাম বাবু ঠাকুরের পথ্য দিতেন, রাম বাবু হামাদের সব খরচখরচা দিতেন। একদিন টাকাপয়সার হিসেব রাখা নিয়ে কথা উঠলো। লোরেনভাই বললে, 'এত হিসেব রাখা-রাখি কেন? এখানে কেউ ত চুরি করতে আসে নি?' বাকী হাম্‌নে বললুম, 'তবু একটা হিসেব রাখা ভালো।' হামার কথা রাখালভাই মেনে নিলো। গোপালদাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার পড়লো।"[১]

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার আসর বসিয়াছে। দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে ঠাকুরের দেহে অসহনীয় কষ্ট দেখিয়া ভক্তগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন, আপ্রাণ সেবাশুশ্রূষার দ্বারা দেহের যন্ত্রণা আরাম করিতে অসাধ্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে ডাক্তার ও সেবকদের অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছে, এদিকে শীর্ণদেহে সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া আনন্দময় পুরুষ ভক্তগণ-মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন।

দিব্যভাবে সদা উদ্ভাসিত তাঁহার বদনমণ্ডল। দেহজ্ঞান বিবিক্ত পুরুষোত্তম এইবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের শেষ বাছাই করিয়া চুম্বকের মত টানিয়া লইলেন। তিনি একদিন নিজমুখে বলিলেন, "লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই,' জিজ্ঞাসা

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি কথা, পৃষ্ঠা ২৩৯-৪০।

করে, তারা বহিরঙ্গ।"[১] বাছাই-পর্ব শেষ হইতে না হইতে প্রত্যেক অন্তরঙ্গ ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ অন্তরঙ্গ উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাঁহারাও ঠাকুরকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া অবসর সময়ে কঠোর সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন। মৃৎশিল্পী খড়ের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ দিয়া মূর্তি গড়িয়া তোলে। মনশিল্পী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি বাছাই-করা বিভিন্ন আধার অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ভাবধারক লোকশিক্ষকদল গড়িতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার অন্তরঙ্গগণ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শরণাগতি লইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা প্রাণ ঢালিয়া করিতে থাকেন। তাঁহারা শুনেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অবতারের শরীর থাকতে থাকতে তাঁর পূজা সেবা করতে হয়। 'সে যে কোঠার ভিতর চোর কুঠরি ভোর হলে সে লুকাবে রে'।"[২] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার ধারক ও বাহক তাঁহার ত্যাগী সন্তানেরা কাশীপুর বাগানে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ধুনিতে অস্মিতা ও মমতা আহুতি দিয়া ধ্যানের উজ্জ্বল শিখাতে সর্বসংশয় ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা জানেন, "ভগবানকে আপনার থেকেও আপনার জেনে যে তাঁর জন্য এই জীবনে সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করেছে, তিনি তাঁর অতি নিকটে। তার কাছে তিনি বাঁধা পড়েছেন—যশোদার কাছে, গোপীদের কাছে দুলাল শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাধা পড়েছিলেন।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর হইতে লাগিল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রত্যেক অন্তরঙ্গ শিষ্যকে তাঁহার নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ধর্মবিজ্ঞানের বিভিন্ন পথ ধরিয়া জ্যোতির্ময় রাজ্যে আরূঢ় করাইতে লাগিলেন।

১ কথামৃত ৪।৩১।১।

২ কথামৃত ৫।১২।৫।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাপূজার যে বিরাট সম্ভাবনাময় প্রস্তুতি চলিতেছিল তাহাও তিনি স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া যান। একবার কয়েকজন ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যায়। জানিতে পারে যে ঠাকুর চিকিৎসার্থে কাশীপুরে আছেন। ভক্তেরা সেই সকল মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ছবির সামনে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে (ঠাকুরের ছবিকে) কেন দিলে?" ইহাতে অসুস্থ ঠাকুরের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া শ্রীশ্রীমা ও অপর সকলে আশঙ্কিত হইলেন। শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিবি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ।)

৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ১১৯।

শ্রীগুরুর সেবা করিবার জন্য যুবক শিষ্যবৃন্দ 'অভিভাবকদের অসন্তোষ এবং চাকুরী ও পাঠহানির আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া' কাশীপুর উদ্যানে মিলিত হইয়াছিলেন। সেবাকার্যের নেতা নরেন্দ্রনাথ। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, "একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।··· ঐরূপে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিয়া তাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশজনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল।" নরেন্দ্র ও রাখালের তদানীন্তন জীবনধারা আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ বলিতেন, "স্বামিজী (নরেন্দ্র) ও মহারাজ (রাখাল) ঠাকুরের এত সেবা করেও ক্লান্তিবোধ করতেন না। তাঁরা দু'জনে সারারাত সাধনভজন নিয়েই থাকতেন।"

সাধনভজনে ও গুরুসেবাশুশ্রূষায় নিরত পার্ষদদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ অদৃশ্য প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। স্বামী প্রেমানন্দ পুরী হইতে ১৫।৮।১৯১৫ তারিখে লিখিত পত্রে একটি মনোহর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, "মনে পড়ে সেই কাশীপুরের বাগানে তুমি আর আমি ছিলাম, ঠাকুর বলিলেন যে—'তোদের আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ'। মনে কি পড়ে বলিলেন—'তোরা যেন বাদর, আর আমি বাদরওয়ালা, তোদের কোমরের দড়ি আমার হাতে। বেশী উপদ্রব কল্লে, বাদরওয়ালা দড়ি টান দেয়।' বলি ভাই মনে রেখো, আমরা তাঁর হাতের বাদর। রাম অবতারে লেজ ছিল, এবার না হয় বেড়ে। বিদ্যা বুদ্ধি সেবার যেমন এবার তাহা অপেক্ষা বড় বেশী মনে করো না। এ সব প্রভুর বাণী।"[১] এই পত্রের ইঙ্গিতেই বোঝা যায়, বিভিন্ন জায়গা থেকে সমাগত ভক্তগণ ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া কি গভীর প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে বুড়োগোপাল-সংগৃহীত গৈরিকবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা নরেন্দ্র, রাখাল ও অন্যান্য নয়জন[২] ত্যাগী সন্তানের মধ্যে বিতরিত হইল।

১ পত্র সংকলন, পৃষ্ঠা ২৩-২৪, স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত পত্র।

২ আরেকখানি বস্ত্র ভৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্রকে দেওয়া হয়। কাহারও বা মতে উহা পাইয়াছিলেন ছোট গোপাল। ত্যাগী এগারজনের নাম—রাখাল, নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়োগোপাল। পুঁথিকার লিখিয়াছেন :

ঠাকুর তাঁহার আদরের দুলাল রাখালকে বৈরাগ্যচিহ্নে ভূষিত করিয়াছেন; তাঁহার বৈরাগ্যপূত জীবন সুগঠিত করিবার মানসে তাঁহাকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন। সেবক শিষ্যদের ভিক্ষালব্ধ শুদ্ধ মাধুকরীর অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিয়াছেন।

ভিক্ষার শুদ্ধ অন্ন মাধুকরী করিতে যাইয়া একদিনের অভিজ্ঞতা লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন। "একদিন হামাকে আর রাখাল বাবুকে ঠাকুর ভিক্ষা করতে বললেন। যাবার সময় ঠাকুর যেমন রোজ বলতেন বলে দিলেন—কেউ গালি দেবে, কেউ আশীর্বাদ করবে, কেউ পয়সা দেবে,—তোরা সব নিবি। প্রথম একজন হামাদের ভিক্ষা করতে দেখে তেড়ে এসেছিলো। বললে—'এমন ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে, আবার ভিক্ষে করছো? কাজ কোরে খেতে পারো না?' রাখাল বাবু তাড়া খেয়ে মুষড়ে পড়লেন। হামি যত বলি ঠাকুর ত আগেই এ সব কথা বলে দিয়েছেন, হামাদের ত সব নিতে বলেছেন, রাখাল বাবু তত লজ্জা পান। শেষে বললুম—'ভয় পাচ্ছেন কেনো? চলুন অন্য বাড়ী যাই।' তারপর একজন বিধবার বাড়ীতে ভিক্ষে করতে যাই। সেই স্ত্রীলোকটি বললে—'তোমরা কি দুঃখে

বস্ত্র মালা একত্রেতে গোপাল এক্ষণে।
হাজির করিয়া দিলা প্রভু-সন্নিধানে॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ।
প্রত্যেকে বসন মালা কৈলা বিতরণ॥
একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে।
পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিরিশ ঘোষে॥ (পৃঃ ৬২০)

অপর একস্থলে পুঁথিকার লিখিয়াছেন:

আর দিন বিধিমত ক্রিয়া-সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশজনে॥
নরেন্দ্র যোগীন লাটু নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম কালীচন্দ্র বণিকনন্দন॥
সুন্দর শরৎ শশী ও তারক ঘোষাল।
শেষ জন নাম যাঁর মুরুব্বি গোপাল॥
রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে॥ (পৃঃ ৬২৮)

এবং পরবর্তিকালে মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ীতে বরাহনগর মঠে তাঁহারা "কুলগত নাম আখ্যা কৈলা পরিহার।" (পুঁথি, পৃঃ ৬৩৩)

শশিভূষণ ঘোষ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের ৪৬০ পৃঃ দেখা যায় "তিরোধানের কয়েক দিবস পূর্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট তাঁহাদিগের উপস্থিত এগারজন ভক্ত সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন।"

ভিক্ষে করছো, বাবা! তোমাদের অভাব কি?' তাকে তখন সব বললুম। তখন সে খুব খুশী হোয়ে একটী সিকি দিলে আর সূর্যনারায়ণের দিকে চেয়ে খুব আশীর্বাদ করলে—'তোমরা যে জন্যে বেরিয়েছো, ভগবান তোমাদের আশা পূরণ করুন।' তারপর আউর অনেকের বাড়ী যাই। তানারা সব চাল পয়সা দিলে। সেগুলো এনে তাঁর (ঠাকুরের) কাছে দিলুম। ঠাকুর জিগ্‌গেস করলেন—'আজ কেমন কোরে ভিক্ষা করলি বল্?' তাঁকে তখন সব বললুম। ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন—'ও ঠিক বলেছে। ছ্যাখ! ইখানকার সঙ্গে সূর্যনারায়ণের যোগ আছে?"[১]

ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের কয়েকজন বৈরাগ্যের প্রাবল্যে তীর্থস্থানে তপস্যাদি করিতে যাইতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তদের বলিলেন, "আচ্ছা ছোকরাদের এ কি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে, কেউ গঙ্গাসাগরে।" শশী ও রাখালের কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ, সর্বতীর্থের সার। তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে ঠাকুরের সেবাকার্যে ও ঠাকুর-প্রদর্শিত সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কাশীপুর-লীলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার শরীর-মনের বাঁধন ভাঙ্গিয়া তাঁহার সৎস্বরূপ প্রায় পূর্ণভাবে প্রকট করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিকট গুহ্যতম তত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সময়কার একটি মধুর স্মৃতির কথা মহারাজ বেলুড় মঠে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "কাশীপুরের বাগানে লীলা-সম্বরণের কিছু আগে ঠাকুর অনন্তের কি সব idea (ধারণা) দিতেন! একদিন আমি, গিরিশ বাবু, স্বামীজী, শশী ও নিরঞ্জন আছি। আমরা তখন ছেলেমানুষ। গিরিশ বাবু আমাদের মধ্যে তখন প্রবীণ, আর অত মেধাবী ত! ঠাকুরের মুখে অনন্তের সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনেই বললেন—আর না, আর ধারণা হচ্ছে না। উঃ! কি সব কথা! বলতেন, শুকদেব ডেও পিঁপড়ে, একদানা পেয়েই বিভোর। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সচ্চিদানন্দ-গাছে থোলো থোলো ফলছে। এই সব অনন্তের ভাব। আমরা তখন ছেলেমানুষ, অত ধারণা করতে পারব কেন?"[২]

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১২৬।
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভগবদ্‌লীলাবিলাসের চিন্ময় তনুখানি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, দেহের সকল কষ্টযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া 'দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাগর।' মহানন্দময় পুরুষ আশ-পাশের কাহাকেও বিষণ্ণ হইতে দিতেন না। ভকতরঞ্জন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে সকলকে আনন্দ বিতরণ করিতেন। ৭ই মার্চ ১৮৮৬ রবিবার উপস্থিত হইল। ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি। "কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিলো। সেদিন লোরেনভায়ের গান হোলো আর সুরেন্দর বাবু একছড়া ভালো গোড়েমালা ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। বলরাম বাবু ও মাষ্টার মশায় একখানা কাপড় ও আংগা দিলেন, আর একজোড়া চটিজুতো কে এনেছিলো জানি না।"[১] ক্রমে উপস্থিত হইল দোলোৎসব।

শ্রীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙ্গগণে।
একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে॥
মহৎ প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর।
উঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর॥
দ্বিতলে দেওয়াল ধরি পথে গবাক্ষের।
দাঁড়ায়ে দেখেন নৃত্য-গীত ভক্তদের॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ করে ঝলমল।
ভক্তমনবিমোহন আনন্দের স্থল॥

অবিরল লাল রেণু চারিদিকে ছুটে।
সড়ক হইল রাঙ্গা ফাগুয়ার চোটে॥
শ্রীপদে প্রণাম করি পরে ভক্তগণ।
দোলখেলা আজিকার কৈল সমাপন॥[২]

ঠাকুরের সেবা,
সাধনভজন, আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া দিন গড়াইয়া চলে। কাশীপুর লীলার আসরও দ্রুত সমাপ্তির পথে, এই আশঙ্কাও অন্তরঙ্গদের অন্তরে প্রায়ই অসহনীয় হইয়া উঠে।

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২৫১ পৃঃ
২ পুঁথি ৬২৩-২৪।

ক্রমেই ঠাকুরের অন্ত্যলীলার পুরবী রাগিণী স্পষ্টতর সুরে বাজিতে লাগিল। সেবক শিষ্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়মন্দিরে আশার জাগদীপ আশঙ্কার ঝড়-ঝাপটায় কখন কখন কাঁপিয়া উঠিল। ১৪ই মার্চ রাত্রিতে অবস্থা সঙ্কটজনক হইল; গভীর রাত্রিতে ভক্তবর গিরিশ ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। পরদিন সকালে অবস্থার উন্নতি দেখা গেল, সেবকদের মুখে হাসি ফুটিল। আনন্দময় পুরুষের অসহনীয় দেহকষ্টে রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জানেন না, বোঝেন না, কি করিবেন, কি করিলে ঠাকুরের দেহকষ্ট সামান্যও লাঘব করা যাইবে—এইসব ভাবিয়া দিশাহারা হইলেন। মাঝে মাঝে মনে হয় ঠাকুর নিজে ইচ্ছা করিলে এই দেহের যন্ত্রণা হ্রাস পাইতে পারে। রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকেন। "ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন।

"রাখাল (সস্নেহে)—আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র রাখালাদি ভক্তের প্রতি)—আর বললে কই হয়?

"এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, 'তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো।' যখন আবার ব্যাকুল হ'য়ে কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাইলেন, এমনি ব্যাকুলতা—যেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,—তখন কিন্তু আর বেরয় না!

"রাখাল (ভক্তদের প্রতি, মৃদুস্বরে)—গৌর অবতারের কথা বলছেন।"

আপনজনদের লইয়া প্রসঙ্গ চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।

রাখাল: তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন ও বলিতেছেন: বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো—গেলো কেউ চিনলে না।"[১]

১ কথামৃত ৩।২৪।২।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, "দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই।...আর যে দেহ ধারণ করা,—এটি ভক্তের জন্য।"

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন, যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে ঠাকুরকে)—নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝ্‌ছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,—"হাঁ। আবার দেখ্‌ছি অনেকে বুঝ্‌ছে! (মাষ্টারের প্রতি) না গো?"

ঠাকুর রাখালাদি ভক্তদিগকে ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্র ও মণিকে দেখাইলেন।

ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া রাখাল বলিতেছেন (সহাস্যে)—আপনি বল্‌ছেন নরেন্দ্রের বীরভাব, আর এঁর সখীভাব?

ঠাকুর হাসিতেছেন।......

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রকে)—আচ্ছা, আমার কি ভাব?

নরেন্দ্র—বীরভাব, সখীভাব,—সব ভাব।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন। হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।

ইঙ্গিত বুঝিয়া নরেন্দ্র বলিলেন—যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি আনন্দে)—দেখছিস!

কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গের পর ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্র সুর করিয়া মোহমুদ্গর হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ও কি! ও কি! ও সব ভাব অতি সামান্য!" নরেন্দ্র ইঙ্গিত বুঝিয়া সখীভাবের গান ধরিলেন—

"কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥

*   *   *

কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম-জপই, ছার তনু করিব বিনাশ

উপস্থিত সকলে নরেন্দ্রর গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। দেখা গেল, ঠাকুর ও রাখালের গণ্ডদেশ বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে।[১]

১ কথামৃত ৩।২৪।৩।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও রাখালকে সেই ছোট বালকটির মত দেখিতেছেন। দেখা যাইত কখনও তিনি তাঁহার মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, কখনও সামনে বসাইয়া খাওয়াইতেছেন। রাখালের জন্য তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না। রাখালের বালকবৎ সারল্য দেখিয়া একদিন ঠাকুর অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "তুই এত সরল! আহা আমি চলে গেলে তোকে কে দেখবে?"[১] অপরপক্ষে, রাখালের নিকট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, মহৎ হইতে মহত্তররূপে প্রতিভাত হইতে থাকিল। ২২শে এপ্রিল, সন্ধ্যাকালে রাখাল, শশী ও মাস্টারমশাই উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। রাখাল ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে মন্তব্য করিলেন, "(ঠাকুর) যেমন একটা টাওয়ার। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না,—কেউ নাগাল পায় না।"[২] ঠাকুরের চিন্তা করিয়া, ঠাকুরের দিব্যভাব ও বাণী অনুধ্যান করিয়া রাখাল তদ্‌গতপ্রাণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। ইদানীং ঠাকুরের অসুস্থতা কিছু প্রশমিত হয়, ভক্তজনের প্রাণে আশাদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।[৩] কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সেই সাময়িক উন্নতি রুদ্ধ হইল।

লীলাসম্বরণের কয়েকদিন পূর্বে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহাকে নির্দেশ দিতে থাকেন। রাখালের অনন্যসাধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।" ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া নরেন্দ্র অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের বলিলেন, "আজ থেকে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকব।" ইহা শুনিয়া আনন্দিত ঠাকুর বলিলেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।"[৪]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা

১ The Swami Brahmananda by M., Prabuddha Bharata, May, 1922, p. 171

২ কথামৃত ২।২৭।১।

৩ ধর্মতত্ত্ব ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৮ শক, ২৮শে এপ্রিল, ১৮৮৬ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করে "......দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন, ডাক্তারেরা আবার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার আশা দিতেছেন।"

৪ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৮৭, ৯৩, ৯৪।

ও কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো ; প্রথম, আমি কে ? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?"[1] এই জানার উদ্যম দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বীজাকারে উপ্ত হইয়াছিল, কাশীপুর সাধনোদ্যানে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে সেই সকল চারাগাছ মহীরুহে পরিণত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-মাহাত্ম্য জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া উদ্গত মহাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসুধাপাত্রের ধারক ও বাহক এই মহাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণলীলার উত্তরপর্ব রচনা করিয়াছিল।

"তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্ছে"—ভক্তবৎসল ঠাকুরের এই বাণীতে ভক্তবৃন্দ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্থূলশরীর-আশ্রয়ী তাঁহার অমৃতময় মর্তলীলার ছেদ টানিয়া দিলেন। সেদিন ছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি। সূর্যগ্রহণের সাময়িক অন্ধকারের মত বিষাদ বেদনা চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল, মনে হইল অন্ধকার বুঝি আর কাটিবে না। কিছুদিন পরে ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ অন্তরের মণিকোঠায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সমাসীন দেখিয়া শান্তি ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহার স্মরণ-মননে ব্যাপৃত হইলেন।

ক্রমে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ত্যাগী সন্তানদের স্মরণ পথে উদয় হয় শ্রীঠাকুরের আরব্ধ কার্য তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। অবতারপুরুষ 'জগদ্ধিতায়' যে ভাবগঙ্গার অবতরণ করাইয়াছিলেন, নূতন যুগের কলুষবিনাশিনী সেই জাহ্নবী সলিলধারাকে জনপদের মধ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হইবে তাঁহাদেরকেই। সর্বকলুষহারী ভাবগঙ্গা দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্লীবতা, জড়তা, সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় যুগ যুগ ধরিয়া প্রবাহিত হইবে। এই প্রসঙ্গে চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সম্বরণের কিছুকাল পরে শ্রীমায়ের সাদা-চোখে দেখা এক গভীর ভাবদ্যোতক দর্শন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর,...আর ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব, গঙ্গাস্নানে যাব মনে করলুম।...একদিন দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে, নরেন, বাবুরাম, রাখাল সব যত ভক্তেরা—কত লোক ! দেখি

১ কথামৃত ৪।১৪।১।

কি ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের পদাম্বুজ হইতে উৎসারিত ও শ্রীমাতাঠাকুরাণী-কর্তৃক আরাধিত ভাবগঙ্গা সর্ববিধ কল্যাণাভিমুখীন হইয়া জগতের দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা এখন সেই ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৮।

তৃতীয় অধ্যায়

দিব্য উত্তরাধিকার

তৃতীয় অধ্যায়

দিব্য উত্তরাধিকার

লীলাগুণমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চক্ষুর অন্তরাল হইলে তদ্গতপ্রাণ রাথালচন্দ্রের অন্তঃকরণ মাতৃহারা বালকের ন্যায় আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে তাঁহার মাতা ও পিতা, সখা ও সহায়, একমাত্র নির্ভরস্থল। ঠাকুরের অভাব তিনি কিভাবে মিটাইবেন, তাহার কুলকিনারা করিতে পারেন না। তাঁহার বিরহকাতর মনের ভাব যেন প্রকাশিত হইয়াছে শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে।

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্
শূন্যায়িতং জগৎ সবং গোবিন্দ বিরহেন মে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বিহনে জীবন্মৃত রাথালের নিকট ত্রিভুবন শূন্য বোধ হয়। দুঃখের তুষানলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে। পুরুষোত্তমের দিব্যসঙ্গের সুখস্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাহার চিত্তকে অস্থির করিয়া তোলে।

মহাকাল চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। দিনের শেষে রাত্রি আসে; রাত্রির শেষে দিন। ভক্তদের অনেকের বোধ হইল তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা অস্তমিত। ত্যাগী সন্তানবৃন্দ অনাথ হইয়া শোকসাগরে ভাসিতে থাকেন। তদানীন্তন কয়েকটি ঘটনা ক্রমশঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "তাঁর অস্থি আর ভস্ম একটা কলসীতে পুরে শশীভাই মাথায় কোরে বাগানে এনেছিলো। যে বিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কলসীটি রেখে দেওয়া হোলো।"..."পরের দিন গোলাপ-মা এসে খবর দিলো—(শ্রী) মাকে উনি (ঠাকুর) দেখা দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন—'আমি কি কোথাও গেছি গো? এইত রয়েছি; শুধু এঘর থেকে ওঘরে এসেছি।' যারা সব দুঃখ করছিলো গোলাপ-মার কথা শুনে তাদের সন্দেহ মিটে গেলো। তারা এখন সকলে মিলে বল্লে—'সেবা যেমন চলছিলো তেমনি চলবে।'......দুপুরে সেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হোয়েছিলো। সবাই

মিলে তাঁর ঘরে কীর্তন কোরেছিলো। রাতে সুজীর পায়েস কোরে তাঁকে নিবেদন করা হোলো। ফিন্ রামনাম শুনানো হোলো। তারপর সব যে যার বাড়ী চলে গেলো। হাম্‌নে, গোপাল দাদা আর তারক দাদা সেইখানে রয়ে গেলুম।··· তিন-চার দিন পরে (শ্রী) মা হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সন্ধ্যের আগেই তিনি কাশীপুর বাগানে ফিরে এলেন।······শুনেছি সেদিন বিকালের দিকে রাম বাবু বাগানে এসেছিলেন। দুপুরে শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, লোরেনভাই, রাখালভাই ও বলরামভাই এসেছিলো। রাম বাবু নাকি আশ্রম (অর্থাৎ কাশীপুরের বাগানবাড়ী) তুলে দিতে চেয়েছেন আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন।"[১]

একটি কঠিন সমস্যা দেখা দিল। প্রধান গৃহী ভক্তরা স্থির করিলেন কাশীপুর উদ্যানবাটীর ভাড়া ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত মিটাইয়া বাড়ীটি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নেতৃস্থানীয় ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসী কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সমাহিত করা হইবে। উপরন্তু তিনি ত্যাগী সন্তানদের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, "তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব ত্যাগী সন্তানদের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধি পরামর্শ করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, "শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশী অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ঐ কৌটা বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুণাক্ষরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু আসিলে বাকী অস্থি কলসী-সহ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত মতো তাহাই করা হইল। সেই রাত্রে কলসী হইতে প্রায় সমস্ত অস্থিই বাহির করিয়া একটি কৌটায়[২] রাখা হইল এবং যৎসামান্য অস্থির গুঁড়া, ভস্ম ও গঙ্গামৃত্তিকা সেই তামার কলসীতে রাখিয়া দেওয়া হইল।"[৩] পূতাস্থি সপ্তাহকাল কাশীপুরের উদ্যানে রক্ষিত হইল। প্রত্যহ উহার পূজা ও ভোগারতি হইত। ৮ই ভাদ্র, ১২৯৩ (ইংরাজী ২৩শে আগস্ট, ১৮৮৬) জন্মাষ্টমীর দিন সেই অস্থিকলসী

১ লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩।

২ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থি-রক্ষিত তাম্রকৌটা শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে "শ্রীর্জ" বা আত্মারামের কৌটা নামে পরিচিত।

৩ আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ। পৃঃ ১২৩, ১২৪।

মহাসমারোহে কাঁকুড়গাছি উদ্যানে সমাহিত করা হইল। উৎসবে গৃহী ভক্তগণের সহিত নরেন্দ্র, রাখাল, শশী প্রমুখ ত্যাগী সন্তানগণ যোগদান করিলেন। "কাঁকুড়-গাছির উৎসবের পর রামলাল (চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে একটা ভাণ্ডারা দিলেন, সেখানেও কীর্তন হয়েছিলো।"

এদিকে ৬ই ভাদ্র ভক্ত বলরামবাবু শ্রীমাতাঠাকুরাণী, লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে নিজের বসতবাটীতে যত্নসহকারে লইয়া আসিলেন। সেই পূত ভস্মাস্থিপূর্ণ কোটাটি ঐ বাড়ীতে আনা হইল এবং বসু পরিবারের ঠাকুরঘরে স্থাপনপূর্বক পূজানুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা হইল। লাটু ও রাখাল ঠাকুরের ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্র লইয়া বলরামবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির বামদিকের ঘরে সেইসকল দ্রব্য রাখা হইল।[১] ভক্ত বলরামের উদ্যোগে শ্রীমাতাঠাকুরাণী, লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা, মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী, এবং ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে লাটু, যোগেন ও কালী ১৫ই ভাদ্র তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন। তাঁহারা দেওঘর, কাশী ও অযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন। অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবন যাত্রার পথে শ্রীমা অভাবনীয়রূপে ঠাকুরের দর্শন পাইলেন। শ্রীমা রেলগাড়ীতে জানালার পার্শ্বে হাত রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল ঠাকুরের দেওয়া সুবর্ণনির্মিত ইষ্টকবচ। শ্রীমা অকস্মাৎ দেখেন, ঠাকুর জানালায় মুখ বাড়াইয়া বলিতেছেন, "কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়।" এই দর্শনের বিষয় শুনিয়া সকলের মনে আবার প্রত্যয় হইল যে, ঠাকুর অদৃশ্যভাবে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে তারকনাথ কিছুকাল বৃন্দাবনধামে তপস্যাদি করিয়া কাশীধামে বসবাস করিতেছিলেন। এইকালে রাখাল অধিকাংশ সময় বলরামভবনে অবস্থান করিতেন। নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক ভিটা লইয়া যে মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল তাহাতে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া আপদে বিপদে বন্ধু রাখালচন্দ্র তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিরহ-বিধুর অন্তঃকরণে জ্বলিতে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতির দীপশিখা।

ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানেরা গভীর বেদনার বোঝা লইয়া কেহ পিতৃগৃহে, কেহ বা অন্যত্র গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আদেশ ছিল, "তুই

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা পৃঃ ২৮১।

ছেলেদের একত্র রাখিস্ ও দেখাশুনা করিস্।" ঠাকুরের আদেশ কিভাবে পালন করা যায় সেই-চিন্তায় ভারাক্রান্ত তিনি অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদের সহিত আলোচনা করেন, কিন্তু সুস্পষ্ট কোন উপায় খুঁজিয়া পাননা। তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক সকলের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব প্রদীপ্ত রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই সময় এক অলৌকিক ঘটনা পথের নিশানা দেখাইয়া দিল। স্বামী শিবানন্দজী পরবর্ত্তীকালে বেলুড় মঠে ঘটনাটি যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরের কি অসীম করুণা, তিনি অলক্ষ্যেও আমাদের রক্ষা করেছেন। তাঁর ভক্ত সুরেশ মিত্র, যাঁকে ঠাকুর সুরেন্দ্র বলে ডাকতেন, একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের ধ্যান করছিলেন, এমন সময় তাঁর অদ্ভুত এক দিব্য দর্শন হ'ল। তিনি অকস্মাৎ দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, 'তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের আগে একটা ব্যবস্থা কর!' একথা বলেই ঠাকুর অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরের ঐ দৈববাণী শুনে সুরেশবাবু নরেন্দ্রনাথের কাছে উন্মত্তভাবে ছুটে গেলেন। তাঁরা এক পল্লীতেই বাস করতেন। অশ্রু-ধারায় সিক্ত সুরেশবাবু তাঁর দিব্যদর্শনের কথা নরেন্দ্রনাথকে বলে অবশেষে তাঁর হাত ধরে বলতে লাগলেন, 'ভাই একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, পূত ভস্মাস্থি ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র রেখে পূজার্চনার ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে তোমরা কাম-কাঞ্চন ত্যাগী ভক্তেরা এক সঙ্গে থাকতে পারবে, মাঝে মাঝে আমরা গিয়েও সেখানে দুদণ্ড জুড়াতে পারব। আমি কাশীপুরে মাঝে মাঝে যে টাকা দিতাম, সেই টাকা এখনও দেব।' ঠাকুরের অপার করুণার কথা শুনে অশ্রুসিক্ত নরেন্দ্রনাথ সুরেশবাবুকে আলিঙ্গন করলেন।"[১]

পরদিনই গঙ্গার ধারে অল্প টাকায় একটি ভাড়া বাড়ীর সন্ধান আরম্ভ হইল। কয়েকদিনের মধ্যে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ভবনাথের চেষ্টায় বরাহনগরে গঙ্গার নিকট ভুবন দত্তের বাড়ী মাসিক এগার টাকা ভাড়াতে ব্যবস্থা হইল। 'পোড়ো বাড়ী' নামে পরিচিত জীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ীটির মালিক ছিলেন টাকীর জমিদার মুন্সি-রাবুরা। ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়া হুট্‌কো গোপাল ঐ বাড়ীতে বাস করিতে থাকিলেন। সঙ্গে ছিল শশী নামে এক পাচক ব্রাহ্মণ। নরেন্দ্রনাথ তারককে

১ স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা।

কাশীতে তার করিলেন সত্বর আসিবার জন্য। তারকনাথ হাওড়া স্টেশনে পৌছাইয়া একটি ঘোড়ার গাড়ীতে বলরাম ভবনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেখানে নরেন্দ্রনাথ রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়া সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপস্থিত। কাল বিলম্ব না করিয়া সেই গাড়ীতেই তাঁহারা বরাহনগরের ভাড়া বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। অনুমান হয়, ঠাকুরের শয্যাদ্রব্য বস্ত্র ইত্যাদি ঐ ঘোড়ার গাড়ীতেই বরাহনগর বাড়ীতে লইয়া আসা হয়। একটি শয্যার উপর স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিতে প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি, ধূপধুনাদি দেওয়া শুরু হইল। এইভাবে ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসের শেষে বরাহনগর মঠের সূত্রপাত হয়।[১] মঠ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পরে ১০ই কার্তিক মঠে প্রথম শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। হুট্‌কো গোপাল, তারক, বুড়ো গোপাল স্থায়ীভাবে মঠে বাস করিতেছিলেন, মাসখানেক পরে কালীপ্রসাদ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মঠে যোগদান করেন। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী প্রভৃতি যুবকগণ মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

বাবুরাম-জননী মাতঙ্গিনী দেবীর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল আঁটপুরে তাঁহার

১ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরী হইতে জানা যায়, বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯৩ সালের ৩রা কার্তিক। প্রাপ্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে অনুমান হয় যে, এই দিনটি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার পাদুকাতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হইতে থাকে।

কথামৃতকারের বর্ণনাতে পাই: যাঁরা নির্জনে ধ্যানধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্বদক্ষিণের ঘরটিতে তাহারাই থাকিতেন।......মঠের ভাইরা বলিতেন 'কালী তপস্বীর ঘর'।......(এই) ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর।......এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন। দানাদের ঘরের পূর্বকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া-দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর। ঠাকুরঘরের ও কালী তপস্বীর ঘরের পূর্বে বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর দোতলার উপরে। কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি।" (কথামৃত, ২। পরিশিষ্ট) আবার স্বামী বোধানন্দের বর্ণনাতে পাই: বাড়ীটি অতি পুরাতন। প্রায় অর্ধেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতলে মঠ অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দরদালানের বাঁদিকের দরজা দিয়ে মঠে প্রবেশ করিতে হয়। একটি বড় ঘর ও দালান। উহার পাশে রান্নাঘর ও খাইবার ঘর। তাহার পিছনে পায়খানা। দরজা দিয়া ঢুকিয়াই বাঁদিকে একটি ছোটঘর ছিল।......উহার পাশেই ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরের দক্ষিণে আর একটি ছোট ঘর ছিল। উহার পূর্বদিকের দরজাটি দিয়া দরদালানে যাওয়া যাইত।......যে অংশটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সেখানে স্তূপাকার ইট ছিল। উহার মধ্যে গোক্ষুর, কেউটে ইত্যাদি সাপ যথেষ্ট থাকিত।" (উদ্বোধন, ৫২ বর্ষ, ৯ সং, পৃঃ ৪৫১)

বসতবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে আনিয়া সেবা করেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল বলিয়া তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন। জননীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাবুরাম স্থির করিলেন, ঠাকুরের অতি প্রিয় নরেন্দ্রনাথকে আঁটপুরে লইয়া যাইবেন। প্রস্তাবে নরেন্দ্রনাথ সানন্দে সম্মত হইলেন। নিমন্ত্রণের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের অনেকেই আঁটপুরে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নরেন্দ্র, তারক, শরৎ প্রভৃতি নয়জন হাওড়া হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়ীতে চড়িয়া ভজনকীর্তন করিতে করিতে আঁটপুরে পৌঁছাইলেন। অতিথিবৎসল মাতঙ্গিনী দেবী তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জপধ্যান আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া দিনগুলি গড়াইয়া চলিল। একদিন ঘোষ পরিবারের দুর্গামণ্ডপে হরপার্বতীর পূজা করা হইল। গঙ্গাধর 'শিব' ও সারদাচরণ 'পার্বতী' সাজিয়াছিলেন।[১]

প্রায়দিনই সন্ধ্যাকালে দুর্গাদালানের সম্মুখে একটি বৃক্ষমূলে ধুনি জ্বালাইয়া সকলে বসিতেন, কখনও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, কখনও বা জপধ্যান করিতেন। অনুরূপ এক সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ঈশানুসরণ (Imitation of Christ) অবলম্বনে ঈশার পবিত্রতা, ত্যাগবৈরাগ্য, প্রেমভক্তির কাহিনী বলিতে থাকিলেন, সেই অমৃতময় বাণী প্রচারের জন্য খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ যে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে, মহাশক্তির আধার প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব তাঁহার চিহ্নিত ত্যাগী যুবক ভক্তগণকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্ম প্রবর্তনের গুরুদায়িত্ব তাঁহার প্রিয় সন্তানদের উপরই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের উদাত্ত আহ্বান উপস্থিত সকলের প্রাণে আলোড়ন তুলিল, পবিত্র ধুনির সম্মুখে বসিয়া তাঁহারা ত্যাগব্রতের জীবন বরণ করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও ব্রত সমবেতভাবে একাভিমুখী হইল। সকল সংশয় দূর হইল। এক অচিন্ত্য দৈবশক্তির প্রেরণায় যেন এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হইল। পরে তাঁহারা জানিলেন যে, সেই পবিত্র মুহূর্ত ছিল ২৪শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যাকাল, অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের প্রাক-সন্ধ্যা; সকলের সংবিত্তি দৃঢ় হইল যে শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতেই এক দিব্য ভাব তাঁহাদিগের অন্তর মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের

১ তুলসীরাম ঘোষের স্মৃতিকথা হইতে প্রাপ্ত।

ন্যায় প্রকাশিত হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে সাহায্য করিয়াছে। পরবর্তীকালে এই ঘটনা স্মরণ করিয়া স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "আঁটপুরেই আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল। ঠাকুরতো আমাদেরকে সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেনই —ঐ ভাব আরও পাকা হ'ল আঁটপুরে।" আঁটপুর গ্রামে দিন সাতেক অতিবাহিত করিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ কয়েকক্রোশ দূরে ৺তারকেশ্বর গমন করিলেন। ৺তারকেশ্বর মহাদেবের পূজার্চনা করিয়া ও ভজনকীর্তনে দুইদিন কাটাইয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রাগুক্ত দলে অনুপস্থিত ছিলেন রাখাল, যোগেন, গোপাল ও লাটু। বাবুরাম-জননী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের রাখালকে দেখিতে না পাইয়া পুনঃ পুনঃ খেদ করিতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ রাখালকে লইয়া পুনরায় আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে মাতঙ্গিনী দেবী অনেকটা শান্ত হইলেন। সেই সময় রাখাল কিছুদিনের জন্য পুরী গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাখালকে লইয়া আঁটপুরে গমন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যান বাবুরাম, যোগেন, বুড়ো গোপাল ও গৌরীমা। তাঁহাদের পাইয়া মাতঙ্গিনী দেবীর সকল দুঃখ মিটিল, তিনি আহ্লাদিত হইলেন। কথিত আছে, এই সময় আঁটপুর গ্রামে জনৈক শিক্ষিত যুবক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। সেই যুবক রাখালচন্দ্রের সান্নিধ্যে তাঁহার ধ্যানতন্ময় ভাব দেখিয়া তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে ধর্মান্তরের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

ক্রমে ক্রমে বরাহনগর মঠে শরৎ, শশী, নিরঞ্জন, রাখাল, নরেন্দ্র, সারদা, সুবোধ একে একে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া লাটু যোগদান করিলেন, যোগেনও আসিলেন। বরাহনগর মঠের দৈনন্দিন জীবন জমজমাট হইয়া উঠিল। আনুমানিক জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বলরামভবন হইতে "শ্রীজী" বরাহনগর মঠে আনা হয় এবং মঠে নিত্যপূজার সূত্রপাত হয়। পূজা সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন সেবা নিষ্ঠার ঘনীভূত বিগ্রহ শশী।

সেই সময়কার মধুর স্মৃতি চয়ন করিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "বরাহনগর মঠে শশীভাই এমনি আরতি করতো কি বলবো? ঠাকুর ঘরটা তখন গমগম করতো। শশীভাই মুখে, 'জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব!' বলতো, আর কালীভাই একটা স্তোত্র পাঠ করতো।......হামাদের আর কুছু ছিলো না...হর্‌বখৎ

শশীভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমন ভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন্ কোনটা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে করতো।"

বরাহনগর মঠে ত্যাগী যুবকবৃন্দ বিবেকবৈরাগ্যের হোমাগ্নি চয়ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানে ভজনকীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। সুরু হইল দুশ্চর তপস্যার এক স্মরণীয় অধ্যায়, দিবারাত্রের হিসাব লইয়া কালের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। মঠচারিগণ একাহারে, অর্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে কাটাইয়াছেন, কখনও শুধু ভাত, নুন ভাত বা তেলাকুচাপাতার ব্যাঞ্জন সহযোগে ভাত খাইয়াছেন ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়াছে ভজন-কীর্তন, পূজা-পাঠ, বিচার-জপধ্যান। সেই সময়ের মঠজীবন বর্ণনা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "খরচপত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠে central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) ব'লে জানবি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষে ক'রে চাল আনা হ'ল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, জপধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে। সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!"[১] সেই সময়কার স্মৃতি চয়ন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "অবশ্য খাওয়াপরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল। তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাউল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোন কোন দিন শাক্ সব্জী কোনরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। সকলের পরণে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ-কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব। তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১৩৬৯ ; ৯।২৩৯।

ভরিয়া ওঠে!"[১] স্বামী ব্রহ্মানন্দও উত্তর কালে কৌতুক করিয়া বলিতেন, "যখন খাবার শক্তি ছিল, তখন তেলাকুচো সেদ্ধ ভাত জোটাই মুসকিল হোত, এখন খাবার সামর্থ্য নেই, উপাদেয় আহার জুটছে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক। শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিতেন, "তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ওরকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখন কেউ দেখেছে?"[২] ত্যাগীরাজের শিষ্যগণের জীবনও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। অশন-বসনে ছিল কৃচ্ছ্রতা, কিন্তু মঠ বাসীদের হৃদয়কুঞ্জে অনুরণিত হইত ত্যাগ বৈরাগ্যের মধুর স্বরধারা।[৩] ভক্তমণ্ডলীর সুপরিচিত মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর এক বিবরণী তিনি লিখিয়াছেন। উহা হইতে মঠ জীবনের অন্তরঙ্গ ভাবটি বুঝিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি সকল মঠবাসী শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন। মাস্টারমশাই "দানাদের ঘরে" প্রবেশ করিলে নরেন্দ্র রচিত গান "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" গাহিয়া তারকনাথ তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। উপস্থিত রাখালও গানে যোগ দিলেন—সুরের তালে তালে তাঁহারা শিবনৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাত্রিকালে মঠপ্রাঙ্গণে বিল্বমূলে পূজার আয়োজন হইয়াছে। গৈরিক বস্ত্রধারী কৌমার বৈরাগ্যবান ভক্তগণ ধুনি জ্বালিয়া বসিয়াছেন। পূজার ভাবগম্ভীর মন্ত্র, ভজন, শাস্ত্রপাঠ, বিচার সবকিছু মিলিয়া পূজাপ্রাঙ্গণ কাশীতীর্থে পরিণত হইল। চারপ্রহরে চারপূজা সুসম্পন্ন হইল; প্রতি প্রহরে পূজান্তে ভক্তবৃন্দ সঙ্গীত সহযোগে বিল্বমূলের চতুর্দিকে নৃত্য করিতে থাকেন, কখনও বা তাঁহাদের জলদগম্ভীর 'শিবগুরু' হুঙ্কার ধ্বনি আনন্দবার্তা চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইতে থাকিল। অরুণোদয়ের

১ স্বামী অভেদানন্দের "আমার জীবনকথা" পৃঃ ১৩৭।

২ "শ্রীমা সারদাদেবী" পৃঃ ৫৮৫।

৩ অনন্ত তেজবীর্যে বলীয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি অভিমত খুবই লক্ষণীয়। তিনি তাঁহার এক পাশ্চাত্যদেশীয়া শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন, "When my Master left the body, we were a dozen penniless and unknown youngmen. Against us were a hundred powerful organizations, struggling hard to nip us in the bud. But Ramakrishna had given us one great gift, the desire and the life-long struggle not to talk alone but to live the life."

সংগে পূজা সমাপ্ত হইল। ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রণাম করিলেন। অতঃপর প্রসাদ ধারণের জন্য সকলে দানাদের ঘরে মিলিত হইলেন। প্রসাদ ধারণের সময় আনন্দ রঙ্গরসের ফোয়ারা ছুটিল। মাস্টার-মশাই আনন্দের হাট হইতে আনন্দ কণিকা সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তখনও পিতা আনন্দমোহন রাখালের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য 'মোহমুদ্গর'-এ কুহকিনী আশা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তদপি ন মুঞ্চ-ত্যাশাভাণ্ডম্।" পুত্রকে দেখিবার জন্য প্রায়ই তিনি বরাহনগর মঠে আসিতেন। এইরূপে মিথ্যা আশার মোহে তাঁহার আসা যাওয়ার কষ্ট দেখিয়া রাখাল একদিন নম্র ধীরকণ্ঠে পিতাকে বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করিয়া আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" পুত্রের মুখে এই নির্মম কথা শুনিয়া তাঁহার আশার বৃক্ষমূল ছিন্ন হইল। গভীর হতাশা লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে সাধকের চিত্তপট হইতে ধনজন পরিবারের স্মৃতি পরিত্যক্ত জীর্ণপত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে, নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ত্যাগী যুবকবৃন্দ বরাহনগর মঠে একত্র মিলিত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধন-ভজন লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "আমাদের সকলেরই মনে ছিল যে, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও দ্যাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃত-পক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল।"[১] ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে পৈতৃক বাড়ী সংক্রান্ত এক মামলার জন্য প্রায়ই কলিকাতায় যাইতে হইত। রাখালের উপর মঠের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সকল বিষয়ে তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। সময় সময় বিচিত্র সমস্যা দেখা দিত।

১ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৩৭।

কথামৃতকারের লিপিবদ্ধ একটি ঘটনা বিবৃত করা যাইতে পারে। একদিন নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়া শুনিলেন যে, গুরুভ্রাতা সারদাপ্রসন্ন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। প্রথমেই স্বামীজীর মনে হইল, 'রাজা কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন?' যেন রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়াই পলাতক নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। রাখালের সহিত কথা বলিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় সারদাপ্রসন্ন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল তাঁহার জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি পরদিন ফিরিয়া আসিলেন, মঠবাসিগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

মঠবাসীদের ত্যাগবৈরাগ্য, পূজা-পাঠ, শ্রবণ-কীর্তন সব কিছুর মর্মমূলে ছিলেন পরমপ্রেমস্বরূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। মঠজীবনের মূলসুরটি প্রকাশ করা যায় একটি শাস্ত্রবাণী দিয়ে।

মৎকর্ম মম সম্বন্ধো মন্নাম মম চিন্তনম্।
মৎকথা মদনুধ্যানং মদাবেশো মদর্চনা॥[১]

ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া মঠজীবন যে গাথুনী দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিল; সেই গাথুনীর মসলা ছিল পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও প্রেমভক্তি। একজন মঠবাসী সুখস্মৃতি চয়ন করিয়াছেন, "হামেশা ঠাকুরের ভালবাসা নিয়ে কথা উঠতো। কেউ বলতো—'ঠাকুর হামায় বেশী ভালবাসেন'; আর একজন অমনি বলতো—'না, হামায় বেশী।' এই রকম করতে করতে শেষে তক্‌রার হোতে থাকতো। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, সবাই মনে করতো তাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।"[২] প্রেমের পরশমণির স্পর্শে মঠবাসীদের সকলেরই অন্তর সোনা হইয়া গিয়াছিল। প্রেম ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি সেখানে স্থান পাইত না। মঠের গোষ্ঠীজীবন অধিকতর মাধুর্যময় হইয়া উঠিয়াছিল দুঃখকষ্টের পরীক্ষার মধ্য দিয়া। শ্রীশ্রীমা সেইসময়কার একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে ছেলেরা সব বীড়ে (পরীক্ষা ক'রে) নিয়ে তবে ছেড়েছে। বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল,......একদিন সকলে বলাবলি করলে, 'আচ্ছা আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম

১ বৃহন্নীল তন্ত্র, ৫ম পটল, শ্লোক ২০৯।
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৮২-৮৩।

নিয়ে প'ড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কি না। সুরেশবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষেটিক্ষেও কেউ করতে যাব না।' এই বলে সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে দিলে। সারাদিন গেল—রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে দরজায় কে ঘা মারছে। নরেন আগে উঠেছে, বলছে—'দেখ্ তো দরজা খুলে, কে? আগে দেখ্ তার হাতে কিছু আছে কি না।' আহা! খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেছে। দেখে তো সব মহা খুশী—ঠাকুরের দয়া টের পেলে। তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে।"[১] মঠের ছোট-খাট কায়িক পরিশ্রমের কাজ, যেমন বাসনমাজা, ঘর ঝাড় দেওয়া ইত্যাদি গুরুভ্রাতারা সাধারণতঃ রাখালকে করিতে দিতেন না। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "একদিন রাখাল-ভাইকে কে যেন একজন কি একটা কাজ করতে বলেছিলো; তাতে লোরেনভাই হুকুম দিয়ে দিলো,—'রাখালভাইকে কেউ কোন কাজ করতে বলবে না।' সেই হুকুম হামাদের সকলে মেনে চল্‌তো।"[২] অন্য প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "রাখালকে রাজা হতে হবে কি না, তাই রাখালকে দিয়ে তিনি (ঠাকুর) কোন ছোট কাজ করাতেন না।"[৩] অবশ্য রাখাল নিজেই অগ্রণী হইয়া অপরের কাজে সাহায্য করিতেন।[৪] একের কাজ অপরে করিয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করা, ইহাই ছিল মঠের রীতি। রাখালের প্রধান কাজ ছিল, মঠের ব্যবস্থাপনার তদারক করা এবং নরেন্দ্রকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা।

মঠের জপধ্যান পূজাপাঠ কাজকর্মের মধ্যেও রাখালরাজের অন্তঃকরণে সবক্ষণ অনুরণিত হইতে থাকে, "অন্যের আছয়ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি।" করুণাঘন শ্রীগুরুর দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি হৃদ্‌পদ্মে উদ্ভাসিত হইয়া মন সায়র উদ্বেল

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, ১০০-০১।
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—পৃঃ ২৮২।
৩ ঐ ঐ ,পৃঃ ১০৫।
৪ শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আহা! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট ক'রে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও আমার কতদিন ভাতের হাণ্ডা মাজতে হয়েছে।" শ্রীশ্রীমায়ের কথা। ১ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ।

"মঠে প্রবেশ করিয়াই গৌরীমা দেখিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি লোহার কড়া মাজিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন।—এই সেই রাখাল, ঠাকুর যাঁহাকে কত কোলেকাঁধে করিয়া রাখিতেন,......তাঁহাকে সরাইয়া গৌরীমা নিজেই বাসন মাজিতে বসিয়া গেলেন।" গৌরীমা—পৃঃ ১২৮।

করিয়া তুলিত। তিনি নীরবে নিভৃতে প্রাণের আকুতি নিবেদন করেন। পরম-দয়িতকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য তিনি কখনও ভাবেন পঞ্চতপা[১] করিবেন বলিয়া, কখনও ইচ্ছা হয় শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি নর্মদাতটে তপশ্চর্যা করিবেন। নির্জন বিপিনে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা হইত। আবার নরেন্দ্রপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদের অকৃত্রিম প্রেম ও বৈরাগ্যরঞ্জিত জীবনও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিত। প্রাণের মধ্যে আকুলিবিকুলি, তবুও ধৈর্যধারণপূর্বক অপর গুরুভ্রাতাদের উতলা মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। "শ্রীম" উপস্থিত করিয়াছেন অতি মনোরম একটি আলেখ্য। বরাহনগর মঠে কালীতপস্বীর ঘরে বসিয়া রাখাল প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।[২]

"রাখাল (প্রসন্নের প্রতি)—কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?

প্রসন্ন—কলিকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল—গুরুমহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর কি করেছি?

মাষ্টার (স্বগতঃ)—আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাঁকে বলে অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

প্রসন্ন—তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না?

রাখাল—মনে খেয়াল হয় যে নর্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিনদিন পঞ্চতপা করি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে আমার মন হয় না।"

সেইসময় রাখালচন্দ্রের একটি চিত্র পাই জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাখালমহারাজের ভাব তখন নিতান্ত নিরাশ্রয় বালকের মত······নিজের ইচ্ছা বা শক্তি যেন কিছুই নাই। বাহিরের একটা কি মহাশক্তি

১ শ্রীশ্রীমা ১৮৯৩ খ্রীঃ নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে 'পঞ্চতপা' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি ১৫।৪।১৮৮৯ তারিখে একটি চিঠিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে রাখাল লিখিয়া জানান 'পঞ্চতপা' কিরূপে করিতে হয়।

২ কথামৃত। দ্বিতীয় ভাগ। পরিশিষ্ট—১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৬-৫৭।

বা অন্য কোন পদার্থ যেন তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।......জগৎ-সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যেন কোন স্থলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং কেহ কোন কথা কহিলে বা ডাকাডাকি করিলে তিনি যেন অন্য জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া জগৎটা দেখিতেন ও উপস্থিত মত দুই একটি কথা কহিয়া অতি দীন হীনের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।"[১] "বরাহনগরের মঠের বাইরের ছোট ঘরে তিনি একাকী দরজার দিকে মুখ করিয়া একটা পটপটী চাটাইয়ে বসিয়া স্থির হইয়া জপ করিতেন।......নিশ্চল জীবন্ত বিগ্রহের ন্যায় তিনি এক মনে জপ করিতেন। এইটি যেন তাঁহার ধাতস্থ অবস্থা ছিল। বলরামবাবুর বাড়িতে যখন থাকিতেন তখন বড় ঘরটির মেঝেতে বসিয়া তিনি এক মনে জপ করিতেন এবং জপ করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাইতেন। মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি একেবারে অন্য রকম হইয়া যাইত।......সকলেই বলাবলি করিতেন, দেখছ রাখাল কি একমনে জপ করে! জমিদারের ছেলে বাড়ি ঘরদোর ত্যাগ করেছে, একমনে কিরূপ জপ কচ্ছে দেখছ? জপটাকে যেন আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।"[২]

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১২৯৩ সালের মাঘমাসের গোড়ার দিকে) এক শুভদিনে নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শশী, শরৎ, বুড়ো গোপাল, কালী, নিরঞ্জন, সারদা, হরি এই কয়জন গুরুভ্রাতা বরাহনগর মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানপূর্বক বৈদিক সন্ন্যাস ও তদনুযায়ী নূতন নাম গ্রহণ করেন। তারকনাথ, লাটু, যোগীন, গঙ্গাধর, সুবোধ, হরিপ্রসন্ন—ইঁহারা পরে বিভিন্ন সময়ে বিরজাহোম সম্পাদনপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের নাম হয় স্বামী বিবিদিষানন্দ।[৩] রাখালচন্দ্রের নাম

১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৮।

২ ঐ ঐ পৃঃ ১২৭।

৩ সন্ন্যাসের পর নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে তিনটি নাম ব্যবহার করেন—বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও বিবেকানন্দ। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে অনুমান হয়, তিনি সন্ন্যাসের সময় স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপবাপর গুরুভ্রাতাদের নাম যথাক্রমে

বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ।	সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।
শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।	তারক—স্বামী শিবানন্দ।
শরৎ—স্বামী সারদানন্দ।	লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ।
নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।	যোগীন—স্বামী যোগানন্দ।
কালী—স্বামী অভেদানন্দ।	গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ।

হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ। নরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা অনেকে তাঁহাকে আদরপূর্বক 'রাজা' সম্বোধন করিতেন। পরবর্তীকালে অপরাপর সকলের মধ্যে তিনি 'মহারাজ' আখ্যায় পূজিত ও সম্বর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবহমান ছিল বৈরাগ্যের ফল্গুধারা। এক্ষণে বহির্সন্ন্যাস গ্রহণে তাহা অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। তাঁহার তদানীন্তন মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যায় আচার্য শংকরের নিম্নলিখিত শ্লোকটির সাহায্যে—

বেদান্তবাক্যেষু যদা রমন্তো, ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

তাঁহার মনে হইল, বরাহনগরের কঠোর জীবনও তপশ্চর্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়; মঠ-জীবন, গুরুভ্রাতাদের প্রেমবন্ধনও "সন্ন্যাসী নগরীর" ন্যায় হেয় বোধ হইল। বিবিক্ত সেবীর জীবনযাপনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল। সেইসময়কার তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণ মনের একটি ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন 'শ্রীম'[২]—

"রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় বেড়াইতেছেন। ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন।

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া)—মাষ্টারমশায়, আসুন, সকলে সাধন করি। তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হ'তেই হবে! আহা! নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে। আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন।

মাষ্টার—তা ঠিক কথা। রাখাল বাবু, তোমারও দেখ্‌ছি মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

রাখাল—মাষ্টারমশায়, কি বলবো? দুপুর বেলায় নর্মদায় যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছিল! মাষ্টারমশায়, সাধন করুন, তা না হ'লে কিছু হচ্ছে না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন! ব্যাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না!

হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ। সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ।
বুড়ো গোপাল—স্বামী অদ্বৈতানন্দ।
হরিপ্রসন্ন ১৮৯৯ খৃঃ ৯ই মে তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের সম্মুখে বিরজাহোমপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

২ কথামৃত। দ্বিতীয় ভাগ। পরিশিষ্ট। প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃঃ ২৫৪-৫৫।

মাষ্টার—যোগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম করতে বলেছেন। শুকদেব বল্‌ছেন, হরিপাদপদ্মই সার। আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়েমানুষের সঙ্গে বাস, এতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

রাখাল—অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হলো। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নীচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক; তা না হ'লে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বোধ থাকে না।'

মাষ্টার—ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই।

রাখাল—তাই বলছি, আমাদের সাধন চাই। মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে।"

তিনি নরেন্দ্রনাথকেও বলেন মনের গোপনকথা—'এখানে থেকে তো কিছুই হ'ল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবানদর্শন; কৈ হ'ল?' নরেন্দ্রনাথ কি আর বলিবেন, তাঁহার মনেও ব্যাকুলতার ঝড় বহিতেছে, নির্জনে বিপিনে তপস্যা করিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল। গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ তপস্যার উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের আদরের রাখালরাজ অজ্ঞাত স্থানে ভিক্ষাটনে অনশনে কষ্ট পাইবেন, ইহা নরেন্দ্রনাথ বা অন্যান্য গুরুভ্রাতারা পছন্দ করিতেন না। অনন্যোপায় হইয়া রাখাল সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভক্ত বলরামবাবুর ব্যবস্থাপনায় শ্রীমাতাঠাকুরাণী পুরীধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সহিত ব্রহ্মানন্দ যাইতে চাহিলে কেহ আর অপত্তি তুলিলেন না। নভেম্বর মাসে শ্রী-মা, যোগেন-মা, লক্ষ্মীদেবী, যোগানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ৺পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাইবার ব্যবস্থা ছিল কলিকাতা হইতে চাঁদবালি পর্যন্ত বড়জাহাজে, সেখান হইতে কটক ক্যানেল স্টীমারে, এবং অবশিষ্ট পথ গরুর গাড়ীতে।[১] তাঁহারা ভোরবেলা ৺পুরী পৌঁছাইয়া

১ তদানীন্তনকালের দুর্গম ৺পুরীযাত্রার যে চিত্র স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' চিত্রিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"সে সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজালেম দর্শনে আগত যাত্রিদিগের অবস্থা অনেকটা, রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে অগ্রসর যাত্রিদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদি-শোভিত একই প্রকার দীর্ঘপথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম-স্থান চটি বা সরাই—ধর্মশালারও অভাব ছিল না, শুনা যায়; সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা; সেই চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদি দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান—মুদির,

ধূলিপায়ে শ্রীমন্দির দর্শন করিলেন এবং বলরামবাবুদের ক্ষেত্রবাসীর মঠে আশ্রয় লইলেন। কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে আসিলেন কঠোরী তুরীয়ানন্দ। নিজেদের ভাবে থাকিয়া সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ 'এমার মঠে' ঠাঁই লইলেন। মাধুকরীই ছিল একমাত্র অবলম্বন তাঁহারা দুইজন কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। স্নেহের রাখাল আহার বিহারে অত্যধিক কৃচ্ছ্র করিতেছে শুনিয়া শ্রীমাতাঠাকুরাণী ব্যস্ত হইতেন। তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য ভক্ত বলরামবাবু কখনও কখনও রাখালকে ভোজন করাইতেন। এইরূপ পরিবেশে ইচ্ছানুরূপ আহার বিহার সাধনভজন করা অসুবিধাজনক বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মানন্দ দুইমাস পরে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বরাহনগর মঠে বা বলরামভবনে নিজের ভাবে জপ ধ্যান করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেছিলেন। মধ্যে একবার কয়েক-দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে যান। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীমাতা ঠাকুরাণী, গোলাপ-মা, নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, বাবুরাম, সারদা, লাটু, তুলসী (নির্মলানন্দ), শরৎ ও মাষ্টার মশাই একত্রে আঁটপুর গমন করেন ও মাতঙ্গিনী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে সাতদিন অবস্থান করিয়া তাঁহারা তারকেশ্বরে যান এবং সেস্থান হইতে কামারপুকুরে গমন করেন। তারকেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ জ্বর ও ভেদবমিতে আক্রান্ত হইলে বাবুরাম তাঁহাকে লইয়া আঁটপুরে ফিরিয়া আসিলেন।[১] আর সকলে ঠাকুরের জন্ম ও বাল্যলীলাভূমি সন্দর্শন করিয়া শ্রীমায়ের সহিত জয়রামবাটী গমন করিলেন। শ্রীমায়ের আদর-যত্নে কাটাইয়া ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া

দোকান; সেই ধূলা; সেই ধর্মভাব বিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী, যাত্রিদিগের পরমবন্ধু মশককুল; সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যু-তস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্য-লাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন, এবং পরিশেষে সেই যাত্রিদিগের একান্ত ঈশ্বর নির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি।"

১ 'আমার জীবন কথা' স্বামীজীর পত্রাবলী ও স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে গৃহীত। অনুমান হয় এইবারেই কামারপুকুর হইতে ফিরিবার পথে, ব্রহ্মানন্দ আরামবাগ ও বর্ধমানের পথে আসেন। সঙ্গে ছিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ ও অপর একজন গুরুভ্রাতা। বর্ধমানে আসিয়া ক্ষুধায় ঐ তিনজন একটি হোটেলে ঢুকিলেন। ছয়আনা দরে পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা। তিনজন খাইতে বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে রান্না ভাত শেষ হইল। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষতঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পেট ভরে নাই। তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার ভাত রান্না হইল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আবার ভাত ফুরাইল। কিন্তু এইবার তাঁহারা তৃপ্ত হইলেন। তাঁহারা যখন পয়সা দিতে গেলেন হোটেল মালিক হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন, দয়া করে আর আমার হোটেলে আসবেন না।"

আসিলেন।[১] পুণ্যভূমি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দের মনে ঠাকুরের চিন্তা প্রবল হইল। তিনি অন্তর্মুখ হইয়া পড়িলেন। তিনি সকল বিষয় হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া ভগবৎচিন্তায় বুঁদ হইয়া থাকিতেন। এইভাবে প্রায় একবৎসর অতিবাহিত হইল। এইসময়ে তাঁহার অমক্তমনের একটু পরিচয় পাওয়া যায় স্বামী নিরঞ্জনানন্দের ১০।১১।৮৯ তারিখের একটি পত্র হইতে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বৈদ্যনাথধাম হইতে লিখিলেন[২]—"ভাই রাজা তোমাকে আবার পত্র লিখিতে হইল। উত্তরত পাইব না স্থির, তবে বলরামবাবুর পীড়া শুনিয়া ভাবিত আছি। তিনি কেমন আছেন পত্রপাঠ কাহার দ্বারা লিখিয়া দিলে বড়ই সুখী হইব।" স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিজের শরীর ভাল যাইতেছিল না, তিনি বেশ কিছুকাল ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। যাহা হউক, তিনি নিরঞ্জনানন্দকে পত্রোত্তরে এইবার সকল সংবাদ জানাইলেন। গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ প্রিয় 'রাজাকে' বৈদ্যনাথধামে বায়ু পরিবর্তনে যাইতে সাদরে আহ্বান জানাইলেন। স্বাস্থ্যের জন্য কোন স্থান পরিবর্তন অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে কোন নির্জনস্থানে গিয়া তপস্যা করিবার জন্য তিনি সেসময়ে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। গুরুভ্রাতার আহ্বানে সেই ইচ্ছা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রীমাতাঠাকুরাণী জয়রামবাটীতে ছিলেন। তিনি চিঠিতে মাতাঠাকুরাণীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী ২১।১১।৮৯ তারিখে বলরামবাবুকে বুঝাইয়া লিখিলেন, "রাখালের জ্বরভাব হইয়াছিল। বেশ সুস্থ হইয়াছে তো? শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবার জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত বাদে ফাল্গুন মাস নাগাদ গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব?" ব্রহ্মানন্দ নিজেও শ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে এই মর্মে লিখিত একটি অনুমোদন-পত্র পাইলেন। তাঁহার আর কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি নরেন্দ্রনাথকে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। এইবার আর বাধা দিয়া কোন লাভ হইবে না বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ভিক্ষাটনের ক্লেশ কিছু লাঘব করিবার জন্য গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দকে

১ স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর গিয়াছিলেন। (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৩১)।

২ উল্লেখযোগ্য যে এই চিঠির ঠিকানায় লেখা ছিল: Swami Rakhal Raj 57 Ramkanta Bose Street, Bagbazar, Calcutta.

সঙ্গে পাঠাইলেন এবং কাশীধামে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখিয়া ইঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

তাঁহাদের পর্যটনের লক্ষ্যস্থল ছিল হিমালয় পাদপীঠে উত্তরাখণ্ড। সেই অঞ্চলে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পত্রে যোগাযোগ করিয়া সেখানে যাইবার সংকল্পও করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদ্যনাথধাম হইতে নিরঞ্জনানন্দের আহ্বান স্মরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সর্বপ্রথম বৈদ্যনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সেই সময় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম অংশ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দকে লইয়া বৈদ্যনাথধামে পূর্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে দুইদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দের আদর যত্ন প্রীতির সম্বর্ধনাও তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বোধহয় তাঁহাদের রেলওয়ের টিকিট বরাবর কাশী পর্যন্ত ছিল বলিয়াও তাঁহারা বেশীদিন বৈদ্যনাথে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। যুগযুগান্তব্যাপী অগণিত সাধকের সেবিত তীর্থভূমি কাশীধাম। কাশীপতি বাবা বিশ্বনাথের ভজন আরাধনায় তরুণ সন্ন্যাসীদ্বয় মগ্ন হইলেন।

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮।১২।৮৯ তারিখে বলরাম বসু মহাশয়কে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত চিঠি লিখেন। সেই চিঠি হইতে এই সময়কার কিছু খবর জানা যায়। তিনি লিখিলেন, "কাশীধামে পৌঁছাইয়া খোকাকে সেইদিন প্রমদাবাবুর নিকটে পাঠাই, এবং পরদিন তাঁহারই অনুরোধে আমরা উভয়েই তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষা করি। তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। অত বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য থাকায়ও তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান নাই। পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়, পরে অপর অপর কথা হয়। কাশীর বাঙ্গালী-টোলায় থাকার ইচ্ছা না থাকায় তিনি পিশাচ মোচনে তাঁহার বাগানে একটি উত্তম স্থান দিয়াছিলেন, এবং তথায় আমাদিগকে বাস করিবার জন্য বলেন। কিন্তু তাঁহার খরচ পড়িবে বলিয়া আমরা তাহাতে স্বীকার করি নাই। সত্রে বলিয়া দিয়াছেন এবং অপর সত্রে বলিয়া দিবে কহিয়াছেন। ২।৪ দিন তাঁহার বাটীতেই ভিক্ষা হয়। এখানে ওখানে একরকম করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহার কহা সত্রে একদিন মাত্র গিয়াছিলাম, সে দিবস যত্নের সহিত আহার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বোধহয় সুবিধার নহে। কারণ তাঁহাদের যে কর্মচারী সে সুস্পষ্ট বলিল যে ব্রাহ্মণের সহিত যাহারা বসিয়া

খাইবে তাহাদের সুবিধা, আমাদের স্থানাভাব, এবং বিশেষ দাতার অনুমতি যে সন্ন্যাসী প্রভৃতি একদিবস মাত্র, তবে প্রমদাবাবুর অনুরোধে আমরা দুই চার দিন বেশী করিতে পারি। তবে এ-সত্রে একদিন ও-সত্রে করিয়া একপ্রকার চলিতে পারে। তারকেশ্বরের মহান্তর সত্রে একদিন গিয়াছিলাম। তাহারা যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছিল। তাহারা বলে ১০।১৫ দিন বাদে এখানে আসিয়া ভিক্ষা করিতে পারেন। মহান্তর অনুমতি ব্যতীত প্রত্যহ ভিক্ষায় সুবিধা নয়।

"আমরা প্রাতে বাগান হইতে আসিয়া স্নানাদি করিয়া পুনরায় বাগানে যাই। রোজ দেড়ক্রোশ প্রায় হাঁটিতে হয়। প্রমদাবাবু আমাদের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাগানটি অতি চমৎকার। আমাদের পক্ষে বেশ নির্জন এবং লোকজনেরও কোন কষ্ট নাই। চাকর প্রভৃতি আসিয়া সর্বদা অনুসন্ধান নেয় যাহাতে কোন কষ্ট না হয়। তিনিও প্রত্যহ আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তবে দিন কতক হইল লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর ইত্যাদি আসিবে, একারণে দেখা করিতে পারেন নাই। সেই দিকেই ব্যস্ত। সকল সুবিধাই হইয়াছে ; কেবল সত্রে সুবিধা হইলে উত্তম হইত।

"অত্যন্ত শীতের দরুণ হৃষীকেশ যাওয়ার কল্পনা দুমাস ত্যাগ করা গিয়াছে। তবে নিকট নিকট স্থান দর্শনে সত্বর যাইব, এইরূপ ইচ্ছা আছে। যাহা গুরুদেবের ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

এই সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, নির্মলানন্দ, সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় হিমালয় পাদপীঠে—হৃষীকেশে তপস্যায় নিরত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় বলরামবাবুকে লিখিলেন, "আমরা পাঁচজনে এখানে বেশ আনন্দে আছি। শ্রীশ্রীকৃপায় কোন বিষয়ে অভাব নাই। রাখালরাজা প্রথমে বরাহনগর হইতে এবং পরে ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে কাশীধাম হইতে দুইখানা পত্র লেখেন। তাহাও কল্য পাইলাম। অদ্য আপনার কথামত প্রমদা দাস মিত্রের ঠিকানায় তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলাম।" সেইদিনই স্বামী সারদানন্দ প্রমদা বাবুকে পত্র লিখিলেন, "কলিকাতার এক পত্রে অবগত হইলাম যে, আমাদের রাখাল ও সুবোধ কাশীতে আপনার বাগানে রহিয়াছেন এবং হৃষীকেশে আসিতে বড়ই উৎসুক। তাঁহাকে এইপত্র দেখাইবেন, এবং বলিবেন যে এইস্থান সম্পূর্ণ অনুকূল। এখানে আসিলে মাঘমাসে কল্পবাসও হইবে, কারণ সপ্ত প্রয়াগের মধ্যে এইস্থান দ্বিতীয় প্রয়াগ।"

অগণিত সাধকের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শিবভূমি কাশীধাম ভাবঘন ধ্যান-মূর্তিতে বিরাজমান। পঞ্চক্রোশী কাশীর বোম্ বোম্ হর হর ধ্বনি সাধকের মনকে গভীর অন্তর্মুখ করিয়া তোলে। এই অনুকূল পরিবেশেও ব্রহ্মানন্দের প্রাণের পিপাসা তৃপ্ত হইল না। বরং তাঁহার বিরহজ্বালা যেন আরও উদ্বেল করিয়া তুলিল। ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি প্রাণমন অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত নর্মদাতীরে যাইয়া সাধনের আসন পাতিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইতিমধ্যে নর্মদাতীরে যাইবার একটি সুযোগও উপস্থিত হইল। জনৈক বাঙালী পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দের প্রশান্ত আনন ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগামী হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হৃষীকেশ হইতে গুরুভ্রাতা সারদা-নন্দের সাদর আহ্বান কাশীধামে পৌঁছাইবার পূর্বেই ব্রহ্মানন্দ ওঁকারনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গী হইলেন সুবোধানন্দ ও উক্ত বাঙালী পরিব্রাজক।

নর্মদার তীরেই ওঁকারনাথের মন্দির ব্রহ্মানন্দের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ-ভূমি আচার্য শঙ্করের কীর্তিকাহিনী বিজড়িত নর্মদাতীর্থ ব্রহ্মানন্দের মনকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করিল। পুণ্যতোয়া নর্মদার তীরে একাদশনামী সম্প্রদায়ের মঠে তিনজনের থাকিবার স্থান হইল। স্বামী সুবোধানন্দের নিকট হইতে জানা যায়, পবিত্র নর্মদাতীর্থে অনুকূল পরিবেশে ব্রহ্মানন্দ একাদিক্রমে ছয়দিন অতীন্দ্রিয় ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া দেহবোধ বিরহিত অবস্থায় তন্ময়ভাবে অবস্থান করিয়া-ছিলেন।[১] সুবোধানন্দ ও পরিব্রাজক সাধুটি সযত্নে তাঁহার শরীর রক্ষা করিতেন। ব্যুত্থিত হইয়া আনন্দিত চিত্তে তিনি গোদাবরীতটে পঞ্চবটী দর্শন করিতে গেলেন। পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র জানকীর স্মৃতি বিজড়িত নিবিড় বনরাশির পরিবর্তে অট্টালিকা ও জনবসতি দেখিয়া তীর্থসেবিগণ একটু হতাশ হইলেন। কিন্তু বাহ্য স্থূল বিষয়াদির অন্তরালে শ্রীভগবানের যে নিত্যলীলাবিলাস চলিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে দিব্যদৃষ্টিতে। একদিন ব্রহ্মানন্দ ভাবচক্ষে দর্শন করিলেন, পম্পাসরোবরতীরে তপস্বীবেশে ধনুর্ধারী শ্যামলসুন্দর রামচন্দ্র, পাশে দাঁড়াইয়া তপস্বিনী জননী জানকী, কিছুদূরে কুটীরের সম্মুখে ব্রহ্মচারীবেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ। "জয় সীতারাম" উচ্চারণ করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মানন্দ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।

১ "খোকা মহারাজের মুখে আমি শুনেছি—(মহারাজ) ঐ ছয়দিন নির্বিকল্পভূমিতে ছিলেন। অনেক কষ্টে খোকা মহারাজ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করেন।"
—স্বামী প্রভবানন্দের পত্রাংশ।

এইরূপে সিদ্ধসাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি পবিত্র তীর্থভূমিকে চিরজাগ্রত, চিরসত্য বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রমাণিত করিয়া ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

সেইস্থানে অধিকদিন অবস্থান করা হইল না। সম্মুখে অগ্রসর হইলেন পরিব্রাজক দল। আনন্দ-আবেশের স্মৃতি যাত্রাপথের সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া দেয়। এই সময়ের তীর্থ পর্যটনের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ ব্রহ্মানন্দের লিখিত এক পত্রে[১] পাওয়া যায়। আমরা এইস্থানে তাহারই উদ্ধৃতি দিতেছি।

"আমাদের কাশীধাম হইতে এক সঙ্গী জোটে, তাহার সহিত নর্মদা যাই। নর্মদায় স্নানাদি করিয়া তাহার পর ওঁকারনাথ দর্শন করিয়া সেখানে কিছুদিন থাকা যায়। ওঁকারনাথটি অতি উত্তম—নর্মদার ধারে। অনেক সাধু এবং বাবাজী আছেন, থাকিবার খুব সুবিধা। আমরা একটি মঠে ছিলাম। চতুর্দিকে খুব পাহাড় ও নির্জন স্থান, অতি চমৎকার দৃশ্যসকল আছে। কিছুদিন বেশী তথায় থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রারব্ধ কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়। তাহার পর সেখান হইতে গোদাবরীর ধারে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীর বন দর্শন করি। তথায় ২।৩ দিবস থাকি। তথায় থাকিবার সুবিধাও বেশ আছে। তবে সেখানে সংসারী লোক অনেক বাস করে, স্থান তত নির্জন নয়। বনের নামমাত্র নাই, তবে চতুর্দিকে ভারি ভারি পাহাড় আছে। তথা হইতে বোম্বাই যাই। বোম্বাই শহরে ৭।৮ দিবস ছিলাম, কোনরূপ অসুবিধা আমরা বোধ করি নাই। একটি উত্তম বাটীতে ছিলাম। কালীপদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাসায় থাকিতে খুব অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আমরা ভাল স্থানে[২] ছিলাম বলিয়া সেখানে থাকি নাই।

"বোম্বাই হইতে একটি শেঠ আমাদিগকে দ্বারকা যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট দেয়। জাহাজে প্রায় ৪৭ ঘণ্টা থাকিতে হয়; পরে দ্বারকাধামে পৌঁছাই। দ্বারকাধামের মন্দির প্রায় সমুদ্রের সন্নিকট এবং মন্দির কম বড় নয়। সেখান হইতে ১৪ মাইল ভেটপুরী নামক স্থানে যাই। সেখানে খুব জাঁকজমক আচারে মন্দিরের সেবাকার্য করিয়া থাকে। তথায় দর্শন করিয়া পুনরায় দ্বারকা আসিয়া

১ বৃন্দাবন হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী বলরাম বসুকে এই চিঠি লিখেন।
২ তাঁহারা ৺মুম্বাদেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্‌বর্তী একটি গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

জাহাজে চড়িয়া সুদামপুরী নামক স্থানে আসি। তথা হইতে জুনাগড় নামক স্থানে যাই, সেখান হইতে গির্ণারের পাহাড় ৭ মাইল, তথায় ২।১ দিন থাকিয়া গির্ণারের পাহাড়ে যাই।[১] গির্ণারের পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, খাড়া চড়াই ১০ মাইল। আমাদের উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। ৩।৪ দিবস গায়ের ব্যথা ছিল। তথা হইতে গুজরাটের ভিতর দিয়া আমেদাবাদ আসি এবং তথা হইতে ৺পুষ্করতীর্থে আসি। পুষ্করতীর্থে ৮।৯ দিন ছিলাম। তথায় একজন বাঙালী ব্রহ্মচারী আছেন, তিনি আমাদের থাকিতে স্থান দেন—অতি ভদ্রলোক। তথায় আমাদের সঙ্গী লোকটির জ্বর হয়। ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা দুইজনে তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া আসি। তথাকার ডাক্তার বলিলেন, ইঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আমরা বৃন্দাবন চলিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মচারী আমাদের এখানে আসিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।"

সেইসময় ঈশ্বরের উপর সদা নির্ভরশীল সন্ন্যাসিদ্বয় এইরূপ কর্পদকশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেন যে, চিঠি বেয়ারিং পোস্টে পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "পয়সা অভাবে বেয়ারিং পত্র দিলাম, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না।"

কয়েকটি তীর্থসেবার পরেই বহূদক সন্ন্যাসীর চিত্ত গভীর হইতে গভীরতর সাগরে ডুব দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। নির্জনে, নিভৃতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা সুরক্ষিত হৃদয়প্রকোষ্ঠে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ জ্বালিয়া 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পরব্রহ্ম সন্দর্শনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়াছে স্কন্দোপনিষদের একটি মন্ত্রে ঃ

> ব্রহ্মামৃতং পিবেদ্ভৈক্ষমাচরেদ্দেহরক্ষণে।
> বসেদেকান্তিকো ভূত্বা চৈকান্তে দ্বৈতবর্জিতে।
> ইত্যেবমাচরেদ্ধীমান্‌স এবং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥[২]

অন্তর্মুখ অন্তঃকরণ লইয়া তিনি মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের এই দ্বিতীয়বার আগমন। এইবার

১ স্বামী সারদানন্দের ২৮।২।১৮৯৩ তারিখের পত্রানুসারে "রাখালরাজ ৺শিবরাত্রিতে গির্ণার পাহাড়ে ছিলেন।"

২ স্কন্দোপনিষৎ, ১২

ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ; Edited by Vasudev Laxman Sastri Pansikar; 3rd edition; 1925 p. 307.

তিনি ফৌজদার কুঞ্জে এবং কিছুদিন কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের তদানীন্তন গতিবিধি দেখিয়া মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "গরু যেমন পেট ভ'রে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় ব'সে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল ক'রে চিবাতে বা জাবর কাট্‌তে থাকে, সেইরকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে ব'সে ভাব্‌তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সেসব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই, তা হ'লে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।"[১] স্বামী সুবোধানন্দ মাধুকরী করিয়া আহার্য যাহা পাইতেন তাহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য উপস্থিত করিতেন, কিন্তু জপধ্যানে বিভোর ব্রহ্মানন্দ দিনান্তে একবার গুরুভ্রাতার সংগৃহীত আহার্য হইতে সামান্যই গ্রহণ করিতেন।[২] কোনদিন ভিক্ষা হইতে সুবোধানন্দের ফিরিতে দেরী হইলে আহার না করিয়াই তিনি পুনরায় আসনে বসিয়া যাইতেন। এইকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাধন-ভজন সম্বন্ধে সুবোধানন্দ বলিতেন, "দিন নাই, রাত্রি নাই, মহারাজ একাসনে বসিয়া তন্ময়ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। কথাবার্তা প্রায় বলিতেন না।" গোপীবল্লভের চিন্ময় নিত্যলীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে মহারাজ সাধন-নৌকায় পাল তুলিয়া শক্ত হাতে হাল ধরিয়া বসিলেন। এই সময়কার মনের অবস্থা তাঁহার এক পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "একজায়গায় থাকিলে নানা স্থানে যাইতে মন বড় ব্যস্ত হয়। সেটা কেবল ভ্রমমাত্র। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কথায়ও আমাদের চৈতন্য হয় না। ঠেকিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন 'যার হেথায় আছে তার সেখানেও আছে, যার এখানে নাই—তার সেখানেও নাই।' বাস্তবিক এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি।" পরিব্রাজক বহূদক সন্ন্যাসী এইবার কুটীচক হইয়া সাধনসমুদ্রে ডুব দিলেন, আধ্যাত্মিক মণিরত্নাদি কুড়াইতে লাগিলেন। কোন কোন দিন নিকটবর্তী মন্দিরে যাইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন, সেই সময় কখনও গভীরভাবে বিভোর হইতেন। কখনও বা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার মত মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই যেন কবি রচনা করিয়াছেন,—

১ স্বামী সারদানন্দ (জীবন-কথা)—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সঙ্কলিত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ১৯৩৬, পৃঃ ৫৭।

২ উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দজী বলিতেন, "স্থূল বিষয়ের ত্যাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বাসনার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। সূক্ষ্মবাসনার মধ্যে জিহ্বা লাম্পট্য আরও কঠিন। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় এই সূক্ষ্ম লালসার ত্যাগ হয়।"

"মাখি সর্ব অংগে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিয় প্রেমবারি দুইহাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনায়।
ভ্রমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব হরি পদে নিত্য করিব বিহার॥"

বলরামবাবুকে লিখিত ব্রহ্মানন্দের এক পত্র হইতে[১] জানা যায়, "শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে প্রায় ২।৩ মাস আসিয়া আছেন। তিনি গোপীনাথের বাগের মধ্যে থাকেন—এ স্থান তাঁহার বড়ই উত্তম বোধ হইয়াছে। এখানকার ভাবে এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন—তিলকমালা ধারণ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবদিগের সংগে সর্বদা কীর্তনাদি করিয়া থাকেন—আমাদের সংগে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তাঁহার এখন কিছুকাল বৃন্দাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা এরূপ বলেন।" গোসাইজী ব্যতীত, কৃষ্ণচৈতন্যদাস বাবাজী, নিমাইচরণ গোস্বামী প্রভৃতি সাধকগণের সহিত আলাপ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

সেইসময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রায় চৌদ্দ আনা লোক ঐ জ্বরের কবলে পড়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দও ঐ জ্বরে আক্রান্ত হন। গোসাইজী তাঁহার সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এতই দীনভাবে থাকেন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলিও তাঁহার নাই। তিনি আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য মশারি আনাইলেন, পেরেক দড়ি আনিয়া মশারি খাটাইয়া দিলেন ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিলেন। ২৯শে মার্চ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরামবাবুকে লিখিলেন "...সকলেই জ্বরে ভুগিতেছে। তবে ইহাতে কেহ এখন মরিতেছে না। কিন্তু জ্বর এখন কমে নাই,—এখনও অনেক লোকের হইতেছে। লোকাভাবে অনেক স্থানে মন্দিরের সেবাকার্য কমাইয়া করিতেছে। ...গোসাইজী বড় ভাল নাই। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থাবস্থায় আছে, বোধ করি সত্বর তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিবেন। আমার শরীর এখনও বড় দুর্বল,...।" শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলেও সাধন-ভজন নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে চলিতে থাকিল। সেইসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরামবাবু ব্যতীত কাহারও সহিত যোগাযোগ রাখিতেন না। এমনকি সারদানন্দ হৃষীকেশ হইতে চিঠি লিখিয়া তাঁহার কোন উত্তর পাইলেন না।

১ ২১।২।১৮৯০ তাং লিখিত পত্র।

তখন তাঁহার অসক্ত নিঃসঙ্গ মনে বৈরাগ্য-মলয় প্রবাহিত, এবং সুউচ্চ সাধন-মার্গের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সেই মন দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত নিয়োজিত। উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দজী সৎপ্রসঙ্গ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম—সত্যাশ্রয়ী হ'তে হবে······দ্বিতীয়—কামজয়ী হ'তে হবে। তৃতীয়—বাসনাজয়ী হ'তে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে। এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন আসল তপস্যা।······আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত।······ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা হলে প্রত্যেক জিনিসেই তাঁর বিভূতি দেখবে।"[১]

বলরামবাবুকে লিখিত পত্রের এক অংশে ব্রহ্মানন্দজীর মনের বেদনাও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "বাহ্যজগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্য-জগতে মন থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহা মনের স্বধর্ম। এই মনকে সর্বপ্রকারে বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরিপাদপদ্মে স্থিতি করা—ইহা কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। যত দিন যাইতেছে ততই অজ্ঞান এবং অশান্তিতে মনকে জড়ীভূত করিতেছে। সাধন-ভজন দ্বারা মনের শান্তি পাইব এরূপ আশাও নাই। যেমন পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রূপ অনুরাগবিহীন সাধন-ভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে। জানি না কতদিন আমাকে এরূপ অশান্তিতে এবং মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন সত্বর দেহাদিভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। এ জনমে আর কোন আশা নাই। এখন বাচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। আশীর্বাদ করুন যেন গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া যাই, আর আমার কোন বাসনা না থাকে।" মহাজনের অন্তরের ব্যথা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্যক্ ধারণা করা দুঃসাধ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন, "নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্ম-জীবন আরম্ভ হয়। তখনই যথার্থ চিত্ত-বিক্ষেপ বা struggle (অন্তর্দ্বন্দ্ব) আরম্ভ হয়, তুচ্ছ কামক্রোধ নিয়ে struggle তো তার তুলনায় কিছুই নয়।" এইরূপ উচ্চ আধিকারিক পুরুষের যে মানসিক

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৮৩-৮৪।

অশান্তির স্ফুট প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তাৎপর্য আমরা বুঝিব কিরূপে? মহা-সাধকের সাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে আমাদের অজ্ঞাত কত ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিয়া থাকে, তিনি নীরবে সকল বাধাবিপত্তি অচল-অটলভাবে মস্তকোপরি ধারণ করিয়া তাঁহার লোকাতীত জীবনকে মহিমান্বিত করেন। মহাসাধক জানেন, "ভাব বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ না তাঁর কাছে পৌঁছান যায় ততক্ষণ সব আলুনি।"[১] "মন করেরে প্রাণাধিক"—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মানন্দজী সাধনসাগরে ডুব দিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরমহংসদেব আপনাকে তো সবরকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন, তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দজী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যেসব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি মাত্র।" দেহের সবপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করিয়া ব্রহ্মানন্দজী কেন এই কঠোর তপস্যা করিতেছেন এই প্রশ্ন গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দেরও পুনঃপুনঃ মনে হইতে থাকে। একদিন তিনি তাঁহাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত ধ্যান জপ করেন কেন? আপনাকে তো ঠাকুর সবই করে দিয়েছেন, তবে এত সাধনা কিসের জন্য?" এই প্রশ্নে ব্রহ্মানন্দজী খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ওরে খোকা, তিনি যে জিনিস দিয়েছেন, যে সম্পত্তির অধিকারী করেছেন, সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে তো।" এই উত্তরাধিকার বুঝিয়া লইবার সাধনা চলিয়াছিল তীব্র কঠোরতার মধ্য দিয়া। ঠাকুরের মানসপুত্র তাঁহার উত্তরাধিকার সুচারুরূপেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা লাউ-কুমড়া গাছে আগে ফল, পরে ফুল, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত প্রবল অনুরাগবলে অগ্রে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়া পরে শাস্ত্রবিহিত সাধনার সোপান অতিক্রম করিতে অগ্রসর হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর যাথার্থ্য পুনঃ প্রমাণিত হইল তাঁহার মানসপুত্রের জীবনে। পরবর্তীকালে দেখা যাইত, ব্রহ্মানন্দজী সদক্ষণই এক লোকাতীত রাজ্যে বাস করিতেছেন, ডিমে তা দেওয়া পাখির মত—তাঁহার চোখের দৃষ্টি ছিল ফ্যাল ফ্যালে। এইরূপ একদিন বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া মহারাজ স্বামী আত্মানন্দকে বলিয়াছিলেন, "নিত্য ও লীলার মধ্যে Fine একটা কাচের ব্যবধান

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী লিখিত ২০।৬।২১ তারিখের পত্রাংশ

রয়েছে—সবই দেখতে পাচ্ছি। ইচ্ছা করে সেটা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ঠাকুর দিচ্ছেন না।" লোকবুদ্ধির অন্তরালে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসকল ব্রহ্মানন্দজীর দৈনন্দিন জীবনে শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া সমীপাগতদের বিস্মিত করিত। অবশ্য তাঁহার সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিবার একটা গূঢ় তাৎপর্য সহজেই প্রতিভাত হয়। সংঘের অধ্যাত্মচেতনাকে সদা সক্রিয় রাখিবার জন্য সংঘের মর্মস্থলে এমন একটা শক্তিকেন্দ্র আবশ্যক যাহা হইতে কর্মব্যাপৃত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত শক্তি সংক্রান্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। ব্রহ্মানন্দজীর নিজের মুখেও একটা কথা অনেকবার শোনা গিয়াছে, "একটি ছেলেও যদি ঠিক ঠিক সাধন ভজন করে তো তার পুণ্যে একটা মঠ চলে যায়।"[১]

বৃন্দাবন পৌঁছিবার কিছু পরেই সুবোধানন্দ তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্পানুসারে উত্তরাখণ্ড পর্যটনে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মানন্দজীর নিকট নিবেদন করিলে তিনি সানন্দে তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মানন্দী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লিখিয়াছেন, "সুবোধ (খোকা) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্বর পদব্রজে হরিদ্বারে যাইবে এইরূপ বলিতেছে, আমি হাঁটিয়া বোধ হয় এত পথ যাইতে পারিব না, সুতরাং এইবার যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।" সুবোধানন্দ ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়াছিলেন। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতে ব্রহ্মানন্দজীও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এইসকল কারণে সুবোধানন্দকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সুবোধানন্দ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া একজন পরিব্রাজকের সহিত পদব্রজে হরিদ্বারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তখন এপ্রিলের মধ্যভাগ। সুবোধানন্দকে বিদায় দিয়া ব্রহ্মানন্দজী নিঃসঙ্গভাবে সাধনভজনে সমাহিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত,

"স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টমন্তঃ, সুশান্ত সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

ব্যাকুলতার তীব্রস্রোতে তাঁহার সাধনতরী ব্রহ্মানন্দসাগরে স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটিয়া চলিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আদেশ করিয়াছিলেন, "আমি ষোল ট্যাং করেছি। তোরা এক ট্যাংও কর।" এক ট্যাং তপস্যার জোয়ার শরীর মনকে প্লাবিত করিয়া সাধককে ভগবৎরসে জারিত করিল।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২৮২।

কয়েকমাস ধরিয়া তিনি সংবাদ পাইতেছিলেন যে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম ও সুরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল অসুখে ভুগিতেছেন। সুরেশবাবুর পীড়া ক্রমেই উদ্বেগজনক হইতেছে জানিতে পারিয়া তিনি ২৬শে মার্চ বলরামবাবুকে একটি গভীর ভাবব্যঞ্জক চিঠি লিখিয়াছিলেন। পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সুরেশবাবুর[১] পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে জানিয়া যৎপরোনাস্তি মনে কষ্ট পাইলাম। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বর সকলের রক্ষাকর্তা। তিনি এ যাত্রা যদ্যপি রক্ষা করেন তাহা হইলে মঙ্গল। নচেৎ সামান্য জীবের ইচ্ছায় কিছু হইবার নহে। তাঁহার লীলাকে কেহ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সৎকর্ম করুক, অসৎকর্ম করুক, সুখদুঃখ কর্মানুসারে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করে এমত লোক অতি বিরল। বিশেষ সৌভাগ্যবান সেই হয়, যে সকল বাসনা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়াছে। বোধ করি শান্তিরাজ্যে তাহারই অধিকার, নচেৎ এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প, দুঃখের ভাগ অধিক এবং দুঃখময় এই জীবন লইয়া সকলেই অতিবাহিত করিতেছে। জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়া কেন তাঁহার জীবকে এত কষ্ট ভোগ করান ইহার গূঢ় ভাব তিনি জানেন, সামান্য জীবের জানিবার কোন উপায় নাই। জীবের এত কষ্ট কেবল আমি ও আমার এই অজ্ঞানবশতঃ। যাহার অহংভাব একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মনবুদ্ধিপ্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, আমার বলিতে কিছুই নাই, এমত ব্যক্তি সৌভাগ্যবান ও যথার্থ সুখী। জীবের নিজের কোন বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু সর্বদা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই। 'হে জগদীশ্বর, আমি কিছুই নই—এই চৈতন্যটুকু যেন থাকে এবং তুমি নিত্য এবং সত্য এই বোধ যেন সর্বদা থাকে।' তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, স্ত্রীপুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা ভগবানের নিমিত্ত কয়টি লোকের সেরূপ ভালবাসা হয়? বোধ করি, তাঁহার শতাংশের এক অংশও জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না এবং কয়টা লোক ভালবাসিতে চেষ্টা করে?"

দেড়মাস পরের ঘটনা। সেদিন ১৩ই মে[২]। ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, ভক্ত বলরামের জ্যোতির্ময়মূর্তি হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে আরোহণ

১ ঠাকুর ভক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রকে সুরেন্দ্র বা সুরেন্দর বলিয়া ডাকিতেন
২ বাংলা ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ।

করিতেছে। এই দর্শনে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন। পরদিন তারযোগে সংবাদ আসিল, বলরামবাবু পূর্বদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম অনুভূতিধারণক্ষম মন বিষাদের কালো মেঘে ছাইয়া গেল। মনে পড়িতে থাকে দাস্যভাবের প্রতিমূর্তি ভক্ত বলরামের শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তমণ্ডলীর সেবা। মনে পড়ে বরাহনগর মঠে ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের সুখে-দুঃখে তাঁহার দরদ ও সহানুভূতি। মনে পড়ে ভক্ত বলরাম-সম্পর্কিত কত সুখস্মৃতি। কয়েকদিন পর আবার দুঃখবাহী সংবাদ আসিল, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন ২৫শে মে। যাঁহার অর্থ সাহায্য উপলক্ষ করিয়া বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল, যিনি দীর্ঘকাল ভাবতন্ময়তার সহিত ঠাকুরের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদা যত্নপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার পরলোকগমনে বরাহনগর মঠের গুরুভ্রাতাগণ কত গভীর মর্মাহত হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার তাঁহার মনে হইল ভক্তবৃন্দের বিরহে যে হৃদয়তন্ত্রীতে বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহাও একপ্রকারের বন্ধনই, সুতরাং অবশ্যই ত্যাজ্য। তিনি সকল ভাবনা হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিয়া পরমতত্ত্বের ধ্যানে সমাহিত হইলেন। দিন, সপ্তাহ, মাস গড়াইয়া চলিল।

এই সময়ে বৈরাগ্য-উদ্দীপক হিমালয়ের পাদপীঠে সাধনভজন করিবার পূর্ব-সঙ্কল্প পুনরায় তাঁহার মনে উদিত হইল। সেই সঙ্কল্পানুসারে তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পদব্রজে সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যস্থলী যেন ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশভূমি। যতদূর দৃষ্টি চলে শিখরের পর শিখর, তরঙ্গায়িত কলেবর, মনে হয় "উথলি উঠিছে যেন অনন্ত জলধি।" ভারত-তীর্থের শতসহস্র সাধকের যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যায় ঘনীভূত ভাবধারণ করিয়া কলুষপাবনী সুরধুনীর তীরে গিরিশৃঙ্গসমূহ যেন সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মনে পড়ে, প্রেরণার উৎস প্রবলতর করিয়া তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেখানে অনেক লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা প্রার্থনা উপাসনা করেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে, তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়।" এই অনুকূল পরিবেশে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্মুখ মন ধ্যান-প্রবণ হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কনখল গ্রামে এক নিভৃত পর্ণকুটীরে যোগাসন স্থাপন করিলেন। ঘটনাচক্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাধনপূত ঐ স্থানের উপর উত্তরকালে গড়িয়া উঠে রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র।

নভেম্বর মাসে ত্রিগুণাতীতানন্দ একটি পত্রে লিখিলেন, "রাখাল এখন কনখলে আছেন। সেখান হইতে হৃষিকেশ যাইবেন। তাঁহার বড় বৈরাগ্য শুনিলাম।" সেইসময় হৃষিকেশের গাম্ভীর্যঘন পরিবেশে বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ তপস্যা করিতেছিলেন, সেইস্থানে বিবেকানন্দ সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এমন কি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। তিনি ক্রমে পথশ্রম সহ্য করিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলে গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে হরিদ্বারে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে টিহিরির দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল; দিল্লীতে গিয়া সুদক্ষ জনৈক হাকিমের নিকট চিকিৎসা করাইবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় পরিচয়পত্রও লিখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী শুনিলেন, কনখলে গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ তপস্যায় নিরত। তাঁহারা সকলে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের মিলনে আনন্দের হাট বসিল। একাকী কঠোর তপস্যা করিতে করিতে 'রাজার' স্বাস্থ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আদরপূর্বক বলিলেন, "চল, এখানে আর নয়—আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।" প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রের আহ্বান তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাহাছাড়াও স্বামীজীর কঙ্কালসার চেহারা দেখিয়া তিনি অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বামীজীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাঁহার সঙ্গে সহরে যাইতে উৎসাহিত হইলেন।

পরিব্রাজকের দল সাহারাণপুর উপস্থিত হইলেন। সেখানে সজ্জন উকিল বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শুনিলেন অসুস্থ অখণ্ডানন্দ মীরাটে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মানন্দকে খুবই আগ্রহান্বিত দেখিয়া সকলে মীরাটের দিকে যাত্রা করিলেন। কালীপূজার পর[১] শরতের এক সন্ধ্যায় সন্ন্যাসিবৃন্দ

১ সেই বৎসর কালীপূজা হইয়াছিল ২৬শে কার্তিক ১২৯৬/ইংরাজী ১১ই নভেম্বর, ১৮৯০। ২০।১১।৯০ তাং মীরাট হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ কাশীতে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেন, "ডেরাডুন হইতে একাকী, তৎপরে তাঁহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং তাঁহারাও আমার জানেন না। তাঁহারা জানিতেন যে আমি ৺প্রয়াগ যাইব কিন্তু পথিমধ্যে এ অবস্থিতির কথা কিছু জানিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহারা হৃষিকেশে আছেন কি কোথায় গেছেন এবং তাঁহাদের কি মানস কিছুই বলিতে পারিলাম না।" মীরাট হইতে প্রমদাবাবুকে লিখিত স্বামী অখণ্ডানন্দের ২৫।১১।৯০ তাং এর দীর্ঘপত্র ও ৫।১২।৯০ তাং এর পোষ্টকার্ডে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের মীরাটে আগমনের কোন উল্লেখ নাই।

সুতরাং পরিব্রাজকদল কালীপূজার পর ৫ই ডিসেম্বরের পরে মীরাটে পৌঁছাইয়া থাকিবেন, তাহার পূর্বে নহে।

মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেসময়ে অখণ্ডানন্দ ত্রৈলোক্যনাথবাবুর দাদাকে একখানি সদ্গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। অখণ্ডানন্দ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকদিন পর গুরুভ্রাতাদের দেখা-সাক্ষাতে আনন্দের আসর বসিল। সকলে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, স্বামীজী ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন। অখণ্ডানন্দও সেখানে থাকিবেন। অপর সকলে যজ্ঞেশ্বর বাবুর[১] বাটীতে আশ্রয় পাইলেন।

কয়েকদিন পরে তাঁহারা 'শেঠজীর বাগান' নামে পরিচিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর এক বন্ধুর বাগানবাড়ীতে আসন পাতিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীজী অনেকাংশে সুস্থ হইয়া বাগানবাড়ীতে আসিয়া যোগদান করিলেন। তীর্থ পরিক্রমণে রত অদ্বৈতানন্দ হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, অদ্বৈতানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল (পরে স্বামী কৃপানন্দ), এই সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে শেঠজীর বাগানবাটী ভজন-পূজনে, পাঠে-বিচারে, আনন্দে-উৎসবে একটি মঠবাড়ীতে পরিণত হইল।

সেইবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল ; সেদিকে কাহারও বিশেষ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ত্রৈলোক্য ডাক্তার সপ্তাহে সপ্তাহে সিধা পাঠাইয়া দিতেন, সাধুরা নিজহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন। স্থানীয় বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠ আলোচনাদি হইত। তাঁহাদের উপস্থিতির সংবাদ প্রচারিত হইলে স্থানীয় ভদ্রলোক অনেকেই ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে শেঠজীর বাগানে সমবেত হইতেন। এইকালের সুখস্মৃতি চয়ন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯।১২।১৯১৫ তারিখে স্বামী প্রেমানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এই সময়ের মীরাটের স্মৃতি আমাদের মনে খুব জাগরূক রহিয়াছে। পুণ্যস্মৃতি স্বামীজী হৃষিকেশের অসুখের পর মীরাটে পরিবর্তন করিয়াই আবার পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেইসময় প্রায় ছয়মাস-কাল আমরা তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সময়েই আমরা কনখলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি ও তখন হইতে অন্যূন ছয়বৎসরকাল তাঁহার সহিত একত্রে যাপন করিয়াছিলাম। মীরাটের অবস্থান যে কী সুখের হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বামীজী আমাদের জুতা সেলাই থেকে

১ ইনি পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে ভারতবর্ষ মহামণ্ডলের নেতারূপে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন।

চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময় দিতেন। এদিকে বেদান্ত উপনিষদ সংস্কৃত নাটক সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। ওদিকে, পোলাও কালিয়া রান্না শিখাইতেন, আরও কত কি যে করিতেন তাহা তুমি অনুমানই করিতে পারিতেছ। এই সময়ের একদিনের ঘটনা চিরদিনের মত হৃদয়ে অংকিত আছে। এও সেই মঠের মাগুর মাছ রান্নার মত। মনে আছে ত' মাগুর মাছের ঝোলের কথা। সে কথা কি ভুলিবার? এও সেই রকমের। একদিন পোলাও কালিয়া প্রভৃতি রান্না করিয়াছেন। আর মাংসের কিমা করাইয়াছেন, তাঁহার কিছু শিক-কাবাব করিবার ইচ্ছা।

"হরিভাইকে শিক-কাবাব খাওয়াব। কিন্তু শিক পাওয়া গেল না, কিন্তু স্বামীজী কি দমিবার পাত্র; সম্মুখে ঝিচুগাছ ছিল। তারই গোটাকতক ছোট ডাল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেই কিমা জড়িয়ে দিয়ে কাবাব তৈরী হোলো। সে যে কি উপাদেয় হোলো, তা আর কি বলবো। আমরা ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের খাইয়ে দিলেন। নিজে দাঁতে কাটলেন না। আমরা বলায় বললেন যে, আমি ওসব ঢের খেয়েছি। তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ হচ্ছে, সব খেয়ে ফেলো। বোঝো। ঘটনা সামান্য কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম কাঠি-কাবাব। কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ান, সব স্মৃতিপটে জ্বল্ জ্বল্ করছে।"

শেঠজীর বাগানের দিনগুলি ক্রমেই নিবিড় প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দ প্রাচুর্যের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল। স্বামীজী একদিন হঠাৎ গুরুভ্রাতাদের বলিলেন, "আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" গুরুভ্রাতাদের সকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া একদিন সকালে স্বামীজী মীরাট ত্যাগ করিলেন। আনুমানিক সময় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ।[১]

সকলেই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার স্বভাবজ উৎসাহপূর্ণ বাক্যে গুরুভ্রাতাদের উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, স্বামীজীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে। দুইদিন পরে দক্ষ মহারাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। আটদিন সেখানে বাস করিয়া তিনি ও অদ্বৈতানন্দ কুম্ভমেলায়[২]

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৯১) অনুসারে স্বামীজী মীরাট ত্যাগ করেন ১৮৯১ খ্রীঃ জানুয়ারীর শেষভাগে।

২ এই বৎসর কুম্ভস্নানের তারিখ ছিল ১৮৯১ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী।

যোগদানের জন্য হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে সেইদিনই ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় গাজিয়াবাদে যান ও সেইখানে একজন গরীবদাসী সাধুসেবকের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন।

সেইস্থান হইতে সারদানন্দ[১] ও সান্ন্যাল মহাশয় এটোয়া যাত্রা করেন। অপর তিনজন দিল্লী গেলেন। দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে প্রাপ্ত একটি সংবাদের সূত্র ধরিয়া তাঁহারা শ্যামলদাস নামক একজন শেঠের বাড়ীতে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাইলেন। প্রিয় স্বামীজীকে আবার পাইয়া তাঁহাদের আনন্দ আর ধরে না। স্বামীজী তাঁহার একাকী দিনযাপনের সঙ্কল্পে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও গুরুভ্রাতাদের পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন। গুরুভ্রাতাগণ অন্যত্র অবস্থান করিলেও স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় দিনই শ্যামলদাসের বাড়ীতে একত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, কখনও বা তাঁহারা সকলে সেই গরীবদাসী সাধু-সেবকের আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের কাতরভাবে বলিলেন, "আমি ভেতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমাকে একা থাকতে হবে। তোমরা আমাকে ছেড়ে যাও।" স্বামীজীর মনের ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়া গুরুভ্রাতাগণ আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে স্বামীজী আলোয়ার গমন করিলেন। পূর্বোক্ত পত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখিয়াছেন, "যদিও দিল্লীতে আবার (স্বামীজীর সঙ্গে) একবার দেখা হয়েছিল এবং একসঙ্গে প্রায় একমাস[২] থাকা গেচলো, কিন্তু তারপর আট বৎসর পরে একেবারে জগৎজয়ী হয়ে মঠে ফিরেছিলেন। ইহার মধ্যে একবার বম্বেতে মহারাজ ও আমার সহিত কিছুদিনের জন্য দেখা হয়েছিল মাত্র।"

২২শে ফেব্রুয়ারী স্বামী শিবানন্দ-লিখিত একপত্রে জানা যায়, "শরৎ ও সান্ন্যাল দুইজন Etuah রহিয়াছেন।; গঙ্গাধর, হরি ও রাখাল দিল্লীতে আছেন। বোধহয় তাঁহারা পাঞ্জাবে যাইবেন।" প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী স্বামীজীর দিল্লী পরিত্যাগের পরও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও ধর্মস্থান দর্শন করিবার জন্য আর কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। মার্চ মাসের শেষ-

১ মীরাটে অবস্থানকালে সারদানন্দ স্বামী কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। ত্রৈলোক্যবাবুর চিকিৎসায় সুস্থ হইলেও তিনি দুর্বলবোধ করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্য দল ছাড়িয়া তিনি এটোয়া যাত্রা করেন।

২ প্রত্যুতপক্ষে কিঞ্চিদধিক তিন সপ্তাহ তাঁহারা একত্রে দিল্লী বাস করিতে পারিয়াছিলেন।

ভাগে ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী গাজিয়াবাদ যান। সেইস্থানে আটদিন অবস্থান করিয়া অখণ্ডানন্দজী বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং অপর দুইজন তীর্থসেবা করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সিদ্ধপুরুষের তীর্থসেবার বিশেষত্ব লক্ষণীয়। সিদ্ধপুরুষ স্বয়ং চলমান তীর্থ। তিনি যেখানেই যান, যেখানে থাকেন, যাহা কিছু করেন ও বলেন—সবকিছুর মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে নিত্য-অনুষ্ঠিত ভগবৎ-লীলাবিলাস। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান আশ্রয়ভিখারী দুর্বাসা মুনিকে বলিয়াছিলেন,

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥[১]

ভগবান বলিতেছেন, তিনি স্বয়ং সাধুদের ধ্যান করেন, সাধুগণও সর্বদা তাঁহার ধ্যান করেন। এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ ভগবান ভিন্ন কিছু জানেন না। সেই কারণে ভক্তাধীন ভগবানও তাঁহাদের ব্যতীত কিছু জানেন না। এইরূপ মহাজন যেখানেই যান সেখানেই ভগবৎ-ভাবোদ্দীপক ভাব-পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা তীর্থস্থানাদির মাহাত্ম্য উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

গীতোক্ত ত্যাগের মূর্তপ্রতীক স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গ করিবার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। এইবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মানন্দজী তীর্থপর্যটন ও সাধনভজনে প্রায় ছয় বৎসর তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে গোপীনাথপুরে জ্বালামুখীর মন্দির, সেইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সন্ন্যাসিদ্বয় তপস্যাদি করেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া বৈজনাথ এবং তথা হইতে পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগুমারী ও মুলতান হইয়া সক্করের নিকট সাধুবেলায় যান। একটি দ্বীপের উপর সাধুবেলার মঠ। মঠাধ্যক্ষের আগ্রহাতিশয্যে ঐ মনোরম পরিবেশে তাঁহারা দুইজন কয়েক-মাস সাধনভজনে অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক তীর্থস্থানে তাঁহারা কয়েকদিন বাস করিতেন ও নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিয়া তীর্থমাহাত্ম্য সম্ভোগ করিতেন। তাঁহাদের মত আধিকারিক পুরুষদের তীর্থসেবায় স্থানমাহাত্ম্যও যেন বর্ধিত হয়। লোককল্যাণের জন্যই যেন তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি।"[২] তাঁহাদের পবিত্র সাহচর্যে

১ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৮।
২ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।২৮।

ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ হয়, চিরকল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। সাধুবেলা হইতে তাঁহারা করাচি হইয়া জাহাজ যোগে বোম্বাই আসেন। তখন আনুমানিক সময় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস।

পরিব্রাজকদ্বয়ের উপর্যুক্ত দুই বৎসর কালের বিশেষ কোন খবরাদি পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, বৈরাগ্য-সমুজ্জ্বল সন্ন্যাসিদ্বয় সেইকালে এতই বিবিক্ত-ভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, তাঁহারা কাহারও সহিত যোগাযোগ রাখিতেন না, আর তাঁহাদের নিজমুখে নিজেদের সম্বন্ধে তথ্যাদি জানা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই সময়কার একটি কাহিনী তুরীয়ানন্দজীর মুখে শোনা যায়। "একবার একটি পাহাড়ের নীচে আমরা ছিলুম। সে অঞ্চলে অনাবৃষ্টির দরুণ ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল। কয়েকটি গ্রামের লোক পরামর্শ করে ঠিক করলে, এক বিশেষ দিনে শিবের বারে পাহাড়ের উপর শিবের মাথায় জল চড়াবে। অনেক গাঁয়ে খবর দেওয়া হল। সকাল থেকেই চারধারের লোক আসতে লাগল। সকলেই কুয়ো থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় চড়ালে আর মুখে বললে. 'বাবা বরষাও, বাবা বরষাও।' আমরাও দুজনে কুয়ো থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় চড়ালুম ও জপ করতে লাগলুম। ভীষণ রৌদ্র, কিন্তু বিকালে মেঘ দেখা গেল, ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। সকলেই আনন্দে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরে গেল। অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেল। হবে নাই বা কেন? ব্রহ্মানন্দজী নিজে জপ করতে লাগলেন। শিবের মাথায় জল চড়ালেন। ব্রহ্মানন্দজীর ইচ্ছায় এইসব হল। কিন্তু এসব কে বুঝবে?"[১]

কালীপদ ঘোষ বা 'দানাকালী' কাগজের ব্যবসায়ী জন্ ডিকিন্সন কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাইতে থাকিতেন। প্যাগেল রোডে তাঁহার বাড়ীতে আশাতীতভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল। পাশ্চাত্য-দেশে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি করিতেছিলেন। প্রিয় শিষ্য অজিত সিংহের একান্ত অনুরোধে স্বামীজী নবজাত রাজকুমারকে আশীর্বাদ করিবার জন্য রাজার একান্ত-সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারী) মুন্সী জগমোহন লালের সহিত খেতড়ী যাইতেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী একত্রে যাত্রা করিলেন। পথে আবুরোড স্টেশনে তাঁহারা নামিয়া পড়িলেন। আবু পাহাড়ে যে গুহাটিতে, স্বামীজী পূর্বে সাধন-

১ স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবক স্বামী প্রবোধানন্দের স্মৃতিকথা।

ভজন করিয়াছিলেন, সেইখানে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর থাকিবার সুব্যবস্থা স্বামীজী স্বয়ং করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন হইতে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী একত্রে একটি পত্রে অদ্বৈতানন্দজীকে লিখিয়াছিলেন, "আমরা যখন বম্বে ছিলাম, তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম। পরে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে আবু পাহাড়ে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যান।" গুরুভ্রাতাদ্বয়ের নির্বিঘ্ন সাধন-ভজনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বামীজী খেতড়ী যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী ১০ই মে খেতড়ী ত্যাগ করিয়া জয়পুর হইয়া আনুমানিক ১৬।১৭ তারিখে আবুরোড স্টেশনে আসিলেন এবং পূর্ব পরিচিত এক রেলকর্মচারী তারিণীবাবুর[১] বাসায় রাত্রিযাপন করিলেন। একটি গরুর গাড়ীতে সারারাত্র চলিয়া সকালবেলায় ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের গায়ে খুব ব্যথা হইয়াছে শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "গাড়োয়ানকে দু'টো পয়সা দিলেই গাড়ীতে খড় বিছিয়ে দিত, কোন কষ্ট হোত না।" গুরুভ্রাতৃদ্বয় স্বামীজীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন, তাঁহারা স্বামীজীর শুভযাত্রার জন্য শ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামীজী 'রাজা'কে সাধন-ভজন করিতে এবং তুরীয়ানন্দকে কলিকাতায় ফিরিয়া মঠের কাজে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

আবুপাহাড়ে দুই সাধক সাধন-ভজনে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। সেইসময়ে যোধপুরের দেওয়ান শরৎচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তাঁহাদের বিশেষ যত্ন লইতেন। তাঁহাদের আবুপাহাড়ে থাকাকালীন হঠাৎ গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া সকলকে বলিলেন, "ওহে রাখালের দেখলুম একেবারে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আগেকার রাখাল যেন আর নেই, অনবরত জপ করছে। তার কথাবার্তাও কি মিষ্টি হয়েছে। আবুপাহাড়ের কাছে দেখলুম যে তার পাথুরীর রোগ হয়েছে। পাথুরীর কি ভীষণ যন্ত্রণা। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে না বসতে পারছে না দাঁড়াতে পারছে। কিন্তু এত ধীর ও আত্মসংযমী যে মুখে তার কোন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। অমন ভীষণ যন্ত্রণা চুপ করে সহ্য করে রয়েছে। কথাবার্তা গলার আওয়াজ কি মিষ্টি হয়েছে।

১ তারিণীবাবু Traffic Superintendent-এর কাজ করিতেন।

রাখালকে দেখে বড্ড আহ্লাদ হল, তার অবস্থা এখন খুব উন্নত। তার উন্নত অবস্থা দেখে খুব আহ্লাদ হল।"[১] তপস্যাকালীন এইসব সুখ-দুঃখের কোন কাহিনীই ব্রহ্মানন্দজীর মুখে শোনা যায় নাই, তিনি ছিলেন খুবই চাপা।

আমেরিকা যাত্রা করিবার প্রাক্কালে স্বামীজী বোম্বাই হইতে প্রিয় গুরুভ্রাতা রাজা ও হরিভাইকে একটি আবেগপূর্ণ চিঠি লেখেন। ইহার উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মানন্দজী বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী আমেরিকা যাবার আগে আমাকে ও হরি মহারাজকে আবু পাহাড়ে যে চিঠি লেখেন তার এই কথাগুলি আমার জ্বলন্ত মনে রয়েছে। হরি ভায়াও সে কথাগুলি প্রায়ই উত্থাপন করেন। সে কথাগুলি হচ্ছে —'জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।' উঃ! কি ভয়ানক কথা বল দেখি? এ কথার কি মূল্য আছে?"[২]

ইতিমধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে বোম্বাই হইতে অখণ্ডানন্দজী ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আবু রোডে খাড়ারি নামক স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। তিন-চার দিন পরে জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে তাঁহারা তিনজন আজমীড়ে যাইয়া সাবিত্রী-মন্দির, ব্রহ্মার মন্দির ও প্রসিদ্ধ সুফী ফকির চিস্তি সাহেবের দরগা দর্শন করিলেন। সেখান হইতে জয়পুরে যাইয়া সর্দার ভুরো সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। স্বামীজীর অনুরাগী সর্দার হরি সিং[৩] তাঁহাদের খবর পাইয়া নিজ গৃহে আদরপূর্বক লইয়া গেলেন এবং তাঁহার অনুরোধে সন্ন্যাসী তিনজন কয়েকদিন জয়পুরে অবস্থান করিয়া গোবিন্দজীর বিগ্রহ, রাজা প্রতাপাদিত্যের কুলবিগ্রহ যশোরেশ্বরী দেবীমূর্তি ইত্যাদি দর্শন করিয়া আনন্দ পাইলেন। রাজপুতানার জলবায়ু স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বাস্থ্যোদ্ধারে সাহায্য করিবে বিবেচনা করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ খেতড়ির রাজাকে একটি পরিচয়পত্র লিখিয়া অখণ্ডানন্দজীকে সেখানে পাঠাইলেন।

এদিকে বৃন্দাবনধামের তীব্র আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দজীকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। অধিক কালক্ষেপ না করিয়া তিনি ও স্বামী তুরীয়ানন্দ চাতুর্মাস্য করিবার উদ্দেশে বৃন্দাবনে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উপস্থিত হইলেন। শরণাগত ভক্তের মনে

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৮-২৯। ১৮৯৭ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার দার্জিলিং বাসকালে এই পাথুরী রোগ পুনর্বার দেখা দিয়াছিল। কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন।

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ—৭০।

৩ ইনি জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার পুরা নাম সর্দার হরি সিং লাদকানি।

কত ভাবেরই না উদয় হয়! ব্রজধামে উপস্থিত হইয়াই স্বামী তুরীয়ানন্দ ঘোষণা করিলেন, "আজ ভিক্ষায় বেরুব না, দেখি রাধারাণী উপবাসী রাখেন কিনা।" জপধ্যানে তন্ময় সাধকদ্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন প্রায় সকাল নয়টার সময় জনৈক শেঠ প্রচুর খাদ্য সামগ্রী লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। 'রাধারাণীর জয়' উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা আনীত আহার্য দ্রব্যের কিয়দংশ হৃষ্টমনে গ্রহণ করিলেন।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বাহির হইয়া তাঁহারা পদব্রজে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষানা দর্শন সমাপনান্তে কুসুম সরোবরে ভরতপুরের রাজার বাড়ীর পাশে একতলা একটি বাড়ীতে সাধন-ভজনের ডেরা পাতিলেন। দুইজনেই কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ তুরীয়ানন্দজী তাঁহাদের উভয়ের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। একদিন তাঁহাদের মাধুকরীতে কয়েকখানা শুকনা রুটি মাত্র জুটিল। একটি কূপের ধারে বসিয়া জলে ভিজাইয়া ওই শুকনা রুটি দুইজনে আহার করিতে বসিলেন। হঠাৎ তুরীয়ানন্দজী ভাবাবেগে অশ্রু-বিসর্জন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত আদর-যত্ন করতেন, ক্ষীর-ননী খাওয়াতেন, আর আজ আপনাকে আমি শুকনো রুটি খাওয়াচ্ছি।" ব্রহ্মানন্দজী প্রবোধ-বাক্যে গুরুভ্রাতাকে শান্ত করিলেন। সাধন-ভজনে গভীর অন্তর্মুখ মহারাজের তখন আহার-বিহার কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

এইসময়কার একটি ঘটনা তুরীয়ানন্দজীর নিকট হইতে শোনা গিয়াছিল। পরপর কয়েকরাত্রে ব্রহ্মানন্দজী ধ্যানাসনে বসিলে তাঁহার চারিপাশে বালি, চূণ, ইটের টুক্‌রা পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে অপরিচিত একটি শব্দ হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দজী একদিন একটি প্রেতাত্মা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ কেন?" প্রেতাত্মা নিবেদন করে যে ব্রহ্মানন্দজীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সে এরূপ করিয়াছে। সে ব্রহ্মানন্দজীর নিকট তাহার মুক্তির প্রার্থনা জানায়। তাহাকে কিভাবে মুক্তি দিবেন, তাহা তিনি জানেন না, ব্রহ্মানন্দজী একথা বলিলে প্রেতাত্মা নিবেদন করে, "আপনি মহাত্মা, আমার মুক্তির জন্য আপনি প্রার্থনা করিলেই আমি মুক্ত হইব।" ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ইহার পর আর কখনও অনুরূপ কোন উৎপাত ঘটে নাই।

পুরাতন দিনের স্মৃতি মন্থন করিয়া তুরীয়ানন্দজী বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মানন্দজী বেশ ত্যাগী পুরুষ, কঠোর সাধন-ভজনের প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তার মাঝে ফস্ করে গম্ভীর হয়ে যাওয়া, কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া কেমন একরকম ভাব ছিল। হয়তো, এমন কথা বন্ধ করেছেন যে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে কি ব্যাপার। কয়েকদিন পরে আবার স্বাভাবিক কথাবার্তা হত।" গভীর অন্তর্মুখ ব্রহ্মানন্দজীর হৃদয়তল খুঁজিয়া পাইতে অত্যন্ত আপনজন গুরুভ্রাতাদেরও বেগ পাইতে হইত।

বৃন্দাবনধামে দুই সাধকপ্রবর পরস্পরের সাহচর্যে ভজনে আরাধনায় বিভোর হইয়াছিলেন। কলিকাতায় গুরুভ্রাতাদের সহিত তুরীয়ানন্দজীর চিঠিপত্রের আদান প্রদান হইত। পত্রে জানিতে পারিলেন মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে ১৮৯২ খৃঃ ঠাকুরের জন্মতিথির পূর্বেই। ঠাকুরের জন্মোৎসবে প্রতিবৎসরই লোকসমাগম বাড়িতেছে, মঠে যুবক ভক্তদের যাতায়াত শুরু হইয়াছে। আরও সংবাদ আসিল বিদেশে স্বামীজীর বিজয়ডঙ্কা ভারতভূমিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ঠাকুরের মহিমা প্রচার হইতেছে জানিয়া সাধক দুইজন খুবই আনন্দ করিতে লাগিলেন। মঠ মারফৎ স্বামীজী তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিলেন। মঠে ফিরিয়া যাইয়া সংগঠনের কাজে সাহায্য করিবার জন্য স্বামীজী তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দজী অন্তর হইতে সাড়া পাইলেন না। তিনি অবিলম্বে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতে পারিলেন না। এদিকে মঠ হইতেও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ঘন ঘন তাগাদা আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে অযোধ্যায় ঝুলনযাত্রা দর্শন করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী পথে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন এবং Advocate পত্রিকার সম্পাদক নিত্যগোপালবাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখানে স্বামী শিবানন্দের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখেও স্বামীজীর আদেশের কথা শুনিতে পাইলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী একত্রে একখানি চিঠিতে তাঁহাদের মনের কথা খুলিয়া স্বামীজীকে জানাইলেন। এই পত্রের উল্লেখ করিয়া স্বামীজী কলিকাতায় ভক্তবৃন্দকে লিখিলেন, "রাখালকে হরিকে এত অনুরোধ করা গেল, একটা Organisation করতে—তাদের বৈরাগ্য প্রবল।" ঐ চিঠির উল্লেখপূর্বক স্বামীজী কলিকাতায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন, "তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় Malarious, রাখাল আর হরি লিখেছেন।...রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ, লাট্টিবৎ, ইষ্টকবৎ,

ছতরীবৎ দিবে।" জুন মাসের মাঝামাঝি এই সময়কার স্মৃতিচারণ করিয়া শিবানন্দজী বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তিনজনে সারারাত ছাদের উপর গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শিবানন্দজী চতুর্মাস্য করিবার উদ্দেশে সেখান হইতে মুসৌরী হইয়া উত্তরকাশী যাত্রা করিলেন।

ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী অযোধ্যাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা ঝুলনযাত্রা দেখিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যাতে কিছুকালের জন্য ভজনে আরাধনায় তাঁহারা আবার ডুবিয়া গেলেন। অযোধ্যাতে থাকাকালীন একটি ঘটনা ঘটে। অযোধ্যাতে তখন খুবই অন্নকষ্ট। একাদশীর দিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া তুরীয়ানন্দজী কিছু গেটে কচু সিদ্ধ মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন। ভিক্ষালব্ধ কচু সিদ্ধই তাঁহারা নির্বিকারভাবে আহার করিতে বসিলেন। কচু সামান্য খাইতেই ব্রহ্মানন্দজীর গলা খুব ধরিয়া উঠিল। তুরীয়ানন্দজীরও গলায় যন্ত্রণা হইতেছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দজীর জন্য একটা লেবু সংগ্রহের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একটি লেবুবাগানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাছে ফুল ধরিয়াছে মাত্র। উপস্থিত মুনিষ কয়েকজন জানাইল, ঐ সময়ে লেবু পাওয়া সম্ভব নহে। হতাশ হইয়া তুরীয়ানন্দজী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল গাছের একটি পাকা লেবু। তিনি মুনিষদের নিকট ঐ লেবুটি প্রার্থনা করিলেন। 'গাছে লেবু ছিল না, এটা আপনার ভাগ্যে মিলেছে',—বলিয়া তাহারা গাছ হইতে লেবুটি পাড়িয়া দিল। ঐ লেবু সেবন করিয়া ব্রহ্মানন্দজী সামান্য আরাম পাইলেন বটে, তবুও বোধ করিলেন যে গলা ফুলিয়া রহিয়াছে। গলায় যন্ত্রণা, তাঁহার উপর ক্ষুধার জ্বালা—রাত্রিবেলা তিনি ঠাকুরের উপর অভিমানভরে সখেদে বলিতে লাগিলেন,—"একমুঠো অন্নই যদি না জুটিয়ে দিতে পারলে, তবে ঘরের বার করেছিলে কেন? কাল সকালে যদি গরম খিচুড়ী আর চাটনী খাওয়াতে পার তবে বুঝবো তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।" ভক্তের জন্য ভগবানকেও পরীক্ষা দিতে হয়। বিপদে-সম্পদে, দুঃখে-আনন্দে সর্বদাই ব্রহ্মানন্দজী জানেন যে ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া রহিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও সাময়িকভাবে সন্দেহ আসে, অভিমান হয়, তাহাতে ঘটে লীলার বৈচিত্র্য। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা সরযুর লক্ষ্মণ-বর্জন ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিতেই দেখেন একজন রামাইত সাধু ব্যগ্রভাবে কাহাকেও যেন খুঁজিতেছেন। সাধুটি ব্রহ্মানন্দজী

ও তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজী আপনারাই তো একাদশীর উপবাস করিয়া রহিয়াছেন। চলুন ৺রামজীর কুটিরে, পারণ করবেন।" সন্ন্যাসিদ্বয় বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, "বাবাজী এত সকালে কি পারণ করাবেন?" সাধুটি সবিনয়ে জানাইলেন যে তিনি ৺রামজীকে খিচুড়ী ভোগ দিয়া আসিয়াছেন। ৺রামজীর প্রসাদ দিয়াই পারণ হইবে। সাধুটিকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এক নিম গাছ তলায় খড়ের ঝুপড়ীতে বাবাজীর আস্তানায় উপস্থিত হইলেন। ৺রামজীর প্রসাদ গরম খিচুড়ীর সঙ্গে আম, লেবু ও তেঁতুলের আচার দিয়া পারণ ভালই হইল। এদিকে সাধুজী আবেগের সঙ্গে বলিতে থাকেন, "ওহো, আমার কি সৌভাগ্য! আজ চব্বিশ বছর ধরিয়া আমি এইস্থানে বসিয়া আছি ৺রামজীর একটি বাণী শুনিবার জন্য। তাঁহাকে একবার দর্শন করিব এই আশায় প্রতীক্ষা করিতেছি। আজ ৺রামজী আমাকে কৃপা করিয়াছেন।" সাধুটির অশ্রু অবিরল ধারায় ঝরিতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দজী অনুরোধ করিলেন, "বাবাজী ব্যাপারটি একটু খুলেই বলুন।" সাধুটি বলিতে লাগিলেন, "শেষরাত্রে কে যেন খুব নরম হাতে আমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, 'ওরে ওঠ, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। শীঘ্র খিচুড়ী রাঁধিয়া আমাকে ভোগ দে। আর ভোরবেলা লক্ষ্মণ-বর্জন ঘাটে যাইয়া দেখিতে পাইবি, আমার দুইজন ভক্ত স্নান করিতেছে। তাহারা একাদশীর উপবাস করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ খাইতে দিবি'।" তাহার কুটীরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রের ছবি দেখাইয়া বলিলেন. "আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এই ৺রামজী হাত দিয়া ঠেলিয়া আমায় তুলিলেন আর ঐ কথাগুলি বলিলেন।······আপনাদের দয়ায় ৺রামজী এতদিনে আমায় কৃপা করিলেন।"

বিস্মিত সন্ন্যাসিদ্বয় ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ৺রামজীর প্রসাদ ধারণ করিলেন। নিজেদের কুটিয়ায় ফিরিবার পথে ব্রহ্মানন্দজী বিবৃত করেন পূর্বরাত্রে ঠাকুরের উপর তাঁহার অভিমান ও আবদারের কাহিনী। ঠাকুরের অহেতুক কৃপা সদাসর্বদা যে তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, ইহা পুনরায় অনুভব করিয়া তাঁহাদের মন প্রশান্তিতে ভরপুর হইল।

যে আধার যত বড় তাহার ধারণক্ষমতাও তত বেশী। তাহা অল্পেতে পূর্ণ হয় না, ফলে পরিতৃপ্তি আসে না। অতৃপ্তির আবেগ লইয়া ব্রহ্মানন্দজী অযোধ্যাধাম হইতে একাকী বৃন্দাবনধামে ফিরিয়া গেলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গেলেন

ফৈজাবাদ ; সেখানে এক ধর্মপ্রাণ উকিলের বাড়ীতে মূল্যবান গ্রন্থে সুসজ্জিত একটি গ্রন্থাগার ছিল। ফৈজাবাদে কয়েকমাস অবস্থান করিয়া তিনি নিবিষ্টমনে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। চাতুর্মাস্য সমাপনান্তে স্বামী শিবানন্দ লক্ষ্ণৌ হইতে অনুসন্ধান করিতে করিতে ফৈজাবাদে স্বামী তুরীয়ানন্দের সাথে মিলিত হইলেন আনুমানিক নভেম্বর মাসে। তাঁহারা স্বামীজীকে আমেরিকার ঠিকানায় যুক্তভাবে একটি পত্র লিখিলেন। উহার উল্লেখপূর্বক স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখিলেন, "তারকদা ও হরির লিখিত এক পত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম যে তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন।"

এদিকে ব্রহ্মানন্দজীর পুনরায় বৃন্দাবন গমনের সংবাদ স্বামীজী জানিতে পারিয়া আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন,—"রাখালরাজা ঘুরে ফিরে পুনর্বৃন্দাবনং গচ্ছেদিতি।" স্বামী ব্রহ্মানন্দের এবার চতুর্থবার বৃন্দাবনে আগমন। তিনি নিরাসক্ত, নিরালম্ব ভাব অবলম্বনপূর্বক দুশ্চর অজগরবৃত্তি[১] গ্রহণ করিলেন। কুসুম সরোবরের নিকট কোনস্থানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া শোনা যায়। ভিক্ষাতে যাইতেন না, কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিতেন না। সাধুপুরুষ দেখিয়া কেহ হয়ত কিছু আহার্য দিয়া গেল। কোনদিন হয়ত কিছুই মিলিত না। এক ব্রজবাসী ভক্ত শেঠ তাঁহাকে কোন কোন দিন ভিক্ষা দিয়া যাইত। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন পুণ্যাত্মা ব্রহ্মানন্দজীর সম্মুখে একখানি নূতন কম্বল রাখিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক চোর আসিয়া তাহার চোখের সম্মুখেই উহা লইয়া চলিয়া গেল। সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা ব্রহ্মানন্দজী মহামায়ার লীলা দেখিয়া নিশ্চলভাবে তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'— এই ভগবদ্-প্রতিশ্রুতির যাথার্থ্য পুনঃপুনঃ আস্বাদন করিয়া ব্রহ্মানন্দজী আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। ধ্যানরাজ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল আস্বাদন করিতে করিতে কয়েকমাস অতীত হইল। সেই অলৌকিক রাজ্য পরিভ্রমণে কি ঘটিয়াছিল তাহার সংবাদ কে দিবে?

পরবর্তীকালে মহারাজের একটি সৎপ্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গে অবধারণ করিবার চেষ্টা

১ মহারাজ কাশীতে একদিন বলিয়াছিলেন, "কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক idiot-রা—(জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা) যাদের brain (মস্তিষ্ক) খাটাবার শক্তি নেই, কোনোরকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে—আর এক মহাপুরুষ পারেন, যাঁরা কর্মের পার।"
(ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১০৯)

করা দরকার। তিনি বলিতেছেন, "আনন্দ কি বলছ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই···। ···আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মত help করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জ্ঞান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে-সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোন···ভয় নেই—শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন।"

বিগতভী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করে—"মহারাজ, নিত্যে পৌঁছে তারপর ত লীলা?" মহারাজ উত্তর দেন, "তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, 'সখি, বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি'। বেদান্তসিদ্ধান্ত কি না সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্য লীলা দুয়ের পার।"[১]

ভক্তি হইতেছে যমুনা আর জ্ঞান হইল গঙ্গা। বিবেক-বৈরাগ্য-ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি যেন পুণ্যতোয়া সরস্বতী। ইহাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে আধিকারিক পুরুষের জীবনে। তাঁহাদের উদার জীবনভূমিই কেবল এই প্রবল ত্রিবেণী-স্রোত ধারণে সমর্থ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ পুরুষ। তাঁহার মধ্যে উপস্থিত হইল এই দুর্লভ সমন্বয়। তাঁহার অন্তরলোক দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল, বিমল আনন্দধারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। সিদ্ধ সাধক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপলব্ধি করিলেন, আবার চক্ষু উন্মীলন করিয়াও অনুভব করিলেন, 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।'

অনন্তভাবময় ভগবানের ইতি করা যায় না, নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষদের অনুভূতিরাজ্যের উপলব্ধিসমূহেরও পরিসীমা করা যায় না। তবে তাঁহাদের দিব্য-জীবন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সকল আধিকারিক পুরুষগণ, বিশেষত অবতারের পার্ষদগণ শ্রীভগবানের অবতরণ সার্থক করিবার জন্যই নিত্য ও লীলার মধ্যে তাঁহাদের বিশুদ্ধ মন-তরী লইয়া বাইচ খেলেন। তাঁহাদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়া দিব্য আনন্দলোকের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা আস্বাদন করিয়াই ভক্তজন পরিতৃপ্তি লাভ করে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম ভাগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্ভবতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন আদেশ বা ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১০৪

বলিতেন, "তাঁর (ঠাকুরের) ইঙ্গিত ভিন্ন আমার কিছু করবার জো নেই।" প্রায় কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তিনি একদিন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণমঠ[১] তখন কর্মযজ্ঞের উদ্যোগে প্রাণচঞ্চল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-স্রোতাস্বিনীর প্রবল শক্তি-আবর্তের কেন্দ্রবিন্দু সেই মঠ। অবতার প্রবর্তিত যুগধর্মের অধিকতর প্রকাশ, প্রসার ও ব্যাপকক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রস্তুতি সেখানে চলিতেছে, অবতারের লীলামাহাত্ম্য নূতন নূতন রূপে প্রকট হইতে চলিয়াছে। নবযুগের বিরাট সম্ভাবনা সকলের মনে আশার সঞ্চার করিতেছে। সুমহান এই উদ্যোগপর্বে উপস্থিত হইলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এবং 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তিনি যুগধর্ম সম্প্রসারণ কর্মযজ্ঞে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

১ ইতিপূর্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ আলমবাজারে একটি ভাড়াবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। স্বামী বিরজানন্দের বর্ণনাতে পাই: "বাহির ও ভিতর দিকে চক্‌মিলানো বেশ বড় বাড়ী, রাস্তার ধারে থামওয়ালা সরু বারান্দা। গলির দিকে দরজা, ঢুকেই সম্মুখে উঠান ও চণ্ডীমণ্ডপ। বাহিরে নীচে উপরের সিঁড়ির ডান দিকে দুইটি ঘর খুব অন্ধকার......। বাহির বাড়ীর উপরে দুই দিকে বারান্দা, উত্তর দিকে একটি লম্বা হল ঘর, তার ভিতর দিয়ে গিয়ে একটি ছোট ঘর।......ভিতরের বাড়ীতে ঢুকে বামদিকে ঠাকুর ঘর, ডানদিকে তিনটি শোবার ঘর, পূর্বদিকে ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘর, তিনদিকে বারান্দা ও পাশে ছাদ। ছাদের কোণে একটি পায়খানা। ঠাকুরের ভাঁড়ার ও ঠাকুর ঘরের মাঝে নীচে যাবার সিঁড়ি। নীচের ঘরগুলিতে একটি রান্নাঘর, দুইটি গুদাম ঘর, একটি জলের ঘর......।"
(অতীতের স্মৃতি, ৩সং, পৃঃ ৪৯-৫০)

চতুর্থ অধ্যায়

'লোকহিতায়'

চতুর্থ অধ্যায়

লোকহিতায়

পূর্ণকাম-পুরুষ মহারাজকে দীর্ঘকাল পরে গুরুভ্রাতাগণ মঠে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রসূত অন্তর্মুখী ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, আনন্দোৎসারিত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল ও শান্ত সমাহিত ভাব নিকট-দূরের সকলকে আকর্ষণ করিল। তাঁহার উপস্থিতিতে মঠজীবনে নূতন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। তিনি একদিকে যেমন আর্তজিজ্ঞাসুদের ধর্মোপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রধান বাহক রামকৃষ্ণ সংঘের সারথ্য অনেকাংশে নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের ধন 'বৃন্দাবনের রাখাল' এইবার 'রাজার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন।

প্রত্যাবৃত্ত মহারাজের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "রাখাল মহারাজও প্রায় এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পূর্বেকার বিষণ্ণভাব তখন চলিয়া গিয়া গম্ভীরভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি সর্বদাই জপ করিতেন। কখন বসিয়া আছেন কখন বা পাইচারি করিতেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জপ করিতেছেন। মাঝে মাঝে আবশ্যক হইলে তীক্ষ্ণ হাস্যকৌতুক করিতেছেন। শেষ জীবনে যে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সর্ব বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধির প্রাচুর্য দেখা গিয়াছিল এই সময় হইতেই তাহার আভা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বাল্যকালের বা বরাহনগর মঠের অবস্থানকালের ভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং ধীর গম্ভীর ভাবটি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন না।···অল্পকথায় কার্য প্রণালী নির্ধারণ করিয়া দিবার তাঁহার একটি অসাধারণ শক্তি ছিল। একটি লক্ষণ তাঁহার ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইত যে তিনি সকলেরই নিকট ঋজু ও বিনয়ী হইয়া থাকিতেন এবং পারতপক্ষে এমন কোন কথা কখন বলিতেন না যে তাহাতে কাহার মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এইজন্যই তাঁহার সহিত কাহার বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই।"[১]

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় ভাগ পৃঃ ৩০-৩১

সুদক্ষ যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে সদানির্ভরশীল নিপুণ যন্ত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন গুরুভ্রাতা যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে স্পষ্টভাবে বলিলেন তাঁহার নিজস্ব ভূমিকার কথা। তিনি বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে বেশ ছিলুম। যাতে মঠের ভিতর তাঁর সেই প্রেম ভক্তি ভাব জীবনে বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে তাই বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এমন যুগ তো আর সহজে মিলবে না। তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ দেখে জগতের লোক জুড়ুতে আসবে, ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে তারা ত্রিতাপজ্বালা থেকে শান্তি পাবে। তাই তো বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছি।"[১]

রামকৃষ্ণ সংঘে মহারাজের নেতৃত্ব ছিল 'কুটোবাঁধা'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের কিছুকাল পূর্বে 'রাখালরাজ'কে নেতৃত্বের জন্য চিহ্নিত করিয়া দেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে স্বামী বিবেকানন্দ ও অপর গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাদের 'রাখাল'কে 'রাজার' ভূমিকায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর লীলার স্মৃতিচারণ করিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "রাখালকে রাজা হতে হবে কিনা তাই রাখালকে দিয়ে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোন ছোট কাজ করাতেন না !"

বরাহনগর মঠ পরিচালনা বিষয়েও দেখিতে পাই নরেন্দ্রনাথ রাখালের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, তাঁহার উপর মঠের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব দিয়াছেন এবং বাড়ীর মামলা-মোকদ্দমার জন্য যখন তিনি কলিকাতায় যাইতেন তখন রাখালকেই মুখ্য দায়িত্ব দিয়া যাইতেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ মার্কিন দেশে যাইবার পূর্বে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে এক পত্র লিখেন, তাহাতেও দেখিতে পাই ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর স্বীকৃতি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "As to the other two Swamis, they were my Guru-bhais who went to you last at Junagad; of them one is our leader. I met them after three years and we came together as far as Abu and I left them."[২] উল্লিখিত দুই গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ ও

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৬৯-৭০

২ বঙ্গানুবাদ: অপর দুইজন স্বামীজী যাঁহারা গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার গুরুভাই এবং তন্মধ্যে একজন আমাদের নেতা। তাঁহাদের সহিত তিন বছর পর সাক্ষাৎ হয়। আমরা একত্রে আবু পর্যন্ত আসি এবং আমি সেখান হইতে চলিয়া যাই।

তুরীয়ানন্দের মধ্যে প্রথমজনকেই স্বামীজী দলনায়করূপে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর শ্রদ্ধামিশ্রিত উচ্চধারণা অনেক সময়েই প্রকাশ পাইয়াছে। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন বিকালে জনৈক সাহেব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রশ্ন সমাধানের জন্য মঠে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ স্বামীজীর মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া সাহেবকে স্বামীজীর নিকট যাইতে বলিলেন। সাহেব স্বামীজীর নিকট আসিলেন। স্বামীজী তখন বুঝাইয়া বলিলেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দই তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করিয়া দিবেন। সেইসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন, "There is a dynamo working and we are all under him." সাহেব পুনরায় মহারাজের নিকট আসিলে তিনি সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে জিজ্ঞাসুর সকল সন্দেহ নিরসন করিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে সাহেব গৃহে ফিরিবার সময় স্বামীজীকে ধন্যবাদ জানাইয়া গেলেন।[১]

'রাখাল' ও 'হরি' শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মার্কিন দেশে স্বামী বিবেকানন্দ ইহা জানিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। মঠে রামকৃষ্ণানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী লিখিলেন, "রাখাল ও হরিকে আমার আলিঙ্গন প্রণাম জানাইবে। তাহাদের বিশেষ যত্ন করিবে। ...রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস একথা ভুলো না।" মঠবাসিগণও সকল সময় মহারাজকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিজয়-দুন্দুভি সপ্তসাগর পার হইয়া স্বদেশে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।[২] পত্রপত্রিকা মারফৎ স্বামীজীর ভাবস্ফুলিঙ্গ কলিকাতায় ও মাদ্রাজে যুবকদের হৃদয়ে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। নবযুগের ধর্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতের পুনরভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা স্বামীজীর মানসপটে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহাই বিভিন্ন আকারে ভারতে পৌছাইয়া কর্মিদের উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে নূতন ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া ধর্মানুরাগী কয়েকজন যুবক আলমবাজার মঠে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করিয়াছে এবং

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৬৭-৬৮

২ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে, সেই এক ঘা ভারতের ভিতর লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়।" তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সকল দিকেই মহান এক জাগরণের সূচনা। দিকে দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার জয়গান শুনিয়া মহারাজের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মহারাজের প্রথম কাজ হইল স্বামীজীর সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মিদের এবং মঠের হিতৈষীদের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করা। আমেরিকা হইতে স্বামীজীর বিভিন্ন নির্দেশ ও পরামর্শসহ উৎসাহপূর্ণ চিঠিপত্র আসিতে লাগিল। মহারাজ মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা প্রভৃতি ভক্ত-কর্মিবৃন্দ, রাজপুতানায় কর্মরত অখণ্ডানন্দ, খেতরীর মহারাজা, মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের মহারাজা প্রভৃতি সুহৃদ ব্যক্তিদের সহিত ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা যোগাযোগ সুদৃঢ় করিলেন। তিনি স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে শশী মহারাজ প্রভৃতি মঠবাসিদের সহিত পরামর্শ করিয়া আলমবাজার মঠের কাজকর্ম সংগঠিত করিলেন। কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল; গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই মঠ সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা অধিক খোঁজখবর লইতে লাগিলেন, নানাভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লোককল্যাণার্থে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, তদুদ্দেশে যুগোপযোগী ধর্মসংস্থাপনকার্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন স্বয়ং। স্থূলশরীর অপ্রকট হইবার পর তাঁহার লোকহিতৈষণা শক্তি পার্ষদদের মধ্য দিয়া প্রকট হইল। পুঁথিকার সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

রামকৃষ্ণ মহালীলা সুবিশাল তরু।
লীলাক্ষেত্রে প্রভুদেব জগতের গুরু॥
হরিহর-বিধি-পূজ্য সৃষ্টির আধান।
রোপিয়া তাহার কাজ হৈলা অন্তর্দ্ধান॥

* * * *

ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের খানা।
ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা॥
এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাঁই।
ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গোঁসাই॥
অবিরত খেলা তাঁর লয়ে ভক্তগণ।
প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলক্ষ্য এখন॥

ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়মধ্যে খেলা।
ভক্তেরে করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেলা॥[১]

সঙ্ঘজননী শ্রীমাতাঠাকুরানীও বলিতেন, "তিনি (ঠাকুর) শত বৎসর সূক্ষ্ম শরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন বলেছেন।"[২] জীবহিতব্রতে অবতীর্ণ ঈশ-শক্তি ভক্তগণের, বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে অবলম্বন করিয়া বহুধারাতে সুপ্রকাশিত হইতে থাকিল।

কলিকাতায় শ্রীমায়ের একটি ভাল বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য বিদেশে থাকিতেই স্বামীজী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতায় মহারাজের চেষ্টায় বাংলা ১৩০৩ সালের গোড়াতে (১৮৯৬ খৃঃ) সরকারবাড়ী লেনে 'গুদামবাড়ী' নামে পরিচিত গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি বাড়ীর দোতালা ও তিনতলা ভাড়া লওয়া হইল। শ্রীমা মহিলা ভক্তদের লইয়া তিনতলায় থাকিতেন। দোতালায় থাকিতেন মহারাজ, স্বামী যোগানন্দ ও কয়েকজন সেবক। এই বাড়ীতে পাঁচ-ছয় মাস বাস করিয়া শ্রীমা কালীপূজার পর জয়রামবাটীতে চলিয়া যান। এই বাড়ীতেই ঠাকুরের আদর্শ গৃহী ভক্ত নাগ মহাশয় শ্রীমাকে দর্শন করেন। শ্রীমা বছর দুই পরে কলিকাতায় আসিয়া ১০।২ নং বোস পাড়া লেনে বসবাস করেন। যাহা হউক, কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীমায়ের কলিকাতায় বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী বাটী নির্মিত হইলে মহারাজ ও অন্যান্য সন্তানগণ নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

ভারতবাসী ও তাহাদের শাশ্বত ঐতিহ্য সম্বন্ধে গর্বিত পাশ্চাত্যবাসীর যে অজ্ঞান-অন্ধকার ছিল, তাহা স্বামীজী-প্রজ্বলিত ভাববহ্নিতে অনেকাংশে দূরীভূত হইলে পাশ্চাত্যবাসী শ্রদ্ধার ভাব লইয়া এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত ভাবের লেনদেন করিতে অগ্রসর হইল। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের পেষণে ভারতবাসী মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিদেশীর অনুকরণে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদেরও সংবিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। প্রতীচ্য-বিজয় সমাপনান্তে স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ভারতবাসীর নিকট বহুকাল অপেক্ষিত এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সমগ্র দেশে উৎসাহ-অগ্নি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দ-গর্বে উৎফুল্ল কলিকাতা মহানগরী তাহার কৃতী সন্তানকে

১ পুঁথি, পৃঃ ৬৩১
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য়, ১০

সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানাইল।[১] হর্ষোৎফুল্ল মহারাজ পুষ্পমাল্যে গুরুভ্রাতা ও বাল্যবন্ধুকে বরণ করিলেন। 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলিয়া স্বামীজী মহারাজের পাদস্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা' বলিয়া স্বামীজীকে প্রতিপ্রণাম জানাইলেন। উপস্থিত সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ দুই পার্ষদের প্রেমের সম্পর্ক যাহারা দেখিল তাহারাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

স্বামীজী তাঁহার সংগৃহীত অর্থ একদিন আলমবাজার মঠে মহারাজের হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এদ্দিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"[২] এদিকে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। মহারাজের অনুরোধে স্বামীজী তাঁহার অন্যান্য কর্মসূচী বাতিল করিয়া দার্জিলিং-এ কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। মার্চ মাসের মধ্যভাগে স্বামীজী, মহারাজ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, জ্ঞানানন্দ, মিঃ গুডউইন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ টার্ণবুল এবং মাদ্রাজের ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য ও সিঙ্গেরভেলু-মুদালিয়ার দার্জিলিং গমন করিলেন। স্বামীজী ও গুরুভ্রাতাগণ মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বাড়িতে, অপর সকলে বর্ধমানের মহারাজের প্রাসাদ 'রোজব্যাঙ্কে' অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যে খেতরীরাজ অজিত সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বামীজী ২১শে হইতে ২৬শে মার্চ—এই কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় দার্জিলিং চলিয়া যান।

স্বামীজী মুখ্যতঃ বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং আসিলেও মহারাজ ও গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিতে তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। দৃঢ়ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ-প্রচার যন্ত্রটি সংগঠনের যে চিন্তারাশি স্বামীজী এতকাল সযত্নে বহন করিতেছিলেন, তিনি তাহা গুরুভ্রাতাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একটি অভিমত প্রকাশ করিলেন। অভিমতটির গুরুত্ব বুঝিয়া স্বামীজী উপস্থিত

১ স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎবাণী "কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মূল গ্রন্থি পর্যন্ত নড়িয়া উঠিবে। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।" (New Discovery, p. 581) বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১৭২

একজনকে উহা লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। স্বামীজী মহারাজকে বলিলেন, "তুই যা বলবি তাই করবো। এমন কি তুই যদি আগাগোড়া সব বদলে দিতে চাস, তাই হবে।" সহাস্যবদন মহারাজের মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। স্বামীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একথা কেন বলছি তা কি তোর মাথায় ঢুকল?" মহারাজ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "তবে আমি আর কিছু বলব না।" উপস্থিত সকলে দুই-জনের সপ্রেম ব্যবহার উপভোগ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের ভবিষ্যৎ কার্য-ধারা নির্ধারণের জন্য দার্জিলিং-এর ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনাদির দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীর একটি ছক প্রস্তুত হইলে স্বামীজী কালবিলম্ব না করিয়া উহাকে বাস্তবে রূপদান করিতে ব্যগ্র হইলেন। স্বামীজীর নির্দেশে মহারাজ মুর্শিদাবাদ হইতে অখণ্ডানন্দকে কলিকাতায় ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মহারাজ-সহ স্বামীজী ২৮শে এপ্রিল কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বলরাম ভবনের দোতালার হলঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এবং অন্যান্য অনুরাগিগণ এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হইলেন। স্বামীজী সমবেত সুধীবৃন্দের নিকট তুলিয়া ধরিলেন তাঁহার মহতী পরিকল্পনা। তিনি বলিতে লাগিলেন, "নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সংঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে।...এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাহিরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র-মতে সংঘের কাজ চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সংঘে একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একাজে সহায় হোন।"[১]

১ স্বামিশিষ্য সংবাদ। পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৫৫-৬

সকলের সম্মতিক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন বা রামকৃষ্ণ-প্রচার সঙ্ঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশনের সাধারণ সভাপতিরূপে স্বামীজী এবং কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতির পদে মহারাজ নির্বাচিত হইলেন। স্বামী যোগানন্দ হইলেন উপ-সভাপতি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি মহোদয় হইলেন ইহার সম্পাদক এবং ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার হইলেন সহকারী সম্পাদক। এইরূপে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হওয়াতে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হইল। কলিকাতা-কেন্দ্র আলমবাজার মঠ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সভাপতিত্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। মঠ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর উপ-সভাপতি ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ।

দার্জিলিং-এ একমাস বাস করিলেও স্বামীজীর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি না হওয়াতে তিনি মহারাজ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে ৬ই মে[1] কলিকাতা হইতে আলমোড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে মহারাজকেই সর্বপ্রথম পরিকল্পিত মিশনের কর্মসূচী রূপদান করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল।

এদিকে মঠে আসিয়া স্বামীজী ও মহারাজ জানিতে পারিলেন অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে মহুলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বাস করিতেছেন ; দুঃস্থ আর্তদের সেবা করিবার জন্য অখণ্ডানন্দের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রাণের বেদনা মাদ্রাজে শশী মহারাজ এবং আলমবাজারে বাবুরাম মহারাজকে জানাইয়াছিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে লিখিলেন, "তুমি কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী, হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থান করা তোমার অসাধ্য। অতএব তোমার মঠে ফিরিয়া যাওয়া উচিত।" বাবুরাম মহারাজও এই মর্মে একখানি চিঠি দিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ ইহাতে বিচলিত হইলেন না। এদিকে তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ পণ জানিতে পারিয়া বিগলিত-হৃদয় স্বামীজী তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, "সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজীকি ফতে !! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেব।" স্বামীজীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে মহারাজও মুর্শিদাবাদে সেবাধর্ম সংগঠনের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহা উৎসাহে সেবা কাজ আরম্ভ করিলেন।

১ স্বামীজী ৫ই মে ১৮৯৭ ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, "কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি,—স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য।" পত্রাবলী, পৃ. ৫৪১

মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক চারুবাবু আলমবাজার মঠে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। তিনি সাধুদের শুভ সংকল্প জানিতে পারিয়া সোসাইটির তরফ হইতে অবিলম্বে একশত পঞ্চাশ টাকা দান করিলেন। মহারাজ এই অর্থসহ দুইজন সাধু কর্মীকে অখণ্ডানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং একটি পত্রে লিখিলেন, "সর্বদা তিন জনে পরামর্শ করিয়া কার্য করিবে। ইহাদের নিকট অনেক বলিয়া দিয়াছি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে।" কলিকাতা হইতে অর্থ, ঔষধপত্র, বস্ত্র ইত্যাদি পাঠাইয়া এবং পত্রযোগে নির্দেশ ও উৎসাহাদি দিয়া মহারাজ অল্প সময়ের মধ্যে সেবাকার্য সংগঠন করিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দ ১২ই মে মহুলা পৌঁছাইলে ১৫ই মে হইতে সুসংবদ্ধভাবে আর্তত্রাণসেবা আরম্ভ হইল। ইহাই রামকৃষ্ণ-সংঘ পরিচালিত প্রথম সুপরিকল্পিত সেবাকার্য। সেবাযজ্ঞ সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপে স্বামীজী, মহারাজ ও স্বামী অখণ্ডানন্দের মধ্যে কয়েকটি পত্রের আদান-প্রদান হয়। তাহাতে প্রকাশিত মহারাজের সংগঠন-দক্ষতা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও হৃদয়বত্তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি কর্মীদের উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়াছেন, কাজকর্ম সম্বন্ধে খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়াছেন, আবার কখনও ভুল-ত্রুটির জন্য জবাবদিহি চাহিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মহারাজের কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৯শে মে, ১৮৯৭ খ্রীঃ : "টাকার পুনরায় আবশ্যক হইলে ১০।১২ দিন আগে লিখিবে। তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা ঐ ফাণ্ড হইতে আপাততঃ লইয়া নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত ফাণ্ডে দিবে; যদ্যপি বেশী লোকের আবশ্যক না হয় তাহা হইলে গুলতান করিবার আবশ্যক কি আছে? যেমত বিবেচনা হয় করিবে।"

১লা জুন, ১৮৯৭ : "তাঁহার (স্বামীজীর) ইচ্ছা যে কাগজে লেখা, বাস্তবিক কাগজে লেখা হইলে আমরা fund-এর জন্য Subscription তুলিতে পারিব, কারণ কেহ জানে না সেখানে তোমরা কিরূপ কার্য করিতেছ।...অতএব তোমরা যত শীঘ্র পার Correspondence Mirror এবং Patrikaতে পাঠাইবে। তোমাদের Correspondence বাংলা এবং ইংরাজীতে বাহির হইলে চাঁদার চেষ্টা করা যাইবে। আমাদের যখন সকলের এই মত তখন তোমরা কেন বিলম্ব করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।...নিত্যানন্দের চিঠিতে জানিলাম যে পত্রাদি

ছাপাইবার তোমাদের ইচ্ছা নাই, শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। যাহা হউক, obedience না থাকিলে কোন কার্য হইবে না।"

৫ই জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ: "আমরা বসুমতী কাগজে রিপোর্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছি। যদি তোমরাই বসুমতীতে একেবারে পাঠাও তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু মঠে যেন প্রতি সপ্তাহে একখানা করিয়া তোমাদের কার্যবিবরণী সম্বলিত পত্র আসে।···যদি কোন পত্রিকায় কার্যবিবরণ প্রকাশ হয় তবে সেই পত্রিকা মঠে পাঠাইবে। টাকা পাঠাইয়াছি।"

৮ই জুন, ১৮৯৭: "তোমাদের কার্যের কথা তোমরা না লিখিয়া গ্রামের লোক অথবা Govt. Officer-গণ যদি লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে অধিক কাজ হইবে। তোমরা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে।···তোমরা যে হারে চাউল দিতেছ, সেই হারে মাসে কত খরচ হয়, তাহা শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইবে। আমরা প্রতিদিন একমণ করিয়া চাউলের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি।···গুরুদেবের উপর নির্ভর করিয়া খুব উৎসাহের সহিত কার্য কর।"

জুন, ১৮৯৭: "Heart-এর development না হইলে কোন কাজ হয় না। তোমাদের এই প্রকার কার্য মহান হৃদয়ের পরিচায়ক। 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ' এই মহৎ শ্লোকের যথার্থ application তোমাদের কার্যেই দেখা যাইতেছে। তোমরা আরও দিন দিন উৎসাহের সহিত কার্য কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃস্বার্থভাবে কোন মহৎ কার্যে ব্রতী হইলে ভগবান তাহার সহায়তা করেন।"

১৪ই জুন, ১৮৯৭: "আমাদের এখান হইতে দুইজন যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওয়া হয় তবে তোমাদের ওখানেই পাঠাইব। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের লোক যায় ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া বা অন্যত্র রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক পরে লিখিব।"

৫ই জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে মহারাজ এক দীর্ঘ চিঠিতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং আর্তত্রাণ কাজের জন্য কয়েকটি মূল নির্দেশ পাঠাইয়াছেন, যাহা অদ্যাবধি মিশন-পরিচালিত সেবাকার্যে সাধারণ নীতিরূপে অনুসৃত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "I have something to suggest regarding your work there.

1. When the Government will no more be willing to supply with rice at that price then it is necessary for you to control distribution as well as to be very discreet.

2. Those who are really needy and quite incapable of earning livelihood are to be enlisted for having the alms.

3. You will enlist such people as you will think really deserving the charity and will not be guided by any other people either in private charity or in public."[১]

আর্তদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিকট কেহ নালিশ জানাইলে তিনি মহারাজকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য লিখিলেন। অখণ্ডানন্দকে একটি পত্র লিখিয়া মহারাজ অভিযোগের সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা করিলেন। ইহাতে ভুল বুঝিয়া অখণ্ডানন্দ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। প্রখর-বুদ্ধি মহারাজ ১৬ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া লিখিলেন, "আমি এবং মঠস্থ আমরা সকলেই তোমার কার্যে সন্তুষ্ট আছি। আমি যে তোমার নিকট explanation চাহিয়াছিলাম, সে কোনও প্রকার অবিশ্বাসবশতঃ নহে, কেবল অপর পাঁচ জনকে উহা দেখাইয়া তাহাদের ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য। তোমার যেরূপ সহৃদয়তা তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। তোমার করুণ হৃদয়, সর্বসাধারণের দুঃখে সহানুভূতি, অদম্য অধ্যবসায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছে। গুরুদেবের কৃপায় তুমি আরো উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত থাক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

সেবাকার্যের সূচী সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া মহারাজ সেবাকার্যের পরিধি বিস্তৃত করিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইলেন ১৬ই জুলাই-এর চিঠিতে: "পূর্বে যে টাকা পাঠাইয়াছি তাহার দ্বারা এই জুলাই মাস চালাইয়া দিয়া বাকী টাকা সব রাখিয়া দিও ও একশত পঞ্চাশ টাকা শীঘ্র পাঠাইব—তাহার

১ তোমাদের সেবাকার্য সম্বন্ধে কয়েকটি পরামর্শ দিতেছি।

১) সরকার যদি ঐ মূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে রাজী না হয়, তোমাদের চাউল বিতরণ সম্বন্ধে সংযত ও হুঁশিয়ার হইতে হইবে।

২) সাহায্য বিতরণের জন্য একমাত্র সেইসকল ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করিবে যাহারা প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত এবং জীবিকা উপার্জনে অক্ষম।

৩) তোমরা যাহাদের বাস্তবিকই সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচনা করিবে শুধু তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবে; অন্য লোকের অভিমত দ্বারা পরিচালিত হইবে না।

দ্বারা August মাস চালাইবে। অতঃপর বোধ হয় আর আমরা Mahabodhi Societyর অর্থ লইব না। সারদাকে Goalanda না পাঠাইয়া তোমার নিকট পাঠাইব মনে করিতেছি। তুমি সুরেন্দ্র ও সারদাকে মহুলায় রাখিয়া নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে Centre করিতে নিজে একবার যাইলে ভাল হয়। আর Government যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত লিখিয়াছ তাহা লইয়া ঐ স্থানে Relief কার্য করিতে থাক।"

২৬শে জুলাই, ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে লিখেন: "ওখানকার Local লোকেরা যাহা কিছু সাহায্য করে আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইও। সমুদায় এখান হইতে acknowledge করা হইবে,··· কাগজে দিতে হইবে···fact is fact। যে যাহা দিবে acknowledge কর এবং আমরা যাহা Subscription পাই acknowledge করি—এই কথা বলা হইয়াছে। বোধহয় তাহারা আমাদের এই প্রসঙ্গে রাজী হইবে। তুমি এইবার হইতে সাবধানে কাজ করিবে···"।

উপরি-উক্ত পত্রাংশগুলি হইতে কার্যধারা বোঝা যায়। তিনমাস সেবাকার্য চলিবার পর মহুলার সাহায্যকেন্দ্র অর্থাভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ হইতে অর্থ সাহায্য পৌছাইলে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতে থাকে। ১২ই জুন, ১৮৯৭ হইতে কান্দী মহকুমার গোকর্ণ থানায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে চাল ইত্যাদি বিতরণ আরম্ভ হয়। মহারাজের চিঠিতে স্বামীজী সেবাকার্যের বিস্তৃত বিবরণ পাইতেছিলেন। ১১।৭।৯৭ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী আলমবাজার মঠে লিখিলেন, "অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্যপ্রণালী ভাল বোধ হচ্চে না। মনে হয়, তারা একটি ছোট গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল বিতরণের কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচার কার্য হচ্চে—কৈ এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। জনসাধারণকে যদি আত্ম-নির্ভরশীল হতে শেখান না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না।"[১] মহারাজের নিজস্ব অভিমত ছিল—সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ বিস্তার করা। তিনি মনে করিতেন, এই

১ স্বামীজীর এই চিঠি ১৬ই জুলাই (১৮৯৭) পাইয়া মহারাজ পরদিন অখণ্ডানন্দকে লিখিলেন: "গতকাল স্বামীজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন famine relief-এর সাথে সাথে preaching যেন হয়, কোনমতে অন্যথা না হয়।······তুমি এ বিষয় খুব করিবে। যাহাতে পরমহংসদেবের life ও teaching প্রচার হয় তাহার যত্ন সর্বদা করিবে। তিনি আরও লিখিতেছেন যে একস্থানে কেন, অন্য অন্য স্থানে Gangadhar-রা কেন না যাইতেছে?"

সেবার দ্বার দিয়া জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ সুগম করিতে হইবে, যাহার ফলে জনসাধারণ ক্রমে আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হইতে শিখিবে এবং ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে। সেই কারণে দেখা যায় মহারাজ সেবাব্রতে নিযুক্ত অখণ্ডানন্দকে পুনরায় ২৭শে জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে লিখিয়াছেন, "Swamiji ক্রমাগত পত্রে লিখিতেছেন, যাহাতে Preaching হয়…এবং কার্য করা হয়। Trigunatitaকে ওখানে পাঠাইতেছি। তাহা হইলে তুমি আলাহিদা Centre খুলিতে পারিবে এবং কোনও স্থানে Preaching কার্য ভাল হইবে।" মহারাজ কার্যনীতি নিয়মন করিতে যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন তেমনি খুঁটিনাটি বিষয়েও পরামর্শ দিয়াছেন। সেবাকার্যে সহানুভূতিশীল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য উক্ত পত্রের শেষাংশে লিখিয়াছেন, "তখন Berhampur Bar-menদের invite করিবে যাহাতে present থাকে এবং সেজন্য Levinge Sahebকে thanks দিতে পার তো ভাল হয়। Tea party proposal—অতি উত্তম স্থানে সাজাইয়া decorated with flowers যদ্যপি হয় ত' ভাল।" সময়মত ত্রিগুণাতীতানন্দ তথায় প্রেরিত হইলেন, তিনি মিশনের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধন্যবাদ জানাইলেন। কলিকাতা মঠ হইতে প্রেরিত ও বহরমপুর শহর হইতে সংগৃহীত বস্ত্র দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সাহেবের হাত দিয়া বিতরণ করান হইল। সেদিন প্রায় এক হাজার নরনারী ও শিশুকে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসী সেবকবৃন্দ পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। মুর্শিদাবাদে আর্তত্রাণকার্য নভেম্বর মাসে সমাপ্ত হইলে দুঃস্থ অনাথ কয়েকটি শিশুকে লইয়া অখণ্ডানন্দ মহুলা গ্রামে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্যে প্রেরিত হইলেন। তিনি জেলাশাসক মিঃ বোনহাম কাস্টার (Mr. Bonham Caster)-এর সহিত পরামর্শ করিয়া ১৫ই আগস্ট হইতে বিরল গ্রামে সাহায্য বিতরণ শুরু করিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে চারমাস দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করিয়া তিনি জেলাশাসক ও স্থানীয় অধিবাসীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিলেন। বিরজানন্দ বৈদ্যনাথধাম দেওঘরে সেবাকার্যে নিযুক্ত হইলেন, দক্ষিণেশ্বরে অতিবৃষ্টি ও অনাহারে ক্লিষ্ট দুঃস্থদের সেবা করিতে লাগিলেন প্রকাশানন্দ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কল্যাণানন্দ কিষেণগড়ে যাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করিতে থাকেন এবং ঐ বৎসরের শেষভাগে পঞ্চাশজন বালক ও কুড়িজন বালিকাকে লইয়া

কিছুদিনের জন্য একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে অখণ্ডানন্দ ও সদানন্দ ভাগলপুরের ঘোঘা অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র সংগঠন করিলেন, খাণ্ডোয়াতে নিরঞ্জনানন্দ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যেখান হইতেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ পাওয়া গেল, সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানেই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া নরনারায়ণ সেবাযজ্ঞে প্রাণপাত করিতে থাকিলেন। এইভাবে দুঃখ-পীড়িত আর্ত মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া নবযুগের আদর্শ বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা দেশব্যাপী এক আলোড়ন তুলিলেন। যুবকদের মধ্যে বহুজনহিতায় শুভকর্মে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিল।

নানাস্থানে সেবাকার্য সংগঠন ছাড়াও দক্ষিণদেশে প্রচার ও সেবাকার্যের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে প্রেরিত হইলেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ বেদান্তপ্রচার স্থায়ীভাবে সংগঠন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। চতুর্দিকেই সাড়া পড়িয়াছিল। অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান—এই দানধর্মের মহিমা নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিল। কাজকর্মের ঝড়ঝাপটার মধ্যেও মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রীতি-ভালবাসা গুরুভ্রাতাদের সহিত যেভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সংঘের আদর্শ হইয়া আছে।[১] দক্ষিণদেশে কর্মরত রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন,[২] "তোমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে বড় বলবতী হচ্ছে, এখন কি করি বল দেখি? তুমি আমাকে ভুলে গেছ, না একটু একটু মনে আছে?" কয়েকমাস পরে তিনি আবার লিখিয়াছেন,[৩] "মোহান্ত! তুমি কবে কলিকাতায় আসিবে, মঠের জন্য যাহা খরিদ করা হইয়াছে তাহা একবার দেখিবে না?" সেবাকর্মে রত অখণ্ডানন্দকে দুর্গাপূজার পর মহারাজ লিখিলেন, "My Bejoya greetings, Pronams and কোলাকুলি to you." আরেক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছেন, "তোমাকে আর কি বলিব খুঁজিয়া

১ এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন, "বাল্য অবস্থায় যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে আসিয়া সিমলায় বাস করিয়াছিলেন তখন হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই ভাবটি বিশেষ পরিলক্ষিত হইত যে অপরের ভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখিয়া তিনি কথা কহিতেন। এইজন্য কেহ কখন তাঁহার নিন্দা করে নাই। যদি 'অজাতশত্রু' এই শব্দটি বর্তমানে কাহাকেও বলা যাইতে পারে তাহা হইলে রাখাল মহারাজকেই দেখিয়াছি যে তিনি যথার্থই অজাতশত্রু।" (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী/৩য় খণ্ড/৩১ পৃঃ)

২ ১৮।১২।৯৭ তারিখে লিখিত পত্র।

৩ ৭।৫।৯৮ তারিখে লিখিত পত্র।

পাইতেছি না, তুমি এখানে আসিলে grand reception এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।"

এইভাবে কার্যক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকটিত হইয়াছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বের সর্বতোমুখী প্রতিভা।

এদিকে মূলকেন্দ্র আলমবাজার মঠের কাজকর্ম সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী প্রেমানন্দের একটি পত্রে[১] সেই সময়কার মঠের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়—"মঠের নিয়মাদির কথা বোধহয় তুমি শুনিয়াছ। প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ধ্যান, তারপর স্তবপাঠ ধারাবাহিকরূপে, এক এক জন এক এক দিন পাঠ করে। তারপর Del Sarte[২] হয়, তৎপরে হালুয়া ভক্ষণ ইত্যাদি। আমি প্রত্যুষে উঠিয়া পূজাদি করিতেছি।...বিকালে ৫টা হইতে ৬টা হরিভায়া গীতা ক্লাশ করেন, আচার্যের ভাষ্য হইতেছে। তৃতীয় অধ্যায় আগামীকল্য আরম্ভ হইবে। আরতির পর পুনর্বার একঘন্টা ধ্যান ও পরে question class হয়, মধ্যে মধ্যে শ্রীপ্রভুর কথাও হইয়া থাকে এবং একদিন গান হয়। মোটের উপর মঠের কার্য এখন অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।" স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একটি পত্র[৩] হইতে তদানীন্তন মঠের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুটা ধারণা করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"মঠে উপস্থিত এই কতিপয় মহাপুরুষ আছেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য, ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, শ্রীমান নন্দলাল মুখোপাধ্যায়। পরে কলিকাতায় আছেন—স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, শ্রীমান কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা দুই এক দিবস মধ্যেই মঠে আসিবেন··· আরো বিদেশে এই মঠভুক্ত অনেক সাধু-মহাত্মা আছেন,···মঠে আরেকটি আছেন, সেইটি এই সকল মহাপুরুষের দাস।···মঠে একটি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমাদিগকে ভিক্ষা প্রস্তুত ও রন্ধন করিয়া দেন। আর একটি শূদ্র ব্যক্তি আছেন, তিনি মঠের যাবতীয় পরিচারকের কর্ম করেন।"

মঠের কাজকর্ম ও মিশনের কর্মসূচীর সাপ্তাহিক বিবরণ মহারাজ সংগ্রহ

১ ৯।৫।৯৭ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র।
২ একপ্রকারের লঘু ব্যায়াম বিশেষ।
৩ ২২।১।৯৮ তারিখে লিখিত পত্র

করিতেন এবং স্বামীজী বাহিরে থাকিলে তাঁহাকে বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইতেন। এই বিবরণীর মধ্যে "মঠে কি কি বিষয়ে পাঠ বা কে কি বিষয়ে lecture দিয়াছে, কে কি private study করিয়াছে"[১] তাহাও সংকলন করিতে হইত। সেই সময়কার একটি সাপ্তাহিক বিবরণী পাঠ করিলে অন্যতম কর্মক্ষেত্র মাদ্রাজ মঠের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মঠবাসী চারিজন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও মিঃ গুডউইন। কাজকর্মের প্রধান সহায়ক ভক্ত আলাসিঙ্গা। জুলাই মাসের (১৮৯৭) বিবরণীতে দৈনন্দিন কর্মসূচীর উল্লেখ রহিয়াছে।

সকাল ৫টা	: শুধু শনিবার—স্বাধ্যায়
৬টা	শয্যাত্যাগ
৬টা—৭টা	রামায়ণ পাঠ
৭টা—৯টা	অতিথি অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ
৯টা—১০টা	স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ ও আলোচনা
১০টা—১১-৩০ মিনিট	স্নান ও আহার
১১-৩০ মিঃ—১টা	বিশ্রাম
১টা—৪টা	স্বাধ্যায়
৪টা—৭টা	অতিথি অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ

কিন্তু বুঝিতে হইবে, প্রধান কেন্দ্র বেলুড়মঠে গৃহীত নিয়মকানুন অন্যান্য সকল কেন্দ্রকে মানিয়া চলিতে হইত। স্বামীজী একটি চিঠিতে মহারাজকে লিখিয়াছেন, "মঠের Rules & Regulations-এর ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙলা কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন ঐ প্রকার কার্য হয়, তাহা লিখিবে।"[২]

প্রচারকার্যে নিযুক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বেদান্তপ্রচারের কার্যসূচীও বিশেষ লক্ষণীয়। মঠে রবিবার দিন সন্ধ্যায় ভাগবত বা গীতা, মঙ্গল ও শুক্রবার সন্ধ্যায় উপনিষদ এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় ভজন গান হইত। ইহা ছাড়াও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রতি শনিবার বিকালে ওয়াই এম সি এ এবং সোমবার বিকালে ব্ল্যাক টাউনে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক ক্লাস লইতেন।

আমেরিকা হইতে স্বামী অভেদানন্দ, ইংল্যাণ্ড হইতে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের কার্যবিবরণী নিয়মিত পাঠাইতে থাকেন। চারিদিকে বিপুল কর্মযজ্ঞের

১ স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত মহারাজের পত্রাংশ হইতে।
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭।৩৩৯।

সূচনা দেখা গেল। এইভাবে সকল কর্মকেন্দ্রের সহিত এবং দেশে-বিদেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংস্থাপিত হওয়ায় রামকৃষ্ণ সংঘের কর্মসূচী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ নব-গঠিত মিশনের কর্মসূচী নিপুণভাবে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধু কর্মী, কিন্তু স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা এই সামান্য সংখ্যক রামকৃষ্ণ-সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের গৃহীত পরিকল্পনা দ্রুত কার্যে রূপদান করিবে। তিনি মহারাজকে একটি পত্রে লিখিলেন—"আমার এখন ঘড়িতে ঘোড়া ছোটে, আমি চাই তড়ি-ঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।" কোন কর্মীর কোন বিফলতা বা অভিপ্রেত নৈপুণ্য প্রদর্শনে অক্ষমতা প্রভৃতির কোন সংবাদ স্বামীজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি সময় সময় অস্থির হইয়া উঠিতেন ও দলনেতা মহারাজকে কখন কখন ইহার জন্য দায়ী করিতেন, কখনও বা কর্মিদের দোষ-ত্রুটির কৈফিয়ৎ তলব করিতেন। কাজকর্ম যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কর্মিগণও যাহাতে ভুল বুঝিয়া মনঃক্ষুণ্ণ না হয়, অথচ স্বামীজীর ইচ্ছাও যাহাতে প্রতিপালিত হয়—এইরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত মহারাজকে। এইসকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় মহারাজ যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অসীম স্থৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পরিস্ফুট হইবে।

কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে মাদ্রাজ মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের তীর্থযাত্রা ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন খবর স্বামীজীর কানে উঠিল; তিনি অবিলম্বে অনুসন্ধান করিবার জন্য মহারাজকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখিলেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ধীর স্থির মহারাজ মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন[১] "তোমরা অনেকগুলিন একসঙ্গে জমিয়াছ, দেখ, যেন তোমার কার্যের ক্ষতি না হয়। Duty is duty একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। খরচপত্র যেন বিবেচনা করিয়া করিবে। কোনমতে বেশী না হয়। কাহারও whims শুনিয়া চলিবে না। You need not care for the opinion of others; only do your own duty which is proper and best. স্বামীজী বড় অসন্তুষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা work

১ ১৮।১২।৯৭ তারিখের পত্র।

না করিয়া idle and aimlessly বেড়ায়।...তুমি কোনরূপ চক্ষুলজ্জা করিবে না; আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করিয়া কাহাকেও please করা যায় না।" অপরের মনে আঘাত না দিয়া স্বামীজীর আদেশ পালনের জন্য সুনিপুণ হস্তে কর্তব্য সম্পাদন মহারাজের 'রাজবুদ্ধি'র একটি উদাহরণ মাত্র। পরিচালন বিষয়ে মহারাজকে যে কতটা ঝক্কি পোহাইতে হইত তাহা মহারাজের ২০।২।১৯০২ তারিখে স্বামীজীকে লেখা চিঠি হইতেও অনুমান করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "অদ্য তোমার একখানি পত্র পাইলাম। পূর্ব পত্রের জবাব আমি Registered letter দ্বারা পাঠাইতেছি ২।১ দিনের মধ্যে। তুমি মনেও ওরকম স্থান দিও না যে শরৎ ওরূপ কথা লিখিয়াছে বা বলিয়াছে। আমার পত্র পেলে অনেকটা বুঝবে। আমি সেই পত্র পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।"

দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজার সময় উপস্থিত হইল। আলমবাজার মঠে ঘটে-পটে দুর্গাপূজার আয়োজন হইল। সুশীল মহারাজ পূজক, তন্ত্রধারক সুধীর মহারাজ। এদিকে নবরাত্রি উপলক্ষে বেদজ্ঞ তুরীয়ানন্দজী নয়দিন ধরিয়া চণ্ডীপাঠ করিলেন। পূজার কয়েকদিন আনন্দস্রোত বহিতে থাকিল। জপ ধ্যান পাঠ, সেইসঙ্গে তীব্র কাজকর্মের মধ্য দিয়া আলমবাজার মঠবাসিদের জীবনধারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে রূপায়ণ করিতে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন বিকাল ৫টায় (সেই সময় সুবোধানন্দ মঠবাসিদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিলেন) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। কলিকাতায় অনেক বাড়ী-ঘরের ক্ষতি হয়, কিছুসংখ্যক লোকও মারা যায়। ১৪ই জুন একটি পত্রে মহারাজ লিখিয়াছেন, "আর গত পরশ্ব এখানে এক অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া আমাদিগের মঠের অনেকস্থান ভগ্ন ও অনেকস্থানে crack হইয়াছে। এ বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে। এই কারণে আমরা সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি।" বস্তুতঃ পরদিন হইতেই একটি উপযুক্ত বাড়ীর সন্ধান আরম্ভ হয়।

মঠ ও মিশনের বিবিধ কাজকর্মের মধ্যে মহারাজের কর্মদক্ষতা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হইতে দেখিয়া আনন্দিত স্বামীজী তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া ৩০শে নভেম্বর (১৮৯৭) লিখিলেন, "এই ৮।৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ।" এত প্রকারের জটিল কাজকর্মের মধ্যে জড়িত থাকিলেও মহারাজ ছিলেন নির্লেপ; কর্মচাঞ্চল্যের বাহ্যিক চিহ্ন তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না; কর্তৃত্বের

অভিমান বা নেতৃত্বের দর্প তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্বামী সারদানন্দ পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঙ্ঘ-পরিচালনার দায়িত্ব অনেকাংশে গ্রহণ করিলে মহারাজের কর্মভার কিছুটা লাঘব হইয়াছিল। মহারাজও তাঁহার ন্যায় যোগ্য কর্মীকে পাইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বামী সারদানন্দের এই শুভ যোগাযোগ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মঠের নিজস্ব একটি ভূমিখণ্ড সংগ্রহের জন্য মহারাজ বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সন্নিকটে একটি ভূমিখণ্ড সকলের পছন্দ হইলেও কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিক্রেতার সর্তাদি মানিয়া লওয়া সম্ভবপর হইল না। আবার কাশীপুর উদ্যানবাটি[১] ক্রয় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কিন্তু মঠ কর্তৃপক্ষ সেই সময় সফল হইলেন না।[২] গঙ্গার উভয়তীরে কামারহাটি, কোন্নগর, বেলুড় প্রভৃতি অনেক স্থানেই জমির জন্য চেষ্টা করা হইল। অবশেষে বর্তমানে বেলুড়মঠ যে জমিতে অবস্থিত, সেই জমির সন্ধান পাওয়া গেল।[৩] মহারাজের একটি চিঠিতে জানিতে পারি,—"On the river-side at Belur a land of about 20 bighas has been entered into an agreement at about Rs. 40,000 for our Math purposes. If the deeds and documents of the said land be approved of by attorneys and other professional lawyers it will be purchased within a month. You keep it in private and need not give this out until we are able to purchase."[৪]

মঠ-কর্তৃপক্ষের তদানীন্তন পরিকল্পনাটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একটি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮) তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে

১ "বাস্তবিক এইটি আমাদের প্রথম মঠ"—স্বামীজী ও মহারাজ দুজনেই এই অভিমত পোষণ করিতেন।

২ মহাপুরুষের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না; ঐ উদ্যানবাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধিকারে আসে ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৬ খ্রীঃ।

৩ বেলুড় মঠের জমিখণ্ড সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপারে ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা/২য় খণ্ড/ পৃঃ ৪৮)

৪ ৫।২।৯৮ তারিখে শশী মহারাজকে লিখিত পত্রের অংশ।

লিখিয়াছেন, "মঠ নির্মাণের ব্যয়ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা দিয়া ১৮ বিঘা[১] উত্তম জমি গঙ্গার পশ্চিমকূলে ক্রয় করা হইয়াছে। আরও মঠের জন্য প্রায় একশত বিঘা জমি ঐ জমির চতুষ্পার্শে ক্রয় করিবার জন্য আছে। জমিতেই প্রায় ২ লক্ষ টাকা পড়িয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত মন্দির নির্মাণ করিতে প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা পড়িবে। এ সমস্ত বৃহদ্ব্যয়ভার একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কে লইতে সমর্থ!" আবার ৬ই মার্চ (১৮৯৮) তারিখে স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন (রামকৃষ্ণানন্দকে), "গতকল্য এই জায়গাটি ৩৯,০০০ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেত-পাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। দেখেশুনে লোকে অবাক্ হয়ে যাচ্ছে!" সেই সময়ে মঠ-কর্তৃপক্ষের কোন গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি ছিল না। স্বামীজীর এক বিদেশিনী শিষ্যা শ্রীমতী হেনরীয়েটা মূলারের অর্থানুকূল্যে মঠের উক্ত জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। অর্থ না থাকিলেও ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্রস্বরূপ স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী নেতৃবৃন্দ বিরাট ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন এবং যখন যেরূপ ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইতেছিলেন, সেইভাবে কার্যে অগ্রসর হইতেছিলেন।

নূতন সংগৃহীত জমি ছিল খুবই অসমতল, সেখানে নৌকা-মেরামত প্রভৃতি কার্য হইত। জমিখণ্ডের উত্তরাংশে দুইখানি ঘর ও দক্ষিণাংশে একখানি ঘর ছিল; উভয় অংশের সংযোগস্বরূপ একখানি লম্বা ঘর ছিল এবং উহার পূর্বে একটি বারান্দা গঙ্গার দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। ইহা ছাড়াও ভৃত্যদের বাসের জন্য বাড়ীর উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল আর একটি পৃথক ছোট বাড়ী।[২] উপস্থিত ঘরবাড়ী যাহা ছিল তাহা সম্প্রসারণপূর্বক বাসোপযোগী মঠ-গৃহ ও শ্রীজীর মন্দির নির্মাণ করিবার জন্য স্বামীজী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আইনবিদ্ কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি ও ঠাকুরের ভক্ত পণ্টুবাবুর পরামর্শে বেড়া দিয়া জমি ঘেরাও করা হইল। বাড়ীঘর তৈরীর ব্যাপারে আড়িয়াদহ-বাসী ইঞ্জিনিয়র রায় পি. সি. ব্যানার্জী বাহাদুরের সাহায্য লইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নির্মাণকার্য আরম্ভ করিলেন। মহারাজ ১৮ই জুন একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "নূতন মঠে থাকিবার মত পাঁচ ছয়টি ঘর প্রস্তুত হইবার

১. প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাপ Trust deed অনুযায়ী কমবেশী ২২ বিঘা।

২ শ্রীমতী ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা হইতে গৃহীত। এইসকল বাড়ীর সংস্কার ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছিল মিসেস ওলিবুলের অর্থানুকূল্যে।

জন্য কনট্রাকটারকে চুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিন মাসে প্রস্তুত হইয়া যাইবে। আগামী আশ্বিন মাসে মঠ সেখানে উঠিয়া যাইতে পারে।" মঠে রক্ষিত ডায়েরী হইতে দেখা যায়, মহারাজ প্রত্যেকদিন একবার, কোন কোন দিন একাধিকবার নূতন জমিতে আসিয়া কাজকর্ম তদারকি করিতেছেন।

আলমবাজার মঠবাড়ী বাসের প্রায় অনুপযুক্ত হওয়ায় ও নূতন জমিতে গৃহ-নির্মাণকার্যের তদারকি সুবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিয়া বেলুড়ে নূতন সংগৃহীত[1] জমির দক্ষিণে অতি নিকটে গঙ্গার ধারে নীলাম্বর মুখার্জীর উদ্যানবাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮) এই উদ্যানবাড়ীতে মঠ সাময়িক-ভাবে স্থানান্তরিত করা হইল। ধ্যান-ভজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সেবাকার্যের সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে মঠবাড়ী প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন সন্নিকট হইল, জন্মোৎসবের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের তদানীন্তন পরিচালক ত্রৈলোক্যবাবু কতকগুলি সর্ত আরোপ করিলেন, রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া সম্ভব হইল না। ফলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে অন্যান্যবারের মত সাধারণ উৎসব করা গেল না। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অশেষ পরিশ্রম করিয়া গঙ্গার পশ্চিমকূলে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে সাধারণ উৎসবের আয়োজন করিলেন। নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে অবস্থিত মঠে মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিথিপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। উৎসবের ক্ষুদ্র বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দের একটি পত্রাংশ হইতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্র-ধারকের কাজ করিয়াছিল। ঐদিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্র-নাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।

---

১ জমি কেনার বায়না করা হয় ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮। জমি রেজেস্ট্রি করা হয় ৫ই মার্চ, ১৮৯৮।

ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায়, এক অপূর্ব শোভা হইয়াছিল। আমরা অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত পূজা হোমাদি হইয়াছিল। ঐদিন গঙ্গা ও সুরেন মহুলা হইতে একমণ ওজনের দুই ছানাবড়া লইয়া হাজির।"[১] ঐ দিনই স্বামীজী ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রায় পঞ্চাশজনের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পরের রবিবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী গঙ্গাতীরে পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় ঠাকুরবাড়ী নির্মাণের জন্য যে জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই জমিতে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, অসংখ্য ভক্তের সমাগমে উৎসব হইল আনন্দমুখর। অগণিত দেশীয় নরনারী ছাড়াও ম্যাক্‌লাউড্, ওলিবুল, মূলার ও মার্গারেট—এই সকল বিদেশিনী ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসবক্ষেত্র প্রকৃতই সর্বজনীনরূপ ধারণ করিল। ঐদিনে ত্রৈলোক্যবাবু প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণেও একটি সাধারণ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপর একটি কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন[২] প্রাতঃকালে স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাটীতে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকায়

১ বেলুড় হইতে ৬।৩।১৮৯৮ তারিখে শশী মহারাজকে লিখিত।

২ স্বামীজী ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ তারিখে রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিয়াছিলেন, "যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।" ৬।৩।১৮৯৮ তারিখের প্রাগুক্ত চিঠিতে প্রেমানন্দজী লিখিয়াছেন, "গত রবিবার দাঁদের বাড়ীতে মহোৎসব অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় অন্য বছরের তুল্য। ঐদিন নূতন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল।" এই দিনটি ছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (৪র্থ সং, পৃঃ ১১০) অনুসারে ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে "নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা" করিয়াছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার History of the Ramakrishna Math & Mission (পৃঃ ১৩০) ও 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (৩য় ভাগ, ২ সং, পৃঃ ১৭৯-৮১) এই তারিখটি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপরি উক্ত দুইখানি পত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী নূতন মঠের জমিতে যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মঠ ডায়েরীতে পাওয়া যায়, "9th Dec. 1898 : Thakoor was taken to the new Math and the new Math was constructed". সেদিন সম্ভবতঃনব-নির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান ও পূজার পর তিনি আত্মারামের কৌটাটি[১] দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া মঠের জন্য প্রস্তাবিত ভূমিখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। মঠবাসিগণ ও ভক্তবৃন্দ অনুগামী হইলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে গঙ্গার তটভূমি আনন্দমুখরিত হইল। যাইতে যাইতে স্বামীজী বলিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুঠিরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে ক'রে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"[২]

মঠের জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে একটি আসনের উপর 'আত্মারামের কৌটা' স্থাপন করিয়া স্বামীজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তিনি নিজেই পূজা ও হোম করিয়া পায়সান্ন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে এ-কে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন।"[৩] মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই ঐরূপে প্রার্থনা করিলেন। পূজা সমাপনান্তে 'আত্মারামের কৌটা' পূর্বস্থানে ফিরাইয়া আনা হইল। এইরূপে বেলুড়গ্রামে প্রতিষ্ঠা হইল নূতন যুগের ধর্মক্ষেত্র।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষভাগ। কলিকাতা মহানগরীতে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। মৃত্যুর কবলে যত মানুষ না পড়িল, প্লেগের আতঙ্কে এবং সরকারের কঠোর বিধি ব্যবস্থার ভয়ে তত সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হইল। দলে দলে মানুষ শহরত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। মহারাজ ২৯শে এপ্রিল স্বামীজীকে লিখিয়া জানাইলেন, "এখন কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পালাইতেছে। একটা খুব panic হইয়াছে। বোধহয় ২।৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে। প্লেগরোগের বিভীষিকা যে কিরূপ হইয়াছিল মাস্টার

১ তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত-ভস্মাস্থি 'আত্মারামের কৌটা' বা 'শ্রীজী' নামে পরিচিত ছিল।

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ১১১।

৩ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ১১২।

মশাই-এর (শ্রীম) একটি চিঠি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "We continue to be under the cold shadow of the plague regulations"।[১] বাগবাজার অঞ্চলে রোগের ব্যাপক আকার দেখিয়া শ্রীমাকে জয়রামবাটী পাঠান হইল।[২] টেলিগ্রামে কলিকাতা নগরবাসীদের দুর্দশার সংবাদ শুনিয়া স্বামীজী দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন ৩রা মে। প্রয়োজন হইলে নূতন কেনা মঠের জমি বিক্রয় করিয়াও বিপন্ন মানুষের সেবা করিতে হইবে, স্বামীজীর এই পণ জানিতে পারিয়া সন্ন্যাসিবর্গ সেবার কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হিন্দী ও বাংলাতে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া জনসাধারণের করণীয় নির্দেশসমূহ বিতরিত হইল, জনগণকে ভরসা দেওয়া হইল—রামকৃষ্ণ মিশন তাহাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে সাধুসন্ন্যাসীরা নামিয়া পড়িলেন। বিশেষজ্ঞ Dr. Haffkein's রিপোর্ট অনুযায়ী রুগীদের জন্য পৃথক বাসস্থানের (Segregation Camp) ব্যবস্থা করা হইল। প্লেগের প্রকোপ বিশেষ বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং সরকারের কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। মহারাজ নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিপুণ হস্তে মঠের তহবিল পরিচালনা করিবার ফলে মঠবিক্রয়ের বিপজ্জনক প্রস্তাব আর কখনও ওঠে নাই। নিশ্চিন্ত স্বামীজী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ এবং মিসেস্ বুল, নিবেদিতা, মিস্ ম্যাকলাউড্ ও মিসেস প্যাটারসনকে লইয়া ১১ই মে যাত্রা করিলেন আলমোড়ার উদ্দেশ্যে।

স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্লেগ সেবাকার্যের বাকী অংশ পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া জানাইলেন। স্বামীজী ২০শে মে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে তাঁহাকে লিখিলেন: ওখানে যে দু' একটি Case এক্ষণে হইতেছে তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং Ward-এ Ward-এ হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। এ সকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে, তবে বাগবাজারে কে কি বলেছে তাহা Public Opinion নহে জানিবে।

১ ১৭।৫।৯৮ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র।

২ শ্রীমা জয়রামবাটী যাত্রা করেন ২১শে জুন, ১৮৯৮। প্লেগরোগের জন্যই তিনি জয়রামবাটী গিয়াছিলেন কিনা, এ বিষয়ে দ্বিমত আছে।

…আবশ্যক কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়—এই সকল দেখিয়া কাজ করিবে।" অল্প সময়ের মধ্যে প্লেগরোগের ভীতি সহর হইতে বিদূরিত হইল। পর বৎসর পুনরায় কলিকাতায় প্লেগরোগ দেখা দিলে মঠের সন্ন্যাসিগণ সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন ৩১শে মার্চ হইতে। সেবাকার্য পরিচালনার জন্য একটি ছোট পরিচালনা কমিটি গঠিত হইল। ভগিনী নিবেদিতা তাহার সম্পাদিকা নিযুক্ত হইলেন। স্বামী সদানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাধুকর্মীরা, ভগিনী নিবেদিতা ও যুবক ছাত্রদল সহরের রাস্তায় গলিতে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল পরিষ্কারের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রুগীদের সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। এইবারেও অল্প সময়ের মধ্যে প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হইল[১], কিন্তু কলিকাতাবাসীর নিকট স্থায়ী হইয়া রহিল ত্যাগব্রতের একটি উজ্জ্বল স্মৃতি।

বেলুড়ের নূতন ভূমিখণ্ডের অধিকার লাভ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন (৭ই এপ্রিল) শ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানস্থিত মঠে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও গোলাপ-মা। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র মঠে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল। শ্রীমা অবতরণ করিলে সন্ন্যাসীরা তাঁহার শ্রীচরণ ধুইয়া তাঁহাকে ঠাকুরঘরের দালানে লইয়া গেলেন এবং একে একে সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীমা নিজহস্তে পূজা করিলেন ও ভোগ নিবেদন করিলেন। আহারের পর বিশ্রাম করিয়া বিকাল ৪টার সময় শ্রীমা ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় সেবক কৃষ্ণলাল আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের সানুনয় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন, "মা যাবার আগে যেন মঠের নূতন জমিতে একবার পদধূলি দিয়ে যান।" শ্রীমা নৌকা করিয়া অগ্রসর হইলেন। ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড্ তখন সেখানে বাস করিতেন। তাঁহারা সাগ্রহে শ্রীমাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূমিখণ্ড দেখাইতে লাগিলেন। আহ্লাদিতা সঙ্ঘজননী মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হ'ল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।" অতঃপর শ্রীমা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অকস্মাৎ স্বামীজী সদানন্দকে লইয়া লাহোর হইতে সোজা ১৮ই অক্টোবর

১ ১৫ই এপ্রিল নাগাদ সেবাকার্যের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে ভগিনী নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামীজী। ৩০শে এপ্রিল শিয়ালদহ অঞ্চলে সেবা কাজ শেষ হয়।

নীলাম্বরবাবুর বাটীতে অবস্থিত মঠে উপস্থিত হইলেন। আনন্দের সাড়া পড়িল কিন্তু স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও গভীর অন্তর্মুখ ভাব দেখিয়া মহারাজের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইল। দুই তিন দিন পরে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মঠে আসিলে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে বসে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে নামাতে চেষ্টা করিস।" শিষ্য স্বামীজীকে দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ৺অমরনাথ দর্শনের পর হইতে শিব যেন তাঁহার মস্তকে চাপিয়া বসিয়াছেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামীজী সুস্থ হইলেন। দুর্গাপূজা আসিল, মঠে আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গ উঠিল। নবরাত্রিব্যাপী চণ্ডীপাঠ ও পটে পূজার আয়োজন হইল। মহাসপ্তমীর দিন স্বামীজী নিজহস্তে হোম করিলেন। সেইদিনই তিনি কাশ্মীরে থাকাকালীন তাঁর রচিত গভীর ভাবদ্যোতক মৃত্যুরূপা মাতা (Kali the Mother) পাঠ করিয়া সকলকে শোনাইলেন। মহাষ্টমীর দিন তিনি মহারাজ ও বিমলানন্দকে লইয়া বাগবাজারে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণবন্দনা করিলেন। পরদিন মহানবমীতে 'সপ্তসতী' হোম অনুষ্ঠিত হইল, স্বামীজীও যোগদান করিলেন। এইরূপে দুর্গাপূজা মহানন্দে অতিবাহিত হইল।

নভেম্বরের প্রথম ভাগে নূতন জমিতে ঠাকুরের পূজাগৃহ, রন্ধনশালা, সাধুদের বাসস্থানাদির নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিল। ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮ শ্রীমা নবনির্মিত মঠে শুভ পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে আনিলেন তাঁহার নিত্য-পূজিত ঠাকুরের পটটি। কয়েকজন মহিলা ভক্তও শ্রীমায়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীমা স্বয়ং নূতন বাড়ীতে পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাকার্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করিলেন। প্রসাদ ধারণ করিয়া সকলে প্রচুর আনন্দ পাইলেন। শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গীদের যত্নসহকারে ভোজন করান হইল। সঙ্ঘ-জননীর প্রাণঢালা আশীর্বাদ লাভ করিয়া সন্তানদেরও আনন্দ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য শ্রীমায়ের পরবর্তীকালের একটি উক্তি, "বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা

হত!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।"[১] নীলাম্বরবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া মঠ নিজস্ব জমির উপর নির্মিত গৃহে উঠিয়া আসিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা প্রচার ও প্রসারের প্রধান কেন্দ্র নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন ও পরমানন্দ বোধ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে স্বামীজী একদিন নূতন মঠবাড়ীতে মহারাজকে পরিতোষ সহকারে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইলেন। তিনি আবার হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "রাজা, তোর আদর তিনিই জানতেন, আমরা কি জানি যে তোর আদর করব?" অপরূপ সেই দৃশ্য দেখিয়া মঠবাসিগণ মোহিত হইলেন।

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর। তাঁহাকে শ্রীমায়ের ১০/২ নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নিবেদিতার ভাবী কর্মকেন্দ্রের জন্য নিকটবর্তী ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। নিবেদিতা তাঁহার ভবিষ্যতের কর্মসূচী লইয়া মহারাজের সহিত প্রায়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১২ই নভেম্বর বিকালে বলরামবাবুর বাড়ীতে একটি ঘরোয়া সভার আয়োজন হইল। সভাতে স্বামীজী, মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি যোগদান করিলেন।[২] ভগিনী নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কার্যসূচী নিবেদন করিলেন। সেই কার্যসূচী সাদরে গৃহীত হইল।

১৩ই নভেম্বর রবিবার ৺শ্যামাপূজার দিন শ্রীমা নিবেদিতার বাড়ীতে স্বহস্তে পূজা করিলেন। পূজান্তে তিনি নিবেদিতার প্রচেষ্টাকে প্রাণঢালা আশীর্বাদ জানাইলেন, নিবেদিতা ও আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। এই আনন্দোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন স্বামীজী, মহারাজ ও শরৎ মহারাজ। পরদিন সোমবার পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়েকে লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইল। স্বামীজী, মহারাজ, বিরজানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ পুনরায় সেদিন আসিয়া তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। দেশের নারীজাগরণের আন্দোলনের এই সূচনা নিবেদিতাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

১ শ্রীশ্রীমায়েরকথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৮-৪৯। নবনির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠার পর শ্রীমা "নূতন মঠ" দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮। (মঠ ডায়েরী)

২ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা: ভগিনী নিবেদিতা (১৯৭৬), পৃঃ ১২৩

রামকৃষ্ণ-প্রচার প্রসারলাভ করিতেছে, চারিদিকে চলিয়াছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। আনন্দ-উৎসবে কর্মের গতিশীলতায় পরিপূর্ণ দিনগুলি। মাঝে ঘটে দুর্ঘটনা, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত দেহত্যাগ করিলেন ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৯৯। স্বামী যোগানন্দ,[১] যাঁহাকে জন্মান্তরে 'কৃষ্ণসখা অর্জুন' বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চিহ্নিত করিয়াছিলেন, ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ১০।২ বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে শেষ রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন। বহুবিধ চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষা চলিল, কিন্তু সকল প্রচেষ্টা বিফল করিয়া স্বামী যোগানন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ (১৩০৬ সালের ১৫ই চৈত্র) মহাসমাধিতে লীন হইলেন। শ্রীমা তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবকের তিরোধানে কাঁদিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন, "বাড়ীর একখানি ইঁট খসল; এবার সব যাবে।" গুরুভ্রাতাগণ বেদনাহত হইলেন। মর্মাহত মহারাজ প্রিয় গুরুভ্রাতার বিরহে কয়েকদিন মৌন ছিলেন এবং চারিমাস পর্যন্ত নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন।

কাজকর্মের মধ্যে নিমগ্ন স্বামীজীর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছিল না। চিকিৎসাদিতেও বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। মহারাজ ও অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাদের অনুরোধে স্বামীজী পুনরায় বিদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন, সঙ্গে চলিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। যাত্রার দিন মাতা-ঠাকুরানী মধ্যাহ্নে তাঁহার সন্তানদের একটি ভোজ দেন এবং যাত্রার পূর্বে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করেন। ঐ দিনই স্বামীজী একটি অর্পণনামায় অপর গুরুভ্রাতাদের সাক্ষী রাখিয়া মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি মহারাজের নামে লিখিয়া দিলেন। অর্পণনামায় লিখিত ছিল,

"I, Swami Vivekananda of Belur Math, Dist. Howrah, Bengal herewith bequeth all I possess in land, buildings, Governmental securities, cash or otherwise to my Gurubhai Swami Brahmananda of the Belur Math, Howrah District, Bengal.

১ স্বামী যোগানন্দ নূতন মঠের জমিতে অনেকবার বিভিন্ন কাজকর্মে এবং একবার বনভোজন করিতেও আসিয়াছিলেন। ইহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরী হইতে জানা যায়। নূতন বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত হইবার পর তিনি বেলুড়ে যাইতে পারেন নাই। একদিন অসুস্থ স্বামী যোগানন্দকে নৌকা করিয়া গঙ্গা হইতে নূতন মঠবাড়ী দেখান হয়।

Also, this revokes and nullifies all my will and testaments that have preceded this my last dated the 20th June, 1899."[১]

Swami Vivekananda

Witnesses :

Swami Saradananda
Swami Shivananda
Swami Turiananda
Swami Sadananda
Swami Trigunatita
Sri Hariprasanna Chatterjee.

মহারাজ স্বামীজীর প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারিলেন না।[২] তিনি স্বামীজীকে তাঁহার বক্তব্য একটি চিঠিতে নিবেদন করিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীজীও 'রাজার' পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল বেলুড় মঠের সম্পত্তি কয়েকজন গুরুভ্রাতা দ্বারা গঠিত ট্রাস্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিবে। তদনুযায়ী আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা হইল। স্বামীজী প্যারিস নগরীতে বৃটিশ কনসালের সম্মুখে দলিলে স্বাক্ষর করিয়া কাগজপত্র বেলুড়মঠে

১ অর্পণনামার বঙ্গানুবাদ :

"বাঙলা দেশের হাওড়া জিলার বেলুড় মঠের স্বামী বিবেকানন্দ আমি, জমি গৃহ-বাড়ী সরকারী সিকিউরিটী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সকল কিছু আমার গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ, হাওড়া জিলার বেলুড়মঠে তিনি বাস করেন, তাঁহাকে দান করিতেছি।

আজ ২০শে জুন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার আমার সমস্ত অর্পণনামাদি ইহার দ্বারা খারিজ করা হইল।"

স্বামী বিবেকানন্দ

সাক্ষীদাতাদের স্বাক্ষর :

স্বামী সারদানন্দ
স্বামী শিবানন্দ
স্বামী তুরীয়ানন্দ
স্বামী সদানন্দ
স্বামী ত্রিগুণাতীত
শ্রীহরিপ্রসন্ন চ্যাটার্জী।

২ ইহারও পূর্বে স্বামীজী মারী হইতে ১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখে মহারাজকে লিখিয়াছিলেন : "পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজিষ্ট্রি করে এস যে, in case আমি তুমি মরে যাই ত হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যা কিছু সব পাবে।" বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন প্রয়োজন হয় নাই।

পাঠাইয়া দিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট প্যারিস হইতে স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখিলেন, "ট্রাস্টের দলিলগুলি, দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল। সুতরাং আমি বৃটিশ কনসালের অফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও ত্যাগ আমি করেছি। এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।" সেই সময়ে স্বামীজী একটি চিঠি লেখেন তুরীয়ানন্দকে, ঐ চিঠির অংশবিশেষও লক্ষণীয়—"কাজেই সব লিখে পড়ে আলাদা করে দিয়েছি।······গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কর্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন, এ তাঁর কাজ—প্রাণে ধরে সব সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব তা আমার কাজ।" স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ডীড্ (Trust deed) রেজিস্ট্রী করা হইল। ট্রাস্টী নিযুক্ত হইলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ত্যাগী সন্তান—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ। সঙ্ঘের শাসনযন্ত্র পরিচালনার সরাসরি দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বামীজী একটি প্রধান দায় হইতে মুক্ত হইলেন; বোধ করিলেন, তাঁহার অবর্তমানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে সঙ্ঘ সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে, তিনি নিজহস্তে সেই স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিয়া শান্তি পাইলেন। সঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের একটি স্থায়ী ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়াতে মহারাজ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত যুগধর্ম সংস্থাপন ও ক্রমবিস্তার নূতন সংগঠিত ট্রাস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য রূপায়ণে নিরূপিত অন্যান্য কর্মপদ্ধতির মধ্যে ইহাও উল্লিখিত হইল যে, প্রতি দুই বৎসর অন্তর ট্রাস্টীগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে অধ্যক্ষ বা সভাপতি নির্বাচন করিবেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ট্রাস্ট বডির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। নিয়মানুসারে

সকলে ব্যালট ভোটে অধ্যক্ষ নির্বাচন করিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সর্বাধিক ভোটে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হইলেন স্বামী সারদানন্দ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টীগণের সভায় মহারাজ পুনরায় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অভেদানন্দের উপস্থিতিতে ট্রাস্টীগণ মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মহারাজ আজীবন সংঘাধ্যক্ষ পদে বহাল থাকিবেন।[১]

রামকৃষ্ণ-সংঘের নিজস্ব ঠাঁই হইয়াছে, সংগঠনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় আঁটঘাটও বাধা হইয়াছে, তবুও সঙ্ঘের প্রচারশক্তি ধর্মপ্রাণতা বলিষ্ঠ গতিতে সম্প্রসারিত হইতে সক্ষম কিনা সেই বিষয়ে স্বামীজী ও মহারাজ চিন্তামুক্ত হইতে পারিতেছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের যোগ্য আধাররূপে যাহাতে সঙ্ঘ কার্য করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সঙ্ঘের সংগঠন-ব্যবস্থা নিখুঁত ও দৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অন্যান্য ধর্মসঙ্ঘের পরিণতি পর্যালোচনা করিয়া এবং তদানীন্তন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করিবে, ইহাই ছিল স্বামীজীর চিন্তা। স্বামীজী তাঁহার ভাবনা উন্মোচিত করিয়াছেন মহারাজকে লিখিত একটি চিঠিতে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার কেবল ভয় এই যে এখন ত' একরকম খাড়া করা গেল, অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায় তাই দিনরাত আমার চিন্তা।"

স্বামীজী তাঁহার চিন্তার বোঝা, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব অভিমত বা বুদ্ধি-পরামর্শ 'রাজা'কে পাঠাইতেন এবং পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন। অনেক সময় তিনি নিজস্ব অভিমত জানাইয়া শেষে লিখিতেন বা বলিতেন, 'তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।' গুণগ্রাহী স্বামীজী 'রাজা'র অভিমত চাহিতেন, তিনি কোন মতামত পাঠাইলে উহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেন। কখনও বা তাঁহার মত অপেক্ষা মহারাজের মত উৎকৃষ্টতর মনে হইলে সাদরে উহা স্বীকার করিতেন।

১ ট্রাস্টীগণের ঐ সিদ্ধান্ত আইনরক্ষার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি ইতিবৃত্ত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা মহারাজ প্রিয় গুরুভ্রাতা অভেদানন্দকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া স্বামী শিবানন্দ 'মহারাজে'র নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বামীজীর আদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। স্বামীজীর এই আদেশ ছিল যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আজীবন সংঘাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অগত্যা মহারাজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীনগর হইতে ১৭।৭।৯৮ তারিখে স্বামীজী রাজা-মহারাজকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "টাকাকড়ি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে···আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আমার policy ভুল, তোমারটিই ঠিক··· about helping others, অর্থাৎ একেবারে বেশী বেশী দিলে লোকে, grateful না হইয়া উল্টা ঠাওরায় যে, একটা বোকা বেশ পাওয়া গেছে। I always lost sight of the demoralising influence of charity on receivers. দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয় তাহা হইতে একটুও এদিক-ওদিক করিবার অধিকার আমার নাই।" এইভাবে স্বামীজী ও মহারাজ পরস্পর যুক্তি-পরামর্শ করিয়া সংঘ-সংগঠনের প্রতি পদক্ষেপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে, মহারাজ ছিলেন সর্বান্তঃকরণে স্বামীজীর চির-অনুগত। কেহ স্বামীজীর অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করিলে মহারাজ নির্দ্বিধায় বলিতেন, "এটা স্বামীজীর মঠ। তাঁর ইচ্ছানুসারে চলতে না পারলে মঠ ছেড়ে চলে যেতে পার।"[১]

প্রচারের দ্বারা ধর্ম-সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি সক্রিয় ও বলবতী থাকে। সেইজন্য প্রথম হইতেই নবযুগের ভাব ও আদর্শ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। স্বামীজী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক পুনরভ্যুত্থানের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিবানন্দ কলম্বো যাইয়া গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সাধারণভাবে ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণ দেশে নূতন যুগের ভাবাদর্শ অক্লান্তভাবে প্রচার করিতেছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রচারকর্ম ও অর্থসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানানন্দ ও শুদ্ধানন্দ আম্বালায় প্রেরিত হইলেন। একই উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরই বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ পূর্ববঙ্গে যাইয়া ঢাকা সহরে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া এক আলোড়নের সৃষ্টি করিলেন। মহারাজ প্রচারকদের বারংবার বলিতেন,

১ Swami Asokananda : Swami Brahmananda (1970), p. 35

"যখন কোন বক্তৃতা দিবে তখন পরমহংসদেবের কথা যত বলতে পার বলবে, কারণ উহা অতি সহজ ব্যাখ্যা।" প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে ব্যাখ্যাত ভারতীয় শাস্ত্রবাণী জনসাধারণ সাদরে মাথায় তুলিয়া লইল। কলিকাতা মহানগরীতেও প্রচারকার্য তীব্র গতিতে চলিতে লাগিল। বলরাম-ভবনে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভা ছাড়াও ভগিনী নিবেদিতার জনপ্রিয় বক্তৃতামালা, স্বামীজীর শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দের[১] বোম্বাই, কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতাগুলিতে নূতন যুগের উপযোগী ভাবান্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপক ভাষণগুলি ছাড়াও স্বামী সারদানন্দের প্রশান্ত গম্ভীর ভাষণগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববন্যা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ যুবকদের হৃদয়ে আলোড়ন তুলিল। আহূত হইয়া স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৯ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে সাফল্যের সহিত প্রচারকার্য সমাধা করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন পরবর্তী জানুয়ারী মাসের ১৩ই তারিখে। তিনি সংবাদ আনিলেন যে ভক্তপ্রবর সাধু নাগ মহাশয় ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ (১৩ই পৌষ, ১৩০৬) তারিখে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। অঙ্গে রোমাঞ্চ পুলকাদি বিস্ফুরণপূর্বক তাঁহার দেহত্যাগের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া সকলে রামকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যের জয়গান করিলেন।

স্বামীজী বিদেশে যাইয়া কয়েকমাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ আনন্দিত হইলেন। মঠ ও মিশনের কাজ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। নবাগত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সাধুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নির্মলানন্দকে দিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ফুটবল, হাতে-তৈরী ক্রিকেট ব্যাট-বল, প্যারালাল বার ইত্যাদি খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চা প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে মঠবাসিদের স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহারাজ নিজে প্রতিদিন নিয়মিত শারীরিক চর্চা করিতেন এবং তাঁহার শেষ অসুখের পূর্ব পর্যন্ত এই অভ্যাস অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশে থাকাকালীন মঠ ও মিশনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য

১ শ্রীমতী মেরী লুই আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল স্বামী অভয়ানন্দ।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সম্মুখে মানস-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। সন্ন্যাসী জীবনে তপস্যাই শক্তির উৎস। মহারাজ জপধ্যান ও শাস্ত্র-পাঠের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। উৎসাহের প্রাবল্যে সারা--রাত্রিব্যাপী জপধ্যানের কর্মসূচী গৃহীত হইল ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে (১৮৯৯)। নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যেই উহা সীমিত রহিল না। স্বামী সারদানন্দও উহাতে যোগদান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব উপস্থিত হইল। ৪ঠা মার্চ (১৯০০) তিথিপূজার দিন পূজা, হোম কীর্তনে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইল। ভোররাত্রে ব্রহ্মচারী সত্যকামকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করা হইল। পরবর্তী রবিবার মঠের নিজস্ব জমিতে মহাসমারোহের সহিত সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। মঠপ্রাঙ্গণে প্রায় ৩০টি কীর্তনীয়া দল ও হাজার পঁচিশ লোকের সমাগমে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভাষণ দানে কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে একটি স্মরণীয় বাৎসরিক উৎসবে পরিগণিত হইল। কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর বাগানের উৎসবাদিও মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইল।[১]

শারদোৎসব উপস্থিত হইল। পটে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইল। পূজা করিলেন বোধানন্দ, তন্ত্রধারক ছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু আনন্দ জমিতে পারিল না, কারণ সপ্তাহব্যাপী অভূতপূর্ব বারিবর্ষণে কলিকাতা সহর প্লাবিত হইয়াছিল। সদানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ সেবক কর্মিদের সাহায্য লইয়া দুর্গতদের আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন।

মহারাজের পরিচালনায় মঠের যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ধর্মপ্রতিষ্ঠান নহে এই দাবী করিয়া বালী মিউনিসিপ্যালিটি মঠের জমির উপর অনেক টাকা কর ধার্য করিল। শুধু তদানীন্তন সময়ের কর-ভারই নহে, ভবিষ্যতে উহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে বিবেচনা করিয়া মঠ-কর্তৃপক্ষ মামলা রুজু করিলেন। মঠের ডায়েরী হইতে দেখা যায়, এই মামলার তদারকি করিতে মহারাজ কখনও উকিলের বাড়ী, কখনও হাওড়া কোর্টে, কখনও কলিকাতা হাইকোর্টে যাতায়াত করিয়াছেন। ৫।১২।১৯০০

১ প্রেমানন্দজীর এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে শশী মহারাজকে লেখা পত্রের অংশঃ "রামবাবুর বাগানে আগামী শুক্রবার মহোৎসব হবে। সমস্ত কাজকর্ম তথায় রাখালের পরামর্শ অনুসারে হচ্ছে। তারা সবাই রাখালকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে।"

তারিখে স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "শ্রীযুত রাখাল ভায়ার শরীরও অসুস্থ। হয় পেট-খারাপ হয়, নয় সর্দি—একটা না একটা আছেই। কোথাও যাবার ভারী ইচ্ছা ও দরকার, কিন্তু যাবার যো নাই, মকদ্দমার জন্য। জায়গা হলেই মামলা সঙ্গে সঙ্গে। Municipality tax ধরেছে প্রায় কিছু কম দুই শত সাত টাকা। আমরা বলেছি Public place of worship—এখানে tax হবে না। কাজেই মামলা। এখন হচ্ছে হুগলীতে। রাখাল এই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন।" শেষ পর্যন্ত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পূর্বদিন আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হইল। মঠভূমি নিষ্কর ঘোষিত হইল। এইসকল নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও মহারাজের ফুল গাছের সখ মঠপ্রাঙ্গণে বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া শোভাবর্ধন করিয়াছিল। প্রাগুক্ত পত্রেই স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, "নানা জাতের গোলাপ বাগানে হয়েছে। কিছুদিন পরেই খুব ফুল হবে। রাখাল ও গোপাল-দাদার (অদ্বৈতানন্দ) গোলাপের উপর ভারী নজর।" কয়েকমাস পূর্বে আর একটি পত্রে স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছিলেন, "গোপালদার গোলাপে ভারী সখ্, আর রাখালের সখ্ কেনায় (Canna)। রকমারী কেনা যোগাড় হয়েছে। বাগান থেকে সব ফুল হয়।"[১]

সঙ্ঘজীবনের বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে বিকশিত হইতেছিল; অন্যান্য কাজ-কর্মের সহিত মঠবাসীদের মধ্যে নিয়মিত শাস্ত্রাদি-পাঠ ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। বিদেশ-যাত্রার পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দের উপর এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল। স্বামী সারদানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া এই বিভাগটির দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন। বিধিবদ্ধভাবে শাস্ত্রাদি পাঠ ছাড়াও প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। মহারাজ স্বয়ং এই আসরে কয়েকবার ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজের আলোচনার সামান্য অংশ 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রথম পাদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভের নিদর্শন হিসাবে তিনটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশন গৌরবের বিষয়। সঙ্ঘের প্রথম মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদিন্' মাদ্রাজ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় এবং স্বদেশে ও বিদেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত এই চিঠির আনুমানিক সময় এপ্রিল, ১৯০০ খৃঃ।

জুলাই হইতে ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিক পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পত্রিকার সম্পাদক রাজম্ আয়ারের[১] অকালে মৃত্যু হইলে পত্রিকার প্রকাশন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। পুনরায় ঐ বৎসর আগস্ট মাসে আলমোড়ায় থমসন হাউস হইতে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে এবং কয়েকমাস পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ঐ প্রকাশন কার্য চলিতে থাকে। কলিকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় সঙ্ঘের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী জন্মলাভ করে এবং অল্পকালের মধ্যেই তদানীন্তন বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, তথা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের অগ্নিগর্ভ বাণী বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকাদি, বক্তৃতার মাধ্যমে দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাতের ১৩ দিন পরে ১৮৭৫ সনের ২৮শে মার্চ 'ইণ্ডিয়ন মিরর' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাঠকদের সহিত সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়া দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই 'ধর্মতত্ত্ব' 'ইণ্ডিয়ন মিরর' 'সানডে মিরর' 'নিউ ডিস্পেনসেশন', 'সুলভ সমাচার' 'পরিচারিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র তাঁহার জীবনকাহিনী ও প্রাণস্পর্শী বাণী প্রকাশ করিতে থাকে। তাঁহার তিরোভাবের পরে এসকল পত্র-পত্রিকা ও 'তত্ত্বকৌমুদী', ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' 'বেদব্যাস', 'সখা' ইত্যাদির মাধ্যমে ও সমসাময়িক বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচার হইতে থাকে। ১৮৯০ খৃঃ ৮ই জুলাই রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রথমে চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া, বর্তমান আকারে প্রকাশিত হয় ২৫শে নভেম্বর, ১৯০১। রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভগবত্তত্ত্বমূলক নাটক 'লীলামৃত' ১৯০০ খৃঃ ও সত্যচরণ মিত্র লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' ১৮৯৭ খৃঃ প্রচারিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইংরাজীতে প্রথম দুইখণ্ড প্রকাশ করেন ১৮৯৭ সনে। ১৯০২ সন হইতে 'কথামৃত' বাংলায় প্রকাশিত হইতে

১ শ্রীযুক্ত বি. আর. রাজম্ আয়ার।

থাকে। বাংলায় প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১১ই মার্চ, ১৯০২ এবং পঞ্চম খণ্ডের ১৯৩২। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনিসাহেব লিখিত প্রবন্ধ A modern Hindu saInt (১৮৯৬) ও রামচন্দ্র দত্ত প্রদত্ত (১৮৯৩-৯৭) ১৮টি বক্তৃতাও প্রচারকার্যে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তেমনি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমুলার রচিত একটি প্রবন্ধ (১৮৯৬) এবং দুই বৎসর পরে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Ramakrishna : His life & sayings। দেখা যাইতেছে রামকৃষ্ণ-প্রচার এক অদৃষ্ট শক্তিপ্রবাহে বিশ্বের দরবারে নূতন এক ভাবপ্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বভাবতই মনে হয় তাঁহার প্রচার তিনিই করিয়াছিলেন, বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর (১৯০০) অকস্মাৎ বেলুড় মঠে রাত্রিবেলা উপস্থিত হইলেন; মঠে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বেলুড়ে পৌঁছিয়া তিনি জানিলেন রামকৃষ্ণ-প্রচারের অন্যতম দরদী বন্ধু ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছেন ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০ খৃঃ। সেভিয়ার-গৃহিণীকে সান্ত্বনাদানের জন্য ও মায়াবতীতে স্থাপিত অদ্বৈতাশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিচালনাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বামীজী প্রচণ্ড শীত তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়া সেখানে যান। বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০১। স্বামীজীর হাঁফানিরোগ পুনরায় দেখা দিল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহার মায়ের 'প্রাণের সাধ' তীর্থদর্শন মিটাইবার জন্য ১৮ই মার্চ পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ১২ই মে। পথিমধ্যেই বহুমূত্রের সহিত হাঁফানির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ হইল যে মঠবাসিগণ তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের সহিত তাঁহার সংযোগ এই ভ্রমণের সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। স্বামীজীর পা ফুলিয়া শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অভিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসায় তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সুঠাম স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। স্বামীজী মঠে ফিরিয়া পুনরায় শিষ্যদের জীবন-গঠন প্রচার ইত্যাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িল। উদ্বিগ্ন মহারাজ স্বামীজীকে যথাসম্ভব কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতেন, স্বামীজীকে কিভাবে

বিশ্রাম দেওয়া যায় সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই সজাগ থাকিতেন। দীর্ঘকাল পীড়ায় ভুগিয়া এবং অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া স্বামীজীর অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তিনি যখন যাহা আদেশ করিতেন, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত না হইলে অধৈর্য হইয়া পড়িতেন, উত্তেজনায় তাঁহার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর আবেগ-উত্তেজনার ঝাপটা মহারাজকেই সহ্য করিতে হইত সকলের চাইতে বেশী। মহারাজ জানিতেন, প্রেমময় স্বামীজী রোগের বিকারে ঐরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে রহিয়াছে অফুরন্ত প্রেমের প্রস্রবণ। স্বামীজীও মহারাজের অন্তরের ভাব বুঝিতেন। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন "তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে, আমি জানি ও-মঠে আর কেউ নেই যে সইবে।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় উপস্থিত হইল। পূজা আরম্ভের চার-পাচ দিন পূর্বে মহারাজ ভাবচক্ষে দেখিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে গঙ্গা বাহিয়া মঠপ্রাঙ্গণে বিল্বতলায় উঠিলেন। এই দর্শনের কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বাগবাজার হইতে নৌকা করিয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তিনি ভাবচক্ষে দেখিয়াছেন যে মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইতেছে; মহারাজও তাঁহার দর্শন বর্ণনা করিলেন। প্রতিমায় দুর্গাপূজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। সময় অল্প, তবুও মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকল বিষয় তদারক করিয়া পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। কলিকাতায় শ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া পূজানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। সঙ্ঘজননীর নামেই পূজার সংকল্প হইল, ষষ্ঠীর দিন প্রতিমা কলিকাতা হইতে আনিয়া মঠের বিল্বমূলে বোধন হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজকের এবং কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্দ-উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। অগণিত নরনারী ভক্তিনিষ্ঠার পূজা দর্শন করিয়া ও প্রসাদ ধারণ করিয়া আনন্দ-লাভ করিল। শ্রীমা মহিলা ভক্তদের লইয়া মঠের নিকটবর্তী নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পূজা উৎসবে যোগদান করিলেন। গরীব-দুঃখী কাঙালগণকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করান এই পূজোৎসবের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত-অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহারাও আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি

তাঁহাদের বিদ্বেষ দূর হয়। তাঁহাদের ধারণা দৃঢ় হয় যে, মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দু-সন্ন্যাসী। স্বামীজী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; নবমীর দিন রাত্রে কিছু সুস্থ বোধ করিলে তিনি পূজা মণ্ডপে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় দুই-তিনটি গান গাহিলেন ; সেইরাত্রে মঠে ভজনে কীর্তনে আনন্দের তুফান ছুটিয়াছিল। দশমীর দিন বিসর্জনের পূর্বে মায়ের প্রতিমা নৌকা-ভ্রমণে বাহির হইল। ব্যাণ্ড খোল করতাল বিবিধ বাজনা বাজিতে লাগিল ; অসুস্থ দেহে স্বামীজী মঠবাড়ীর বারান্দা হইতে দেখিলেন 'রাজা' একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাতি বাধিয়া প্রতিমার সম্মুখে বালকের ন্যায় মধুর নৃত্য করিতেছেন। এই আমোদ-দৃশ্যে সকলের মন মোহিত হইল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ইহার পর দীর্ঘকাল মঠে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর প্রতিমায় পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ এক দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর শুভক্ষণে মহারাজ একশত আটটি রক্তপদ্ম দিয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাপানী শিল্পী ওডা ওকাকুরা ও বৌদ্ধনেতা ধর্মপাল ও নিবেদিতাকে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যান। সেখান হইতে জাপানী শিল্পীকে অজন্তা ইলোরার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীজী বারাণসীতে চলিয়া আসিলেন। সেস্থানে অবস্থানকালে তিনি ফেব্রুয়ারীর শেষ-ভাগে গুরুতরভাবে পীড়িত হইলেন। তাঁহাকে অতি সাবধানে বেলুড় মঠে আনা হইল। কবিরাজী চিকিৎসায় এবং গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের একনিষ্ঠ সেবাযত্নে স্বামীজী প্রায় একমাস পরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।[১] এই সময়ের সেবাযত্নের উল্লেখপূর্বক মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরেরও এত সেবা করিনি।" পীড়ার উপশম হইলে মঠবাসিগণ নূতন আশার আলো দেখিতে পাইলেন ; স্বামীজীর মুখের হাসি দেখিয়া মহারাজ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

অখণ্ডের ঋষি স্বামীজী এখন ঘরমুখো। একদিন স্বামীজীর সাধ হইল, তিনি

১ স্বামী সারদানন্দ ৭।৮।১৯০২ তারিখে স্বামী অভেদানন্দকে লিখেন, "প্রায় দুই মাস পূর্বে তিনি কাশীধামে যান, সেখান হইতে শরীর খুব খারাপ হইয়া আসেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করান। তাহাতে বেশ সারিয়া উঠেন। একমাস ঔষধ ব্যবহারে হাত-পা ফোলা সারিয়া গেল ; পেটেও (উদরী হইযাছিল) জল রহিল না। শরীরে লাবণ্য আসিল এবং জোরও বেশ হইল। কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন—একমাইল, দুইমাইল পথ হাঁটিতে কোন কষ্টবোধ হইত না।"

মাধুকরীর অন্ন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য সাধুদের সহিত মহারাজও ভিক্ষায় বাহির হইলেন।[১] সকলের ভিক্ষালব্ধ অন্নের কিঞ্চিৎ ধারণ করিয়া স্বামীজী পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "তোমরা মাঝে মাঝে এরকম ভিক্ষা করতে ভুলে যেও না।"

স্বামীজী একদিন গুরুভ্রাতা 'রাজা'কে বলিলেন মনের কথা, "এবার যা হয় একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যান জপ করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।"[২] কিন্তু স্বামীজী যে শেষ পর্যন্ত অতি শীঘ্র শরীর ছাড়িবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপস্থিত হইল। জন্মতিথি-পূজা হইল ১১ই মার্চ। পরবর্তী রবিবারে সাধারণ উৎসবে হাজার ত্রিশ লোকের সমাগম হইল, দলে দলে কীর্তন দল আসিয়া উৎসব প্রাঙ্গণ মাতাইয়া তুলিল। স্বামীজী তখন প্রায় শয্যাগত, দাঁড়াইয়া ঘরের জানালা দিয়া ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন করিলেন মাত্র। শরীর একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় অধ্যাপনা, সঙ্ঘের কাজকর্মে পরামর্শদান ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিলেন ; তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া মহারাজ অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিলেন।

কিন্তু সকলের বরেণ্য, মহারাজের প্রাণপ্রিয় স্বামীজী মহাসমাধির জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেদিন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। সারাদিন বেদপাঠ, অধ্যাপনা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আলোচনা ইত্যাদি শেষ করিয়া স্বামীজী মহানিশায় ধ্যান-যোগে তাঁহার পার্থিব তনু পরিত্যাগ করিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দের লিখিত একটি পত্র[৩] হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"প্রায় দুইমাস হইতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যান-ভজন করাতেন। এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হ'তে বৈরাগ্যের ভাব খুব প্রবল দেখতুম। 'কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জরেৎ' প্রায়ই এই শ্লোক আওড়াইতেন। আর

---

১ ১লা মে তারিখের মহারাজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে—"তারকদা, আমি, কানাই ও হরিপদ মাধুকরী ভিক্ষা করিতে যাই এবং সকাল ১০-৩০ মিঃ নাগাদ মঠে ফিরিয়া আসি।"

২ ৭।৮।১৯০২ তারিখে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত স্বামী সারদানন্দের পত্রাংশ।

৩ ২০।৮।১৯০২ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ এই পত্র লিখেন আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দকে।

জিজ্ঞাসা কত্তেন, 'হাঁরে, ঠাকুর কোন দু'টি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন' ব'লে 'ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী' ও 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে' এই গানগুলি গাহিতেন। তুমি জান কাজকর্মের ভাব তাঁতে কোনদিন কম ছিল না। ১০।১৫ দিন পূর্বে ই কাশীতে একটি আশ্রম খুলিবার জন্য তারকদাদাকে পাঠাইয়াছিলেন। মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, এই ইচ্ছা ক'দিন হ'তে খুব প্রবল হয়েছিল। শেষের দিনে বেদ-সংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়। আমার সঙ্গে ঐদিন বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বেদ পড়িয়া কি হইবে?' 'কুসংস্কার-গুলি যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন।

"কার্যগতিকে শরৎ রাখাল ২।৪ দিন কলিকাতায় ছিল। পুরাতন লোকের মধ্যে গোপালদাদা ও আমি সেদিন মঠে ছিলাম। কোন অসুখই ছিল না, বুঝতে পাচ্ছ? ঐদিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফূর্তি করতেন সেইরূপ স্ফূর্তি হাসি বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কত হ'ল।...আন্দাজ বেলা ৮॥ টার সময় তিনি ঠাকুর ঘরে ধ্যান করবার জন্য উঠলেন। আমি ৯॥ টায় পূজার জন্য ঠাকুর ঘরে উঠিলাম। আমায় দেখিয়া কহিলেন, 'আমার আসন ঠাকুরের শয়ন ঘরে করে চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দে।' অন্যদিন আমি পূজা করিলেও ঐ পূজা-ঘরের এক কোণে স্বামীজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্যমত করিলেন। আন্দাজ ১১ টার পর ধ্যান থেকে উঠিয়া 'মা কি আমার কালো, কালোরূপী এলোকেশী হৃদপদ্ম করে আলো' গুণ্ গুণ্ রবে এই গান গহিলেন।...বেলা ১ টার পর আমায় তুলে বললেন, 'চল পড়িগে, সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার ঘুম হোলো না একটু, ধ্যান করে মাথাটা খুব ধরেছে, brain weak হয়েছে দেখছি।' তারপর library ঘরে বসে তিনঘন্টা পানিণি ব্যাকরণ পড়াইলেন। চারটার পর আমায় সঙ্গে নিয়ে বাগানের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলেন।...

"সন্ধ্যার সময় আমি ঠাকুর ঘরে গেলে আমাদের শশীর বাবার সহিত অনেকক্ষণ কথা ক'য়ে স্বামীজী উপরে গিয়া আর একবার পায়খানায় গেলেন...

"নিজের ঘরে বসে ঐ ব্রজেন্দ্রকে 'আমার মালা দু'ছড়া দে' কহিলেন। আর উহাকে অন্যঘরে যাইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন, 'ডাকিলে আসিস্।' প্রায় একঘন্টা বাদে উহাকে ডাকিয়া বাতাস করিতে ও পা টিপিয়া দিতে বলিলেন, পা টিপিয়া দিতে দিতে তাঁর নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধঘন্টা নিদ্রাবেগের পর তাঁর

হাত ঈষৎ কাঁপিল ২।৪ সেকেণ্ডের জন্য ; ইহার পর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস মুখ দিয়া ত্যাগ করিলেন, তার ২।৩ মিনিট পর আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গোপালদাকে ডাকিয়া বলে, 'কি হইল দেখুন'। ইহার দু'এক মিনিট পরে আমি সমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে ডাকিয়া স্বামীজীর কানে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নাম করিতে লাগিলাম, যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। ও সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, সে স্বর্গীয় তেজোগুণ বিস্ফারিত নেত্র, কেবল কৌপীন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ...ইচ্ছা ক'রে যেন শরীর ত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মজুমদার ডাক্তারকে আনান হইল। শরৎ, রাখাল ও সাণ্ডেল রাত্রে আসিল। ডাক্তারও ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না কোন রোগে এইরূপ হইল।

"ঠাকুর যে বলিতেন—'তুই যেদিন স্ব-স্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি'—তাই হইল।"

কলিকাতা হইতে আসিয়া মহারাজ বিহ্বলভাবে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিলেন, দিশেহারা হইয়া শায়িত স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ; তিনি অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সারদানন্দ অতি কষ্টে রোরুদ্যমান মহারাজকে তুলিয়া ধরিলেন। মহারাজ বলিতে বলিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।"

শ্রীরামকৃষ্ণাবতার-লীলাসৌধে 'একে একে নিবিছে দেউটি।' মঠবাসিগণ শোকে অভিভূত, গৃহস্থ ভক্তগণ গভীর মর্মপীড়িত, দেশবাসী মর্মাহত। ক্রমে শোক-সন্তাপের তীব্রতা কিছু উপশান্ত হইলে সকলেই সান্ত্বনা ও ভরসার স্থল স্বামী ব্রহ্মানন্দের মুখাপেক্ষী হইল ; তাঁহার হৃদয়-বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহারাজ সকলের মনে আশা, প্রাণে ভরসা দিয়া শোকে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। দলনায়ক রাখালরাজ সকলকে প্রেমের ডুরিতে বাঁধিয়া অবতারলীলা সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

* * *

পূর্বে আলোচিত ঘটনারাজির মধ্যে দেখিতে পাই প্রচণ্ড শক্তিবাহী এক ভাব-প্লাবন নিদ্রিতপ্রায় ভারতবাসীর জীবনতটে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, বিশ্বের দরবারে বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছে। অমিততেজসম্পন্ন ঐ ভাবপ্লাবনের সম্যক তাৎপর্য ধারণা করিতে হইলে নিছক ঘটনামাত্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ

ঘটনাসকলের মাধ্যমে যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকটিত হইয়াছে তাহাকে বুঝিতে হইবে। পরমকারুণিক ভগবানের অবতরণের ফলে যে সুমহান ভাববিপ্লব, প্রচলিত জীর্ণ-দীর্ণ চিন্তাস্তূপ ভাসাইয়া দিয়া ভারতভারতীর শাশ্বত আদর্শকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন আধিকারিক পুরুষকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সমাগত ভাববিপ্লবের আদর্শটির গুরুত্ব বুঝিতে হইলে জানা দরকার ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক নেতৃবর্গের জীবন ও বাণী, সেই সঙ্গে ভাবান্দোলন যে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া আদর্শ রূপায়ণে সচেষ্ট ছিল তাহার সহিত পরিচয় হওয়া দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে লিখিয়াছেন, "আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে-সমাচ্ছন্ন স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্মনামক যুগযুগান্ত-ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।··· শ্রীভগবান, পরমকারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ সর্বভাব-সমন্বিত সর্ববিদ্যাসহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও একদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।" হিন্দুজাতির যুগযুগান্ত সঞ্চিত অধ্যাত্মসুধা আহরণপূর্বক অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ[১]; অবতরণের প্রধান উদ্দেশ্য যুগোপযোগী ধর্মসংস্থাপন। ইহার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তিতে প্রকাশিত ঐশীশক্তি আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি পুণ্য ভারত-ভূমিতে ধর্মকেন্দ্রিক সর্ববিষয়ক এক বিরাট অভ্যুদয়ের সূচনা করিয়াছিল এবং জাগতিক শক্তি-প্রমত্ত পাশ্চাত্য জাতিসকল নবপ্রচারিত উদার ও গভীর ধর্মচিন্তার মধ্যে নূতন আলোক ও স্থায়ী শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল।

---

১ মনীষী রোঁমা রোলাঁও লিখিয়াছেন, "(Sri Ramkrishna) was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people ; a great symphony composed of thousand voices and thousand faiths of mankind."

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অনন্ত মত অনন্ত পথ' এই সর্বধর্মানুভূতির তত্ত্ব ভিত্তি করিয়া নবযুগের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই নূতন ধর্মচিন্তা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠার উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "ঐ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন, পরে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য কিভাবে ধর্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"[১] কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।[২] শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তিতে প্রকটিত অধ্যাত্মশক্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘদেহে অনুস্যূত হইয়াছিল। সঙ্ঘের মঠাম্নায় লিখিত হইয়াছে, "এই সঙ্ঘই তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত।"

যুগোপযোগী ধর্মচক্র প্রবর্তন ও প্রসারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচন করিয়াছিলেন আধিকারিক কয়েকজন পুরুষকে। তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষাও দিয়াছিলেন।

সারথি শ্রীপ্রভুদেব ভক্ত তাঁর যত।
এক এক মহারথী পাণ্ডবের মত॥ (পুঁথি, পৃঃ ৩৩১)

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪০৫-০৬

২ স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "এ সঙ্ঘ আমরা সৃষ্টি করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেইসময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর আর সকলকে training দিয়ে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে হবে শিখিয়েছিলেন। এই হল মঠের গোড়াপত্তন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বাচিত নেতা স্বামী বিবেকানন্দকে পুরোভাগে রাখিয়া ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ কর্মবীরগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের তদানীন্তন ধ্যান-ধারণায় বিধৃত যুগধর্মের উদ্দেশ্য ও উপায় পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহারই লিখিত একটি পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে ভারতবাসীর নৈতিক মান উন্নয়নের উপর। সেই জন্য তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত করিতে হইবে পবিত্র উপনিষদ ও তৎ-ভিত্তিক দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে স্ফুরিত তাহাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ভাবসম্পদ। এমন এক সময় ছিল যখন একই মন্ত্রশ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য টীকাদি দুবোধ্য ও বিভ্রান্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল। সে-সকলের সামগ্রিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন মহান আচার্য (শ্রীরামকৃষ্ণ)। এই সত্যসকল পরিস্ফুট হইয়াছিল তাঁহার প্রাত্যহিক দিনচর্যার মধ্যে। এই মহান সত্য প্রচারের জন্য তিনি নিবাচন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। এক্ষণে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে যাবতীয় বাধা দূর করিতে, যাহাতে সেই সত্য সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাইতে পারে; যাহাতে প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব দেবত্ব ও সহজাত-মুক্তি উপলব্ধি করিতে পারে এবং সার্বিক জ্ঞান ও শক্তির উৎসের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইলে সহস্র-ফণা জনগণ বিগতনিদ্র ও জাগ্রত হইবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?'[১]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদিষ্ট সত্যসমূহ তাঁহার অন্তরঙ্গগণের বিভিন্নজনের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর যথার্থ মর্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অতুলনীয়। একদিন ঠাকুর ভক্ত-দিগের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন।...কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া 'সর্বজীবে দয়া' (প্রকাশ করিবে)। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে

১ বাঙ্গালোর বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ বেঙ্কটরঙ্গমকে ৮ই মে, ১৯০২ তারিখে লিখিত পত্রের অংশ।

দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!'……একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন!……ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।……যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব!"[১]

স্বামীজী তাঁহার এই চিন্তা মস্তকে ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতবাসীর জীবনধারার সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। ভারতের পুনরভ্যুত্থানের অন্যতম সূত্রস্বরূপ প্রাগুক্ত চিন্তাই স্বামীজীর মানসপটে নূতন আকার পাইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া জানাইলেন আবু পাহাড়ে তপস্যারত ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে। তিনি লিখিলেন, "জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।" পাশ্চাত্যদেশে প্রচারকার্য সংগঠনের সময়েও স্বামীজী তাঁহার ভাবনারাজি পত্রপত্রিকা-মারফৎ গুরুভ্রাতা ও বন্ধুবান্ধবদের বিস্তারিতভাবে বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাজপুতানায় বাস করিবার সময় দরিদ্র শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন সাধারণ মানুষকে দেখিয়া অখণ্ডানন্দ তাঁহার ইতিকর্তব্য নির্ণয়ের জন্য স্বামীজীকে লিখিলেন। স্বামীজীর উত্তর আসিল, "গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান। কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' হইতে হইবে। পড়িয়াছ 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" মনুষ্যরূপী নারায়ণকে সেবা করার সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন, "এই দেহটা—যাতে 'আমি' অভিমান ক'রে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই

১ লীলাপ্রসঙ্গ ৫ম ভাগ, ২৬১-২৬৪

আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপ কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সবজীবে-সর্বঘটে বিরাজমান—এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।"[১] নরনারায়ণ-জ্ঞানে সেবা মুক্তির অন্যতম পথই শুধু নহে, দেশের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেদান্ত-ভিত্তিক উপায়ে দেশের পুনর্জাগরণের জন্য 'জীবসেবা'ই সর্বোত্তম যুগোপযোগী সাধনা, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহার শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেন, "আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।"[২] একদিন শিষ্য সদানন্দকেও স্বামীজী বলিলেন, "জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।"[৩] কোন্ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া জীবসেবা-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে।...এরূপ পরার্থ কর্মই কর্ম-বন্ধনের মুলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।"[৪]

প্রচলিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিপ্রয়াসের সহিত বর্তমান যুগোপযোগী জীবসেবা তত্ত্বের উদার মিলন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত যুগচক্রের বিশেষ অবদান। প্রবর্তিত ধর্মচক্রে সর্বধর্মসমন্বয়- আদর্শের বাস্তব রূপদান উপরি-উক্ত সূত্র সহজসাধ্য ও বাস্তবানুগ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভাবমূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন রোমাঁ রোলাঁ। "ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিবেকানন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘটির প্রকৃতি ছিল ভগবৎ-প্রেরণা—ভগবৎ-প্রেরণা-প্রসূত-সমাজসেবামূলক, নরনারীর সেবাভাব-

১ স্বামিশিষ্য সংবাদ (পূর্বকাণ্ড) পৃঃ ৮১-৮২
২ স্বামীশিষ্য সংবাদ (উত্তরকাণ্ড) পৃঃ ২৩৭
৩ ঐ (পূর্বকাণ্ড) পৃঃ ৪১
৪ ঐ (ঐ) পৃঃ ১২৬, ১২৮

প্রণোদিত ও বিশ্বজনীন।……উহা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনই উহার মতের সারকথা, কারণ এইরূপ সমন্বয়েরই মধ্যে সনাতন ধর্ম নিহিত।" আদর্শ রূপায়ণের মূলকেন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজী স্বপ্ন দেখিতেন, "সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনশক্তি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান-ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals (উচ্চাদর্শ-সকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে…।"[১] এই মহৎ ভাবরাশির মূল উৎস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই ভাবরাশি রূপায়ণের পরিকল্পনাবিদ্ স্বামী বিবেকানন্দ এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবর্গ।

দার্জিলিং অবস্থানকালে স্বামীজী 'রাজা', গিরিশবাবু প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী-ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া একটি উপযুক্ত সংস্থা বা সমিতি গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন, যাহার মাধ্যমে নিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শ প্রচার করা যাইতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে রামকৃষ্ণসংঘের পরিলেখ আঁকিয়া দিয়াছিলেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া স্থান কাল বিবেচনায় সংঘের প্রকৃত অবয়ব এখন রূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মিলিত সভায় রামকৃষ্ণ প্রচার বা মিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৫ই মে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে নির্দেশিত হইল মিশনের উদ্দেশ্য, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত হইল: "মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' উদ্দেশ্য।"

"জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতনধর্মের রূপান্তরমাত্রজ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' ব্রত।"

১ বাণী ও রচনা, ৯/১২৪-২৫

কার্যপ্রণালীর নির্দেশকরূপে সিদ্ধান্ত হইল, "মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"

কার্যসূচী আলোচনা করিয়া স্থির করা হইল, ভারতবর্ষীয় কার্য হইবে, "ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসিদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলম্বন।" সেইসঙ্গে বিদেশীয় কার্যবিভাগের দায়িত্ব হইবে, "ভারত-বহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম-সংস্থাপন।"[১]

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তীকালে ইহার সহিত আরও যুক্ত হইল, "মিশনের আদর্শ ও লক্ষ্য যেহেতু কেবল আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক, অতএব রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।"[২]

প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সময় হইতেই মঠ ও মিশন এই দুইটি শব্দ এবং তদনুগত চিন্তা সমান্তরাল রেখার ন্যায় ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু মঠ ও মিশনের স্বতন্ত্র সত্তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সংগঠকদের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষুজনের জীবনগঠন ও ধর্মশিক্ষকদের শিক্ষাদান লইয়া মঠ ব্যাপৃত থাকিবে এবং মিশনরূপ সংস্থাটির উদ্দেশ্য হইবে দেশ-বিদেশে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রচার ও প্রসার। মূলতঃ সমজাতীয় ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত এই দুইটি বিভাগ যুগাবতারের ধারক ও বাহক বিহঙ্গমটির দুইটি পক্ষের ন্যায় সম্বদ্ধ। একটি পক্ষ না থাকিলে বা দুর্বল হইলে যেমন পক্ষী সাবলীল গতিতে উড়িতে পারে না, সেইরূপ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান দুই অঙ্গের প্রত্যেকটির নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

যে মহতী ঈশশক্তি লোকসংগ্রহার্থে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ

১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২

২ Life of Swami Vivekananda by Eastern and Western disciples, pp. 501-2

হইয়াছিল সেই লোককল্যাণাকাঙ্ক্ষী আধ্যাত্মিক মহাশক্তির ব্যবহারিক আধাররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। আধ্যাত্মিক মহাশক্তির স্ফুরিতাধারের রক্ষিবৃন্দ বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যাদি দ্বারা কিরূপে শক্তিসঞ্চয় করিয়া সঙ্ঘরূপ ধর্মচক্রকে জীবন্তভাবে বহুজনহিতায় প্রয়োগ করিবে, তাহা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। 'ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য' এই তত্ত্বকে বাস্তব রূপদানের জন্য ধর্মচক্র তাহার নাভিকেন্দ্রে রক্ষিগণের তপস্যাভিত্তিক জীবনগঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়াছে, সঙ্ঘের অঙ্গগণ নিজেদের জীবনে ধর্মপ্রদীপ উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে মানবসাধারণের মধ্যে অনাদৃত পারমার্থিক-বোধ-দীপ জ্বালাইবেন, এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই জনসাধারণের প্রয়োজনানুসারে অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করিতে হইবে। মনুষ্যসমাজকে ঈশ্বরাভিমুখীন্ করিতে হইবে। সঙ্ঘের সকল কর্মই হইবে ধর্মভিত্তিক। সঙ্ঘের অঙ্গদের তপঃশক্তি ও ধর্মানুভূতিই ধর্মচক্রের প্রাণ। এই প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়াই সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ প্রচার ও অন্নদানাদি সেবাকার্য করিবেন, তাহা হইলেই ধর্মচক্র স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখীন্ হইতে পারিবে। অন্যথায় পাশ্চাত্যের মানবতাবোধ-ভিত্তিক সেবাসঙ্ঘে পরিণত হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা সম্বন্ধে সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ সদা সজাগ ছিলেন।

মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রতিমাসের কার্যবিবরণী স্বামীজীর নির্দেশে ইংলণ্ডে সঙ্ঘের শুভার্থীদের নিকট পাঠাইতেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের কার্যবিবরণীর[১] অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের (সন্ন্যাসের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষানবিশগণ) লইয়া গঠিত মূল ভ্রাতৃসঙ্ঘকে অবলম্বন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার নাম মঠ, উদ্দেশ্য—ধর্মশিক্ষকদের শিক্ষাদান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার নির্বাচিত অধ্যক্ষ এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ এই দুইজন হইলেন উপাধ্যক্ষ। মঠের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্ধারিত আচরণবিধি মানিয়া চলিতে হয় এবং নিয়মসকল যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখেন অধ্যক্ষ। প্রতি

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৪।৮।৯৭ তারিখের চিঠির সহিত মিস মার্গারেট নোবেলকে রাস্কিন স্কুল, লণ্ডনের ঠিকানায় পাঠান।

শনিবারে একটি বক্তৃতা হয় এবং প্রত্যেক সাধুব্রহ্মচারীকে পর্যায়ক্রমে, অধ্যক্ষ-কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়ে, পূর্বে প্রস্তুত না হইয়াই বক্তৃতা করিতে হয়। জুনমাসে বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং সন্ন্যাস বা ত্যাগ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী সুবোধানন্দ।

"মঠবাসিগণের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ প্রচার বা মিশন নামে একটি সংস্থা সংগঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীয় জীবনে প্রদর্শিত সত্যসমূহ যাহা তিনি লোক-কল্যাণার্থে প্রচার করিয়াছিলেন, দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য মানুষ যাহাতে সেই সকল সত্য ব্যবহার করিতে পারে সেই বিষয়ে সাহায্য করা মিশনের উদ্দেশ্য। ইহার কর্মপদ্ধতি—বিভিন্ন স্থানে নূতন কেন্দ্র সংগঠন করা এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করা; কলা ও শিল্প-বিষয়ে উৎসাহিত করিয়া বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মচিন্তাসমূহ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে সহজ সরল ও জনপ্রিয় করিয়া শিক্ষকদের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই সংস্থার সাধারণ সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ।

"কলিকাতা ও মাদ্রাজে দুইটি কেন্দ্র-স্থাপন-পূর্বক ভারতবর্ষে কাজ শুরু হইয়াছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ত্যাগী ও গৃহীভক্তদের লইয়া রামকৃষ্ণ প্রচারের কলিকাতা কেন্দ্র সংগঠিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহারও সভাপতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী, আদর্শ প্রসারকল্পে সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং সৎ-জীবন যাপনে সমুৎসুক যে কোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে সমবেত সুধীবৃন্দের নিকট বেদান্ত, গীতা বা ভাগবত গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়, অতঃপর সভাপতি-কর্তৃক নির্বাচিত তৈরী ভাষণ সভ্যবিশেষ পাঠ করেন। জুনমাসে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। (১) স্বামী

From letter dated Math, the 4th August, 97, addressed to Miss Noble, Ruskin School, Wimbledon, London.

1. "The original brotherhood consisting of all the sannyasins (ascetics) and brahmahcaris (students undergoing training to become sannyasins) has been constituted into a central institution called the Math for the training of spiritual educators. Swami Brahmananda, is the President elect of the Math, with Swami Yogananda and Swami Turiyananda as Vice-Presidents. Every member is bound to abide by the rules of conduct laid down and the President is to see that these

বিবেকানন্দের কার্যক্রম—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (২) জ্ঞান ও ভক্তি—বাবু বি. কে. বসু, এম. এ. বি. এল ; (৩) শুকদেবের জীবনী—বাবু এস. বি. ঘোষ এবং (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেব—বাবু মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত, বি. এ.।"

সুপ্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত হইবার প্রথম পদক্ষেপেই মঠ ও মিশন এই দুইটি চিন্তা পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। প্রাগুক্ত তথ্যাদি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সংস্থা মঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত পন্থায় ধর্মপ্রচারকদের জীবন গঠন করা, এবং মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত তত্ত্বসকল যাহাতে যথাবিহিত প্রযুক্ত হইতে পারে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকদের তদ্বিষয়ে সাহায্য করা। উভয়ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী কর্মী একই ত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ হওয়ায় উভয়ের মধ্যে

are strictly obeyed. Every Saturday evening a lecture meeting is held when each member is to deliver in turn an extempore lecture, the subject being selected by the President. In June, lectures were delivered on the life and teaching of Buddha, and on Sannyasa or renunciation, the former by Swami Bijnananda, the latter by Swami Subodhananda.

2. "Under the auspices of the members of the Math an association has been started called the Ramakrishna Mission, its object being to propagate the principles propounded by Sri Ramakrishna and illustrated by his own life for the benefit of humanity and to help mankind in the practical application of those principles in their spiritual, intellectual and physical needs." It's method of work is to 'start new centres in different places, to train spiritual and secular educators by encouraging arts and industries and by popularising the study of Vedanta and other systems of spiritual thoughts as interpreted by the life of Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda has been elected its general President.

3. The Calcutta centre consists of all the disciples (both ascetic and householder) of Shri Ramakrishna. Swami Brahmananda is also its President. "Any one who believes in the mission of Shri Ramakrishna, who is ready to co-operate for the spread of that mission, and who endeavours to lead a moral life is eligible to the membership." Meetings are held every Sunday evening when recitations and explanations of the text from the Vedanta, Gita or Bhagabata are given and the lectures selected by the President are read by the members named for the occasion. The following lectures were read during the month of June : (1) The work of Swami Vivekananda by Babu Girish Chandra Ghosh, (2) Jnana and Bhakti by Babu B. K. Bose, M.A.B.L., (3) The life of Sukadeva by Babu S. B. Ghosh and (4) Sri Ramakrishna by Babu M. N. Gupta, B.A.

কখনও কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। উপরন্তু ঐ শব্দ দুইটি সমার্থকরূপে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইয়াছে। গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের লইয়া গঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতা-কেন্দ্র প্রায় তিন বৎসর একটি সাপ্তাহিক আলোচনাচক্রের ন্যায় কাজ করে। কিন্তু ক্রমেই উহা ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ে স্থানান্তরিত হইবার পর ইহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যসকল মঠের সাধুবৃন্দ পূর্ণোদ্যমে গ্রহণ করার ফলে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া যায়। মঠ ও মিশনের উভয়েরই কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায় সন্ন্যাসিগণ পরিচালিত বেলুড় মঠ।

যদিও স্বামীজীর নির্দেশে ও মহারাজের পরিচালনায় মঠবাসিগণ নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তবুও গুছাইয়া কাজকর্ম করিবার জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের প্রয়োজন হইল। বিশেষতঃ, গৃহত্যাগী নবাগত যুবকদের নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে স্বামীজী আলমবাজার মঠে নিয়মাবলীর কয়েকটি অনুচ্ছেদ মুখে মুখে রচনা করেন। ব্রহ্মচারী সুধীর (পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ) উহা লিখিয়া নেন। নিয়মাবলী রচনার পূর্বে স্বামীজী মুখবন্ধ করিয়া বলিলেন, "দেখ্, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে; কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করবার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতঃই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে, সুনিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে—যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাটাই ফেলে দিতে হয়।" এইভাবে আলমবাজার মঠেই নিয়মাবলীর প্রথম অংশ রচিত হয়। দ্বিতীয়াংশ রচিত হয় নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। স্বামীজী বলিতেন এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়া লইতেন। অবশেষে অনুলেখক স্বামী শুদ্ধানন্দ ভাষার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া ও স্বামীজীর নির্দেশে নেতিবাচক বাক্যসমূহ বর্জন করিয়া নিয়মাবলীর বর্তমান রূপটি দান করেন এবং স্বামীজী উহা অনুমোদন করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য যে মঠ, তাহার উদ্দেশ্য ও সাধনের উপায় সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই নিয়মাবলিতে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই দেখা যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুভ্রাতা সারদানন্দ,

অখণ্ডানন্দ ও গৃহীভক্ত পল্টুবাবু প্রভৃতির সহিত সঙ্ঘের আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। ক্রমে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশন রেজেষ্ট্রি করা হয়। ইহার কাঠামো এইরূপভাবে প্রস্তুত করা হইল যে মঠ ও মিশন একই নেতৃবর্গ দ্বারা মূল এক উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ-স্বরূপ পরিচালিত হইতে পারে। মূল আদর্শ অব্যাহত রাখিয়া সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তগণ একতাবদ্ধভাবে রামকৃষ্ণ-প্রচারের আদি পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রসর হইল। মঠ ও মিশন রামকৃষ্ণ সংঘের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ ত্যাগ ও সেবা—এই মহান আদর্শের বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, তাঁহার বিরাট ব্যাপক কর্মদেহ। সঙ্ঘের মধ্য দিয়াই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেশকালের অবচ্ছেদ তুচ্ছ করিয়া জগতের কল্যাণার্থে তাঁহার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই সঙ্ঘের আদর্শ-বাণী—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের কল্যাণসাধন। সর্বধর্মপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান দ্বারা হিতসাধন করিয়া ঈশ্বরকর্মিগণ মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানলাভের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং সেবিত নরনারীকে ঈশ্বরাভিমুখীন করিয়া থাকেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দুই অঙ্গ—মঠ ও মিশন যে ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক তাহা জনসাধারণ এক নজরেই যাহাতে বুঝিতে পারে সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ একটি প্রতীক রচনা করেন। সঙ্ঘ বর্তমানে যে প্রতীক (emblem) ব্যবহার করিয়া থাকে সেটি সৃষ্টি করিয়া স্বামীজী তাঁহার ২৪।৭।১৯০০ তারিখে লিখিত একটি পত্রে নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সূর্য—জ্ঞান, তরঙ্গায়িত জল—কর্ম; পদ্ম—প্রেম, সর্প—যোগ; হংস—আত্মা; উক্তিটি—হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন। এটি হৃৎ-সরোবর।" বলা বাহুল্য প্রতীকটি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সার চিত্রাকারে পরিস্ফুট করিয়াছে। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ মস্তকোপরি কিরীটস্বরূপ এই প্রতীক ধারণ করিয়া জনসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি প্রচার করিতেছে।

বোম্বাইএর মোহনদাস পাণ্ডুরঙ্গ মোরের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর একটি চিঠি[১] দিয়াছিলেন। তাহাতেও সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল

১। "The main object of our institution is to impart such instructions to the youngmen of our country as will enable them to realise the highest ideal of freedom (Jibanmukti) held up by the Vedanta;

ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে এবং নূতন একটি চিন্তাও পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের যুবকদিগকে বেদান্ত-বিঘোষিত মুক্তির চরম আদর্শ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা। সেই কারণে তাঁহাদের চরিত্র-গঠনের জন্য এবং শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন না করিয়া যাহাতে উন্নততর কাঠামোতে জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে সেই বিষয়ে আমরা অধিক যত্ন লইয়া থাকি। সংক্ষেপে ইহা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এই মঠে যুবকেরা ঘর-সংসার ত্যাগপূর্বক শাস্ত্রোক্ত সত্যসকল আয়ত্ত করিবার জন্য আমাদের পরিচালনায় বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণপূর্বক সাধনভজন করে এবং নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কঠোর নিয়ম অনুশাসন মানিয়া চলে।

"শিক্ষার্থীর প্রবেশলাভের সর্তাদি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যাহাদের ত্যাগের পথ হইতে ভবিষ্যতে বিচ্যুত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, বা যাহাদের উপর বহুবিধ সাংসারিক দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রহণ করা হয় না। অবশ্য আমাদের অপর একটি শিক্ষায়তন সংগঠন করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে, যেখানে সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক এবং জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে সচেষ্ট হইবে—এইরূপ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে।" উপরি-উক্ত ভাবধারা লইয়া বেলুড়মঠে এবং পরে বহুস্থানে গুরুগৃহ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে,

and as such we take greater care to help them to form their character, to cast their life in a better mould than to make them superficial master of our scriptures. In a word, ours is a religious institution, a bona-fide monastery, where men who have renounced for ever all family connection with a view to realise the truths inculcated in the Shastras, live and receive systematic training under our guidance, practice devotion, and subject themselves to a course of discipline which is calculated to elevate their moral nature.

"As regards the condition on which we receive students, I wish to inform you that we do not admit such men in our Institution, as have a chance to swerve from the path of renunciation or have heavy responsibilities upon their shoulders. But we have a mind to start other institutions for the training of men who wish to keep their connection with the world and yet have a strong desire to make the best of the opportunities (both secular and spiritual) afforded to them by the various conditions of their birth, occupation, etc."

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বেলুড়মঠে শুদ্ধানন্দের শিক্ষাধীনে বিভিন্ন পরিবারের ছয়টি কিশোর এই পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

নিজস্ব একটি নিশ্চিত কর্মপন্থা গ্রহণের পূবে রামকৃষ্ণ সংঘকে বহুবিধ বিরোধ-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহার সহিত মোটামুটিভাবে পরিচিত না হইলে, নূতন যুগের ভাবান্দোলনের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ নরনারায়ণ-সেবাযজ্ঞের উদ্যোগ করিলে সরব প্রতিবাদ উঠিল যে, উহা পরমহংসদেবের মত-সম্মত নহে। এই প্রতিবাদের ঝড় কখন মৃদু, কখন প্রবলভাবে, বহুবিধ অশান্তির কারণ হইয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অনুসৃত ভাবস্রোত ক্রমে বলশালী হইয়া নরনারায়ণ-সেবাযজ্ঞের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসের ঘটনা। বলরাম-ভবনে একদিন স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি, এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে বুঝি তোদের গণ্ডীতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" তিনি আরও বললেন, "এ যুগের প্রধান সাধন হবে সেবা-ধর্ম, কারণ প্রাচীন মতে ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অতি বিরল; আর সেবা করলে সাধনের সময় পাওয়া যায় না—তাও ঠিক নয়।" আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ স্বামীজীকে কার্যান্তরে অন্যত্র যাইতে হইল। অপর একদিন মঠের সুপরিচিত ভক্ত 'শ্রীম' আসিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত' মায়ার রাজ্যের কথা; যখন বেদান্তমতে মানবের চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে ফল কি?" তীক্ষ্ণধী স্বামীজী বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়াই পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "মুক্তিটা কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা ত' নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?" প্রশ্নকর্তা নিবৃত্ত হইলেন।

গম্ভীরাত্মা স্বামীজীর সুগভীর চিন্তাধারা অনেকে সম্যক ধারণা করিতে না পারায় প্রতিবাদ বিভিন্ন সূত্র ধরিয়া ঝঙ্কৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরের কথা। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

মহাশয় স্বামীজীর সহিত আলোচনা করিতে আসিলেন। স্থান বলরামবাবুর বাড়ী। স্বামীজীর বলিষ্ঠ মতামত শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "আমরা সব বিষয়েই আপনার সহিত একমত, শুধু আপনাদের অবতারবাদে আমরা সায় দিতে পারি না।" উদারচেতা স্বামীজী অতিথিকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিলেন, "আমি তো ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করি না।" ইহা শুনিয়া নিকটে দণ্ডায়মান যোগানন্দের মুখ আরক্তিম হইল। অতিথি মহাশয় স্থান ত্যাগ করিতেই, তিনি ও উপস্থিত দুই-একজন গুরুভ্রাতা স্বামীজীর ঐ অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। হাস্যরসিক স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি যদি প্রচার না করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?" যোগানন্দ ইহাতে আরও চটিয়া গেলেন, ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি (ঠাকুর) না থাকলে তুমি বড়জোর একটা W.C. Banerjeeর মত ব্যারিষ্টার হতে।" আলোচনা ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল। বিদেশে প্রচারকার্য ও স্বদেশে সেবাকার্য সংগঠন করিতে যাইয়া স্বামীজী সীমাহীন বাধা সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে গুরুভ্রাতাদের এক অংশের অবুঝ মনোভাব তাঁহার নিকট হৃদয়বিদারক হইল। তিনি অভিমানে ক্ষোভে 'যা তবে এ শরীর রাখব না' বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন এবং বাড়ীর ছাদে উঠিয়া গম্ভীরভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ঐখানেই সমালোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। রাজা মহারাজ কার্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি ছাদে যাইয়া স্বামীজীকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

এই চিন্তাগত বিরোধের গুরুত্ব তখনই বুঝিতে পারা যায়, যখন দেখা যায়, স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের বিশেষ অনুরাগী প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রমদাদাস মিত্র পর্যন্ত স্বামীজী ও সন্ন্যাসিবর্গের কর্মের যোগ্যতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সন্দেহভঞ্জনের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দীর্ঘকাল পত্র-মারফত তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে একটি সাধ আছে, লোকের একটি ভ্রম খণ্ডন করি; অনেকে ভাবে যে, নরেনের মত ঠাকুরের মত হইতে বিভিন্ন। আমার বড় ইচ্ছা, এই ভ্রম খণ্ডন করি।"

যে কর্ম বন্ধনের কারণ, সেই কর্মই যোগযুক্ত হইয়া সাধন করিলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্যেই বিদ্যমান এই রহস্য। অভিনব ও বিস্ময়কর এই নূতন ব্যাখ্যাত সনাতন ধর্মের আদর্শ ঈশ্বরসেবীদের গ্রহণীয় হইতে সময় লাগিল, কিন্তু কালোপযোগী এই চিন্তাধারা দেশের শিক্ষিত যুবকদের মানসজগতে উপস্থিত করিল আলোড়ন। এই পটভূমিকায়, গুরুভ্রাতাগণ ও গৃহীভক্তমণ্ডলীর মধ্যে পরমপ্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া নরনারায়ণ-সেবাযজ্ঞের আদর্শ রূপায়ণের কঠিন দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন সঙ্ঘনায়ক মহারাজ ও সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, "স্বামিজীর ভাবরাশিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ।"[১] স্বামীজীর তিরোধানের পরেও ঐ ভাবগত বিরোধ কখন কখন মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে এই বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে বিরোধীদের স্বমতে আনিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এই সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উপরি-উক্ত ভাবগত বিরোধের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'শ্রীম'। তাঁহার ভ্রমনিষ্পত্তির কাহিনী বড় চিত্তাকর্ষক। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমাতাঠাকুরাণী কাশীধামে আসিয়া ভক্ত কিরণ দত্তের নূতন বাড়ী 'লক্ষ্মী-নিবাসে' গৃহ প্রবেশ করেন এবং সেখানে অবস্থান করিতে থাকেন। ৺শ্যামাপূজার পরদিন সকালে শ্রীমা সেবাশ্রমে পদধূলি দেন। সেই সময় মহারাজ, চারুবাবু, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অচলানন্দ মাতাঠাকুরাণীর পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রোগীদের আবাসগৃহগুলি দেখাইলেন এবং প্রত্যেক গৃহের পরিচয় দিলেন। সমস্ত দেখা হইলে শ্রীমা উপবেশন করিলেন ও বলিলেন "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" শ্রীমা সেবাশ্রম সম্বন্ধে অনেক খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এটি প্রথমে কি করে আরম্ভ হ'ল? এ ভাবটি কার মাথায় প্রথম এসেছিল?" অচলানন্দ তখন চারুবাবু, যামিনীবাবু প্রভৃতির নাম করিলেন এবং জানাইলেন যে, বুড়োবাবা দাড়াইয়া থাকিয়া গৃহনির্মাণ তদারক করিয়াছেন।

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৪৫

মহারাজও অচলানন্দের যত্ন পরিশ্রমের বিষয় শ্রীমাকে বলিলেন। শ্রীমা আনন্দে বলিতে লাগিলেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" মাতাঠাকুরাণী লক্ষ্মীনিবাসে ফিরিয়া গোলাপ-মার হাতে সেবাশ্রমের জন্য দশটি টাকা[১] পাঠাইলেন। 'শ্রীমায়ের দান' গোলাপ-মার হাতে পাইয়া মহারাজ আনন্দিত হইলেন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ চারুবাবু উহা গ্রহণ করিলেন। জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" শ্রীমা ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।" শ্রীমায়ের অভিমত অল্প সময়ের মধ্যে মহারাজের কাছে পৌঁছাইলে, আনন্দিত মহারাজ পার্শ্ববর্তী মহাপুরুষ মহারাজের সহিত ইহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেইসময় মাস্টারমহাশয় অদ্বৈতাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহারাজের ইঙ্গিতে ভক্ত কুমুদবন্ধু সেন মাস্টারমহাশয়কে বলিলেন, "মা বলেছেন, সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন। এখন আপনি কি বলেন?" অন্যান্য কয়েকজন তাঁহাকে ঐ এক প্রশ্ন করিলেন। তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। মাস্টারমহাশয় অগত্যা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নেই।" এই ঘটনার পর মাস্টারমহাশয়ের সেবাকর্ম সম্বন্ধে ধারণা সম্ভবতঃ পরিবর্তিত হইয়াছিল।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনজ্যোতিতে বিগলিত করুণাধারার ন্যায় বিবেকানন্দ-চিত্ত-গোমুখী হইতে সত্যধারা প্রবাহিত। সেই পবিত্র ভাবগঙ্গা হইতে মঙ্গলকলস পূর্ণ করিয়া রামকৃষ্ণসংঘের অঙ্গস্বরূপ সাধকবৃন্দ বিশ্বমানবের ঘাটে-বাটে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। জগৎ-কল্যাণসাধন-যন্ত্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত অধ্যাত্মশক্তি অবলম্বনপূর্বক 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিশ্ববাসীর জীবনধারাকে কল্যাণাভিমুখীন করিবার ব্রত গ্রহণ করিল, শীর্ষদেশে রহিলেন পরিচালক ও পথপ্রদর্শক স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

মহারাজের নেতৃত্বের অন্যতম ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, তাঁহার নেতৃত্বাধীনে আপাতবিরোধী কর্ম ও উপাসনার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সুপরীক্ষিত-

১ শ্রীমায়ের প্রদত্ত দশ টাকার নোট কাশী সেবাশ্রমে সুরক্ষিত আছে।

ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উপদেশ করিয়াছিলেন, "তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়।···তুমি যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আস্‌বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পার্‌বে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই ক'রছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল ক'রবে।"[১] স্বামী বিবেকানন্দও পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ; অপরে পায় নাই। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এবং যে-কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপভাবে পরের সেবা শুভকর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন তিনি প্রকাশিত হন'।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দও উপরি-উক্ত তত্ত্বকে সাধকের উপযোগী করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদটি বিভিন্ন ভাবে তিনি মঠ-কর্মিগণের নিকট প্রায়ই তুলিয়া ধরিতেন। ঐ স্তবকে রহিয়াছে, "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।"

মহারাজ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিতেন, "কর্ম না করলে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যানজপ সাধন-ভজন নিয়ে থাকে তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতে সময় কেটে যায়।" প্রচলিত ধারণা হইতে অনেকেরই মনে সংশয় জাগে, কর্ম তো একটা বন্ধন। গীতায় শ্রীভগবান উপদেশ করিয়াছিলেন,

১ কথামৃত ৩।১।৬।

"সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।"[১]

মহারাজও সকলকে অভয় দিয়া বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কর্মে কোন বন্ধন আসে না। তাঁদের কাজ করছি. এই ভাব নিয়ে কাজ করলে কোন বন্ধন ত' হয়ই না, বরং শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব দিকেই উন্নতি হবে।" প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম ও উপাসনা একই সঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে। সার্থক প্রচেষ্টায় কর্ম ও উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম শুদ্ধ উপাসনাতে পরিণত হয়। কি উপায়ে অভ্যাস করিতে হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন মহারাজ, "তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর, তাঁদের গোলাম হ'য়ে যাও; তাঁদের একান্ত শরণাগত হও।" ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাবটি প্রবর্তক সাধকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া মহারাজ বলিতেন, "আগে তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে জেনে খুঁটি জোর কবে ধ'রে নিতে হবে, খুঁটি জোর করে ধরে নিয়ে যা করবে সব ঠিক ঠিক হবে; কখনও বেচাল হবে না। তখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রভৃতি যে-কোন রাস্তাতেই চল না কেন, নিজের ও দশের কল্যাণের স্বরূপ হবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।"

মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুরের শরণাগত হয়ে তাঁর কর্ম জেনে কাজ করলে দিন দিন চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিত্তে ধ্যানজপ খুব জমে।" নিষ্কাম সেবাকর্মের মাহাত্ম্য কত, তাহা বলিতে যাইয়া স্বামী প্রেমানন্দও বলিয়াছিলেন, "মহারাজ বলেন, যারা ঠিক ঠিক নিষ্কাম ভাবে দীন, দরিদ্র, আর্ত রোগীর সেবা করে তাদের লক্ষ জপের কাজ হচ্ছে। এ স্তোকবাক্য নয়, সত্য কথা। চিত্ত শুদ্ধ হলে তখন কর্ম ত্যাগ।"[২]

ঠাকুর ও স্বামীজী প্রদর্শিত কর্মের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কুটিল কর্মের গতি, দুর্বোধ্য কর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল জাল। ভয় পাইয়া অকর্ম আশ্রয় করিলে বা এলোমেলোভাবে বিকর্ম অবলম্বন করিলে বিপদের সম্ভাবনা। যে কর্ম করিলে, যে বুদ্ধিতে কর্ম করিলে মন ঈশ্বরাভিমুখীন

১ গীতা ১৮।৫৬।

২ স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ: প্রেমানন্দ-১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭। ৫।১।১৬ তারিখে প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজ বলেন—তোমাদের কোটি কোটি জন্মের তপস্যার কাজ হয়ে যাচ্ছে ঐ নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ কর্মে। এ কেবল স্তোকবাক্য নয়, সত্যকথা জানবে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে সেবা করছ।"

হয় তাহাই কর্ম; এইরূপ কর্ম আশ্রয় করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়; নিঃশ্রেয়সের পথ উন্মোচিত হয়। কর্ম ও উপাসনার মধ্যে একটি গতিশীল সমন্বয় সাধনের জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা কঠিন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও মহারাজ উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "দু'চার-বার পারলে না ব'লে মনে করো না পারবে না, বারবার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে কতবার পড়ে যায়, তবু ছাড়ে না—শেষে দৌড়ুতে শেখে।"

কর্ম ও উপাসনার সূক্ষ্ম সাধনা তিনি প্রবর্তককে শিখাইয়া দিতেন। তিনি সাধককে বলেন, "কাজ করবার সময় একবার তাঁদের প্রণাম করবি। আবার কোন কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে অবসর পেলে তাঁদের স্মরণ-মনন করবি। কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি।" কর্মের একটা মোহ রহিয়াছে, কর্মাবর্তে পড়িয়া সাধক যাহাতে জীবনের উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত না হয়, সেই বিষয়ে তিনি সাবধান করিয়া দিতেন—"কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ।"

নবীন সাধক অনেক সময় অভিযোগ তুলিয়াছে যে, কাজ করিতে করিতে সমস্ত শক্তি যেন ব্যয় হইয়া যায়; ঈশ্বরের নামগুণগান করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য যেন থাকে না। মহারাজ বুঝিতে পারেন নিষ্কাম কর্মের রহস্য আয়ত্ত করিতে না পারায় ঐ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কর্মীকে বলিয়া দিতেন কর্মরহস্য, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।" মহারাজের মুখে প্রায়ই শোনা যাইত, "তীব্র কর্ম কর আর নাম কর। সব কর্মের ভিতর কর দেখি তাঁর নাম। এই নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে, তবে ত'? করে দেখ, একদম সব জ্বালা ঘুচে যাবে। কত কত মহাপাতকী এই নাম আশ্রয় করে শুদ্ধমুক্ত আত্মা হয়ে গেল।"

নিঃশ্রেয়সের পথে ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রধান আশ্রয়; ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে যে কর্মপ্রচেষ্টা তাহারও ভিত্তি ত্যাগ ও বৈরাগ্য। সেবাকর্মে সাধককে উদ্বোধিত করিবার কালে তিনি হুঁশিয়ার করিয়া দিতেন, "ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে ভগবানকে আশ্রয় না করে কর্ম করতে গেলে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়, কেউ কেউ নরকে ডুবে যায়।" কর্ম ও উপাসনার সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁহার সকল উপদেশাবলীর মধ্যে বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর একটি পঙ্‌ক্তি সুস্পষ্ট হইয়া

বারংবার প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়মাবলীতে বলা হইয়াছে, "ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।"

তদানীন্তন কালে পাশ্চাত্য হইতে আমদানী-করা যুক্তিবাদ ও মানবিকতাবাদ দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া দেশবাসী অনেকেই মনে করিয়াছিল যে নরনারায়ণ সেবা ইউরোপের মানবিকতাবাদের ভারতীয় সংস্করণমাত্র। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি বিদেশী শিক্ষার ঘোলা জল পান করিয়া নরনারায়ণ সেবাভাবের মধ্যেও পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদটিকে সুদৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। শিক্ষিত যুবকদের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতেন, "অনেকে বলে দেশের দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এ-ভাব ইংরাজী শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপা লাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।" এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝিতে হইবে নারায়ণ-জ্ঞানে মানুষের সেবার তাৎপর্য। ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—নিষ্ঠার সহিত আন্তরিক সেবার দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সর্বব্যাপী নারায়ণ তাঁহাকে হৃদপদ্মে ধারণ করিয়া ও তাঁহাকে বোধে বোধ করিয়া কৃতকৃতার্থ হওয়াই লক্ষ্য।

উপরি-উক্ত ভাব সম্প্রসারণপূর্বক মহারাজ রচনা করিয়াছিলেন অধ্যাত্মতত্ত্ব ও লোকায়ত বিষয়ের মধ্যে একটি ভাবসেতু। এই ভাবসেতু সংযোজনের ফলে স্বামীজী আবিষ্কৃত সূত্র প্রমাণিত করিল যে, ব্যক্তির ধর্মজীবনের প্রগতি দেশ ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী নহে। নরনারায়ণ-সেবাজ্ঞানে কার্য করিলে যুগোপযোগী সমাজের প্রয়োজন মিটান যায়—সেইসঙ্গে ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবন ভগবদভিমুখীন করা সম্ভব হয়। পরোক্ষভাবে এই চিন্তাসূত্র অশেষ কল্যাণের কারণ হইল। জগতের অলীকত্ব প্রচারপূর্বক ধর্মধ্বজিগণ নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় লইয়াছিল—তাহারা জড়তার পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইল।

'ঈশ্বরলাভের জন্যই মানুষের জীবন'—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমৃতময় বাণীকে মূর্ত করিবার উপায়স্বরূপ নরনারায়ণ সেবার আদর্শ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘ

সাতাশ বৎসর প্রয়োগ ও প্রচার করিয়া এমন এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, যাহার ফলস্বরূপ দেখা যায়, ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সনাতন আদর্শ বর্তমান যুগোপযোগী আকার ধারণ করায় যুগযুগান্তর সেবিত দেশের ঐতিহ্য-স্রোতস্বিনীতে দেশবাসী সকল উদ্যম প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে দেশের ভাবসম্পদ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতের বুনিয়াদ দৃঢ় করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

‘লোকনায়ক’

পঞ্চম অধ্যায়

'লোকনায়ক'

প্রিয়তম গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের বিয়োগব্যথা সম্বরণ করিতে যথেষ্ট আয়াস ও সময়ের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমবর্ধমান ধর্মসংঘের পরিচালনের কঠিন দায়িত্ব সঙ্ঘনায়কের অন্তরের সকল ব্যথা সাময়িক-ভাবে যেন দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মর্মন্তুদ সংবাদে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অসংখ্য শোকবাণী আসিতে লাগিল; নিকটদূর হইতে রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ মঠে আসিলেন অন্তরের অশান্তি লাঘব করিবার জন্য, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আসিলেন, সেই সঙ্গে শোকাগ্নিতে দগ্ধ অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণ দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। মহারাজ সমবেত সকলকে তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে ঠাঁই দিলেন, অন্তরঙ্গদের দিলেন সান্ত্বনার বাণী, অকাতরে দান করিলেন সর্বরোগহর প্রেম। মঠবাসিগণ আশ্বস্ত হইলেন, ক্রমে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন এবং স্বামীজীর আরব্ধ কার্যসূচী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পালনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিরূপণের জন্য তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মহারাজের মুখাপেক্ষী হইলেন।

স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর নিকট মহারাজ ছিলেন তাঁহার নিজ সন্তানতুল্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল-পরলোকগমনে শোকাহত স্বামীজীর জননীকে সান্ত্বনা দিবার কঠিন দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন মহারাজ। তিনি প্রথমদিকে প্রতিদিন, কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইয়া জননীর শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। কোনদিন তাঁহার হাতের রান্না খাইতেন, জননীর সাংসারিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতেন। পরিবারের অর্থসংস্থানের সমস্যা ছাড়াও পৈতৃক ভিটা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার তখনও সুমীমাংসা না হওয়াতে ঐ সকল বিষয়ের দায়িত্বও মহারাজকে গ্রহণ করিতে হইল। জননীর শোক

কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজ তাঁহাকে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে পুরীধামে পাঠাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বামীজীর জননী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মহারাজ তাঁহার নিজ পুত্রের ন্যায় সাংসারিক বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।[১]

দেশব্যাপী বিভিন্ন সভাসমিতিতে স্বামীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রণামাঞ্জলি নিবেদিত হইতেছিল। মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও কলিকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক এক সভায় মিলিত হইয়া স্থির করিলেন পুণ্যশ্লোক স্বামীজীর সমাধিস্থানের উপর একটি স্মৃতিমন্দির গড়িয়া তুলিবেন। ইহার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল।[২] অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ স্বামীজীর স্মৃতি-মন্দিরের কাজ শুরু হয়।[৩] তদারকি করিতে থাকেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। নির্মাণকার্যের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে।[৪] বর্তমানে যে দ্বিতল মন্দির দেখা যাইতেছে, উহা সম্পূর্ণ হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী।

আলোচ্য সময়ে মঠপরিচালনার বহুবিধ সমস্যার দিকে মহারাজকে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্মাণের জন্য ঋণ হইয়াছিল, তাহা পরিশোধের জন্য এবং অসমাপ্ত নির্মাণকার্য শেষ করিবার জন্য মহারাজ অর্থসংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রচেষ্টা ছাড়াও ভক্ত গিরিশবাবুর

১ জননী ভুবনেশ্বরী দেবী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। উপরোক্ত তথ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ডায়েরী হইতে প্রাপ্ত।

২ স্বামী প্রেমানন্দের বেলুড়মঠ হইতে ২০।৮।১৯১২ তাং অভেদানন্দজীকে লিখিত পত্রাংশ লক্ষণীয় :—

"যে স্থানে দাহ হয় সেই স্থানে একটি শিব-মন্দির ও তাহাব সম্মুখে নাটমন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে।

"কলিকাতার লোকেও একটি memorial meeting করবার চেষ্টা কচ্ছে। মাদ্রাজে এরূপ একটা হয়ে গেছে, টাকাও উঠেছে।"

৩ (ক) স্বামী সারদানন্দজীর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডায়েরী হইতে পাওয়া যায় দুইটি তথ্য। March 10, Sunday :—N. B. S. V's temple began to-day. March 13 Wednesday—N. B. Hariprasanna came at night from Allahabad.

(খ) শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হইতে ১৮।৪।১৯০৭ তাং অভেদানন্দজীকে লিখিতেছেন, "বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দির আরম্ভ হয়েছে, কতদিনে শেষ হবে, তিনি জানেন।"

৪ স্বামী প্রেমানন্দের পুরী হইতে ৫.৫.১৯০৯ তারিখের লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

সাহায্যে মঠের তহবিলের জন্য প্রদর্শনী-অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে মঠের যা কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহার উপর প্রচুর আয়কর ধার্য হওয়ায় কোর্ট ও আইনজীবিদের সাহায্য লইয়া মহারাজ অনেক চেষ্টার পরে মঠের সম্পত্তি আয়করমুক্ত করিলেন। স্বাস্থ্যকর হিসাবে বালি পৌরসংসদ অত্যধিক কর ধার্য করিয়াছিল; এই করের পরিমাণ হ্রাস করিতেও মহারাজকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। মায়াবতীতে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রমের ট্রাস্ট ডীডের আইনসংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। আইনবিদের পরামর্শে মহারাজ বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীগণের ও মায়াবতীতে মাদার সেভিয়ারের মত লইয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। এইভাবে আইনানুগ সংগঠনের কাজকর্ম মহারাজ অল্পসময়ের মধ্যে গুছাইয়া তুলিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রথমে গোপনে এবং স্বামীজীর তিরোধানের পর প্রকাশ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতির চর্চা হইতে মুক্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ-সংঘ নিবেদিতার কার্যকলাপে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। স্বামীজীর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমাতাঠাকুরানীর আদরের পাত্রী ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনীকে মঠে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত সহৃদয়ভাবে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহাকে সক্রিয় যোগাযোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। স্বাধীনচেতা ভগিনী মহারাজের উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করিলেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন, "I recommend you none—not one—except Brahmananda. That old man's judgment never failed—mine always do. If you have to ask any advice or to get anybody to do your business Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else. With this my conscience is clear."[১]

১ বঙ্গানুবাদ: "একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ছাড়া অপর কাহাকেও আমি অনুমোদন করি না। সেই বৃদ্ধের সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় নাই, আমার সর্বদাই হয়। যদি তোমার কোন উপদেশ নির্দেশ লইবার থাকে অথবা তোমার কাজের জন্য যদি কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন

স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি নিবেদিতার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার এক চিঠিতে। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখি অধ্যাত্মকেন্দ্র-রূপে এবং কর্তারূপে।"[১]

উপায়ান্তর না দেখিয়া মঠ-কর্তৃপক্ষ ও ভগিনী পত্রিকায় ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্যকলাপের জন্য মঠ-কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। ভগিনীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংযোগ ছিন্ন হইলেও তিনি চিরকালই ছিলেন মঠবাসিদের আপনজন, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বরাবরই মহারাজের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন।[২] অপরপক্ষে মিশনের কাজকর্মে, বিশেষতঃ "প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিক পত্র সম্পাদনায়, স্বামীজীর বাণী ও রচনা প্রকাশন ও প্রচার বিষয়ে নিবেদিতার অবদান অবিস্মরণীয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছা বা আদেশ জানিতে পারিলে নিবেদিতা তাহা সানন্দে শিরোধার্য করিয়া লইতেন। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী রচনা করুন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল নিবেদিতা মিস ম্যাক্‌লাউডকে ৭ই জানুয়ারী, ১৯০৪ তারিখে লিখিলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান আমি স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী লিখি। সুতরাং যত শীঘ্র পার এর জন্য উপাদান, 'প্রার্থনা, ভিক্ষা ও হরণ' কর।" এই আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া নিবেদিতা রচনা করেন অমূল্য গ্রন্থ 'The Master as I saw Him' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি)। দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর নিবেদিতা গুরুসেবায় রত থাকিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ

হয়, আমি তোমার নিকট একমাত্র শুধু ব্রহ্মানন্দের নাম করিব। এইকথা জানাইয়া আমার বিবেক দ্বিধাশূন্য হইল।"

১ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ১৯।২।১৯০৩ তারিখের চিঠি (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ২২০)

২ এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার ২টি পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনই তাঁহার হৃদয়কে আমার নিকট হইতে সরাইয়া লন নাই।" পরের সপ্তাহেই ১৩ই নভেম্বর লিখিয়াছিলেন, "আমরা গতকাল মঠে গিয়াছিলাম। ফিরিলাম নবীন চাঁদকে মাথায় লইয়া! স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুতর পীড়িত হইয়াছিলেন, এখন ভাল হইয়াছেন, যদিও তিনি তাহা ভাবেন না। আসল ব্রহ্মানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখিলাম—যখন গতকাল বারান্দায় বসিয়া কথা বলিতেছিলাম। তাঁহাকে মনে হইল স্বামীজী। উনারা (সেবকেরা) বলিলেন, এখন পাঁচ বছরের মতন স্বরূপ তাঁহার! অপরূপ!" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা)

দেহত্যাগ করেন। এই শোক সংবাদে অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দজী ও মঠবাসিগণ গভীরভাবে দুঃখিত হইয়াছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় সান্ আঁতোল উপত্যকায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট "শান্তি আশ্রম" প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে দ্বাদশ জন শিক্ষার্থীর ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে তিনি আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সংবাদপত্রে দুঃসংবাদ পাইলেন, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ তাঁহার মর্ত্যলীলায় ছেদ টানিয়াছেন। শোকে দুঃখে অভিভূত তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর জন্য আনীত উপহার দ্রব্যাদির অনেক কিছু সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন।[১] শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন ২৯শে জুলাই। স্বামীজীর অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত মঠে তাঁহার শোক-বহ্নি অধিকতর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেবাযজ্ঞের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। কোন নির্জন স্থানে যাইয়া তপস্যা করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইরূপ বিরহকাতর গুরুভ্রাতাকে মহারাজ ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন না; তুরীয়ানন্দজী ২৪শে অক্টোবর বৃন্দাবনের পথে কাশীধাম যাত্রা করিলেন। মহারাজের আদেশে তিতিক্ষামূর্তি তুরীয়ানন্দজীর যত্ন লইবার জন্য ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল[২] তাঁহার অনুগামী হইলেন।

আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দের কর্মকেন্দ্রের দায়িত্বগ্রহণের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ তাঁহার প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বিদায়-ভোজের আয়োজন করিলেন। ত্রিগুণাতীতানন্দ ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া মাদ্রাজ, কলম্বো, জাপান হইয়া কালিফোনিয়ায় পৌঁছিলেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী।

গুরুভ্রাতা ত্রিগুণাতীতানন্দকে অভিনন্দিত করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দ ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় সুধীবৃন্দের অনুরোধে তিনি দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখান হইতে তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ১৯শে অক্টোবর। স্বামীজীর মহাসমাধির পর গুরুভ্রাতাদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার কয়েকদিন অতিবাহিত হইল।

১ মতান্তরে তিনি স্বামীজীর জন্য আনীত দ্রব্যাদি মঠে আসিয়া মহারাজের নিকট সমর্পণ করেন। তাঁহার আনীত সোনার ঘড়ি মহারাজ অনেক কাল ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২ কিছুকাল পরে ব্রহ্মচারী নন্দলাল যাইয়া কৃষ্ণলালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণানন্দজী গুরুভ্রাতাদের নিকট তাঁহার স্বামীজী সম্বন্ধে অলৌকিক দর্শনের কাহিনী বলিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তিনি দেখিয়াছিলেন, স্বামীজী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মত ফেলে দিয়েছি।"

স্বামীজীর সুখস্মৃতিসকল আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। কর্মব্যস্ত গুরুভ্রাতাকে মহারাজ আটকাইয়া রাখিলেন না। আটদিন পরে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন।

সঙ্ঘের এইসকল কাজকর্মের তদারকি ছাড়াও মহারাজের দায়িত্বের মধ্যে ছিল রামকৃষ্ণগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ ভক্তদের আপদ-বিপদে সাহায্য করা। ভক্তজনের তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু। সংবাদ আসিল 'গোপালের মা'[১] পীড়িতা। তাঁহাকে কলিকাতার একটি গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি নিজে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। ঠাকুরের ভক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত; সংবাদ আসিল তিনি মহারাজের দর্শনপ্রার্থী। সব কাজ ফেলিয়া মহারাজ তাঁহার নিকট ছুটিলেন; পরদিন ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯০২) প্রিয়বাবু দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে নানাভাবে ভক্তদের ডাকে মহারাজকে সাড়া দিতে দেখা যায়।

কলিকাতার যুবকদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য ভগিনী নিবেদিতা কিছুসংখ্যক যুবকদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত পরিচয় করাইবার জন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়া একদিন মঠে আসিলেন। উৎসাহী যুবকদের লইয়া একটি অরাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা হইল ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর। ২৩শে আগষ্ট, ১৯০২ এলবার্ট হলে একটি জনসভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন হইল। 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'[২] নামে পরিচিত এই যুবসংস্থাটি সারদানন্দজীর পরিচর্যায় পুষ্ট হইয়াছিল এবং সদাসর্বদা মহারাজের

১ উচ্চসাধিকা 'গোপালের মা' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বাল-গোপালের' ভাবে পূজা ও সেবা করিতেন। তাঁহার দিব্যদর্শনাদির কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রমুখ অন্তরঙ্গদের বলিতেন। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেন।

২ সোসাইটির সাপ্তাহিক সভা আরম্ভ হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২। সভাপতি ছিলেন ব্রহ্মানন্দজী। বক্তা সারদানন্দজী 'Ideas of the Swamiji and how can they be brought into practice' শীর্ষক ভাষণ দেন। ব্রহ্মানন্দজী সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন ১৯১৯ থেকে ১৯২২ (এপ্রিল) পর্যন্ত।

আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মহারাজ সাধারণতঃ সভাসমিতি এড়াইয়া যাইতেন, কিন্তু দেখা যায় জীবনসায়াহ্নেও এই সোসাইটির কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছেন। বিভিন্ন সভাসমিতি স্থাপন ও পরিচালন ছাড়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাজ ক্রমেই সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।[১]

কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিলেও প্রিয় স্বামীজীর বিয়োগব্যথা মহারাজের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রায়ই বাজিতে থাকে। বাহিরের কাহাকেও তাহা বুঝিতে না দিয়া তিনি নীরবে অপর সকলকে উৎসাহিত করিতে থাকিলেন; অপরদিকে জরুরী কাজসকল গুছাইয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি কিছুদিনের জন্য নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে একখানি পত্রে তিনি লিখিলেন, "আমি আষাঢ়ের প্রারম্ভে ৺কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে যাইব। তিন-চার মাস তীর্থাদি দর্শন ও সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিব, এইরূপ নিশ্চয় মানস করা গিয়াছে।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস যার যত বৈরাগ্য তিনি তত ভিতরে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থ বিবেক ও বৈরাগ্যের মূর্তি ছিলেন। যত দিন যাইতেছে ততই তাঁহার মহিমা বুঝিতে

১ ১৯০৩ খ্রীঃ প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি ঘরোয়া চিত্র পাওয়া যায় ৫।২।১৯০৩ তারিখে অভেদানন্দজীকে লেখা রামকৃষ্ণানন্দজীর পত্রে:

"আমরা এখানে আজকাল পাঁচজন আছি, যথা গুপ্ত, তাহার ভাগিনেয়, পরমানন্দ, যোগীন নামা একজন ব্রহ্মচারী ও আমি। শ্রীমন্মঠে (বেলুড়স্থ) শরৎ, বাবুরাম, গোপালদা, খোকা, তুলসী, চাটুর্যো, কানাই, নন্দ এবং অনেকগুলি কুঁচা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী।

"লাটু খোড়ো কেদারকে ও অনেককে কৃতার্থ করিতেছেন। Sister Nivedita ব্যাঘ্রহট্টে একটি বাঘের দোকান খুলিবেন বলিয়া বড়ই ব্যস্ত। অর্থাৎ তিনি তেজোবীর্যাওজঃবিশিষ্ট হর্ষ-ভয়োদ্দীপক কতিপয় ভারতনন্দনকে লইয়া ভারতমেলার শোভাবর্দ্ধন করিতে গিয়াছেন। ...তিনি সম্প্রতি স্বীয় প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্য উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।...গঙ্গাধর Orphanage চালাইতেছেন মুর্শিদাবাদের নিকট। হরিপ্রসন্নাদয: এলাহাবাদে একটি ধর্মের Club খুলিয়াছেন, নাম The Brahmavadin Club। তারকদাদা ৺কাশীধামে Poor Men's Relief Association-এ অনেক আতুরের জবা দ্বাবাই হোক বা রোগের দ্বারাই হোক দুঃখ অপনোদন করিতেছেন মঠীয় কয়েকজন স্বামীজীদের সহিত।

"মতিলাল (সচ্চিদানন্দ ছোট), কালীকৃষ্ণ, খগেন, স্বরূপানন্দ, মাতাজী Mrs. Sevier-এর সহিত মায়াবতী নামক হিমালয় দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচণ্ড অদ্বৈতবাদের সুপ্রচণ্ড আওয়াজে—যাহার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত', সমগ্র নিদ্রিত ভারত প্রবুদ্ধ হয় হয় হইয়াছে... পীড়িত সাধুগণ কনখলে ও হৃষিকেশে মনোযোগ সহকারে চিকিৎসিত হইতেছেন। কল্যাণানন্দ এবং সত্যকাম (সারদার ভাই) এই মওড়াটি রক্ষা করিতেছেন। ভারতে অনেক স্থলেই Vivekananda Society সমূহ প্রসূত, নবপ্রসূত ও প্রসবোন্মুখ হইয়াছে।"

পারিতেছি। বিবেক বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে তাহা জ্বলন্ত দেখিয়াছি।"

পূর্বসংকল্প অনুযায়ী মহারাজ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সুবোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী জ্ঞান তাঁহার অনুগামী হইলেন। সেখানে গিয়া মহারাজ দেখিলেন গুরুভ্রাতা শিবানন্দ বহু সমস্যার সহিত সংগ্রাম করিয়া খাজাঞ্চীর বাগানে ভাড়া-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমের কাজকর্ম পরিচালনা করিতেছেন। ভিঙ্গার রাজার প্রদত্ত অর্থে কাশীধামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য স্বামীজীর আদেশে স্বামী শিবানন্দ ২৩শে জুন, ১৯০২ তারিখে[১] বেলুড় মঠ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য যোগাযোগ, কাশীধামে স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের দিন, ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃঃ। মহারাজের উপস্থিতিতে, ভক্তদের সহৃদয়তায় আশ্রমের অর্থকষ্ট কতকাংশে লাঘব হইল। এই সময় ঠাকুরের পূজক কেদারনাথ বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহারাজ তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য কনখলে পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞান তাঁহার পরিবর্তে ঠাকুরের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করেন। এদিকে স্বামীজীর অনুরাগী কয়েকজন যুবক—যামিনীরঞ্জন মজুমদার, কেদারনাথ মৌলিক, চারুচন্দ্র দাস প্রভৃতি কাশীধামে Poor Men's Relief Association ক্ষুদ্রাকারে সংগঠন করিয়া যথাসাধ্য সেবাকার্য করিতেছিলেন। স্বামীজী এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।" এইবার মহারাজের প্রেরণায় ঐ কর্মিবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কারমাইকেল লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠানটির নাম হইল Ramakrishna Mission Home of Service বা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। সেবাশ্রম সুচারুরূপে সংগঠিত করিবার জন্য কাশী অদ্বৈতাশ্রমের সংলগ্ন জমিখণ্ড সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

তীব্র বৈরাগ্যে তখন মহারাজের মন গভীরভাবে অন্তর্মুখীন। তিনি সাধন-ভজনে দিবারাত্র কাটাইতেন এবং অবসরকালে উপস্থিত ভক্ত ও কর্মিবৃন্দকে উপদেশ

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি, June (23) 1902. Tarakda with Kedar gone to Benaras by this evening Mail from Math.

নির্দেশ দিয়া পরিচালিত করিতেন। মহারাজ কাশীধামে প্রায় একমাস বাস করিয়া তথাকার প্রতিষ্ঠান দুইটিকে যথাসম্ভব সংগঠিত করিতে সাহায্য করিলেন। সেইসময় মহারাজ স্বামী বেদানন্দ নামক একজন যোগীপুরুষের সহিত যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[১] অতঃপর তিনি হরিদ্বারের নিকটে কনখল গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

পুণ্যভূমি হরিদ্বার অঞ্চলে তীর্থসেবিগণ ও একমাত্র মাধুকরীর উপর নির্ভরশীল সাধুসন্তগণ রোগাক্রান্ত হইলে "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরি"-র শরণাপন্ন হইতেন। এইসকল রুগী নারায়ণদের সেবা যত্ন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, জুলাই মাসে। সেখানে মাত্র তিনটি চালাঘর লইয়া স্বামীজীর শিষ্য কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ পীড়িত সাধুদের সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহারা ঔষধপথ্যাদি লইয়া পদব্রজে হরিদ্বার এবং হৃষীকেশে যাইয়া পীড়িত সাধুদের সেবাযত্ন করিতেন। ইহা ছাড়াও কনখলে গরীব শিশুদের লইয়া একটি পাঠশালা সংগঠন করিয়াছিলেন। অর্থবল, লোকবল তাঁহাদের প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু দুর্জয় মনোবল লইয়া তাঁহারা এই অভিযান চালাইয়াছিলেন। 'ভাঙ্গী সাধু' বলিয়া সেখানকার সাধুসমাজের অনাদর উপেক্ষাপূর্বক অর্ধাহারে অনাহারে দিনযাপন করিয়া সেবার কাজ চালাইতেছিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয় মহারাজকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ; সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর তিরোধানে তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেবার কাজ ছাড়িয়া বাকী জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন। মহারাজ তাঁহাদের মনের আকুতি ধৈর্য সহকারে শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে নিত্য গঙ্গাস্নান ধ্যানজপ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রায় একমাস সময় চলিয়া গেল। মহারাজের নিকটসান্নিধ্যে ঐ সন্ন্যাসী দুইজনের মনে পরিবর্তন আসিল। তাঁহারা মনে প্রশান্তি অনুভব করিয়া পুনরায় সঙ্কল্প করিলেন যে 'বহুজনসুখায়' সেবাযজ্ঞরূপ তপস্যার মধ্য

১ স্বামী শঙ্করানন্দের নোটবুক হইতে প্রাপ্ত।

২ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের ডায়েরী হইতে দেখা যায়, মায়াবতীতে ২৭।৪।১৯০১ তাং স্বামী কল্যাণানন্দ প্রস্তাব করেন, পীড়িত সাধুদের সেবার জন্য কনখলে একটি হাসপাতালের ব্যবস্থা করিবেন। প্রস্তাব সকলের সাধুবাদ পাইল। সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করিয়া কল্যাণ ও আশু ৮।৬।১৯০১ তাং মায়াবতী হইতে যাত্রা করেন কনখলের উদ্দেশ্যে।

দিয়াই তাঁহারা ধর্মজীবনে অগ্রসর হইবেন। মনে নূতন বল পাইয়া, মহারাজের আশীর্বাদধন্য হইয়া তাঁহারা সেবাকর্মে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ের আনন্দস্মৃতি চয়ন করিয়া কল্যাণানন্দজী পরবর্তীকালে বলিতেন, "মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ বিমল জ্যোতিস্বরূপ। তাঁহার সান্নিধ্যে মানুষের সকল সংশয় দূর হয়ে যায়, হতাশ প্রাণে বল পায়।" তিনি আরও বলিতেন, "মহারাজ এমন একটা sphere থেকে কথা বলতেন যে, তাঁর আদেশ নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন না করে উপায় ছিল না। যাকে যা আদেশ তিনি করতেন সেই আদেশপালনকারী অনুভব করত যে, আদেশ পালন ক'রে তার সর্বতোভাবে কল্যাণ হবে।"[১]

কনখলে আসিবার পূর্বে ফেব্রুয়ারী মাসে কনখল আশ্রমের জমি ক্রয়ের জন্য মহারাজ কলিকাতা হইতে ১৫০০্ টাকা ঋণ[২] করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই অর্থ দিয়া একটি কূপ সমেত পনেরো বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছিল ১৯০৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু জমি সম্বন্ধে বিক্রেতার সহিত বোঝাপড়া না হওয়াতে জমির দখল পাওয়া যায় নাই। এইবার মহারাজের মধ্যস্থতায় জমির মালিকের সহিত গোলমাল মিটিয়া গেল। পরে মহারাজ কলিকাতা হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সেবাশ্রমের পাকা ঘরবাড়ী গড়িয়া উঠে।

অনন্তর[৩] মহারাজ তাঁহার প্রিয় তীর্থস্থান বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে ধর্মসঙ্গী তুরীয়ানন্দকে পাইয়া তিনি পুনরায় গভীর সাধনভজনে নিমগ্ন হইলেন। সেইসময়ে তাঁহারা নাটানীকুঞ্জে ভূতনকা গলিতে একটি গৃহে বসবাস করিতেছিলেন। প্রায় আড়াইমাস সাধনানন্দে অতিবাহিত করিলেন। এইকালে মহারাজ প্রত্যহ রাত্রি বারোটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতেন। এক-রাত্রে অবসাদহেতু তিনি নিত্যকার সময়ে উঠিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ অনুভব করিলেন, কে একজন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিল। শয্যাত্যাগ করিয়া অন্ধকার গৃহমধ্যে দেখিতে পাইলেন সৌম্যমূর্তি এক বৈষ্ণব বাবাজীর সূক্ষ্মদেহ—

১ স্বামী গঙ্গেশানন্দের স্মৃতিকথা।

২ মহারাজ অল্পসময়ের মধ্যে কনখল সেবাশ্রমের জন্য ২৩০০্ টাকার দান পাইয়াছিলেন।

৩ হরি মহারাজ বৃন্দাবন হইতে ১৬।৭।১৯০৩ তারিখে লিখিয়াছেন, "রাখাল মহারাজ ৺কাশীতে আসিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার পত্র পাইয়াছি। লিখিতেছেন ১২।১৬ দিনের মধ্যে এখানে আসিবেন।" কার্যতঃ তিনি সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বৃন্দাবনে পৌঁছাইলেন।

তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মালা জপিতেছেন। মধ্যরাত্রির নহবৎ বাজিয়া উঠিল, মহারাজ বুঝিলেন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি হাতমুখ ধুইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই উক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত মহানিশায় জপধ্যান করিতেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, "বহু মহাত্মা স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরে বিরাজ করেন ও আগ্রহশীল সাধককে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন।" মহারাজ একদিন হরি মহারাজের সহিত যাইয়া পূর্বের তপস্যার স্থান কুসুম সরোবর প্রভৃতি দেখিয়া আসিলেন।

মহারাজ দেখিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর বিয়োগব্যথা কিছু সামলাইয়াছেন। একদিন সুবিধামত মহারাজ প্রস্তাব করিলেন, মঠের কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, শাস্ত্রাদি পাঠের জন্য। "স্বামীজীই চলে গেলেন, আর কাজকর্মের মধ্যে থাকার ইচ্ছা নাই" জানাইয়া তুরীয়ানন্দজী অবিলম্বে ঐ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সেইসময়ে ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষ সপরিবারে বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বালকপুত্র নীরদ প্রায়ই হরি মহারাজের কাছে আসিত, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি মহারাজের নিকট ঘেঁষিতে সাহস পাইত না। হরি মহারাজের আদেশে বালক একদিন ভয়ে ভয়ে মহারাজের ঘরে ঢুকিলে, মহারাজ তাঁহার পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইলেন এবং 'ভয় কি বাবা' বলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। দেখা গেল, বালক নীরদ ইহার পর হইতে মহারাজের কাছেই অধিকাংশ সময় কাটাইত। একদিন মহারাজ হাসিতে হাসিতে হরি মহারাজকে বলিলেন, "আপনার চেলা যে বিগ্‌ড়ে গেল।" হরি মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।" বালক নীরদ পরবর্তীকালে মহারাজের কৃপা পাইয়া রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্বামী অম্বিকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের উপর সদা-নির্ভরশীল মহারাজ অন্তরে প্রেরণা লাভ করিয়া কর্মকেন্দ্র কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[১] সঙ্গে চলিলেন বালক নীরদসহ নবগোপাল ঘোষ। মহারাজ পথে একদিনের জন্য এলাহাবাদে নামিলেন, ব্রহ্মবাদিন্‌ ক্লাবে

১ বেলুড় মঠ-হইতে স্বামী প্রেমানন্দ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ৬।১১।১৯০৩ তারিখে লিখিয়াছেন, "রাখাল বৃন্দাবনে আছে, শীঘ্রই আসিবে।"

গুরুভ্রাতা বিজ্ঞানানন্দের সহিত দেখা হইল, গুরুভ্রাতার ও তথাকার কাজকর্মের খোঁজখবর লইয়া মহারাজ বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি হরি মহারাজকে লিখিলেন, "আপনার সঙ্গে বৃন্দাবনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। পূর্বকথা সব জাগরূক হইয়াছিল। আবার কর্মের ভিতর যাইয়া পড়িব। পুনরায় আপনার সঙ্গলাভের জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।" বিন্ধ্যাচলে মহারাজ দুই সপ্তাহাধিক থাকিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর স্মরণ মনন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া পৌঁছাইলেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। সংঘাধ্যক্ষের এই পরিক্রমা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তিনি সর্বদা একটা ভাব অবলম্বনপূর্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকিতেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হইতেন সেখানে কর্মিগণ উপযাচক হইয়া কেন্দ্রপরিচালনার জন্য উপদেশ পরামর্শাদি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে সাধক কর্মী প্রেরণা পাইতেন, আবিষ্কার করিতেন কর্মরহস্যের সমাধান। বাহ্যদৃষ্টিতে এই পরিক্রমাকে সংঘাধ্যক্ষের পরিদর্শন ও পরামর্শদানের সার্থক প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে প্রতি কর্মকেন্দ্রে নিয়োজিত সাধুকর্মীদের জীবনে অধ্যাত্ম-দীপ সুপ্রজ্বলিত করিতেই তিনি সমধিক ব্যস্ত ছিলেন।

মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সাধু, ভক্ত মঠে আসিয়া ভীড় করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ নিষ্ঠার সহিত মিশনের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেছেন। মহারাজের অনুপস্থিতিতে স্বামী অদ্বৈতানন্দ মঠের অর্থসংরক্ষণ ও আরব্ধ নির্মাণকার্য দেখাশুনা করিতে-ছিলেন। মঠবিভাগ তদারকির ভার ছিল স্বামী প্রেমানন্দের উপর। মঠেও ভক্তদের যাতায়াত বাড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভাব ও বাণী দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং ত্যাগের মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন শত শত হৃদয়ে বৈরাগ্যদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছে। সানন্দচিত্তে সংঘনায়ক মহারাজ পুনরায় সংঘতরণীর হাল নিজহস্তে ধারণ করিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া সংঘাধ্যক্ষের মনে পড়িল একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা। স্বামীজীর মহাসমাধির পর একদল অর্বাচীন ভক্ত "আমাদের গুরুর মঠ" হুজুগ তুলিয়া মঠের অশান্তির কারণ হইয়াছিল। সহকর্মী গুরুভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজ অতি ধৈর্যসহকারে এই অশোভন পরিস্থিতির মোকাবিলা

করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ক্ষমাশীল মহারাজের চরণে মাথা নত করে। এই ঘটনার আলোচনা করিবার সময় মহারাজকে একদিন বলিতে শোনা গেল, "ঠাকুর বল্লেন, শালারা সব কেঁচো হয়ে যাবে।" এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া সঙ্ঘের কল্যাণসাধনই করিয়াছিল। গুরুশক্তির প্রকৃত মহিমা অবধারণে অসমর্থ শিষ্যদল অনেক সময় ভাবপ্রবণতার বশে গুরুভক্তির দোহাই দিয়া নিজেদের অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়। ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্মতি যাহাতে কোন অনর্থ না ঘটাইতে পারে সেইজন্য মহারাজ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহারাজের অনুসৃত নীতি পরবর্তীকালের আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণপার্ষদবর্গ বাহিত অমোঘ রামকৃষ্ণভাববীজ যেখানে উবরা জমি পাইয়াছে সেখানেই অংকুরিত হইয়াছে; ক্রমে পুষ্প-পত্রে শোভিত হইয়া মানব-সাধারণের অশেষ কল্যাণের নিদানস্বরূপ হইয়াছে। মূলকেন্দ্র বেলুড়মঠে যে মহীরূহ দিন দিন কলেবরে ও শক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই ক্রমবর্ধমান ভাববৃক্ষ নানা শাখাপ্রশাখায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রামকৃষ্ণসংঘের নিষ্ঠাবান সেবকগণের অকুণ্ঠ সেবা ও যত্নে দেশ-বিদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-ভাববৃক্ষের সঞ্চারণ ও সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দীর্ঘকালের জন্য ইহার পুরোধাঃ ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া বা পত্র মারফৎ যোগাযোগ করিয়া কর্মীদের হৃদয়ে আদর্শ-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছেন এবং সেই জাগ-দীপ সদা উজ্জ্বল রাখিবার কৌশলও শিখাইয়াছেন। এইভাবে ব্রহ্মানন্দ-পূতাগ্নিতে নিষ্ক্রিয়তা, কলুষ, ভগবদ্বিমুখতা দগ্ধ হইয়াছে। উপনিষদের আহ্বান "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" পুনরায় সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইয়া মানুষ প্রেয় হইতে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক একনিষ্ঠ কর্মী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য ক্যালিফোর্ণিয়া অভিমুখে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যাত্রা করিলে তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইল। যখন অর্থাভাবে উদ্বোধনের নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল[১], তখন মহারাজের নির্দেশে

১ উদ্বোধন পত্রিকার জন্য যে দেনা হয় তাহা পরিশোধের জন্যই ছাপাখানা বিক্রীত হয়। জনৈক ভক্ত গিরীন্দ্রলাল বসাক নিজ বাটীতে 'সারদা প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তমণ্ডলীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া অর্থসংকট লাঘব করা হইল। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ[১] পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এই মূল্যবান প্রকাশন বিভাগ সাবলীল গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজের নির্দেশে পাক্ষিক পত্রিকা দশমবর্ষে মাসিকে রূপান্তরিত হইল। অধিকন্তু তিনি উদ্বোধনের কর্মিবৃন্দকে উৎসাহ ও প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে নিজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিলেন। পঞ্চম বার্ষিক উদ্বোধনে প্রকাশিত মহারাজের 'গুরু' প্রবন্ধ শুধুমাত্র একটি মৌলিক রচনা নহে, গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য অভিমত। এই প্রবন্ধে তিনি সদ্‌গুরু ও কুলগুরুর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাপুরুষদের উপলব্ধ সত্যনিচয় দ্বারা সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধটির বিশেষ গুরুত্ব এই কারণে যে, ইহার প্রতিটি ছত্রে তাঁহার দিব্যজীবনের প্রকাশ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, 'উদ্বোধন' প্রকাশন ক্রমে বলশালী হইয়া বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনকে অতুল শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিল। এদিকে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম উত্তর ভারতে এবং মান্দ্রাজ মঠ দক্ষিণ ভারতে ইংরাজী ভাষায় নবযুগের ভাবধারা ভারতবর্ষে ও বহির্দেশে ছড়াইতে থাকিল। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশনের এই তিনটি প্রধান কেন্দ্র এইকালে বিপুল সম্প্রসারণ লাভ করিয়া প্রচারকার্যকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভাগলপুর শহরে প্লেগ রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। এই ধরনের সেবাকার্যে অভিজ্ঞ সদানন্দের নেতৃত্বাধীনে একদল সেবক প্রেরিত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত সহরবাসী দলে দলে সহর ত্যাগ করিতেছিল। সন্ন্যাসী সেবকবৃন্দের পরিশ্রম ও যত্নে অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে আসে এবং আরও কিছুসময় পরে সহর প্লেগমুক্ত হয়। জীবন উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ যে সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সহরবাসিগণ সভাসমিতি করিয়া তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ১৯০৫ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দেও প্লেগরোগাক্রান্ত এই সহরবাসীদের আবেদনে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে অনুরূপ সেবাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।

ত্রিগুণাতীতানন্দজী বিদেশে যাইলে গিরীন্দ্রবাবু এক বৎসর প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। গিরিন্দ্রবাবু দেহত্যাগ করেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে।

১ ইনিই পরবর্তীকালে মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সময়ে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে আসামের শ্রীহট্ট জেলায়, বাংলার ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ২৪-পরগণা জেলায়, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ ও উড়িষ্যার পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করা হয়। বন্যার্তদের সেবার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায়, অগ্নিবিধ্বস্ত আর্তদের সেবার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরে, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য পাঞ্জাবের ধর্মশালাতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সেবাকার্য করা হয়। এইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আর্তপীড়িতদের দুঃসংবাদ মঠে পৌঁছাইলে, সাধুকর্মিগণ তথায় যাইয়া যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিয়া কর্মের মাধ্যমে ধর্মের সেবা করিতে লাগিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মার্চমাস। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। ইহার কয়েকদিন পরে মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য মহারাজকে কলিকাতায় বলরামভবনে আনা হইল। যথারীতি চিকিৎসা ও সেবকদের দরদপূর্ণ সেবাযত্ন সত্ত্বেও দীর্ঘ একচল্লিশ দিনের পূর্বে তাঁহার জ্বরের উপশম হইল না। দীর্ঘকাল অসুখের সময় মহারাজের সহজাত দৈব বালকভাবটি প্রকট হইয়া উঠে, সেবকগণ মহারাজের বালকবৎ আচরণসকল দেখিয়া বিস্মিত পুলকিত হন, মহারাজের প্রকৃত স্বরূপের সামান্য আভাস পাইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। মহারাজ সুস্থ হইয়া উঠিলে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য বিরজানন্দকে লইয়া কিছুদিন শিমুলতলায় কাটাইয়া আসিলেন। কিন্তু অসুখের পর হইতেই একটা দারুণ নাস্তিক্যভাব সদানন্দময় মহারাজের বড় অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। চিন্ময় শরীরে এই বিপরীত ভাব এতই অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, ইহার উল্লেখপূর্বক মহারাজ পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, "ঐ ভাবটা আরও কিছুকাল থাকলে এই শরীর থাকত না।" গুরুভ্রাতা সারদানন্দ বুঝিলেন, ইহা টাইফয়েড জ্বরের প্রতিক্রিয়া; তিনি মহারাজকে লইয়া তাঁহার প্রিয় তীর্থভূমি পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। নিত্য মহাপ্রভুর দর্শন ও মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়া মহারাজ ঐ অস্বস্তিকর ভাবটি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। এইবারেই মহারাজ একদিন মন্দির দর্শন করিতে যাইয়া মন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মহাপ্রভু, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহের পরিবর্তে এক অপরূপ-দর্শন রাখাল-বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। এই ভাবদর্শনে আনন্দবিহ্বল হইয়া মহারাজ বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মন্দিরে দর্শন করিতে

যাইয়া তিনি এক এক দিন এক এক ভাবে বিভোর হইতেন, সময় সময় সহাস্যবদনে হাতমুখ নাড়িয়া যেন কাহারও সহিত কথা বলিতেন। পুরীতে পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে মঠবাসিগণ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

পুরী হইতে ফিরিবার পর মহারাজের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হইল। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি যেন নিয়ত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। তিনি কাজকর্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সরাসরি লিপ্ত থাকিতেন না। মঠের কাজ তদারক করিতেন প্রেমানন্দজী ও পরে শিবানন্দজী এবং মিশনের কাজ দেখাশোনা করিতেন সারদানন্দজী কিন্তু সকলেরই শীর্ষদেশে থাকিতেন মহারাজ, সকল দায়িত্ব বহন করিতেন তিনি। তাঁহার ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজকর্ম হইত না। শুধু মূলকেন্দ্রে নয়, সকল কর্মক্ষেত্রে তিনি কর্মীদের অন্তরে প্রেরণাস্বরূপ বিরাজ করিতেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি সুদৃঢ়হস্তে সংঘতরীর বৈঠা টানিয়াছেন—সংঘনায়ক মহারাজ প্রশান্তচিত্তে সেই তরীর হাল ধরিয়াছেন, সংঘ-তরী দ্রুতগতিতে কালনদী বাহিয়া ঠাকুরের অমৃতময় ভাব চতুর্দিকে বিতরণ করিয়াছে।

নূতন যুগের হাওয়ায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা বলিষ্ঠ গতিতে প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে। নারায়ণজ্ঞানে আর্তপীড়িতদের সেবার বার্তা ও ঠাকুর স্বামীজীর জীবন ও বাণী চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মূলকেন্দ্রের নির্দেশে কলিকাতা, মান্দ্রাস, কাশী, কনখল প্রভৃতি স্থানে কর্মসংগঠন হইতেছিল। এদিকে সন্ন্যাসীদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনে উদ্বুদ্ধ ভক্তবৃন্দ ও অনুপ্রাণিত যুবকগণ বিভিন্ন-স্থানে প্রচার ও সেবাকার্য আরম্ভ করেন। মঠের সন্ন্যাসীগণও বিভিন্নস্থানে প্রচারাদির জন্য যাইতেন এবং স্থানীয় ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়া সেই সকল স্থানে নূতন যুগের ভাবপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিতেন। বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে উদ্যোক্তাদের স্বকীয়তা স্বভাবতঃই প্রকটিত হইত; উদ্যোক্তাদের হৃদয়ে নূতন যুগের আলো যেভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে তদনুযায়ী উহা প্রতিফলিত হইয়াছে কর্মসংগঠনের মধ্যে। সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হওয়ায় বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত অর্থ ও কর্মীর সাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অল্প-সময়ের মধ্যেই বহু সেবাযজ্ঞের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, আন্দোলন ব্যাপক আকার

ধারণ করিল। এইসকল ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে খর্ব না করিয়া, কাহাকেও অনুৎসাহিত না করিয়া নূতন ভাবাদর্শ যথার্থরূপে প্রচারসাধন রামকৃষ্ণ-সংঘের একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। স্বামীজীর ভাব ছিল এই যে, সৎলোক সৎ-কাজের জন্য চেষ্টা করিলে তাহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে। এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সঙ্ঘের পরিচালকবর্গ সমস্যার একটি সরল ও অনবদ্য সমাধান দিলেন। পরিকল্পনা রূপায়ণ করিলেন সারদানন্দজী।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন আইনবদ্ধ হইবার পর ব্যক্তি ও গোষ্ঠী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভের জন্য সচেষ্ট হইতে হইল। সকলেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলিকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে পরিচালনা করা। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ এইসকল প্রচেষ্টাকে মুক্ত হস্তে স্বীকৃতি দিতে চাহিলেন, কিন্তু অন্তর্ভুক্তির জন্য মৌলিক কয়েকটি নিয়মনীতি বাঁধিয়া দিলেন ও কেন্দ্র পরিচালনার একটি নির্দিষ্ট মান নির্দেশ করিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাগুলি এইবার সংহত, সুসংবদ্ধ ও মূলকেন্দ্র কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইতে লাগিল। আইনানুগ সমর্থনলাভের জন্য সমাজের স্ফুটনোন্মুখ কল্যাণাকাঙ্ক্ষাকে সংগঠিত করিবার প্রয়াসের দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন অধিকতর বলিষ্ঠ হইল, জনসাধারণের প্রাণে সাড়া তুলিল। এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সংগঠনের ব্যবহারিক দিকটি ছিল গৌণ। সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপাকরুণালাভ। এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ যে অক্ষয় ধর্মভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন তাহা হইতে ধর্মসুধা আহরণ। নানাস্থানে স্থাপিত ক্ষুদ্র কেন্দ্রসকল মূলকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিভিন্নভাবে মূলকেন্দ্রের অফুরন্ত অধ্যাত্মশক্তি দেশবিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং এইরূপে শক্তিসঞ্চারের ফলে অগণিত নরনারী নবযুগের আলোকে নিজেদের জীবন আলোকিত করিতে পারিয়াছিল।

মহারাজের পদ্ধতি ছিল—'কর্ম হইতে ধর্মে লইয়া যাওয়া'। বিভিন্ন রকমের ধারণার বশবর্তী হইয়া কর্মীগণ যে সেবামূলক কর্ম সংগঠন করিতেন, সেইসকল শুভ প্রচেষ্টা মহারাজের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের ছটায় প্রকৃত ধর্মের স্পর্শ পাইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। মহারাজ তাঁহার গুরুভ্রাতা, শিষ্যসেবক ভক্তদের লইয়া এইসকল কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিতেন, কোনস্থানে অল্পসময়, কোনস্থানে দীর্ঘদিন

অবস্থানপূর্বক প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রে শক্তিসঞ্চালন করিয়া দিতেন। মহারাজ যেস্থানেই যাইতেন সেস্থানে কর্মী, ভক্ত ও সাধুগণ তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপদেশ নির্দেশ লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন। মহারাজের সংশ্রবে প্রত্যেকের ধর্মজীবন পুষ্টিলাভ করিত, কেন্দ্রের গোষ্ঠীজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবদীপ উজ্জ্বলতর হইয়া আলোক বিকীর্ণ করিত; সমীপাগত সকলেই এক অনাস্বাদিত রস আস্বাদন করিয়া ধর্মকেন্দ্রিক জীবনগঠনের শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিত। কেন্দ্রগুলি পরস্পরের সহিত এবং প্রধানকেন্দ্র বেলুড়মঠের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহার ফলে সেবা ও প্রচারকার্য নিজস্ব গতিপ্রবাহে সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে মহারাজের অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তি প্রভাবে কর্মকেন্দ্রগুলি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বুনিয়াদের উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

নূতন যুগের ভাবে দেশবাসী সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, দেশের প্রাণপিঞ্জরে নূতন সাড়া পড়িয়াছে; দেশবাসী পরাধীনতার কলঙ্ক ঘুচাইতে পুনরায় সচেষ্ট হইলে বিদেশী দেশশাসক দৃঢ়হস্তে নিষ্ঠুরভাবে সেই প্রচেষ্টা খর্ব করিতে চাহিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিল। দেশবাসীর দীর্ঘ-কালের অসন্তোষের বারুদে অগ্নিসংযোগ হইল, সেই আগুন শাসকবর্গ কখনই নির্বাপিত করিতে পারে নাই। সেইসময়ে বৃটিশ সরকারের নিষ্পেষণ ও দমন নীতির ঝাপটা জনপ্রিয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপর পড়িতে লাগিল। প্রায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই ঝড়ঝাপটার উৎপাত মঠ কর্তৃপক্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—ধর্মসঙ্ঘ রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকিবে। কিন্তু তাঁহার বলবীর্যপূর্ণ ভাবসকল 'স্বদেশী-আন্দোলনকারীদের অতি আদরণীয় ও প্রেরণার স্থল ছিল। স্বামীজীর ভাষণ ও রচনা সম্বলিত পুস্তক বিপ্লবীদের হাতে হাতে ফিরিত। তাহাদের গুপ্ত আড্ডাখানায় পাওয়া যাইত গীতা, স্বামীজীর পত্রাবলী, স্বামীজীর কর্মযোগ ইত্যাদি। বৃটিশ সরকারের পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের সহিত রামকৃষ্ণ মঠের যোগসাজস কল্পনা করিয়া লইল।[১] উপরন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কয়েকজন রাজনীতি

১ তদানীন্তন Special Superintendent of Police (Intelligence) টেগার্ট সাহেব (C. A. Tegart) তাঁহার ২২।৪।১৯১৪ তারিখে লেখা গোপন দীর্ঘ রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন

সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ইহাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। পুলিশ মঠ-মিশন কেন্দ্রগুলির উপর কড়া নজর রাখিত; সময় সময় হাঙ্গামাও বাঁধাইত। পুলিশী উৎপীড়ন মঠ কর্তৃপক্ষকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে; অপরপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিশ্লিষ্ট রামকৃষ্ণ সংঘকে সেইসময় স্বদেশী আন্দোলনের অনেক নেতাই সুনজরে দেখিতেন না, কেহ কেহ এমনও ভাবিতেন যে রামকৃষ্ণ সংঘ বিপ্লবী বিবেকানন্দ প্রচারিত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। দেশবাসীর অনেকের ভুল ধারণা ও অসন্তোষের ফলে সেবা-কার্যের জন্য অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট বাধা পাইতেও হইয়াছে। কিন্তু সর্বসাধারণের সহৃদয় সহানুভূতির উপরই সেবাকার্যের অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামীজীর শিষ্যা মিস্ ম্যাক্লাউডের অনেক চেষ্টার ফলে ১৯১৭ সালে রাজশক্তি সরাসরিভাবে স্বীকার করে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সক্রিয় রাজনৈতিক কাজকর্মের কোন সম্বন্ধ নাই।[১] এই স্বীকৃতির ফলে সরকারের

"...there have been several indications that the Mission and its followers are connected with the revolutionary side of the recent political upheaval in India.. ..the Ramakrishna Mission itself has been used in the past as a revolutionary agency, under the guise of religion and philanthropy, and that the greatest danger at the present time lies in the unaffiliated *asramas* which have grown up like mushrooms in the affected areas in Eastern Bengal without the knowledge or sanction of the headquarters of the mission at Belur." এই গোপন তথ্য ইদানীংকালে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সে-সময়েই সন্ত্রাসবাদী কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্থা রামকৃষ্ণ মিশনের নাম তাহাদের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে, ইহা প্রকাশ পাইলে মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯১৪ খৃঃ এপ্রিল মাসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় "A warning to the Public" শীর্ষনামায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহার নিম্নলিখিত অংশ লক্ষণীয়।

"The Governing Body think it desirable, therefore, to inform the general public and specially the unwary young men of Bengal, that the Ramakrishna Order of Monks, whose principal headquarters is at the Belur Math, and who had the Swami Vivekananda as their head, is a strictly Religious Order and has nothing to do whatsoever with politics, much less with societies based on lawlessness......Taught by Sree Ramakrishna and Swami Vivekananda, the Mission has always held the path of religion and service as the only way for the regeneration of Bengal and India and has always preached that the regeneration can only come through characters based on a direct realisation of religion and the Lord, and never through politics......"

১ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের Administrative report-এ প্রকাশিত হইল যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক তদানীন্তন বিপ্লবের মস্তিষ্ক। এই শাসন-বিবরণী প্রকাশের পর

রোষদৃষ্টি হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়; সঙ্ঘনায়ক মহারাজ ইহাতে নিশ্চিন্তবোধ করেন।

স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইতে থাকিলে বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তারাশির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের জন্য দেশের জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হইল। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রচারকার্যের চাহিদাও বাড়িল। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে রহিয়াছে, "প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনও বিরত হইবে না।" জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য প্রচারকগণ নানাস্থানে প্রেরিত হইলেন। মহারাজের নির্দেশে প্রচারকগণ ঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণীর আলোকে দেশের অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণ দেশে অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য করিতেছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ের উৎসাহী কয়েকজন ভক্তের আহ্বানে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। লোকমান্য তিলক, স্যার বালচন্দ্র পুরুষোত্তমদাস প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রামকৃষ্ণানন্দজীর ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারা সকলে বোম্বাই সহরে রামকৃষ্ণ সংঘের একটি কেন্দ্র স্থাপনের আবেদন জানান। রামকৃষ্ণানন্দজী সেখানকার উৎসবের বিবরণ ও জনসাধারণের আবেদন মহারাজকে জানাইলেন। ইহার পূর্বেই রামকৃষ্ণানন্দজী রেঙ্গুনে ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ

বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল (Thomas David Baron Carmichael) ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তাঁর দরবার ভাষণে মন্তব্য করেন, সন্ত্রাসবাদীর দল "often seize the opportunity which membership in a charitable society like the Ramakrishna Mission or participation in the relief of the distress gives them to meet and to influence the boys who have noble ideas, but who have not enough experience to judge where a particular course must lead" তিনি আরও বলেন, "...mean and cruel men do join these societies in order to corrupt the minds of young men who would, if only they were not interfered with, be benefactors to their follow countrymen." (History of the Ramakrishna Math & Mission, 215-16) জনসাধারণের মধ্যে মিশন সম্বন্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্বামী সারদানন্দজী উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া ২৩।১।১৯১৭ তাং লাটসাহেবের নিকট প্রতিবাদ পত্র পেশ করেন এবং ১০ই মার্চ গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব বিষয় বুঝাইয়া বলেন। ২৬।৩।১৯১৭ তারিখে গভর্নর একটি পত্রে লিখিয়া জানাইলেন, "I have full sympathy with the real aims of the true Ramakrishna Mission and it was this abuse of the name of the Mission that I wish to prevent." এই পত্র দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের ফলে ঘনায়মান বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল।

ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগদান করেন। সেইস্থানেও রামকৃষ্ণানন্দজীর অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ শুনিয়া মহারাজ প্রীত হইলেন।

ব্যাঙ্গালোর সহরে রামকৃষ্ণানন্দজীর কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের পর সহরবাসীদের উদ্যোগে সহরের ফোর্ট অঞ্চলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। কয়েক বৎসর পরে বুল টেম্পল রোডে ১৩ একর জমির উপর আশ্রমের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হইল। এই আশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিলেন সংঘাধ্যক্ষ মহারাজজী।[১] মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভায় মহীশূর মহারাজের দেওয়ান বাহাদুর মহারাজের উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। আরও কয়েকটি অভিনন্দনপত্র পাঠ হইবার পর মহারাজ ইংরাজীতে একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। মহারাজের ভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সনাতন কাল হইতে ভারত ধর্মভূমি। ভারতের সম্পত্তি ঈশ্বর। সেইজন্যই ভারতবাসী বলেন, 'হে প্রভো, তোমার পাদপদ্মই আমার অমূল্যধন।' যথার্থই এই ধনের মূল্য নাই। উহা হইতে কি আর কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে? কখনই নহে।

"প্রভুই সকল পদার্থে বিদ্যমান, তিনি যেমন সত্য আর কিছুই তেমন নহে। কেবল তিনিই সৎ—আর সব মিথ্যা। মানুষ এই মহাসত্য ভুলিয়া যায়। তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতে হয়, তাঁহারা আত্মস্বরূপ এবং আত্মাই সব, জগৎ মিথ্যা।

"মদীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মহৎ কার্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে সমগ্র জগৎ ঐ আধ্যাত্মিকতায় রঞ্জিত হইবে। উহারা উচ্চতম সত্যসমূহের জন্য, জীবনসমস্যার সার সমাধানের জন্য পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া আছে। ...তিনি আবির্ভূত হইয়া সাধনদ্বারা দেখিলেন, সকল ধর্মই সত্য এবং সার্বজনীন প্রেমের আদর্শে জীবন যাপন করা যায়—তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে জগতের বায়ু আবার বিশুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় সকল দেশই ধন্য হইবে।

"তাঁহার মহৎ আবির্ভাবের কথা বুঝিয়া যে সকল অঞ্চল তাঁহাকে অন্যান্য

১ সেদিনটি ছিল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী।

স্থানের অপেক্ষা অগ্রে গ্রহণ করিয়াছে ব্যাঙ্গালোর যে তাহাদের অন্যতম ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরা তাঁহার আহ্বান বুঝিয়াছ—তোমরা বড়ই ভাগ্যবান। তোমরা যে এইরূপে তাঁহাকে অগ্রে বুঝিবে ও সাদরে গ্রহণ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কারণ, তোমাদের দেশ অনেক মহান্ আচার্যের জন্মভূমি—তোমাদের দেশে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এখনও প্রাচীনকালের ন্যায় পবিত্র ও অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে। আজকালকার হিন্দু রাজগণের মধ্যে তোমাদের মহারাজা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধার্মিক ব্যক্তি।

"আমি এই কেন্দ্র হইতে অনেক মহৎ কার্যের আশা করি। প্রার্থনা করি—জগতে যে মহা আধ্যাত্মিক বন্যা উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে তোমরা তাঁহার সম্পূর্ণ ভাগী হও।" অতঃপর রামকৃষ্ণানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এতদঞ্চলে মহৎ কর্মের সূচনা হইল।

এই উদ্বোধন উৎসবের সংবাদ কলিকাতায় পৌছাইলে, ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল—প্রেমানন্দজী তাহা লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন, "এখানকার ভক্তমহলে মহারাজের lecture পড়ে উৎসাহ ও আনন্দের কোলাহল পড়েছে।"

দীর্ঘকাল পরে আমেরিকা হইতে অভেদানন্দজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কলম্বো হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান হইল। সর্বত্রই তিনি সময়োপযোগী ভাষণ দিয়া রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচার প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন। ২৩শে আগস্ট তিনি পুরীধামে যাইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিদেশে রামকৃষ্ণপ্রচারের বিস্তারিত সংবাদ নিবেদন করিলেন। ছয়মাস ভারতবর্ষে প্রচারকার্য করিয়া অভেদানন্দজী পুনরায় আমেরিকায় গমন করিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করিয়া প্রচারকার্য করিতেছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকায় যাইয়া ব্রুকলিনে একটি কেন্দ্র সংগঠন করিয়া প্রচারকার্য করেন; প্রায় আড়াই বৎসর পরে মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রথমে অভেদানন্দের সহায়ক হিসাবে, পরে এককভাবে বিভিন্ন সহরে প্রচারকার্য করিতে থাকেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এদিকে সান্‌ফ্রান্সিস্কোকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী

তুরীয়ানন্দের কার্যসূচীকে সম্প্রসারিত করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদান্ত-প্রচার ঐ অঞ্চলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শুরু করিয়া দুই বৎসরের মধ্যেই একটি তিনতলা বাড়ী 'হিন্দু মন্দির' নামে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী উৎসর্গীকৃত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল—মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সংঘাধ্যক্ষ মহারাজকে তথায় লইয়া যান। নানা কারণে তাহা সম্ভব না হইলেও মহারাজ গুরুভ্রাতার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার আশীর্বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ত্রিবান্দ্রামে রামকৃষ্ণানন্দজীর পদার্পণ ও ভাষণদানের পর একটি বেদান্ত সমিতি গঠিত হয়। ক্রমে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সেইস্থানে একটি রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়। এদিকে মাদ্রাজে ক্যাসল কারনানে (Castle Carnan) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ময়লাপুরে নিজস্ব জমিতে একখানি নবনির্মিত অট্টালিকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর স্থানান্তরিত হয়। এই মঠ দক্ষিণদেশে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহের প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুরুগৃহবাসের রীতিতে শিক্ষাদানের জন্য একটি ছাত্রাবাসও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কলিকাতায় ভক্ত কেদার চন্দ্র দাসের প্রদত্ত গোপাল নিয়োগী লেনে তিন কাঠা চারি ছটাক ভূমিখণ্ডের উপর স্বামী সারদানন্দের অশেষ পরিশ্রমের ফলে 'উদ্বোধন' গৃহ নির্মিত হইল। ১৯০৮ খৃঃ শেষভাগে 'উদ্বোধন' অফিস নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইল এবং ১৯০৯ খৃঃ ২৩শে মে[১] শ্রীমায়ের পাদস্পর্শে গৃহের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হইল। এই গৃহের দোতলায় শ্রীমাতাঠাকুরানীর থাকিবার ব্যবস্থা হইল। নীচতলায় স্থান পাইল 'উদ্বোধন' প্রকাশন বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্র। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা কলিকাতার দুইজন ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে কার্যকরী হইল। মহারাজের আদেশে বিজ্ঞানানন্দজী সেখানে যাইয়া গৃহনির্মাণকার্য তদারক করেন। পাকাবাড়ীতে সেবাশ্রম স্থাপিত হইলে সেবাকার্যের সুবিধা হইল, প্রসারও ঘটিল।

কাশী সেবাশ্রমেরও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। মহারাজের ইচ্ছানুসারে ভক্ত

১ ২৫ মে, ১৯০৯ তাং প্রেমানন্দজী লেখা পত্রের অংশঃ "গত পরশু পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কলিকাতার নূতন বাটীতে পৌঁছিয়াছেন।…১২নং গোপাল নিয়োগীর লেন, বাগবাজার তাঁর ঠিকানা।"

উপেন্দ্র নারায়ণ দেব চার হাজার টাকা দান করেন, তারিণী পাল তাঁহার জীবনের সর্বসঞ্চয় দুই হাজার টাকা দিলেন। এই অর্থের সাহায্যে ১৯০৬ খৃঃ ৩১শে জুলাই সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের জমি ক্রীত হইল। সেবাশ্রমের জন্য খাজাঞ্চীর বাগান খরিদ করিয়া নূতন গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তুতি চলিতেছিল।

মহারাজ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে সেবাশ্রমের এক একটি ওয়ার্ড বা ঘর নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচ যিনি বহন করিবেন সেই দাতা বা তাঁহার কোন প্রিয়জনের নামধাম পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হইবে। অল্পব্যয়ে প্রিয়জনের বিশেষতঃ পরলোক-গত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিরক্ষার এই সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করিলেন। মহারাজের নির্দেশে কোন কোন ভক্ত এইভাবে স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থদান করিতে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের এই পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহ হইলে, সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে অনেকগুলি স্মৃতিভবন অল্পসময়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল মহারাজ নূতন সংগৃহীত জমিতে সেবাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন। মহারাজের আদেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কিছুদিন কাশীতে বাস করিয়া গৃহনির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতিসকল করিয়া দেন এবং স্বামী সচ্চিদানন্দের তত্ত্বাবধানে গৃহনির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে। মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজ, রামলালদাদা ও বহু সাধুভক্ত লইয়া কাশীধামে আসেন এবং ১৬ই মে সেবাশ্রমের প্রধান প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। প্রাঙ্গণের বিল্বমূলে পূজা ও হোম হইবার পর মহারাজ প্রত্যেক বাড়ীতে নারায়ণশিলাসহ প্রবেশ করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইল, রাত্রে সুগায়ক অঘোরবাবু ভজনগানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন, এইভাবে উৎসবানন্দে সারাদিন অতিবাহিত হইল। রামাপুরা হইতে উঠিয়া আসিয়া নবনির্মিত বাড়ীতে ৪ঠা জুলাই হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মহারাজ এই যাত্রায় তিন সপ্তাহ কাশীবাস করিয়াছিলেন।

ব্রজধামে তীর্থযাত্রী, সাধু বৈরাগী ও সাধারণ দুঃস্থ লোকদের সেবাশুশ্রূষা করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোগী হন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভক্ত যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। অনতিবিলম্বে সেবাকার্য আরম্ভ করিতে উৎসুক হইয়া উদ্যোক্তাগণ বৃন্দাবনস্থিত কালাবাবুর কুঞ্জের দুই-তিন-খানা ঘর যাহাতে পাওয়া যায় এই মর্মে পুরীতে রামবাবুকে একখানা পত্র লেখেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি সেই পত্র পাইয়া

মহারাজকে দেখাইলেন। মহারাজ সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে[১] রামবাবু তাঁহাদের কালাবাবুর কুঞ্জের বহিরংশে অবস্থিত দোতলা বাড়ীর নীচের দুইখানি ঘর ছাড়িয়া দেন। একটি পরিচালক সমিতির দায়িত্বে যজ্ঞেশ্বরবাবু সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া মঠের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ সেবাকার্যের জন্য বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। অল্পসময়ের মধ্যে সেবাকেন্দ্রটি জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সেবাকাজের দায়িত্ব বাড়িয়া গেলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাকেন্দ্রটির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এইভাবে উত্তর ভারতের প্রধান তিনটি তীর্থস্থান—হরিদ্বার, কাশী ও বৃন্দাবনে সেবাশ্রম সংগঠিত হওয়ায় ধর্মসেবীদের নরনারায়ণসেবা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বাড়িল। মহারাজের আশীর্বাদ "তোমাদের কোটী কোটী বৎসরের তপস্যার কাজ হয়ে যাচ্ছে ঐ দরিদ্রনারায়ণের সেবায়" মাথায় লইয়া সামান্য সংখ্যক কর্মী এই সময়ে যে বিরাট সেবাযজ্ঞ সংসাধিত করিয়াছিলেন তাহার গৌরবময় ইতিহাস সকলের গর্বের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ঘর বাড়ী, কার্যসূচী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোগী কর্মী, যাঁহারা মনে-প্রাণে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সেবাযজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রকাশিত বিবরণীতে মঠ ও মিশন কর্তৃক স্বীকৃত সাতটি মঠ কেন্দ্র ও ছয়টি মিশন কেন্দ্রের উল্লেখ রহিয়াছে। এছাড়াও সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানসকল আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তি লাভ না করিলেও সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভে পুষ্ট হইয়াছিল, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন সরকারী আইনানুসারে তালিকাভুক্ত হইলেও এই সময়ে দেখা যায় মঠ ও মিশন প্রায় সমার্থক উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। মঠ ও মিশনের অন্তর্নিহিত শক্তি, জনসাধারণের প্রয়োজন ও সর্বোপরি ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সামান্য কয়েকজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিরাট সেবাযজ্ঞের উদ্বোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সঙ্ঘনায়ক মহারাজের

---

১ রামকৃষ্ণ বসুর দিনপঞ্জী হইতে গৃহীত।

ধর্ম ধরিয়া সেবা কাজ করিবার প্রেরণা হেমন্তের শিশিরকণার মত প্রস্ফুটোন্মুখ সাধক-কর্মীদের জীবন-গোলাপকে সঞ্জীবিত করিতেছিল, ধীর পদবিক্ষেপে সেবা-যজ্ঞ আশ্রয়পূর্বক সেবাশ্রম ও মঠ কেন্দ্রগুলি সমাজজীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করিতেছিল। ইহার পরবর্তী দশ বৎসরে উপরি-উক্ত কেন্দ্রগুলির কর্ম-পরিধি দ্রুত বিস্তারলাভ করে। ইহা ছাড়াও অনেক নূতন কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত কয়েকটি কেন্দ্র মঠ ও মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী দশ বৎসরে সম্প্রসারণের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্ঘনায়ক মহারাজের গতিবিধি ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করিলে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেতৃত্বের প্রভাব অনেকটা বোধগম্য হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে সময়ানুগ বাস্তবে রূপদানের মধ্য দিয়া ধর্মসঙ্ঘের যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বকীয় ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে সঙ্ঘ-শীর্ষে অবস্থিত মহারাজের নেতৃত্বধারা অনুসরণ করিলে।

মহারাজ যেখানেই যাইতেন, সঙ্গে থাকিতেন কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও সাধু-ব্রহ্মচারী। যে কোন কেন্দ্রে যাইয়া তিনি সর্বজনের চিত্তাকর্ষক এক আনন্দ আসর জমাইয়া রাখিতেন। দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ধর্মপ্রচারের জন্য বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন না। মহারাজ যখন প্রথম মাদ্রাজ মঠে যান, জনৈক ভক্ত রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রশ্ন করিলেন, "নূতন স্বামীজীর বক্তৃতা হবে কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "বক্তৃতায় আছে কি? এর মত মানুষের দর্শন স্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয়।" মহারাজের কার্যপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানে তাঁহার নির্দেশে পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন দিবারাত্র চলিতে থাকিত, মাঝে মাঝে তাঁহার মুখের দিব্যবাণী সমীপাগতদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিত, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা কখন কখন মহারাজের দিব্যভাবের প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হইত—যাহারা আসিত, দেখিত, সঙ্গ করিত, তাহারাই আনন্দে মাতিয়া উঠিত, তাহাদের মন স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরাভিমুখীন হইত।

মঠ মিশনের প্রত্যেক কেন্দ্রে গিয়া মহারাজ তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে লক্ষ্য করিতেন, সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফূর্তি কতখানি হইতেছে, সাধুব্রহ্মচারিগণ সঙ্ঘের আদর্শানুযায়ী চলিতেছে কি না, নিষ্কাম কর্ম ভিত্তিক নরনারায়ণ সেবাযজ্ঞের মূলসূত্রটি সাধক-সেবক ধরিতে পারিয়াছে কি না। অক্ষম কর্মীর দোষত্রুটি ক্ষমা

করিয়া তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে কর্মীকে সঠিক পথে চলিতে সাহায্য করিতেন, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ধর্মভাব প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অপর কয়েকজন সাধু সমভিব্যহারে হরিদ্বারের নিকটবর্তী কনখল আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রুগ্ন সাধু ও তীর্থযাত্রীদের অকাতরে সেবাশুশ্রূষা করিয়াও সেবাশ্রমের সাধুসেবকগণ তথাকার সাধুসমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন, কারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকার্য গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। তুষারধবল হিমালয়শৃঙ্গের ভাবগম্ভীর আবহাওয়া, পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর সুমধুর কলনিনাদ, মহাশক্তি সতীর পুণ্য জন্মভূমি ও লীলাস্থলের পবিত্র ও শুদ্ধ ভাবপ্রবাহ মহারাজকে তথায় সর্বদা মুগ্ধ করিয়া রাখিত। তিনি তথায় দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজের আদেশে বাংলাদেশ হইতে প্রতিমা আনাইয়া সেবাশ্রমে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইল। হিমালয় পাদপীঠ ও যুগযুগান্তব্যাপী সাধুজনসেবিত পুণ্যভূমিতে দেবীর পূজা মহা আনন্দের সৃষ্টি করিল। পূজোৎসব উপলক্ষে মহারাজ বিরাট এক সমষ্টি ভাণ্ডারায় তথাকার সাধুগোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। বহুসংখ্যক সাধু ভাণ্ডারায় যোগদান করেন। তাঁহাদিগকে বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইল। অপরপক্ষে তাঁহাদের অনেকেই মহারাজের তেজলাবণ্যমণ্ডিত সুন্দর শরীর ও সুমিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হন। কেহ কেহ মহারাজের নিকট সৎপ্রসঙ্গ করিতে আসিতেন। যাহা হউক, এই ঘটনার পর তথাকার সাধুসমাজের ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। দুর্গোৎসব সমাপনান্তে মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সেবকগণ কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমে আনন্দোৎসব লাগিয়া গেল। এখানে কালীপূজার অনুষ্ঠান করিতে মহারাজ সংকল্প করিয়াছিলেন। উভয় আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারিগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে স্থানীয় কারিগর ডাকিয়া আনিয়া প্রতিমা তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইল। মহারাজের নির্দেশে কাশী ও কলিকাতা হইতে পূজার যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া পূজার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল।

এদিকে শ্রীমা বায়ু পরিবর্তনের জন্য কালীপূজার তিনদিন পূর্বে ৫ই নভেম্বর কাশীতে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সমারোহপূর্বক

শ্যামাপূজা[১] অনুষ্ঠিত হইল। কয়েকদিন পরে বৃন্দাবন হইতে আগত কয়েকজন হিন্দুস্থানী অভিনেতা অদ্বৈতাশ্রমে 'রাসলীলা' অভিনয় করে। শ্রীমা দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাধা ও কৃষ্ণ ভূমিকার অভিনেতা বালকদ্বয়কে টাকা দিয়া প্রণাম করেন। ৩০ শে ডিসেম্বর শ্রীমায়ের জন্মোৎসব দিবস উপস্থিত হইল। ভক্ত নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উৎসবে এত সমারোহ হইয়াছিল যে, লোকে বলিত আশ্রমপ্রতিষ্ঠা অবধি এইরূপ আনন্দোৎসব পূর্বে কখনও হয় নাই। সেদিন শ্রীমা সকল ত্যাগী সন্তানকে একটি সুতীর কাপড় উপহার দিলেন, মহারাজকে দিলেন একটি রেশমী বস্ত্র। এই বৈষম্যের দিকে কেহ ইঙ্গিত করিলে শ্রীমা সহাস্যে বলিলেন, "রাখাল যে ছেলে।"

এইবারেই কাশীতে এমন একটি ঘটনা ঘটে, তাহা প্রসঙ্গান্তর হইলেও এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। ঘটনাটি 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "একদিন মা সারনাথ দেখিতে যান। কয়েকজন সাহেবও দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে অবাক হইয়া সারনাথের পুরাতন কীর্তি দেখিতেছেন। মা বলিলেন, 'যারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে। আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য সব করে গেছে!' সারনাথ হইতে ফিরিবার সময় মহারাজ নিজের গাড়ীতে মাকে পাঠাইলেন। প্রথমে মা কিছুতেই রাজী হন না, বলেন, 'না, না, ও গাড়ীতে রাখাল এসেছে, রাখাল ওরা যাবে। আমার এ গাড়ীতে কষ্ট হবে না।' মায়ের গাড়ী রওয়ানা হইয়া দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই মহারাজ যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন উহার ঘোড়া ক্ষেপিয়া গিয়া গাড়ীসমেত রাস্তার পাশে খানায় পড়িল। মহারাজের শরীর বহুস্থানে ছড়িয়া গিয়া রক্তারক্তি হইয়াছিল। মা এই ঘটনায় বলিয়াছিলেন, 'এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে ছিল। রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে। না হলে ছেলেপিলে (রাধু, ভূদেব প্রভৃতি) গাড়ীতে; কি যে হত।' "[২]

মহারাজ বলিতেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মত জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু

১ ঐ বৎসর ৺দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় ১৬ই অক্টোবর এবং ৺শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ৮ই নভেম্বর।

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৯ পৃষ্ঠা

জপধ্যান করলেই জমে যায়।" মহারাজের প্রেরণা লাভ করিয়া সাধুব্রহ্মচারিগণের মধ্যে সাধনভজনের উৎসাহ বাড়িয়া যায়, সেবাকার্য ও উপাসনা একসঙ্গে সাধন করিবার কৌশল তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া যুগধর্ম পালনে ব্রতী হয়। মহারাজ ছিলেন যেন অধ্যাত্মশক্তির একটি ডাইনামো; তাঁহার পুণ্য সাহচর্যে ধর্মসেবিগণ নিজেদের ব্যাটারী চার্জ করিয়া লইতেন, সেবকবৃন্দ "কর্ম ধরিয়া ধর্ম" সাধন করিবার রহস্য জানিয়া লইতেন। ছয়মাস কাশীধামে অবস্থানপূর্বক মহারাজ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল বেলুড় মঠের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত নবগোপালবাবুর ভক্তিমতী পত্নী নিস্তারিণী দেবীর একান্ত প্রার্থনায় মহারাজ পুনরায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর কাশীতে আসিলেন এবং নিস্তারিণী দেবীর নামে আয়োজিত দুর্গাপূজায় যোগদান করিয়া সকলকে আনন্দে মাতাইয়া তুলিলেন। মহারাজের আদেশে অম্বিকানন্দের নেতৃত্বে অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের অনেক সাধুব্রহ্মচারী সমবেত হইয়া ভজনকীর্তন অভ্যাস করিতে থাকেন। কিছুকালের মধ্যেই সুরতানলয় আয়ত্ত করিয়া আশ্রমবাসিগণ প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমন্ত্রিত হইয়া এই ভজনকীর্তনের দলটি দুর্গাবাড়ীতে ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে যাইয়া প্রায় তিনঘন্টা সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। এই দলের সঙ্গে যখন মহারাজ উপস্থিত থাকিতেন তখন এক উচ্চ ভাবের উদ্দীপন হইত, অপূর্ব এক জমজমাট আধ্যাত্মিক বাতাবরণ রচিত হইত।

বছর গড়াইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের দুর্গাপূজা উপস্থিত হইল। বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলায় বন্যা, অন্নকষ্ট ইত্যাদির সংবাদ মহারাজের কাছে পৌছাইল। আর্তদের সেবা করিবার জন্য সেবকগণ সাহায্যাদি লইয়া ধাবিত হইলেন। এদিকে মহারাজের আদেশে দুর্গাপূজা স্থগিত রাখিয়া কালীপূজা ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হইল। মহারাজের সাদর আহ্বানে দেরাদুন হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আলমোড়া হইতে স্বামী শিবানন্দ কাশীতে আসিলেন। বেলুড়মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দও আসিলেন মহারাজকে মঠে লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহাদের সকলের উপস্থিতিতে কালীপূজা উপলক্ষে দুই দিন দিব্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার স্মৃতি উপস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে চিরউজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মহারাজের দীর্ঘকাল উপস্থিতিতে অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়, সাধুব্রহ্মচারীদের ধর্মজীবন পুষ্টিলাভ করে। এই সময়েই মহারাজের পরামর্শ-ক্রমে সেবাশ্রম সংলগ্ন পঁচিশ বিঘা জমি সরকারের সাহায্যে ক্রয় করা হয়।

এইবার কাশীবাস করিবার সময় মহারাজ ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশাবলী সংকলন করিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ"[১] পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ করেন। মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া ঠাকুরের উপদেশাবলী লিখিতেন; সংকলন করিবার সময় অপর কাহাকেও ঘরে থাকিতে দিতেন না। তাঁহার সেবকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া কোনদিন উপদেশ সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি আনাইয়া সংশোধন করাইয়াছেন, কাহাকেও কাহাকেও তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, "ঠাকুর এসে বলে গেলেন, একথা তো আমি বলিনি—আমি এই বলেছি।" এই সংকলনকার্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর একটি ঘটনা ঘটিল। সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের নিকট শ্রুত কিছু বলিবার সময় 'বৈষ্ণবচরণ বল্‌ত' 'কেশব বল্‌ত' এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া বলিতেন। একদিন মহারাজকে দর্শন দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জানাইলেন যে, লিখিত একটি উপদেশ[২] তাঁহার নহে। পরে মনে পড়িল, সেই উপদেশটি তিনি গুজরাটে একজন সাধুর নিকট শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর দয়া করে আমাকে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।" অবিলম্বে তিনি ঐ উপদেশ-বাক্যটি বাদ দিলেন এবং সংকলনকার্যও সেখানে সমাপ্ত করিলেন। ঠাকুরের অমূল্য উপদেশাবলীর সার-সংগ্রহ মুমুক্ষুজনের অতি প্রিয় বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে।

১ মহারাজের সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'উদ্বোধনে'র প্রথম তিন বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংকলন-পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ words of the Master-এর ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন,
"It is indeed the labour of grateful love of the beloved disciple, than whom no one used to live so constantly with the Master, to set him at his rights before the public, seeing how his invaluable words are becoming roughly handled, deformed and distorted now-a-days, at the hands of many." (গুরুদেবের অমূল্য বাণী অনেকের অযত্নে বিকৃত ও কদর্থ হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণের সম্মুখে তাহা যথাযথ উপস্থাপিত করিবার জন্য এই সংকলন তাঁহার স্নেহধন্য শিষ্যের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রেমের নিদর্শন। তাঁহার চাইতে বেশী অপর কেহ গুরুদেবের সঙ্গলাভ করেন নাই)

২ মহারাজ প্রায়ই এই উপদেশমূলক গল্পটি বলিতেন। একজন সাধু গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, দেখিলেন একটি বিছা জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সাধুটি বিছাটিকে হাতে তুলিয়া গঙ্গার পারে রাখিলেন। বিছাটি সাধুর হাতে কামড়াইল। বিছাটি আবার জলে পড়িল, সাধুটিও আবার তুলিলেন কিন্তু আবার কামড় খাইলেন। ইহা কয়েকবার ঘটিল। অপর একজন সাধু এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উপদি-উক্ত সাধু বলিলেন, "বিছা তার স্বভাবানুযায়ী কামড়েছে, সাধুর স্বভাব অন্যকে রক্ষা করা, আমি তাই করছি।"

কাশী হইতে মহারাজ এলাহাবাদে যাইয়া তিনরাত্রি বাস করিলেন এবং বেণীমাধব ও ত্রিবেণীসঙ্গম দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। মহারাজ দীর্ঘকাল-যাবৎ বেলুড় মঠে যান নাই। প্রেমানন্দজী বলিতেন, "মহারাজ না থাকায় সকলই নীরস।" তিনি কাশী হইতে মহারাজের সঙ্গে এলাহাবাদ আসিয়াছিলেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া প্রেমানন্দজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ তোমায় মঠে যেতে হবেই!" বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাকে পদতলে দেখিয়া শশব্যস্তে মহারাজ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "ওকি, বাবুরামদা, ওকি! ওঠ ওঠ।" যতক্ষণ না মহারাজ মঠে যাইবার সম্মতি জানাইলেন ততক্ষণ প্রেমানন্দজী তদবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর মহারাজকে লইয়া তিনি ২৬শে নভেম্বর[১] বেলুড়মঠে পৌঁছিলেন।

মহারাজ মঠে দীর্ঘকাল পরে আসাতে নিত্যোৎসব শুরু হইল।[২] ভক্তগণের যাতায়াত বাড়িয়া গেল। মহারাজ একদিন মঠবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রেমানন্দজী-কে ডাকিয়া বলিলেন, "ছেলেদের ধ্যান তপস্যা সাধনভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না।" মহারাজ নিয়ম করিয়া দিলেন মঠের সকল সাধুব্রহ্মচারীকে ভোর চারটায় তাঁহার নিকটে জপধ্যান করিতে বসিতে হইবে। কেহ কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলে মহারাজ খোঁজ লইতেন, ঠাকুরের মন্দিরে বা স্বামীজীর মন্দিরে না বসিয়া সকলে মহারাজের ঘরে জপধ্যান করিতে আসিতেন। ভোর সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত জপধ্যান চলিবার পর সমবেতভাবে ভজন স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি হইত। ইহার পরে মহারাজ কোন কোন দিন সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। মঠবাসিগণ সাধনভজনে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সাধনভজনের জন্য তীব্র ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করিয়া মহারাজ বলিতেন, "উঠে পড়ে লাগ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' মরতে তো হবেই, দু'দিন আগে আর পরে। ভগবানের জন্য জীবনটা যদি যায় ত' লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। রোখ্ করে মনকে বলা বস্তুলাভ করবই করব।······ঠাকুরের এখানে যখন এসে পড়েছিস্, তখন আর ভাবনা কি? দুনিয়ার সব জিনিস ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁকে

১ প্রেমানন্দজী ২৭।১১।১৯১৪ তারিখে চিঠিতে লিখিয়াছেন, "গত বুধবার প্রয়াগ থেকে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছি।"

২ শিবরাত্রির দিন "শ্রীম" চিঠিতে লিখিয়াছেন, "Our dear Rakhal Maharaj has recently come back to the Math to the great joy of the Bhaktas,"

নিয়ে পড়ে থাক।” এই সময়কার প্রাণচঞ্চল মঠজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রেমানন্দজীর ২৫।১২।১৯১৫ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি তুরীয়ানন্দজী-কে লিখিয়াছেন “প্রতিদিনই ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে। নিত্য উৎসব চলেছে। এ বাড়ীতে আর স্থান হচ্ছে না। তাই গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মরণার্থ গৃহ শেষ করিবার জন্য মহারাজ খুব লেগেছেন। ······একটা বিরাট প্লাবন যেন আসবে তাঁর সূচনা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি, মহারাজ।”

পূর্ববঙ্গের ভক্তদের অনুরোধে মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য[১] সাধু-ভক্তদের লইয়া সর্বপ্রথম ৺কামাখ্যা তীর্থে গেলেন। সেখানে তিন রাত্রি বাস করিয়া ক্ষেত্রকর্মাদি সুসম্পন্ন করিয়া সদলবলে ২০শে জানুয়ারী (১৯১৬) ময়মনসিংহ পৌঁছিলেন। বহু ভক্ত স্টেশনে যাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। পরদিন বৈকালে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে একটি সভার আয়োজন হয়। ভক্তগণ মহারাজকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজে কিছু বলিলেন না, অপর কোন সঙ্গীকে বলিতে আদেশ করিলেন না, -তৎপরিবর্তে তাঁহার আদেশে রামনামসংকীর্তন হইয়াছিল। নূতন প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য উদ্যোক্তাগণ মহারাজকে অনুরোধ করিলেন, তিনিও করিতে সম্মত হইলেন। মহারাজের উপস্থিতিতে কি আনন্দোচ্ছ্বাস সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা বাবুরাম মহারাজের একটি পত্রে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাজকে পেয়ে আনন্দে বিভোর। দেশ মেতে গেছে। দেখছি সেই ডুবু ডুবুর ভাব, আর বোধ হয় ঢাকা ভেসে যাবে। কি সুন্দর ভাব, আপনি দেখলে খুব আনন্দ পেতেন, কেবল মাধুর্যময়। ছেলেরা এখানে নিজেরা খেটে একটা লম্বা ঘর তুলেছে। তাইতে গতকল্য ঠাকুর বসিলেন। মহারাজ কল্লেন পূজা, আরতি আর ভোগও দিলেন। গান স্তোত্রপাঠ হ'ল। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ছেলেরা মনে মনে বলেছিল যে যদি মহারাজ আসেন তবেই জানিব ঠাকুর আছেন নতুবা সব মিথ্যা। কল্পতরু প্রভু আমার তাই কামাখ্যাদেবীদর্শন উপলক্ষে মহারাজকে এখানে আনিলেন। ভক্ত যে চুম্বক, তাই ঠিক দেখলুম, কি কাণ্ড যে ঠাকুর কচ্ছেন তা

১ অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে ছিলেন শঙ্করানন্দ, মাধবানন্দ, অম্বিকানন্দ, হরিহরানন্দ, ব্রঃ অবিনাশ, ব্রঃ নরেন্দ্র ও ব্রঃ বিনোদ। (পাণ্ডাদের খাতা হইতে)

লিখে জানাবার নয়। যারা দেখেছে, কিছু কিছু বুঝেছে।"[১] সেখান হইতে ২৫শে জানুয়ারী মহারাজ সদলবলে ঢাকা সহরে উপস্থিত হইলেন, ভক্তদের মধ্যে আনন্দ উৎসবের হিল্লোল উঠিল। ঢাকা সহরে কায়েতটুলিস্থিত সারদা রায়চৌধুরীর বাড়ীতে মহারাজ অবস্থান করেন। ঢাকায় পৌছিবার পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ বলিলেন, "গত রাত্রে দেখলাম ঠাকুর এইখানে নৃত্য করছেন। ঠাকুরই তাঁর নিজের প্রচারকার্য নিজেই করছেন। আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র।" এই দৈব সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে, ভক্তদের মধ্যে উৎসাহের বন্যা প্রবাহিত হইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মহারাজ সদলবলে সেখানে যান। মহারাজের আদেশে মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দেন ; অতঃপর প্রেমানন্দজী ছাত্রদের ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে জীবনগঠন করিবার জন্য এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ যথাবিধি পূজা ও হোমের পর বর্তমান ঢাকা রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই যাত্রাতেই মহারাজ একদিন গেণ্ডেরিয়াতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম পরিদর্শন করেন। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইয়া ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তথা হইতে পদব্রজে দেওভোগে ভক্তপ্রবর সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান দর্শন করিতে যান। পূর্ববঙ্গে এইভাবে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ২৬৷২৭শে[২] ফেব্রুয়ারী মহারাজ বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিলেন, "এক অতি অপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে ওদেশে। অর্থব্যয় করে কত নিয়মবিধি চালিয়ে কত শক্তিমান পুরুষরা যা কত্তে অপারগ, মহারাজ প্রভুর শক্তিতে মাথায় হাত বুলাইয়া তাই করে এসেছেন। বোধ হয় মহা আপদ কেটে যাবে, লোকে নবজীবন লাভ করবে।"

রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সম্প্রসারণ ও প্রচারকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। হিমালয়ে অবস্থিত মায়াবতী আশ্রম কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রকাশন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ লাভ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তক-প্রকাশন বিভাগটি কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মায়াবতী দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুব জনপ্রিয় হয়। মাদ্রাজ মঠ সংগঠিত প্রকাশন বিভাগটি এইকালে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাংলাভাষায় প্রকাশনার বিপুল প্রসার ঘটে উদ্বোধন কার্যালয়

১ ময়মনসিংহ হইতে ২৪।১।১৬ তারিখে তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত পত্র।

২ ২৯।২।১৬ তারিখে স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, "আমরা দুই তিন দিন হইল ঢাকা প্রভৃতি ঘুরিয়া মঠে ফিরিয়াছি।"

হইতে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী মহাপুরুষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "আলমোড়াতে একটা আশ্রম স্থাপন করুন।" ইহা স্মরণ করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ সেইস্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। স্বামী তুরীয়ানন্দের অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় 'রামকৃষ্ণ কুটীর' প্রতিষ্ঠিত হয়; উদ্দেশ্য—সাধুব্রহ্মচারিগণ নির্জনে সাধনভজন করিবে। অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া স্বামী করুণানন্দ দেরাদুনের নিকট কিষেণপুরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি আশ্রম সংগঠন করেন। মায়াবতী হইতে ৩০ মাইল দূরে শ্যামলাতাল গ্রামে সাধুভক্তদের সাধনভজনের উদ্দেশ্যে স্বামী বিরজানন্দের চেষ্টায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়িয়া উঠে বিবেকানন্দ আশ্রম। ক্রমে স্থানীয় দরিদ্র পাহাড়ীদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া বিরজানন্দ একটি পত্র লিখিলেন; উত্তরে মহারাজ উড়িষ্যার ভদ্রক হইতে ৯ই জুন লিখিলেন, "নূতন আশ্রমের উদ্বোধন হয়ে গেছে এবং আমাদের স্বামীজীর নামে আশ্রমের নামকরণ হয়েছে শুনে ভারী খুশী হলুম।··· এই আশ্রমের আদর্শসিদ্ধির জন্য আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানবে। আশ্রমটি একবার দেখবার ইচ্ছা রইলো। স্টেশন থেকে যখন ত্রিশ মাইলের ভিতর, তখন মনে হয় যাওয়া খুব কঠিন হবে না।" শ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রম স্থাপিত হইল; নিকটবর্তী কোয়ালপাড়া গ্রামেও একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। এদিকে বাঁকুড়া, ঢাকার সোনারগাঁও, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা গ্রামের আশ্রমগুলি মঠকর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিলাভ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে জনৈক ভক্তের প্রদত্ত বাড়ীতে গদাধর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে সেখানে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের পূর্বপ্রান্তে জামতারা গ্রামে সাধনভজনের জন্য একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। সকলেই চাহিতেন মহারাজকে, কিন্তু সকল কেন্দ্রে তাঁহার যাওয়া সম্ভব হইত না। যে সকল কর্মকেন্দ্রে মহারাজ নিজে যাইতে পারিতেন না, সেখানকার কর্মিগণ মহারাজের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া ও পত্রমারফৎ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, তাঁহার শুভাশিস্ প্রার্থনা করিতেন।

দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করিয়া কেরল প্রদেশে স্বামী নির্মলানন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুর স্বামীজীর ভাব দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছিল। তিনি মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন, মহারাজ যেন

তাঁহার পূত স্পর্শদ্বারা সংগঠনোন্মুখ সংস্থাগুলিকে ধর্মভাবমণ্ডিত করিয়া দেন। মহারাজ তখন দাক্ষিণাত্যে যান, ইহা প্রেমানন্দজীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দের একান্ত অনুরোধে মহারাজ সম্মতি দিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই স্বামী নির্মলানন্দ ও কয়েকজন সাধুব্রহ্মচারীসহ মহারাজ মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাদ্রাজে যাইয়া দেখিলেন, নূতন মঠবাড়ীর নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ উহা অনুমোদন করিলেন এবং ৪ঠা আগস্ট ঐ বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন। অতঃপর ব্যাঙ্গালোরে যাইয়া তথাকার আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন এবং নভেম্বর মাসে মেলকোট, শিবসমুদ্র ও মহীশূর পরিভ্রমণ করিলেন। কয়েকদিন পরে ২৬শে নভেম্বর মহারাজ সদলবলে ব্যাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়া আলওয়াই[১], এর্ণারকুলম, কোট্টায়ম, হরিপাদ, কুইলান—প্রত্যেক স্থানে দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া ভক্তদের নানাভাবে অনুগৃহীত করিয়া ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছিলেন। সেস্থানে তিনি ৯ই ডিসেম্বর আশ্রমগৃহের 'শিলাপ্রতিষ্ঠা' করিলেন। ত্রিবান্দ্রাম হইতে মোটরে ১০ই ডিসেম্বর কন্যাকুমারী উপস্থিত হইলেন। সেইসময় দেখা গেল, মহারাজের সঙ্গলাভেচ্ছু ভক্তসংখ্যা প্রতিস্থানেই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বত্রিশজন হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজকর্মচারীদের চেষ্টায় সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা হইল। কন্যাকুমারীতে সাতদিন থাকিয়া সেখান হইতে সুচীন্দ্রম হইয়া মহারাজ ৩০শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোর পৌঁছিলেন। মহারাজের এই পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন স্থানে অকাতরে ধর্মদান দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন আচার্যদের ধর্মযাত্রার ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ব্যাঙ্গালোরে মহারাজের উপস্থিতিতে স্বামীজীর জন্মোৎসবের আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইল। কিছুদিন পর তিনি মাদ্রাজ যাইয়া সম্পূর্ণপ্রায় নূতন মঠগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির স্থাপনা করিলেন। সেদিন ছিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে

১ ২৭শে নভেম্বর অপরাহ্ণে মহারাজ আলওয়াইতে এক ভক্তসভায় ইংরাজীতে ভাষণ দেন। সেই ভাষণের অনুদিত কিয়দংশ: "দ্বৈতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত। এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতে পৌঁছুবে। ঈশ্বরকে প্রথমে বাহিরে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তরেও তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস ছাড়বে না। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত দ্বৈতভাবই অবলম্বন করতে হবে। সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। সমাধির স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।"
(পি. শেষাদ্রির স্মৃতিকথা: অনুবাদক—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য)

এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়া। ৬ই মে ছাত্রাবাসের জন্য পরিকল্পিত অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তরও মহারাজ-কর্তৃক স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে তিনি কাঞ্চী, তিরুপতি, পেরেমবুদূর প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইয়া যথারীতি তীর্থসেবা করিয়াছিলেন। প্রায় দশমাস দক্ষিণদেশে অবস্থান করিয়া তিনি সেই অঞ্চলের রামকৃষ্ণপ্রচারের ভাব-প্রদীপটি সুদীপ্ত করিলেন ; অনন্তর তিনি দলবলসহ ৯ই মে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

গুপ্তকাশী ভুবনেশ্বরে একটি মঠ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিয়া মহারাজ অসুস্থ স্বামী তুরীয়ানন্দকে লইয়া ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে 'উদ্বোধন' গৃহে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। দিন পনেরো পরে তাঁহার ডান পায়ে ও বাম হাতে অস্ত্রোপচার করা হইলে তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন।

সেইসময় মহারাজ অধিকাংশ দিন বলরাম ভবনে এবং কয়েকদিনের জন্য উদ্বোধনে বাস করিয়াছিলেন। সেইকালে মহারাজের একটি অনন্যসাধারণ আচরণ দেখিয়া জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, "মা, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ, হরি মহারাজ সকলেই আপনাকে প্রণাম করে যান, মহারাজ আসেন না কেন?" শ্রীমা উত্তরে বলেন, "রাখাল যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমাকে যখন ইচ্ছা করে, তখুনি দেখতে পায়।"[১]

স্বামী তুরীয়ানন্দ সুস্থ হইয়া উঠিবার পরেই স্বামী প্রেমানন্দ মারাত্মক কালাজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। রোগের সামান্য উপশম হইলে বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে বৈদ্যনাথধামে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথম দিকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকিলেও, অকস্মাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াতে তাঁহার জীবন সংশয় দেখা দিল। কলিকাতায় আনিয়া সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ৩০শে জুলাই (১৯১৮) তাঁহার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হইল।

ইহার পূর্বরাত্রে মহারাজ দেখিলেন, দুইটি অশরীরী মূর্তি পশ্চিমদিকের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া। এই অশুভ দর্শনে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সাধুরা নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিমর্ষভাবে ঘরবাহির করিতে থাকিলেন। তিনি গুরুভ্রাতার নিকট যাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবুরামদা,

১ চন্দ্রমোহন দত্তের স্মৃতিকথা হইতে।

ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো ?" বাবুরাম মহারাজ হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল "কৃপা, কৃপা, কৃপা।" বিকাল সোয়া চারটায় প্রেমের প্রতীক প্রেমানন্দজী স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতার অন্তর্ধানে মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন।

এদিকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় সংবাদ আসিল ভুবনেশ্বরে মঠগৃহের নির্মাণকার্য সমাপ্তপ্রায়। মহারাজ ভুবনেশ্বর যাইয়া ৩১শে অক্টোবর নবনির্মিত মঠগৃহের উদ্বোধন করিলেন এবং সেইস্থানে বাস করিয়া মরুভূমি-সদৃশ জমিতে ফুলফলের গাছ দ্বারা সাজাইয়া একটি তপোবন গড়িয়া তুলিলেন। মহারাজ বলিতেন, "সাধুব্রহ্মচারীরা এখানে বসে খুব সাধনভজন করবে আর আমি দেখে খুব আনন্দ করব।" এই সময়ে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হওয়াতে মহারাজ একটি সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া শিষ্য সেবকদের দ্বারা আর্তসেবার ব্যবস্থা করিলেন এবং দারিদ্র্যপীড়িত স্থানীয় লোকদের চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠার পর মহারাজ ঐ স্থানেই জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি ভুবনেশ্বর মঠ সম্বন্ধে বলিতেন, "এ স্থানটি যোগভূমি আর পুরী ভোগভূমি। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী ব'লে জানবে। এখানে একটু সাধনভজন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়; সাধনভজনের বিশেষ অনুকূল স্থান—ধ্যান সহজেই জমে।" এই অনুকূল পরিবেশে মহারাজ আপন-ভোলা হইয়া চলিতেন ফিরিতেন, আনন্দে বিরাজ করিতেন। নানাস্থান হইতে সাধুব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সেখানে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া, উপদেশ নির্দেশ দিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতেন। এই সময়েই মহারাজ জনৈক সাধুকে উপদেশ করিয়াছিলেন, "খুব জপ করবে, মনে মনে সব সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ অভ্যাস করবে। এটা ক্রমশঃ অভ্যাস হলে জপ সহজভাবে চলতে থাকে। এমন কি ঘুমের পূর্বে ও পরে সেই জপই চলে। একটা ছেলে যদি ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক করে তো তার পুণ্যে একটা মঠ চলে যায়।"

কর্মী সেবক শর্বানন্দ মহারাজের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইল, মাদ্রাজে নবনির্মিত ছাত্রাবাস ভবনটি দ্বারোদঘাটনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। মহারাজ সম্মতি দিলে সকল প্রস্তুতি

সম্পূর্ণ করা হইল। মহারাজ গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ভুবনেশ্বর হইতে যাত্রা করিলেন এবং পথে ওয়ালটেয়ারে অবতরণ করিয়া সমুদ্রতীরে ববিবিলি রাজভবনে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এখানেও আধ্যাত্মিক ভাবের আবহাওয়া বেশ আছে। সাধন-ভজনের জন্য এস্থানও অনুকূল।" ২৫শে এপ্রিল মহারাজ সদলবলে মাদ্রাজ স্টেশনে পৌছাইয়া দেখিলেন অগণিত ভক্ত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। মহারাজ ও শিবানন্দজীকে মাল্যভূষিত করিয়া ভক্তগণ জয়ধ্বনিপূর্বক আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১০ই মে মহারাজ ছাত্রগণের জন্য নবনির্মিত বিরাট অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গড়া দুই নিষ্ঠাবান কর্মী রামু ও রামানুজের উদ্যমে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল। উদ্বোধনকার্য-শেষে মহারাজ কর্মিদ্বয়কে প্রাণঢালা আশীর্বাদ করিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি স্বামী শিবানন্দকে লইয়া ব্যাঙ্গালোরে যান এবং সেখানকার আশ্রমে প্রায় চার মাস অবস্থান করেন।

মহারাজের আদেশে মাদ্রাজ মঠে দুর্গাপূজার আয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে ৺মায়ের প্রতিমা আনা হইল। মহারাজের উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। দক্ষিণদেশীয় ভক্তবৃন্দ বঙ্গের বিখ্যাত অকালবোধন উৎসবে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিল। কালীপূজার দিন প্রতিমায় পূজা অনুষ্ঠিত হইল। এইভাবে প্রায় মাসাধিককাল উৎসব-আনন্দ-তরঙ্গে ভক্তগণ অপার আনন্দে ভাসিতে থাকেন। ১৬ই অক্টোবর মহারাজ দুইজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস ও তিনজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান করেন। আরও কয়েক দিন মাদ্রাজে অবস্থান করিয়া মহারাজ ২১শে নভেম্বর রাত্রিবেলা ভুবনেশ্বর মঠে পেঁছাইলেন।

উনবিংশশতকের শেষপাদে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যধারার পরিলেখ রচিত হইয়াছিল। বিংশশতকের প্রথম বার বছরে দেশের তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘ গৃহীত কার্যসূচীসকল বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করিয়াছিল, পরীক্ষামূলক-ভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মসূচীতে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করিতেছিল, ধীর পদক্ষেপে নূতন কয়েকটি ক্ষেত্রে সেবাকার্য সুরু করিয়াছিল। বিদেশী সরকারের কোপদৃষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর অনেকটা স্বচ্ছন্দগতিতে মঠ ও মিশন তাহাদের কর্মপরিধি বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সেবাকেন্দ্র-

গুলিতে সেবাকার্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা দুই একটি সেবাকেন্দ্রের দিকে নজর করিলেই বুঝা যাইবে। কাশী সেবাশ্রম ও কনখল সেবাশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৫,৫৯৬ ও ৯,৩০৮ জন রোগীনারায়ণ চিকিৎসালাভ করে। ১২ বৎসর পরে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩, ২৫৪ ও ৩৩,৭১৭ জন। রোগীদের সেবার জন্য বেলুড়মঠ, বৃন্দাবন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঢাকা জিলার সোনারগাতে ও রেঙ্গুনে সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে কাজের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এইসময়ে। স্থায়ীভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিবাঙ্কুর, হরিপাদ, কুইলাণ্ডিতে। কর্ম বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয় মাদ্রাজ ও কলিকাতা সহর অঞ্চলে। এই কালেই ১৯১৫ সালে মালয়ালম ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ কেরলম্', ১৯১৪ খৃঃ-এ মাদ্রাজ হইতে ইংরাজীতে 'বেদান্ত কেশরী' আত্মপ্রকাশ করে ('ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা ১৯১৩ মে হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল)। এইসময়কার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় শিক্ষার প্রসারের দিকে সঙ্ঘ সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। গুরুকুলপ্রথায় শিক্ষাদানের জন্য ছাত্রাবাস, আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল বিভিন্নস্থানে। তাহাছাড়াও সাধারণভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছিল। স্বামী নির্বেদানন্দের দায়িত্বে গঠিত ছাত্রাবাস বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে নূতন আলোকবর্তিকাস্বরূপ। নারী-শিক্ষাক্ষেত্রে সুসংগঠিত নিবেদিতা বিদ্যালয় নিশ্চিতভাবে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মালয়দেশে বিবেকানন্দ আশ্রম, মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোরে ছাত্রাবাস, মাদ্রাজে বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকায়, সারগাছিতে ও সরিষাতে বিদ্যালয়, বেলুড়ে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র, বরাহনগরে অনাথাশ্রম উল্লেখযোগ্য। সেবাকার্যের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রাদি পাঠ ও সাধনভজনের বিশেষ উপযোগী মঠকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল উত্তর প্রদেশে আলমোড়া ও শ্যামলাতালে, বিহারের জামতারায় এবং দক্ষিণ কলিকাতায় (গদাধর আশ্রম)। ইহা ছাড়াও ব্যাপকভাবে আর্তত্রাণ সেবা কার্য পরিচালিত হইয়াছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। উৎসব-অনুষ্ঠান পাঠ-আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার হইতেছিল, অপরদিকে নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাদি চলিয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে আলোচ্য সময়ের শেষ পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সঙ্ঘের সেবা ও প্রচার কার্যসূচী বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছিল, দেশের মধ্যে নবজাগরণের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

মহারাজের সহজাত অবস্থানভূমি তিনগুণের অতীত আনন্দ-নিরানন্দের পরপারে এক অত্যাশ্চর্য লোক। ভুবনেশ্বরে ফিরিবার পর দেখা গেল তিনি গভীর অন্তর্মুখভাবে সর্বদা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। শুদ্ধমাত্র তাঁহার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা যেন বিশাল সঙ্ঘ পরিচালিত হইতে থাকিল। যে-সকল কর্মী সেই সময়ে তাঁহার নিকট আসিত, তাহারা দেখিতে পাইত তাঁহার দৃষ্টি জীবনের মুল-উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ বিষয়ে অধিকতর নিবিষ্ট। যাবতীয় কাজকর্মের মূলে রহিয়াছে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধনপূর্বক পরিপূর্ণতা লাভ করা। ভগবানলাভই মানুষের উদ্দেশ্য, মহারাজ এই ভাবটি চিরকাল ধরিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ। বেলুড়মঠে বসিবার ঘরে মিশনের বাৎসরিক সভা বসিয়াছে। সভাপতি মহারাজ। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতিও উপস্থিত। স্বামী শুদ্ধানন্দ আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিবার পর মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবার তুমি এদের কিছু উপদেশ দাও।···এরা এই দুপুর রৌদ্রে, পয়সা খরচ করে কষ্ট করে এখানে এসেছে কি এই শুকনো হিসাব নিকাশ শোনবার জন্য? এদের প্রাণে কিছু অমৃত ঢেলে দাও।" স্বামী প্রেমানন্দ সভাপতি 'মহারাজের' আদেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছোট ঘটনা, কিন্তু খুবই ভাবব্যঞ্জক। বিবিধ সেবাকর্মের দ্বারা সেবিতের ও সেবকের দেহমনের উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণে অমৃতসুধা বরিষণ ছিল মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য।

* * * *

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহার রাজবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহাকে নেতৃত্বপদে বৃত করিয়াছিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ যাঁহাকে আজীবন রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মগুরু, অপরদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগপ্রবর্তনের প্রধান নায়ক। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপন কার্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভূমিকা নির্দেশ করিয়া স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "Indeed, if the Swami Vivekananda was loved and cherished by the Master as the instrument by which to proclaim to the world his great Mission in the realm of religion—the Swami Brahmananda was no less regarded by him as the person to fill in an important and very

responsible place in the scheme of his religious organisation."[১] ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাববিপ্লবের গৌরবময় ইতিহাস আলোচনা করিলে সংগঠক ও নায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাস্বর জীবনের কার্যধারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। তাঁহার নেতৃত্বেই বহুকথিত অথচ অব্যবহৃত গীতোক্ত কর্মযোগের পুনরুজ্জীবন ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ জীবনের বিভিন্ন পাদে নিয়োগ হইতে দেখা গিয়াছিল। এই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে Standard Bearer পত্রিকা লিখিয়াছে: গভীর জলমগ্ন শিলাস্তূপ বিশাল দুর্গপ্রাসাদকে অনায়াসে ধারণ করিয়া থাকে। তেমনি ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকৃতি। যাহারা তাঁহার গভীর অন্তর্জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল কেবলমাত্র তাহারাই তাঁহার ন্যায় অধ্যাত্মচরিত্রের গোপনশক্তি এবং উহার গভীর তাৎপর্য কতকাংশে ধারণ করিতে পারিবে।[২]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, "ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ"[৩] ইহা আক্ষরিকভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। নিত্যসিদ্ধ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'যেমন অরণি কাষ্ঠ একটু ঘস্‌লেই আগুন, আবার না ঘস্‌লেও হয়', সদাই ভগবদানন্দে বিভোর, সামান্যতেই উদ্দীপন হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয় মন বাহ্যজগতের সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলে। জাগতিক রীতিনীতির সহিত পরিচিত আমাদের স্বভাবতঃই ধাঁধা লাগে, মহারাজ তাঁহার গভীর অন্তর্মুখীন মন লইয়া কিরূপে বিপুল এক ভাবান্দোলনের নেতৃত্ব করিলেন? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে মহারাজের নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আচার্যের ভূমিকায় মহারাজের লোকশিক্ষার প্রকৃত পরিচয়।

১ বঙ্গানুবাদ: প্রকৃতপক্ষে, স্বামী বিবেকানন্দ যদি তাঁহার গুরুদেবের মহৎ আদর্শ জগতে প্রচার করিবার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) পরিকল্পিত ধর্মসংস্থাপন কার্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন স্থান পূরণের যোগ্য পাত্র বলিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কম আদরণীয় ছিলেন না।

২ "He was of the nature of those, who, like deep-hidden under-rocks delight to carry upon the back of their being the heavy super-structure of stately castle-palaces. And only those who are in the know and could enter into deep inner contact with his soul, can be expected to realise to some degree the potent significance and secret power of the typical spiritual character, symbolised by Swami Brahmananda". ('Standard Bearer', Vol. 2. No. 33, dated 17th April, 1922).

৩ কথামৃত ৩।৯।৩।

সঙ্ঘের অঙ্গগণ, নবীন প্রাচীন যে যেখানেই থাকুক প্রত্যেকেই জানিত সম্পদে বিপদে সর্বাবস্থায় ঠাকুরের প্রতিভূ মহারাজ মাথার উপর রহিয়াছেন। দীর্ঘকাল ব্যবহারে 'মহারাজ' শব্দটি নিগূঢ় প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ভাবে মণ্ডিত হইয়াছিল ; প্রত্যেকেই বিভিন্ন অবস্থায় উহার মূল্য অনুভব করিত শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে, 'সব কিছু পাওয়া'র অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কাজকর্মে আশীর্বাদ ও অনুমোদন লাভের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনে পথনির্দেশ পাইবার আশায় প্রত্যেকেই মহারাজের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিত। মহারাজের গাম্ভীর্য-প্রলেপের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত প্রেমের আস্বাদন করিবার আশায় মহারাজের নিকটবর্তী হইবার, তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে উহা কেহ ছাড়িতে চাহিত না।

লোকসংগ্রহার্থে যে সকল মহাপ্রাণ অবতীর্ণ হন তাঁহাদের সকলের কর্মপদ্ধতি একই প্রকারের হয় না। ভগবদ্‌ভাবে অনুরক্ত মহারাজের শুদ্ধসত্ত্ব মন স্বভাবতঃই কর্মের রজঃ কণারাশিতে যেন লিপ্ত হইতে চাহিত না। তবুও তিনি তাঁহার ধ্যানপ্রশান্ত মন লইয়া দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে কর্ম ও উপাসনার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হওয়ায় ধর্মসঙ্ঘের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইয়াছিল। মহারাজের পরিচালনা-পদ্ধতি, কাজকর্ম সকলকিছুর মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার বাণী, "জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়। সাধন করে এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে এগিয়ে গেলে শেষে জানতে পারবি যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।" অধিনায়কের এই বাণী রূপায়ণের মূল রহস্য সঙ্ঘের অঙ্গগণ দেখিতে পাইতেন মহারাজের দিব্য জীবনে। তাঁহার অপাপবিদ্ধ মন ঈশ্বরের চিন্তায় সদা নিযুক্ত ছিল। এমন কি, যখন কোন কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও তাঁহার মনের সামান্য অংশমাত্র কর্মে নিয়োজিত হইত। তিনি শিষ্যসেবকদের পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, মনের বারো আনা অংশ ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাখিয়া মাত্র চার আনা মন দিয়া কাজকর্ম করিলে সুচারুভাবে নিষ্কাম কর্ম করা যায়। ধর্মসঙ্ঘের নরনারায়ণসেবা, প্রচার ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম ঈশ্বরকেন্দ্রিক হইবে, এই ভাবটি মহারাজ প্রত্যেক ঈশ্বরসেবীর হৃদয়ে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজের এই দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায় বৈদান্তিক স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি উক্তি

হইতে। তিনি মহারাজের মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ থেকে মিশনে ধর্মকে ধরে কর্মকে চালান শেষ হ'য়ে গেল।"[১]

মহারাজের নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বয়ং কর্মে লিপ্ত না হইয়াও তাঁহার অধ্যাত্মশক্তিতে যোগ্য কর্মিদল সংগঠন করিয়া, তাহাদিগকে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া দিয়া, সর্বোপরি তাঁহাদের আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নিজ সঙ্কল্পানুযায়ী কাজ করাইয়া লইতেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার স্নেহের 'রাখাল' সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "রাখালের সে ভাব নয়। ঝঞ্ঝাট বইতে পারে না। মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে। রাখালের ভাবই আলাদা।"[২] সঙ্ঘের কর্ণধাররূপে তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে সকল বিষয় বিবেচনা করিতেন, সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ত্যাগী বা গৃহস্থ সকল কর্মীর মূল যে ধর্মজীবন তাহা সবল ও পুষ্ট করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের মূল চাহিদা তাহার অধ্যাত্মক্ষুধা মিটাইতে পারিলে তাহার অন্যান্য যে কোন সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া যায়; তখনই তাহার পক্ষে প্রকৃত লোকহিতকর কর্ম করা সম্ভব হয়। দেখা যায়, তিনি প্রথম আট নয় বৎসর ব্যতীত পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্দিষ্ট কর্মে লিপ্ত হইতেন না, তৎসত্ত্বেও তিনি সকল স্তরের কর্মিগণের একান্ত নির্ভরযোগ্য পরিচালক ও প্রেরণাদাতারূপে বিরাজ করিয়াছেন।

মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ ছিলেন আমাদের পরিচালক, মঠের অধ্যক্ষপদের কর্তৃত্বদ্বারা নয়, তিনি আমাদিগকে পরিচালনা করতেন তাঁহার প্রেমের বশীকরণ শক্তির দ্বারা।" মহারাজের বামহস্তস্বরূপ মঠবিভাগের পরিচালক স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে[৩] লিখিয়াছিলেন," শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ প্রভৃতিকে ভালবাসায় কিনে ফেলেছিলেন, মহারাজও ঐ ভালবাসায় পরের ছেলেকে আপনার করেছেন। সেজন্য তাঁর কথায় ছেলেরা যথাতথা যায়, প্রাণপাত পরিশ্রম করে—কেবল

১ স্বামী প্রবোধানন্দের স্মৃতিকথা।
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা / দ্বিতীয় ভাগ / পৃঃ ১৫৬।
৩ ১১।৮।১৬ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে লিখিত।

ভালবাসায়।" সহকর্মী গুরুভ্রাতাদের অভিমত হইতে বুঝা যায়, কিরূপে অতি সামান্যসংখ্যক কর্মী লইয়া সঙ্ঘের পক্ষে বিপুল কর্মযজ্ঞ সংগঠন সম্ভবপর হইয়াছিল।

মহারাজের নায়কত্বের অপর একটি বৈশিষ্ট্য, আত্মারাম মহারাজের 'উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মস্ব'-ভাবে অবস্থান। তাঁহার নেতৃত্বকালের উত্তরার্ধে এই ভাবটি বিশেষ প্রকট হইয়াছিল। এই সকল উচ্চ ভাবের সমঝদার ছিলেন অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতারা। স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন, "দেখ তুমি যা লিখেছ, তা ঠিক আমি খুব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কর্তা হয়েও অকর্তা ভাবে থাকৃতে হয়। মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী আমায় এইটি কতকটা ধারণা করিয়ে দিয়াছেন। অনেক সময় আমি ঐটে আওড়াই।" এই অত্যাশ্চর্য শক্তিবলে মহারাজ যেস্থানেই অবস্থান করুন না কেন, সঙ্ঘদেহের সবত্র তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইত।

কর্ম ও উপাসনা, এই দুইটি ভাব পরস্পর অনুযোগী না হইয়া প্রতিযোগীরূপে সাধুকর্মীদের মধ্যে দেখা দেওয়ায় কখনও বা হতাশার ভাব আসিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে নিয়মিত কাজকর্ম ছাড়াও আর্তত্রাণ কার্যের জন্য বহু কর্মীর প্রয়োজন হইল। দুর্ভিক্ষনিবারণকার্য করিতে যাইয়া সাধনভজনের অসুবিধা হয় এই অজুহাতে অনেক কর্মী দ্বিধা করিতে থাকে। যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজী সঙ্ঘাধ্যক্ষের নিকট সমস্যা সবিস্তারে নিবেদন করিলেন। সেদিন ২রা ফেব্রুয়ারী। বিকাল চারটার সময় মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারী মহারাজের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় সমবেত হইলেন, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দও উপস্থিত হইলেন। সমীপাগতদের লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ভিতর শুনতে পাই কেহ কেহ বলে, মিশনের সব কাজগুলো সাধনের অন্তরায়—Relief work ইত্যাদি করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।...... আমাদের ভাব তোমরা বুঝতে পার না।[২] তোমাদের উচিত—

১ ৯।৮।১৬ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে লিখিত।

২ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯২১ খৃঃ, ১৪ই জানুয়ারী স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বাণী। তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেকে ধ্যানের চেয়ে এইসব কর্মকে নীচু বলে জানে, তারা এর মানে বোঝে না, নিজের খেয়ালে ঐরকম বলে।...সর্বভূতে আত্মদর্শন করে স্বামীজী এটা প্রবর্তন করেছেন, লোকে তা বুঝতে পাবে না। সেই পুরাণো কথা চট্‌কানো—ধ্যান জপ নিয়ে থাকতে চায়। তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।...রোগী বলে মনে করে, নারায়ণ বুদ্ধি নেই তাই হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি সকলেই নারায়ণ নয়? 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—তুমি দেখতে পাও না, সে তো তোমার দোষ।"

ভাবটা নেওয়া। অবশ্য আমি একথা পুনঃ পুনঃ বলি এবং এখনও জোর করে বলছি যে, দুর্ভিক্ষনিবারণকার্য ইত্যাদি যে কাজই করতে যাও, সকাল-সন্ধ্যায় এবং কর্মের শেষে এক একবার ভগবানকে ডেকে নেবে—জপ-ধ্যান করবে।·· ··· তোমাদের চোখের সামনে কি ভয়ানক লড়াই (ইউরোপে) হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? ওরা তুচ্ছ স্বদেশের জন্য স্ত্রী-পুত্র, ভোগবিলাস সব ত্যাগ করে নিজের নিজের কাঁচা মাথা দিচ্ছে, আর তোমরা তাদের চেয়েও এক মহত্তর উদ্দেশ্যে—ভগবানলাভের জন্য, জগতের হিতের জন্য—বাড়ীঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্ত প্রকাশ কর! স্বামীজী আমাদের বলতেন, 'ওরে, বহুজনহিতায় যদি একটা জন্ম বৃথাই গেল এরূপ মনে করিস—তা গেলই বা। কত জন্ম তো এমন আলস্যে বৃথা গেছে—একটা জন্ম না হয় জগতের কল্যাণের জন্যই গেল, ভয় কি?' আর ভয়েরও কারণ নেই।"[১] মহারাজের মুখে অভয়বাণী শুনিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সকলে সভা ত্যাগ করিল, সেবাকর্মের জন্য সকলে প্রস্তুত হইল।

কানামাছি খেলায় খেলোয়াড়রা যেমন বুড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখে, ত্যাগী ও গৃহস্থ কর্মিবৃন্দ সেইরূপ ঠাকুরের মানস-সন্তান মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিত। সকল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রস্থলে কর্ণধার মহারাজ অচঞ্চল কূটস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেন। অপরদিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে বৈষয়িক সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও বিশেষ উপকৃত বোধ করিয়াছে। মঠ বা মিশন কেন্দ্রগুলিতে জমি-নিবাচন, ঘর-বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা, সময় সময় প্রবেশদার বা বাড়ীর সম্মুখভাগের নক্সা প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজ তাঁহার সূক্ষ্ম রুচি ও বহুদর্শীর অভিজ্ঞতা লইয়া যে নির্দেশ দিতেন কর্মকর্তারা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। স্বামী সারদানন্দের মত অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীও প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মের জন্য মহারাজের উপদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা করিতেন। বেলুড়ে মাতৃমন্দির নির্মাণের সময় মন্দিরের সাধারণ নক্সা, চূড়াভাগের বিশেষ নক্সা সমস্ত কিছু ব্যাঙ্গালোরে মহারাজকে পাঠান এবং তাঁহার অনুমোদন পাইয়া নির্মাণকার্যে অগ্রসর হন। যে আশ্রমেই মহারাজ যাইতেন সেখানেই ফুলফলের বাগান করিতে নির্দেশ দিতেন, নানাস্থান হইতে গাছ সংগ্রহ করিয়া

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ···পৃঃ ৭০-৭৩,

দিতেন এবং কিভাবে গাছের যত্ন লইতে হইবে তাহাও শিখাইয়া দিতেন। বর্তমানে মঠ মিশনের প্রায় সকল স্থানেই দেখা যাইবে কিছু সবুজ ভূমিখণ্ড ও বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ফুলফলের গাছ। আশ্রমগুলির এই সুন্দর বেশ মহারাজের ইচ্ছার প্রতিরূপায়ণ মাত্র। যখনই কেহ কোন বিষয়, কোন জটিল সমস্যা লইয়া মহারাজের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি গৃহস্থই হউন বা সাধুভক্তই হউন, মহারাজের ভূয়োদর্শনজনিত পরামর্শে চমৎকৃত হইয়াছেন, দূরদর্শী মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করিয়া উপকার পাইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে মহারাজের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন জন যে সকল সমস্যা লইয়া সময় সময় উপস্থিত হইত, উহাদের বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল বিবিধ কারণে, নবীন প্রাচীন সকলেই নানা বিষয়ে মহারাজের নির্দেশ, সর্বোপরি তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিত, প্রাণে শান্তি পাইত। সকলের মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল যে ঠাকুরের মূর্তরূপ তাঁহার মানসপুত্র সকলের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের কাণ্ডারী—তাঁহার মধ্য দিয়া ঠাকুর জগতের কল্যাণ করিতেছেন। উপরন্তু মহারাজের কণ্ঠে, "সঙ্ঘের কাজ ঠাকুরেরই কাজ—ঠাকুর সঙ্ঘের ভিতর আছেন; তাঁর ইঙ্গিত না পেয়ে আমি কোন কাজ করি না," এই আশা-ভরসার বাণী শুনিয়া সকলে আরও তাঁহার মুখাপেক্ষী হইত।

নেতৃত্বের ভূমিকায় মহারাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কাহারও উপর কোন কার্যের ভার অর্পণ করিলে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর ষোল আনা নির্ভর করিতেন। আশ্রম পরিচালনা বা আর্তত্রাণসেবা বা ঠাকুরের সেবা বা ছোটখাট কোন কাজ—সকল ক্ষেত্রেই কর্মীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, অগাধ স্বাধীনতা দিতেন, ইহার ফলে প্রত্যেক কর্মী আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করিয়া কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইতেন, মহারাজের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান হইতেন। কাশীতে সাধুকর্মীদের লক্ষ্য করিয়া মহারাজ তাঁহার অনুসৃত নীতিটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, নিজের নিজের ভাবে সকলে এগিয়ে যাক। যখন দেখি পারছে না, তখন help (সাহায্য) করি।"[১] ইহাতে কর্মীরও নিজের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বিকাশে সাহায্য করিত, তাহার কর্মদক্ষতা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্ঘাধ্যক্ষ

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১১২

মহারাজের অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া সঙ্ঘের কর্মযজ্ঞ নিজস্ব ধারা ও উচ্চমান রাখিয়া চলিতে থাকিত।

মহারাজের নিকট কাজকর্মের পরিমাপগত মূল্যের অপেক্ষা উহার গুণগত মূল্যই ছিল প্রধান। কোন কর্মী 'কতখানি কাজ করিল' অপেক্ষা 'সে কিভাবে উহা করিল' এই মূল্যায়ন ছিল মহারাজের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম—জপধ্যান, পূজা-পাঠ, স্মরণ-মনন সব কিছুই ছিল জীবনবিকাশের সামগ্রিক একটি রূপ। পূজা-পাঠ বা রুগীর সেবা-শুশ্রূষা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কিছু নহে, সকল কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া একই ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটিতেছে। একদিন সকালে মহারাজ হঠাৎ একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা প্রত্যেকে একটা একটা করে আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে আয়, দেখি আজ ভোরে কার ঠিক ঠিক ধ্যান হয়েছিল।" আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকে একটি করিয়া আলুর খোসা ছাড়াইয়া আলুগুলি একত্রে মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি একটি আলু তুলিয়া ধরিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যে-ব্যক্তি ঐ আলুর খোসা ছাড়াইয়াছেন তাঁহারই ঠিক ঠিক ধ্যান হইয়াছে। পরে জানা গেল, ধ্যানী ব্যক্তিটি স্বামী শুদ্ধানন্দ। এই ছোট ঘটনা হইতে অনুধাবন করা যায়—কিরূপ এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহারাজ সকল কাজকর্মের মূল্য নিরূপণ করিতেন

সকল কাজকর্মের মধ্যেই দেখা যায় মহারাজ ব্যক্তি-সাধক ও সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সকল কর্মপ্রচেষ্টা একই উদ্দেশ্য-অভিমুখীন হওয়ায়, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তিনি যে নজির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের জন্য আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে।

একবার জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার সহধর্মিণীর অকালমৃত্যুতে মর্মাহত হইয়া মঠে নিয়মিতভাবে কিছুকাল আসিয়া সাধুসঙ্গ করিতে থাকেন। সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার মনে কল্যাণবুদ্ধির বিকাশ ঘটিল। রামকৃষ্ণ মিশনের জনকল্যাণব্রতের সহিত অধিকতর পরিচয় লাভ করিয়া তিনি তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা মিশনের কার্যে দান করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আন্তরিক আবেদনে কোমলহৃদয় প্রেমানন্দজী সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিলেন। তিনি একদিন অবসরসময়ে দাতার মনের ভাব মহারাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। নিকটে

দৃষ্ট আপাতহিতকর চিন্তাজাল ভেদপূর্বক মহারাজ তাঁহার দূরদৃষ্টিতে সব কিছু বিচার করিয়া দেখিতেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শোকে মুহ্যমান ভদ্রলোকের বৈরাগ্য নিতান্ত সাময়িক। এই দান গ্রহণ করিলে দাতা পরে ইহা লইয়া অনুশোচনা করিতে থাকিবে ও মানসিক যাতনা ভোগ করিবে। মহারাজ কিন্তু এই সত্যটি প্রকাশ করিলেন না, উপরন্তু তাঁহার বৈরাগ্যরঞ্জিত মনের সামান্য কণিকা গুরুভ্রাতাকে উপহার দিলেন। তিনি জোড়হাতপূর্বক গুরুভ্রাতাকে বলিলেন, "বাবুরামদা, সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'ল, আর তার সঙ্গ ক'রে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে?" বলা বাহুল্য, দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল।

জাগতিক দৃষ্টিতেও সঙ্ঘের কাঠামো সুদৃঢ় করিবার জন্য মহারাজ তাঁহার ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেন, "তিন পুরুষ পরে কিরূপ দাঁড়াবে ভেবে তবে এসব কাজ করতে হয়।" তাঁহার এই সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকিলে বুঝিতে পারা যায় তিনি কেন কখনও কোন দাতার বিরাট দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আবার কখনও সামান্য অবস্থার ব্যক্তির সামান্য দানও গ্রহণ করিয়াছেন বা নিজেই কোন কোন ভক্তকে অর্থদান করিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা লইয়াই তিনি জমি নির্বাচন, গৃহাদি নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতেন, ফলে তদনুযায়ী কার্য সমাধা করিয়া কর্মিগণ প্রত্যাশার অধিক সুফললাভ করিয়া আনন্দিত হইতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারসূত্রে মহারাজ লোক চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কখনও উপস্থিত ব্যক্তির শারীরিক লক্ষণাদি বিচার করিয়া, কখনও বা সাধারণভাবে দেখিয়া তাঁহার আন্তর-রাজ্যের পরিচয় লাভ করিতেন। ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা অনুসারে কাহাকেও সাধন-ভজনে জোর দিতে বলিতেন, কাহাকেও দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনা কাজে নিযুক্ত করিতেন, আবার কাহাকেও শাস্ত্রচর্চা করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। কাহারও কণ্ঠস্বর মিষ্ট জানিয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতে বলিতেন, কাহারও সুরতালবোধ আছে দেখিয়া অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পাঠাইতেন। সকল কাজকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সব বিষয়েই ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ ছিল আলোকবর্তিকা, প্রত্যেক সাধক-কর্মীর জীবনে অমৃতের স্পর্শলাভ করাই ছিল উদ্দেশ্য।

স্বাভাবিকভাবেই সঙ্ঘনায়ক মহারাজকে বহুবিধ শাসন ও শোধন সমস্যার

সম্মুখীন হইতে হইত। শাসন-শোধনের ব্যাপারেও মহারাজের অনবদ্য স্বকীয়তা তাঁহার মাধুর্যময় চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। শাসন-শৃঙ্খল বিষয়ে আলোচনার পূর্বে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্বামীজীর জনৈক শিষ্য ত্যাগ ও সেবার আদর্শে প্রণোদিত হইয়া নরনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় ও তাঁহার নিষ্ঠাগুণে কর্মে সাফল্য আসিয়াছিল, কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু জটিল কর্মচক্রে পড়িয়া তাঁহার কর্মযোগের প্রচেষ্টা কর্মভোগের অভিমুখীন হইল। তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মহারাজ তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে নির্জন কোন স্থানে যাইয়া সাধন-ভজন করিবার উপদেশ দিলেন। সাধক মহারাজের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইলেন।

মহারাজ তাঁহার সন্তানদের কর্মদক্ষতার উপর জোর দিতেন, তদপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতেন ধর্মজীবন বিকাশের উপর। একবার মহারাজ এক নবীন ব্রহ্মচারীকে কিছুদিন অন্তর দেখিতে পাইয়া দুঃখিত হইলেন, বুঝিলেন যুবক কর্ম-বিপাকে পড়িয়াছে। মহারাজ কর্মকেন্দ্রের প্রধান সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম কি কেরাণী তৈরী করার জন্য ?"

আরেকবার একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জনৈক অল্পবয়স্ক সাধুকে কর্মে অবহেলার জন্য তিরস্কার করিতেছিলেন। উহা মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রবীণ সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠিকই বলেছ, ছেলেটা কাজে গাফিলতি করে অন্যায় করেছে, তার জন্য একে বকা তোমার যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা বলত, একে কখনও জিজ্ঞাসা করেছ, সে নিজের প্রতি কর্তব্যপালন করেছে কি না ? কখনও একে জিজ্ঞাসা করেছ সে নিয়মিত ধ্যান করে কিনা অথবা ঈশ্বরলাভের পথে কোন বাধা হয়েছে কিনা ? ছেলেটার মনের উন্নতির চাইতেও কি মিশনের কাজটা বড় হল ?" কর্ম—নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক, কিন্তু কর্মের সহিত নিয়মিতভাবে ভগবানের স্মরণ মনন উপাসনাদি না করিলে কর্ম নিষ্কাম হওয়া কঠিন, বরঞ্চ ঠাকুর স্বামীজীর কর্ম উপলক্ষ্য করিয়া অহংতা-মমতার খাদ গভীর হইয়া উঠে, সেই স্বখাত খাদে পতিত হইয়া কর্মী অনেক দুর্ভোগ ভোগ করে। সেই কারণে মহারাজ কর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর্ম করিতে উপদেশ করিতেন।

ভাবের তরঙ্গ দূরকে নিকট করে। ভাবসূত্রের অবলম্বনেই সঙ্ঘের অঙ্গগণ একত্রে গ্রথিত। সেই ভাবসূত্রের গ্রন্থি দৃঢ় হয় প্রধানতঃ নিষ্কাম প্রেমদ্বারা।

নবীন সন্ন্যাসীদের পরিচালনার জন্য কিছু নূতন নিয়ম কানুনের সংযোজনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে মহারাজ তাঁহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী আমাদের জন্য নিয়মকানুন তৈরী করে গেছেন। আমাদের আর নূতন কিছু নিয়ম জুড়তে হবে না। আরও প্রেম দাও, আরও বেশী ভক্তিলাভ কর, অপর সকলকে ভগবান-লাভের পথে সাহায্য কর।"[১] ব্যক্তির আন্তর-জীবন গভীর ও ধর্মমণ্ডিত হইলে বহির্জীবন আপনা-আপনি সুসংগঠিত হয়। সঙ্ঘজীবনেও এই নীতির কার্য-কারিতায় তাঁহার ছিল গভীর বিশ্বাস।

নানাপ্রকারের দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা লইয়া মানুষ। সেসকল দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতার বাধা অতিক্রমপূর্বক মানুষ যাহাতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সুসমঞ্জসভাবে করিয়া যাহাতে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে—মহারাজ তাহার উপর গুরুত্ব দিতেন। ব্যক্তি হয়ত নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্যই অগ্রসর হইতে পারিল; তবুও তাহার প্রচেষ্টা ঈশ্বরাভিমুখীন করিয়া দিয়া, তাহাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়া দেওয়া ছিল মহারাজের পরিচালনার বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ কর্মী-সাধকের ভুলত্রুটি তিনি অগ্রাহ্য করিতেন। সাধু ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ ভক্ত কাহারও বড় রকমের কোন দোষ-ত্রুটি তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাকে স্বাধীনতার লম্বা দড়ি ছাড়িয়া দিতেন যাহাতে সে নিজের দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে। কখনও তিনি আকার-ইঙ্গিত, হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া দোষী ব্যক্তির ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন, কখনও বা দোষী ব্যক্তিকে সুযোগ সুবিধা জুটাইয়া দিয়া আত্মসংশোধনে সাহায্য করিতেন, আবার ঐ ব্যক্তি হতাশ হইয়া পড়িলে তাহাকে সদুপদেশ দিয়া উৎসাহ দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন। দয়া ও ক্ষমাই ছিল তাঁহার শাসনের ধারা। সর্বোপরি, সকলের প্রতি তাঁহার অপার করুণা ও স্নেহ শিষ্য-সেবকদের দোষত্রুটি পরিশুদ্ধ করিয়া লইত। মহারাজের নির্মল ভালবাসার মলয় প্রবাহে সকল সেবকবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষে পরিণত হইয়া নরনারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

দরদী মহারাজের শাসন করিবার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে

১ The Eternal Companion Brahmananda—Swami Prabhavananda, Vedanta Press, California (Third Edition), pp 59

যাইব। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কর্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া মহারাজ মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মঠে আসিয়াই শুনিলেন যে কাশী সেবাশ্রমের জনৈক কর্মী প্রলোভনে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সেবাশ্রমের নামে নানাস্থানে অর্থসংগ্রহ করিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেছে। অবিলম্বে খবরের কাগজের দ্বারা জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বিশেষ সুফল না হওয়ায় তাহাকে ধরিবার জন্য লোক লাগান হইল। তাহাতেও বিফল হইয়া অগত্যা আদালত হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হইল। আসামী দিনাজপুরে অর্থসংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, সেইসময় তাহাকে গ্রেফতার করা হইল। মিশনের তরফ হইতে ফরিয়াদী ছিলেন বোধানন্দ ও সাক্ষী ছিলেন মহারাজ। তাহারা মঠ হইতে এবং চারুবাবু কাশী হইতে খাতাপত্র লইয়া কোর্টে হাজির হইলেন। প্রথমতঃ আসামী নিজের সমস্ত অপরাধ অস্বীকার করে। অতঃপর মহারাজকে সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠিতে দেখিয়া সে অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলে এবং নিজের সকল অপরাধ স্বীকার করে। মহারাজকে আর কিছু বলিতে হইল না। অনুতপ্ত দোষী ব্যক্তির সাজা মুকুব করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল, আইনতঃ ইহা সম্ভবপর না হওয়াতে দণ্ড লঘু করিয়া তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। দয়াব সাগর মহারাজ ঐ ব্যক্তিকে পরে মঠে আসিয়া থাকিবার অনুমতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু সে ঐ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ধর্মসংঘের প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিক সম্পদ, সেই সম্পদ সমৃদ্ধ করিবার জন্য সংঘের কর্ণধার মহারাজ যেমন ব্যক্তিজীবন তেমনি গোষ্ঠীজীবনকে দৃঢ় নৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। নৈতিক স্খলন বা নীতিবহির্ভূত আচরণ, যাহা সঙ্ঘজীবনকে কোনভাবে আঘাত দিতে পারে, তিনি তাহার সহিত আপোষে মীমাংসা করিতেন না, সেক্ষেত্রে মহারাজ ছিলেন নির্মম, কঠোর। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখপূর্বক বিষয়টির আলোচনা করা যাইতে পারে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। মঠের দক্ষিণদিকে যেখানে খাটা পায়খানা ছিল তাহার সংলগ্ন বিঘাখানেক জমিটি পাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। জমির মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা ভক্ত রামকৃষ্ণবাবুর মা মাসখানেকের মধ্যে দিবার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু অবিলম্বে ব্যবস্থা না করিলে জমিখণ্ড হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা ছিল। মঠের তত্ত্বাবধায়ক স্বামী প্রেমানন্দ কলিকাতায় স্বামী সারদানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, মিশন ফণ্ড হইতে সাময়িকভাবে ঐ অর্থ দিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত

বিষয় শুনিয়া সারদানন্দজী সংঘাধ্যক্ষ মহারাজের অনুমোদন অপেক্ষায় তাঁহাকে কাশীতে সবিস্তার লিখিয়া জানাইলেন। মহারাজের নিকট হইতে উত্তর আসিল যে, তিনি বরং সংঘাধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন, তবুও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গচ্ছিত অর্থ অন্য বিষয়ের জন্য ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ত্রস্ত স্বামী সারদানন্দ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের সন্দেহ ছিল বলিয়াই বিশেষ বিবেচনার জন্য মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের নীতি 'মাছের কড়িতে শাক কেনা বা শাকের কড়িতে মাছ কেনা চলবে না' স্মরণ করাইয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে তিনি মঠে আসিয়া অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কয়েকদিন পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া অর্থসংগ্রহপূর্বক ঐ জমিখণ্ড ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহারাজের এই আচরণ ভবিষ্যতের আদর্শ নজির হইয়া রহিয়াছে।

আরেকটি ঘটনা। ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানীয় আর্তপীড়িতদের সেবা করিয়া জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ডাক্তার রতিকান্তবাবুর একনিষ্ঠ সেবা দেখিয়া মহারাজ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রতিকান্তবাবু যাহাতে ছোটখাট অস্ত্রোপচার করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত পদস্থ পুলিশ কর্মচারী (ডি, আই, জি.) সখীচাঁদবাবু অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অস্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দুইশত টাকা দান করেন। মহারাজ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ভুবনেশ্বরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন ভুবনেশ্বর মঠের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় ঐ অর্থ দিয়া দুঃস্থদের ঔষধপত্র কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। দাতা যে উদ্দেশ্যে অর্থ দিয়াছে, তৎভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হওয়ায় মহারাজ অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে কার্যান্তরে ভুবনেশ্বরে মঠ হইতে সরাইয়া দিলেন। এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীতি হইবে কি সুকঠিন নীতি-নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করিয়া মহারাজ ধর্মসংঘের বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

তিনি যেরূপ নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিতেন, তেমনি সেবাকর্মে নিযুক্ত সেবকদের আচার ব্যবহারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কর্মোন্মাদনায় কর্মী অনেক সময় বিনয় শিষ্টাচার প্রভৃতি ভুলিয়া যায়, ক্রমে অহঙ্কারজাত পঙ্কে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, সেই কারণে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহারাজ কর্মীদের

এইসকল ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে বিশেষ যত্ন লইতেন। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে তিনটি কেন্দ্রে আর্তসেবার কাজ চলিতে থাকে; সেবাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক সন্ন্যাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। ভক্ত সখীচাঁদবাবু বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর ধুতিশাড়ী সংগ্রহ করিয়া আর্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য উহা মহারাজকে আনিয়া দেন। বস্ত্রাভাবে খুবই কষ্ট পাইতেছে এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির একটি তালিকা সখীচাঁদবাবু তত্ত্বাবধায়ক মহারাজের হাতে দিয়া ঐ দুঃস্থ ব্যক্তিদের কাপড় বিতরণের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমরা ওদের খবরাখবর না নিয়ে, আপনি কাপড় দিয়েছেন বলেই আপনার কথামত কাপড় তাদের distribute (বিতরণ) করতে পারব না। মিশন থেকে যাকে দেওয়া সাব্যস্ত হবে তাকেই দেব।" এই রূঢ় আচরণে সখীচাঁদবাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। ঘটনাটি লোকপরম্পরায় মহারাজের কানে উঠে। তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে তলব করিলেন ও ঘটনার সত্যতা যাচাই করিলেন। সাধুকর্মী নিবেদন করিলেন যে, তিনি মিশনের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতেছেন মাত্র। বিরক্ত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "শিষ্টাচার মানাও ত' মিশনের নিয়ম, সেটা মানলে না কেন? ভালভাবে বুঝি বলা যেত না যে, খোঁজ করে দেখে ব্যবস্থাদি করব এবং প্রয়োজন হলে বুঝি তাকে সমস্ত তথ্য জানান যেত না?" এইভাবে মহারাজ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। মহারাজের আদেশে তিনি যাইয়া সখীচাঁদবাবুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সখীচাঁদবাবু লজ্জিত হইয়া মহারাজের নিকট আসিয়া বলেন, "আপনি এ কি করলেন, মহারাজ তিনি যে সাধু মানুষ।" মহারাজ বলিলেন, "না ঠিক হয়েছে, অহঙ্কার হয়ে গিছল।"

ব্যক্তির আচার-আচরণ সংশোধনে মহারাজ কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি সকলের উপর প্রয়োগ করিতেন না। অন্তর্দ্রষ্টা মহারাজ ব্যক্তি ও তাহার প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ ব্যবস্থাদি দিতেন। এই বৈচিত্র্য গোষ্ঠীর আচরণ নিয়মন সম্বন্ধেও সত্য। নরনারায়ণ সেবা উপলক্ষ্য করিয়া ব্যক্তি তাহার অহংতা-মমতার জালে গুটিপোকার ন্যায় নিজে বদ্ধ হয় ও সমভাবাপন্ন অপরকেও বদ্ধ করে। অহঙ্কারের মত্ততায় মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এইসকল ক্ষেত্রে মহারাজ যে সমাধান দিতেন তাহা শুধু সুষ্ঠু ও কল্যাণকর বলিয়াই বিবেচিত হইত না, তাহা বৈচিত্র্যে অতুলনীয় ও অননুকরণীয় হইত। কাশী সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমকে

কেন্দ্র করিয়া যে মন-কষাকষি ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আলোচনা করিলে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

কাশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে মন-কষাকষি ও বাকবিতণ্ডার তীব্রতা জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী সারদানন্দ কাশীতে দুইমাস বাস করিয়া প্রত্যেক কর্মীর সহিত সহানুভূতি ও ধৈর্যের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ও তথায় উপস্থিত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আলোচনা করিয়া একটি কর্মসূচী নিরূপণ করিলেন। সকলের নিকট উপস্থাপিত করিলে, মনে হইল উহা অধিকাংশের মনঃপূত হইয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে কয়েকজন অভিমত প্রকাশ করিলেন, ঐ সিদ্ধান্তবিষয়ে ব্রহ্মানন্দজীর অভিমত গ্রহণ করা উচিত, তিনি অনুমোদন করিলে কাহারও আর আপত্তি থাকিবে না। সারদানন্দজী সমস্ত ঘটনা ও আলোচনাদি বিস্তারিত লিখিয়া মহারাজকে জানাইলেন, মহারাজ প্রত্যুত্তরে সারদানন্দজীর সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। সকলেই সংঘাধ্যক্ষের কথা জানিতে পারিলেন। ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী দেখা গেল অদ্বৈতাশ্রমের কয়েকজন প্রাচীন সাধু সারদানন্দজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের কিছু অভিযোগ লইয়া। সমস্ত কিছু শুনিয়া নিরভিমান সারদানন্দজী, উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হাতজোড় করিয়া তাঁহাদের সকলকে অনুরোধ করিলেন, "অতীতে যা ঘটেছে তা ভুলে যাও। ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করতে নেমে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি ক'রো না। তোমাদের হাতজোড় করে বলছি, তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস কর, অন্তর দিয়ে ভালবাস। তাহ'লেই দেখবে সমস্ত ব্যাপার সমাধান হ'য়ে গেছে।" অভিযোগকারীগণ মাথা নীচু করিয়া একে একে স্থান ত্যাগ করিলেন। ক্রমে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাওয়ায় ইহার তিন সপ্তাহ পরে স্বামী সারদানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বিবদমান ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে শান্ত হইলেও, কিছুকালের মধ্যে পুনরায় অশান্তি প্রকাশ পাইল। এমনকি সেই অশান্ত ঝড়ের ধুলো-বালি বেলুড়-মঠের শান্তি বিঘ্নিত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। স্বামী সারদানন্দ এইবার অনন্যোপায় হইয়া ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, মহারাজকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ সম্মত হইলে তাঁহারা উভয়ে কাশীধামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজের

উপস্থিতিতে চারিদিকে এক সাড়া পড়িয়া গেল। নবীন প্রাচীন কর্মী যাঁহারাই মহারাজের নিকট আসিতে লাগিলেন, মহারাজ প্রত্যেককেই সাধনভজন সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পূজা, জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ ভজনাদি নতুন উৎসাহে দুই আশ্রমেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজ কাহাকেও কোন কাজের কথা বলিলেন না বা জিজ্ঞাসা করিলেন না। স্বামীজীর জন্মতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল ৩০শে জানুয়ারী। মহারাজ উদারহস্তে পঁয়ত্রিশজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দান করিলেন। আনন্দে উৎসবে সকলেই মাতিয়া উঠিল, জীবনের আরাধ্য ধন ভগবানলাভ বিষয়ে প্রত্যেকেরই মনে ব্যাকুলতা দেখা দিল, কর্মজাত অহংকারধূলি পরিষ্কৃত হইল। কেহ কেহ তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। মহারাজের সম্মতিক্রমে যে কর্মব্যবস্থা এক বৎসর পূর্বে স্বামী সারদানন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা নির্বাধ গতিতে চলিতে থাকিল ; আশ্রমিকদের দীর্ঘকালের মনোমালিন্য স্থায়ীভাবে মিটিয়া গেল। মহারাজ এই সময়ে যেন এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে সর্বদাই বিরাজ করিতেন ; তাঁহার আশেপাশে যাহারাই আসিত, বসিত, তাহাদের অন্তর প্রশান্তির বিমল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। আনন্দময় মহারাজের সান্নিধ্যে আশ্রমদ্বয়ের পরিবেশ আনন্দময় হইয়া উঠিল। একদিন স্বামী সারদানন্দ সবিনয়ে মহারাজকে বলিলেন, "সাধু না হয়ে তোমার রাজা হওয়া উচিত ছিল। আমি আর হরি মহারাজ দু'জনের মিলিত বুদ্ধিতেও যেখানে কূল দেখতে পাচ্ছিলুম না, কত সহজে তার কিনারা করে দিলে।" মহারাজ পুনঃ ভুবনেশ্বর মঠে ফিরিয়া গেলেন।

স্বতন্ত্রপুরুষ মহারাজ তাঁহার অতুলনীয় অনবদ্য পদ্ধতিতে সঙ্ঘের পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট নিত্যসত্য ভগবান ও অনিত্য সংসারের মধ্যে যে বাঁধ তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সর্বত্রই ছিল তাঁহার অবাধ গতি। তাঁহার দৃষ্টিতে "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ", ইহা ব্যতীত জগতের ভিন্ন অস্তিত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অসংস্কৃত মনবুদ্ধি দ্বারা কাজকর্ম করিয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মন লইয়া মহারাজ অপরের অগম্য শক্তিতে কত সহজেই না বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, পুলকিত হই, তাহার মহিমা আস্বাদন করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গৌরবময় ইতিহাসে মহারাজ

সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহার নেতৃত্বের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় ও সিদ্ধির ব্যাপ্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যিনি ধ্যানে-জ্ঞানে আচারে-ব্যবহারে রামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে সংঘাচার্যের ভূমিকায় যাঁহাদের নিকট-সান্নিধ্যে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতায় পরিস্ফুট হইয়াছে ব্রহ্মানন্দ-শক্তির নিহিত তাৎপর্যটি। ভগিনি দেবমাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা লিখিয়াছেন, "In this familiar daily intercourse the disciple caught the glint of the Master's effulgence It shone through all he said, all he did, all he was. It gave him unlimited power and insight, and an authority no one thought to dispute. This last he used sparingly. He led rather by quiet appeal than by more insistent methods, but so mighty was his spiritual force that his gentlest suggestion was to those who heard it, a word of command."[১]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন করা দুঃসাধ্য।[২] পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক দীর্ঘকালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া মহারাজের নেতৃত্বকালে যে মহাশক্তির জাগরণ হইয়াছিল তাহা নিরূপণের চেষ্টা করিবেন। ১৮৯৫ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বছরের ঘটনাপঞ্জীর দিকে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণাবতারের ধর্মসংস্থাপনের যোগ্য যন্ত্রস্বরূপ রামকৃষ্ণসংঘের সূচনা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই সূচনাকাল হইতে বিশাল শক্তিশালী পবিত্র ধর্মসংঘরূপে ইহা রূপপরিগ্রহ করে মহারাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "In fact

১ Ramakrishna Math, Mylapore, Madras হইতে প্রকাশিত "Spiritual teachings of Swami Brahmananda" গ্রন্থে ভগিনী দেবমাতা লিখিত ভূমিকার অংশ। 2nd Edition ; 1933 p. v

২ তাঁহার নেতৃত্বের একটি মূল্যায়ন করিয়াছেন সুপণ্ডিত স্বামী অশোকানন্দ। তিনি লিখিয়াছেন: "As a matter of fact, everything had flourished under his leadership. All the various activities started by Swami Vivekananda had taken root, and some fifteen monasteries throughout India had been added to those existing when, twenty years earlier, he had taken up the responsibilities of president. The spirit of the Order had become established, and its patterns were set." (Swami Brahmananda, 1970. p. 52).

under the paternal care of the Raja Maharaj, the first President of the Ramakrishna Mission, the organisation that had but existed as a seed in the monastery of Baranagore assumed its present form of a mighty plant."

ঠাকুর-মা-স্বামীজী, এই ত্রিপুটিশক্তি প্রতিষ্ঠিত নবযুগের আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন আদর্শের নিষ্ঠাবান ধারক ও বাহক রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কর্ণধার স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আদর্শবৃক্ষ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্বক সম্প্রসারিত হইয়াছে, ধর্মান্দোলন প্রবল হইয়া ভারতভূমির আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিয়াছে। নূতন যুগের আদর্শ গণনারায়ণের সেবায় বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম ও উপাসনার মধ্যে যে ভাবগত বিরোধ হিন্দুসমাজে পুনঃ পুনঃ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার প্রতিফলনস্বরূপ সঙ্ঘসেবীদের মধ্যে সময় সময় সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে সেই আপাত-অসামঞ্জস্যের সমন্বয়সাধন পুনর্বার এবং নিশ্চিত ও স্থায়ীভাবে এই কালেই সম্ভব হইয়াছে। ঠাকুর-স্বামীজী-প্রদর্শিত নূতন চিন্তার দীর্ঘকাল ব্যাপক প্রয়োগের ফলে সঙ্ঘসেবিগণ সংশয়মুক্ত হইয়াছে, সাধকগণ নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সঙ্ঘনেতা ধর্মসঙ্ঘের মূলকেন্দ্রে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করিয়া সঙ্ঘদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বলিষ্ঠ ধর্মভাব সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। 'ভগবানলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য' এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ সঙ্ঘসেবিগণ নর-নারায়ণসেবার দ্বারা নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে অভ্যাস করিয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নর-নারায়ণসেবা নবযুগের উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট সাধনমার্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অধ্যাত্মভিত্তিক সেবাকার্য পাছে কখনও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া ভগবদ্ভাবের বদলে শুধুমাত্র জনসেবাতে মাত্র পরিণত হয় এই আশঙ্কা হইতে সঙ্ঘের কর্মসূচীকে মুক্ত রাখিবার জন্য মহারাজের চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রত্যেক সাধুকর্মী যাহাতে 'জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানলাভ' আদর্শটি সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকে এবং এই আদর্শের পরিপোষক হিসাবে সেবাকার্যে ব্রতী হয় সেই বিষয়ে তিনি সকলকে হুঁসিয়ার করিয়া দিতেন, প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রের কর্মগতিও তদভিমুখীন পরিচালিত করিতেন।

চতুর্থতঃ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য অবদান সর্বধর্মসমন্বয় সারা বিশ্বে প্রচার করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'অসম্প্রদায়িক সম্প্রদায়' রামকৃষ্ণসঙ্ঘ এই মহান্ ভাবটি স্বায়ত্তীকরণের দুষ্কর ব্রত এই কালেই উদ্‌যাপন করিয়া ভবিষ্যতের

নিশানা দিয়াছিল। এই বিষয়েও মহারাজের অতুলনীয় অবদান বিশেষ স্মরণীয়। পঞ্চমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের সমবেত চর্যায় আলোচ্য কয়েক বৎসরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের গৌরবময় স্বর্ণযুগ রচিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের যে মাহাত্ম্য সঙ্ঘদেহ অবলম্বনে ধীরে ধীরে প্রকটিত হইতেছিল তাহা সুস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছিল এই স্বর্ণযুগেই। ষষ্ঠতঃ, মহাপুরুষদের আচার-আচরণকে মূল করিয়া যে ঐতিহ্য জন্মলাভ করে, ধর্মসঙ্ঘ তাহাই আদর্শস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া ভবিষ্যতের ইতিকর্তব্য নির্ণয় করে। বস্তুতঃ, মহাপুরুষদের অনুসৃত পথ আশ্রয় করিয়া সঙ্ঘসেবিগণ দাগা বুলাইয়া থাকে মাত্র। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভবিষ্যতের বুনিয়াদস্বরূপ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আলোচ্যকালেই একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই দিক হইতেও সঙ্ঘনায়ক মহারাজের পরিচালনাকাল বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বশেষে, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে বিচার করিলে ঈশ্বরকোটি অবতারপার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে কর্মযজ্ঞ করিয়াছেন, তাহা প্রশাসনিক কর্মবিধির সীমায় বদ্ধ নহে, প্রচলিত কর্মধারার হিসাবের বাহিরে। যেমন, শার্সির ঘরে বসিয়া থাকলে ভিতরের ও বাহিরের দুই-ই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরকোটি পুরুষ আত্মস্থ থাকিয়াও শুধুমাত্র কল্যাণেচ্ছা দ্বারা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বাহিরের কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতিটি আচরণ জীবের কল্যাণ-অভিমুখীন, উপরন্তু তাঁহাদের লোকহিতকর্মসাধন শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ লীলামাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'সদগুরু'

ষষ্ঠ অধ্যায়

‘সদ্‌গুরু’

গুরুশক্তির গূঢ় তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, “বেদান্তকার আবার একমাত্র ঈশ্বর-পুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তিনিই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষদিগকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, এইরূপ পুরুষেরা লোককল্যাণকর এক একটি বিশেষ কার্যের জন্যই আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদুপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইয়া আসেন দেখিয়া ইহাদিগকে ‘আধিকারিক’ নাম প্রদান করিয়াছেন।…এই সকল পুরুষের ভিতর কতকগুলিকে ঈশ্বরাবতার এবং কতকগুলিকে স্বাংশঅনির্বাণপ্রাপ্ত নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

“গুরুভাবটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই ভাব। অজ্ঞানমোহে পতিত জীবকে উহার পারে স্বয়ং যাইতে অক্ষম দেখিয়া তিনিই অপার করুণায় তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে আগ্রহবান হন। ঈশ্বরের সেই করুণাপূর্ণ আগ্রহ এবং তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া চেষ্টাদিই শ্রীগুরু ও গুরুভাব। ইতর সাধারণ মানবের ধরিবার বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই গুরুভাব কখন কখন বিশেষ বিশেষ নরাকারে আমাদের নিকট আবহমানকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সে সকল পুরুষকেই জগৎ অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, অবতারপুরুষেরাই মানবসাধারণের যথার্থ গুরু।”[১]

অবতারপুরুষে প্রকটিত গুরুশক্তি সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিয়াছেন, “(অবতাররূপে পূজিত) মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূলস্থান অধিকার করিয়া আছেন, দুঃখময় সংসারে তাঁহারাই মানবমনে বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ জনসাধারণের

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৪২-৪৩।

গোচর করিয়া এবং নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কত শত নর-নারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা জন্মদাতামাত্র, কিন্তু তাঁহারা নিত্য-সুখশান্তিপ্রসবিনী, অপবর্গকারণভূতা পরমাবিদ্যা দান করিয়া থাকেন, এইজন্যই তাঁহারা 'গুরুপদবাচ্য।'"[১]

গুরুশক্তির স্ফুরিতাধার অবতার সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, "অবতার, আধ্যাত্মিক রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, সবদেশের সর্বকালের লোকগুরু কালে কালে অনেক হইলেও একই ব্যক্তি, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্তভাবে উদিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত।"[২] আত্মারাম অবতারপুরুষের মধ্যে যে অমিতবেগ গুরুশক্তির স্ফুরণ হয় তাহা তাঁহার কোনও অভাববোধপ্রসূত নহে, তাহাতে বিদ্যমান শুধুমাত্র লোককল্যাণেচ্ছা।

অবতারপুরুষ ধর্মসংস্থাপক, ধর্মসংরক্ষক। অবতারের পার্ষদগণ তাঁহার সৃষ্ট বা সংযোজিত ধর্মভাবকে সর্বতোভাবে লালনপালন করিয়া পুষ্ট করেন, বিভিন্নভাবে উহা ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের নিকট সহজলভ্য করিয়া তোলেন। অবতারপুরুষের আধারে স্ফুরিত কালশক্তি, ঐশীশক্তি বা গুরুশক্তি তাঁহার নিজের দ্বারা এবং তাঁহার নির্বাচিত ধারক-বাহক ভক্তহৃদয় অবলম্বন করিয়া লোকহিতব্রতে নিয়োজিত হয়। সপার্ষদ অবতারপুরুষকে আশ্রয়পূর্বক প্রকটিত লোককল্যাণশক্তি প্রাগুক্ত গুরুশক্তির সামগ্রিকরূপ। গুরুশক্তিরূপ লোককল্যাণশক্তির প্রভাবে মানুষ বহির্বিশ্বের ভোগলালসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তররাজ্যে অমৃত-সন্ধানে প্রয়াসী হয়; ঐ শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জাগতিক দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কলুষ বর্জন করিয়া দৈবগুণরাশি ধারণ করিতে সমর্থ হয়; ঐ মহৎ শক্তির কৃপায় বিভাবিত ভাগ্যধর মানুষ ধর্মপ্রতিমাকে জীবন্ত অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে অবতীর্ণ কালশক্তি বা গুরুশক্তি লোকসংগ্রহার্থে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কয়েকজন ঈশ্বরকোটি নিত্যপার্ষদ। শ্রীমাতাঠাকুরানীও বলিয়াছিলেন, "তিনি এসেছিলেন আর তাঁর এই সব সাঙ্গোপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন,

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ: 'রামকৃষ্ণতত্ত্বাভাস', উদ্বোধন ৮ম বর্ষ, ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যা।
২ স্বামী সারদানন্দ: 'ভারতে শক্তিপূজা', পৃঃ ৩৩; ৯ম সং, ১৩৬৫

রাখাল, বলরাম, ভবনাথ, মনোমোহন—কত বলব, মা।···ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।"[১] প্রকৃত ধর্মের পুনরুজ্জীবন, সবল ও শক্তিশালী আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অবিকৃত সত্যের প্রচার নিজ নিজ জীবনে পালন দ্বারা সদৃষ্টান্ত তত্ত্ব লোকসমক্ষে অভিব্যক্ত করিবার জন্য অবতারপুরুষ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে চিহ্নিত করিয়া দেন। নিঃসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি আধিকারিক পুরুষ যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা 'মহারাজ' নামে সুপরিচিত তিনিও অবতারপুরুষ কর্তৃক লোকশিক্ষা দিবার জন্য চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের চাপরাসপ্রাপ্ত আচার্যগণই লোকশিক্ষা দিবার প্রকৃত অধিকারী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলেন, "লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তা হলে হ'তে পারে।···আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে?···আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সে-কথা অনুসারে কাজ করবে না।"[২] স্বামী ব্রহ্মানন্দও অন্যতম চাপরাসপ্রাপ্ত লোকশিক্ষক, সেই কারণে তাঁহার কথাবার্তায় প্রতিটি আচরণে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে অমিত শক্তি ও তাহার দুর্দম্য প্রভাব।

সূর্যকিরণ সর্বত্র সমান কিরণ বিকিরণ করিলেও স্বচ্ছ আতসকাচের মধ্যে উহা ঘনীভূত হইয়া অবিলম্বে অগ্নি উৎপাদন করে। বর্ষার বারিধারা ঘরবাড়ী গাছপালা সর্বত্র পড়িলেও সেই জল পাকা বাড়ীর ছাদ-সংলগ্ন নল দিয়া হুড়হুড় করিয়া পড়ে; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ গুরুশক্তি সতত সর্বত্র করুণাধারা বর্ষণ করিলেও উহা নির্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা তাঁহারই নির্বাচিত আধিকারিক পুরুষের মধ্য দিয়া প্রবলশক্তিসম্পন্ন হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ এই মহাশক্তির বিকাশ সহজে বুঝিতে পারে না, চিনিতে পারে না। অমিত তেজসম্পন্ন ঐশী শক্তি দুর্বল মানুষ-দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহাকে জানিতে

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫২-৫৩
২ কথামৃত ১।২।৮

ও চিনিতে কষ্ট হয়। এই মহান্ শক্তি কাহারও কাহারও নিকট কৃপায় স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৃপাবশতঃ যখন তিনি শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়মুকুরে উদ্ভাসিত হন তখন সেই শক্তির মহিমা কিঞ্চিৎ অবধারণ করিয়া ভক্ত জীবন সার্থক করে। কিন্তু তিনি স্বস্বরূপ প্রকাশ না করিলেও ভক্তজন বা সাধারণ মানুষ সকলেই অজ্ঞাত এক আকর্ষণে আধিকারিক পুরুষগণের আনন্দসঙ্গ লাভ করিবার জন্য হৃদয়ে তীব্র টান অনুভব করিয়া থাকে। গুরুশক্তিরূপে বিরাজিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি-উৎস হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া, সেই গুরুশক্তিরই অঙ্গস্বরূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই গুরুশক্তির উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অতুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার দিব্য জীবনপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে থাকিলে তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিবার তাৎপর্যসকল পরিস্ফুট হইতে থাকে। সেইসঙ্গে প্রস্ফুটিত কমলগন্ধে আকৃষ্ট ভক্ত-অলিকুল আবিষ্ট হইয়া মধুসংগ্রহ করিতে ছুটিয়া আসে। তাঁহার ন্যায় আধিকারিক পুরুষের জীবন বিকশিত হইবার অর্থই হইল লোককল্যাণে নিহিত গুরুশক্তির আত্মপ্রকাশ। স্বামী সারদানন্দ ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন, "জীব সকলপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমাধিতে আত্মানুভবের পরম আনন্দ একবার কোনরূপে পাইলে আর সংসারে কোন কারণেই ফিরিতে চাহে না, আধিকারিক পুরুষদিগের জীবনে সে আনন্দ যেমনি অনুভব হয়, অমনি মনে হয় অপর সকলকে কি উপায়ে এ আনন্দের ভাগী করিতে পারি। জীবের ঈশ্বর দর্শনের পরে আর কোন কার্যই থাকে না। আধিকারিক পুরুষদিগের সেই দর্শনলাভের পরেই, যে বিশেষ কার্য করিবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবং সেই কার্য করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য আধিকারিক পুরুষদিগের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যতদিন না তাঁহারা যে কার্যবিশেষ করিতে আসিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের মনে সাধারণ মুক্তপুরুষদিগের মতো 'শরীরটা এখনি যায় যাক্, ক্ষতি নাই', এরূপভাবের উদয় কখনও হয় না—মনুষ্যলোকে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের ঐ আগ্রহে ও জীবের বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কার্য শেষ হইলেই আধিকারিক পুরুষ উহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন এবং আর তিলার্ধও সংসারে না থাকিয়া পরম আনন্দে সমাধিতে দেহত্যাগ

করেন।"[১] স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনপদ্ম বিকশিত হইবার সময়ে উপরি-উক্ত সকল লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মানসপুত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক সত্য জগন্মাতা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "তাহার অনেক কিছুই বলিতে মানা আছে।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবার পরে তাঁহার স্নেহের 'রাখালরাজ' দীর্ঘ নয় বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত অতুলনীয় অধ্যাত্মসম্পদ-সকল স্বায়ত্তে আনিয়াছিলেন। অতঃপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অলক্ষ্য নির্দেশে তিনি লোককল্যাণার্থ আত্মপ্রকাশ করেন; তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল দেহকান্তি হইতে হৃৎকন্দরের আনন্দজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া নিকট-দূরের সকলকে আকৃষ্ট করিল। নরনারী তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তাঁহার পূতসঙ্গলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দিব্য চরিত্রের কুলকিনারা করিতে পারে নাই। তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ভক্তের ন্যায় আমবাগানে গাছপাতার হিসাবের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক অমৃতফল আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, জীবন কৃতার্থ করিয়াছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" তিনি শুধুমাত্র লৌকিক নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন অলৌকিক রাজ্যেরও রাজা। পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বত্রই ছিল তাঁহার অবাধ গতিবিধি। ধর্মজগতে মহারাজের স্থান কত উচ্চে তাহার সামান্য ইঙ্গিতমাত্র তখন পাই, যখন আমরা শুনি তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপূর্বক জনৈক সেবককে বলিতেছেন, "সাধকের অবস্থাভেদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সবই সত্যরূপে অনুভূত হয়ে থাকে। অদ্বৈতানুভূতির পর আবার যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, এইভাবে লীলাও সত্য বলে অনুভূত হয়। তবে কি জানিস্, সমাধির পর—নিজের নিজের ভাবে একেবারে ডুবে যাবার পর—তবে ধর্মের আরম্ভ।"[২] অল্পবুদ্ধি আমাদের নিকট দুর্বোধ্য এই তত্ত্ব, কিন্তু ইহা মহারাজের দিব্য জীবনেরই অনুভূতি। তাঁহার মত আধিকারিক পুরুষের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বরলাভ করতে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ; পৃঃ ১৪৪
২ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃঃ ৭২

পারে; তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটি—তারা যেন রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাত-তলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে ঐ পর্যন্ত।"[১] অধ্যাত্মরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার মানসপুত্র পিতার ঐশ্বর্য ও শক্তি স্বায়ত্তীকরণ করিয়া ধর্মরাজ্যে অবাধে বিচরণ করিয়াছেন। আমরা যে গুরুশক্তি ও তাহার প্রকাশ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহা এক অচিন্ত্য শক্তিশালী আধারে প্রকটিত হইয়াছিল, এবং অভিনব বৈচিত্র্যজাল সৃষ্টি করিয়া বিকশিত হইয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে প্রকাশিত গুরুশক্তির মহিমা সাধারণ মানুষের মনবুদ্ধির পরিমাপ-যন্ত্রে ধরা পড়ে না। ঠাকুর কথিত কাহিনীর বেগুন-বিক্রেতা এক বহুমূল্য জহরের মূল্য নয় সের বেগুনের অধিক দিতে রাজী হয় নাই; সেইরূপ আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে অত্যাশ্চর্য গুরুশক্তি বুঝিবার চেষ্টাও যে বিফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জহুরীই জহর চিনে; সেইজন্য অবতার-পার্ষদ সম্পর্কে স্বয়ং অবতারপুরুষ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিভিন্ন উক্তি ও আচরণাদির সাহায্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে প্রকটিত গুরুশক্তি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আধিকারিক পুরুষের দিব্যজীবনে যে নানাবিধ ঐশ্বর্য তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছাপাইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা শ্রদ্ধা সহকারে সংগ্রহ করিলে ঐ দিব্য চরিত্রের মাধুর্য কথঞ্চিৎ আস্বাদন করা যাইতে পারে।

মহারাজের মধ্যে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাও অনুধাবনযোগ্য। স্বামী প্রেমানন্দজী স্বামী অপর্ণানন্দকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজকে দেখেছ? যাও তাঁর দর্শন করে এস। মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান ও তাঁহার জীবন্ত রূপ-পরিগ্রহ। মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদলাভ করলে জানবে সেটা সরাসরি ঠাকুরের কাছ থেকে আসছে। এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো।" ইহার পর "'জয় মহারাজ' 'জয় মহারাজ' বলিয়া তিনি করজোড় করিয়া প্রণাম জানাইলেন।"[২]

১ কথামৃত ৩।১৪।৩
২ স্বামী অপর্ণানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী শিবানন্দজী বলিয়াছিলেন, "মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মনে করবে যে, ঠাকুরেরই আশীর্বাদ পেয়েছ। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তাঁর ভেতর দিয়ে জগৎ পাচ্ছে।"[১]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ১১।১১।১৯০৯ তারিখের একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "যে কেহ পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি ইহ জীবনেই আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[২]

স্বামী সারদানন্দজী বলিতেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভিতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর সুপরিচিত 'শ্রীম' বিশ্বানন্দকে বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্য ক'রে দেখ মহারাজের চালচলন, তবেই ঠাকুর কেমন ছিলেন সে সম্বন্ধে একটু ধারণা করতে পারবে।"[৩]

মহারাজের প্রথম মাদ্রাজে যাইবার পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সেখানকার মঠবাসীদের বলিয়াছিলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান—এইটি সর্বদা মনে রেখো। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। তিনি যা বলেন, যা তিনি করেন তা ঠাকুরের প্রেরণায়।" তিনি ভক্ত পদ্মনাভ তাম্পিকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "The sight of a man like our most revered President is a boon in itself. He is a God in human flesh and you are lucky to see a God with your fleshy eyes."[৪]

যেরূপ অন্তরঙ্গদের বিভিন্ন উক্তি হইতে তেমনি বিভিন্ন ভক্ত-মানসে ধৃত অভিজ্ঞতা হইতে একই জাতীয় তথ্য পাওয়া যায়। ভক্তিমতী যোগীন-মা ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। মহারাজ বয়সে ছোট বলিয়া যোগীন-মা তাঁহাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতেন বটে, কিন্তু পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। উচ্চ

১ শিবানন্দ বাণী, দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৮
২ উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮, পৃঃ ২৫৪
৩ স্বামী বিশ্বানন্দের স্মৃতিকথা।
৪ ১৬।৫।১৯০৯ তারিখে লিখিত পত্র

সাধিকা যোগীন-মা তাঁহার অনুভূতি দর্শনাদির বিবরণ মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেন, উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে মহারাজের সমর্থন পাইলে তাঁহার মন শান্ত হইত। একদিনের ঘটনা। মহারাজ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, যোগীন-মা অকস্মাৎ দেখিলেন সেখানে স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু বারংবার দেখিয়াও তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্যথা হইল না।

মহারাজের মধ্যে এইরূপ গুরুশক্তির দৈব প্রকাশ শুধু কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত নহে, কোন কোন অপরিচিত ভাগ্যবান ব্যক্তিও দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যক্ষদর্শী মতিলাল শীলের স্মৃতিকথা হইতে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "বেলুড়মঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়।...বেলা অপরাহ্ণ, মহারাজ চা-এর টেবিলের পূর্ব ধারের বেঞ্চিতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।... আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর সামনের বেঞ্চিখানিতে বসিলাম।...মহারাজ বলিলেন 'শরীরটে ভাল ছিল না ব'লে উৎসবে (শালখিয়ার উৎসবে) যেতে পারিনি।' তারপর পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহিত হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘন্টা পরে দেখিলাম দুইজন মান্দ্রাজী ভক্ত কতকগুলা ফুল লইয়া ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল এবং পরক্ষণেই ফুলগুলিসমেত নীচে নামিয়া আসিল। ফুল ঠাকুর ঘরে না রাখিয়া, ফিরাইয়া আনিতে দেখিয়া মনে কেমন খট্‌কা লাগিল; ভাবিলাম কি আশ্চর্য! ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ ঠাকুরকে না দিয়া অম্লানবদনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আঁখির পলকে মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের ছবির মূর্তির মত, নিশ্চল নিস্পন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই ইতিপূর্বে মহারাজের এরূপ ভাবান্তর দেখে নাই। মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন মনে করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপিল, বলাবাহুল্য, কিছুই অনুভব করিতে পারিল না—একজন জল আনিতে ছুটিল। মান্দ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ধীরে ধীরে মহারাজের অভয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিল। প্রায় ৩৪ মিনিট পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মহারাজকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ঠাকুর জানেন' ছাড়া আর

কোন বিশেষ উত্তর পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ নাই। প্রসাদী ফুল লইয়া আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম।"[১]

মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি কিরূপে স্বমহিমা প্রচার করিতেছিল, তাহার একটি ঘটনা স্বামী নির্বাণানন্দের স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "বলরাম মন্দিরে মহারাজের ঘরের বাইরে একটি বেঞ্চের উপর আমি বসিয়া আছি, এমন সময় একটি বালিকা ও তার ভাই সেখানে উপস্থিত হইল। বালিকাটি মহারাজের সহিত দেখা করিবার অনুমতি চাহিল। আমি তাহাকে জানাইলাম যে, মহারাজ বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এসময় তাঁহার সহিত দেখা করার সুবিধা হইবে না। এই কথা শুনিয়া বালিকাটি খুবই দুঃখিতা হইল। আমি মহারাজের নিকট গিয়া তাহার কথা বলিলাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে বলিলেন, 'দেখ এই বুড়ো বয়সে খাবার পর কথা বলতে পারি না। মেয়েটিকে চারটার সময় আস্‌তে বল।'

"বালিকা এই সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল যে, স্বামী সারদানন্দ তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছেন। সে অতি করুণভাবে বলিল, 'দেখুন, আমি তাঁকে শুধু প্রণাম করেই চলে আসব। যে ভাবে হোক একটু ব্যবস্থা করে দিন।'

"তাহার কথা শুনিয়া আমি মহারাজের নিকট পুনরায় যাইয়া বলিলাম, 'মেয়েটিকে শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন। সে শুধু প্রণাম করে চলে যেতে চায়।' স্বামী সারদানন্দের নাম করিতে মহারাজ আর কোন আপত্তি করিলেন না।

"বালিকাটি আনন্দের সহিত মহারাজকে দর্শন করিতে গেল। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। মহারাজ বালিকার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। পরে জানিতে পারি যে, মহারাজকে প্রণাম করিবার সময় মেয়েটি ভাবে বিহ্বল হইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে থাকে। মহারাজও হঠাৎ ভাবস্থ হন এবং স্থির হইয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বালিকাটিকে বলিলেন, 'উঠ, মা, কি হয়েছে আমাকে বল।' তখনও সে কাঁদিতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কিছুক্ষণ সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। তারপর মহারাজের ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি দেখাইয়া সে বলিল, 'উনি আমাকে আপনার নিকট আসতে বলেছেন।' মহারাজ পুনরায় বলিলেন, 'বল মা, কি হয়েছে।'

১ উদ্বোধন, ২৪ বর্ষ, ৫ম সং, পৃঃ ৩০৫-০৬

"তখন সে সব কথা বলিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের দুই সপ্তাহ পরে স্বামীর মৃত্যু হয়। তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। হতাশ হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল ও সদা সর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'ভগবান, আমার কি হবে? আমি যে একা আশ্রয়হীনা; আমি কি করব, আমাকে পথ দেখাও।' প্রায় এক বৎসর পরে এক রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন দেন এবং বলেন, 'কাঁদিস নি, আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারে আছে। তার কাছে যা, সে তোকে সাহায্য করবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বা রাখাল সম্বন্ধে বালিকা কিছু জানিত না।…সে শ্বশুরবাড়ীর অনুমতি লইয়া টালিগঞ্জে মায়ের নিকটে যায় ও স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে। তাহার মা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানিতেন। মায়ের নিকট সব শুনিয়া বালিকা তাহার ভাইকে লইয়া বাগবাজারে যায়। সেখানে যাইয়া খোঁজ করিতে করিতে উদ্বোধনে উপস্থিত হয় এবং স্বামী সারদানন্দের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহাকে সকল কিছু বলে। তিনি বালিকাকে মহারাজের নিকট বলরাম ভবনে পাঠাইয়া দেন।

"বালিকাটি মহারাজের ঘরে দুই ঘণ্টারও বেশী ছিল। অবশেষে মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া জানিতে পারিলাম মেয়েটি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছে। মহারাজ আমাকে বালিকাটি ও তাহার ভাই-এর জন্য খাবার আনিতে বলিলেন।"

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, "তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে"—বিদ্যাপতির এই আকুতি ছিল মহারাজের সাধন; তাহাতে সিদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় সত্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন। পিতার ঐশ্বর্য মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ এতই আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, যেমন অন্তর্জগতে তেমনি বাহিরের চালচলনে সর্বতোভাবে তাঁহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মহারাজের মধ্য দিয়া যে রামকৃষ্ণশক্তি লোককল্যাণে ব্যাপৃত ছিল তাহাই তাঁহার গুরুশক্তির প্রকৃত স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে দুইটি ভাব-সত্তা দেখা যায়। একটি সত্তা অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত একীভূত এবং তাহারই পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সত্তা—গঙ্গাযমুনার ন্যায় প্রবাহিত। ভক্ত-সত্তাটি মানবসাধারণের প্রতি অপার করুণায় বিগলিত, অতি আপনার জনের মত মানুষের ব্যথায় সমব্যথী হইয়া

কলুষহরণ পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিত। অপরপক্ষে দুর্লভক্ষণে প্রকটিত রামকৃষ্ণ-সত্তাটি গুরুশক্তিরূপে মানুষকে কৃপাকটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি বিতরণ করিত। একাধারে এই দ্বৈতশক্তির স্ফুরণ যেমন চমৎকারিত্ব ও মাধুর্যের সৃষ্টি করিত তেমনি অমোঘ শক্তিতে জীবকল্যাণে নিয়োজিত হইত। সদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ মহারাজের অনুপম ব্যক্তিত্বের মধ্যে রামকৃষ্ণ-সত্তাটিরই প্রাধান্য, তাহাকে বেষ্টন করিয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ভক্ত-সত্তাটি।

গুরুশক্তি ও উহার প্রকাশ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে জানিতে হইবে, ব্যবহারিক জগতে কি লক্ষণদ্বারা সদ্‌গুরুকে চিনিতে পারা যায়। 'গুরু' শীর্ষক প্রবন্ধে মহারাজ সদ্‌গুরু সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ হইতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলেন, আমরা ব্রহ্মবিৎ গুরুর সমীপে তাঁহাদের দত্ত সাধনপ্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পদে পদে উপদিষ্ট হইয়া, প্রতি পদে তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্যসকলের আলোকে উৎসাহিত হইয়া তবে এই অবস্থায় আসিয়াছি। তোমারও যদি যথার্থই উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকেও এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে বৈ কি। 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে'—ইহা সকল মহাপুরুষের মত। দেখা যায়, যেখানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্মের বিকাশ হইয়াছে তাহারই পশ্চাতে কোন এক মহাপুরুষ গুরুরূপে সহায় ছিলেন। লোকে চলিত কথায় বলিয়াও থাকে, এ ব্যক্তির গুরুবল আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সদ্‌গুরু বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শিষ্যকেও তিনি দেখিবার পথ দেখাইয়া দেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে লইয়া যান। প্রকৃত গুরুর দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরও নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইলেই যেন সংসারের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়—মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান।...

"যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই গুরু, ব্রাহ্মণাদি উপাধিমাত্র।......

"সংসারে অনেক গুরু দেখিয়াছি, তাঁহাদের নিকট উপদেশও পাইয়াছি, কিন্তু

কোন ফল ফলে নাই। তাহার কারণ তাঁহাদের ভিতর ব্রহ্মবিদের কোন লক্ষণ নাই। তাহাদের সংসারাসক্তি যায় নাই। তাঁহাদের ভিতর বিবেকবৈরাগ্যের প্রভাব দেখি নাই। অন্ধের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও নিষ্ফল।[১] তাঁহাদের সে উপদেশের সঙ্গে এমন শক্তিসঞ্চার করিয়া দেন যে, তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেইদিন হইতে তাহার নূতন বিশ্বাস, নূতন জীবন আরম্ভ হয়।"[২]

গুরুরূপে প্রকটিত ঐশীশক্তি বর্তমান কালোপযোগী হইয়া কিরূপে কার্য করিতেছে সে সম্বন্ধে মহারাজ নিজমুখে বলিয়াছেন, "গুরু বলতে আমরা কি বুঝি? যে কেহ বীজ-সংযুক্ত করে কানে মন্ত্র দেন, সাধারণতঃ তাঁকেই গুরু বলা যায়। সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কারও গুরু হবার অধিকার নেই। যার নিজের রাস্তার খবর জানা নেই তিনি অপরকে রাস্তা দেখাবেন কেমন করে? অবশ্য মন্ত্রশক্তি সমান ভাবেই রয়েছে। কিন্তু বিধি ঠিকমত জানা না থাকায় গুরু শিষ্য উভয়েরই ঠিক ঠিক উন্নতি হয় না। এ জন্যই শিষ্য প্রাণে শান্তি পায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে এবার রাস্তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। অমূল্য রত্ন এঁদের (ঠাকুরের শিষ্যদের) ভাণ্ডারে রয়েছে। যে কেউ সৎ, বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হবে তাকে এখানে আসতেই হবে। অন্য কোথাও শান্তি নেই; এঁদের কাছ থেকে যে যা পেয়েছে, তাতে যদি বিশ্বাস করে নিজের নিজের জীবন গড়ে চলে যায়, সে নিশ্চয়ই অপার আনন্দের অধিকারী হবে, মনুষ্যত্ব লাভ করবে। এঁরা এ যুগের ভাবে ভাবুক, এ যুগে কি রকম ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া দরকার, এঁরা ভাল জানেন। যার যে ভাবে উন্নতি হবে তাকে সে ভাবেই উপদেশ দেন। কাউকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়েছেন, কাউকে উপদেশচ্ছলে দীক্ষা দিয়েছেন, কাউকেও স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন। যার ভাগ্যে যেরূপ জুটেছে সে সেটি বিশ্বাস করে রাস্তা চলুক, সরল প্রাণে গুরুর কাছে প্রার্থনা করুক, বাকি যা দরকার তিনি দেবেন—তিনি নরশরীরে থাকুন বা নাই থাকুন। শিষ্যের

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সৎগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সৎগুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আব দেখেছে, তার কাছে কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়।" কথামৃত ৩।১৬।১

২ উদ্বোধন, পঞ্চম বর্ষ

জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গুরু যিনি, তিনি শিষ্যকে পথ দেখাবার জন্য, তার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন। শিষ্যের জন্য গুরু মধ্যে মধ্যে স্থূল ভাবে প্রকাশ হন।"[১]

মহারাজের মধ্যে প্রকটিত গুরুশক্তি অধিকারী, স্থান ও কালভেদে, আশ্রিত ব্যক্তির উপর প্রবলভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে, দেহমনে আলোড়ন তুলিয়াছে, ঐ ব্যক্তির শুভসংস্কাররাশি উদ্বোধিত করিয়া কল্যাণের পথ উন্মোচিত করিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে স্পর্শদ্বারা, কখনও শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি বলে, কখনও বা উপদেশচ্ছলে ঐ দৈবীশক্তি কার্য করিয়াছে। ভাবগম্ভীর মহারাজ তাঁহার এই দৈবীশক্তি সচরাচর বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিতেন না। ভাব চাপিয়া রাখিবার অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। তৎসত্ত্বেও অহৈতুকী করুণাবশতঃ সময়বিশেষে ঐ শক্তির স্ফূর্তি হইয়া কোন কোন ভাগ্যবান প্রার্থীকে কৃতার্থ করিয়াছে। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঐ দৈবীশক্তি কিভাবে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সুসাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু দীর্ঘকাল পরে একদিন মহারাজের সহিত দেখা করিলেন। অন্তর্দ্রষ্টা মহারাজ দেবেনবাবুর মধ্যে দেখিলেন একটি বড় রকমের পরিবর্তন, চোখেমুখে বিষয়সংসারের কালিমার ছাপ। মহারাজ তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। দেবেনবাবুর সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একদিন মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট দেবেনবাবুর মধ্যে পরিলক্ষিত পরিবর্তনের বিষয় উল্লেখ করিলেন। তাঁহার মারফৎ মহারাজের এই অভিমত দেবেনবাবুর কানে উঠিল, তাঁহার মনে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং ক্রমে তাঁহার হৃদয় অশান্ত করিয়া তুলিল। একদিন মধ্যাহ্নে তিনি অশান্তচিত্তে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহারাজ তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেবক মহারাজের অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন, ইতিমধ্যে দেবেনবাবু অস্থিরভাবে মহারাজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মহারাজ দেবেনবাবুর বক্ষোদেশে কয়েকবার মৃদু চাপড় দিয়া শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কি হয়েছে, দেবেনবাবু? সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুরকে স্মরণ করুন।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১৩১-৩২

মহারাজের করস্পর্শে তীব্রশক্তি তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় দেবেনবাবুকে যেন প্রচণ্ড ভাবে নাড়াচাড়া দিল, মুহূর্তে তাঁহার মন হইতে বিষয়-কুয়াসা দূর হইয়া গেল এবং এক অনাবিল শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইল; ঠাকুরের দিব্যসঙ্গের পুণ্যস্মৃতি মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দিত মনে মহারাজকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন, "মহারাজ, আমার বিষয়বুদ্ধি দূর হ'ল। আমার কি পতনই না হয়েছিল! আপনার দয়ায় ও আশীর্বাদে আবার উঠতে পারলাম। এখন আর আমার কোন দুঃখকষ্ট নেই।" দেবেনবাবু তাঁহার এই দৈব অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিরকৃতজ্ঞতার সহিত বহন করিতেন। 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' শীর্ষক পুস্তকে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া দেবেনবাবু লিখিয়াছেন, "বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন!"[১]

এই মহাশক্তি দেশকাল নির্বিশেষে যোগ্যপাত্রে প্রকাশিত হইত। জনৈক বিদেশিনী মহিলা তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপকের কন্যা স্বামী ব্রহ্মানন্দের দর্শনমানসে বেলুড় মঠে আসিয়া শুনিলেন যে, তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে লইয়া কলিকাতার বলরাম ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহিলাটি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মহারাজের সহিত সাক্ষাতের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা তিনি ভগিনী দেবমাতাকে লিখিয়া জানাইলেন, "Oh, sister, it was far more wonderful than I had hoped. Only five minutes but he said something wonderful to me and so encouraging and he took my hand in his two hands and something definite happened. I went out of that room feeling twenty years younger, full of hope

১ দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বামী নির্বাণানন্দজীকে পরে বলিয়াছিলেন, "যখন তিনি হাত দিয়ে আমার বুক স্পর্শ করলেন, হঠাৎ এক তীব্র অনুভব হ'ল। অতীতের কথা তৎক্ষণাৎ স্মরণ হ'ল। ঈশ্বরপ্রেম ও অভীষ্ট লাভের জন্য হৃদয় পূর্ণ হ'ল। ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি পুনরায় জাগরিত হ'ল।"

to struggle on and with a new faith that it was all true. It was a wonderful day for me. I have felt so much more content and peaceful ever since and so full of gratitude to him and to them all for helping it to happen."[১] এই মহিলাটি সিংহল যাইবার পথে মাদ্রাজ মঠে স্বামী অখিলানন্দকেও অনুরূপ ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মহারাজ স্পর্শ না করিয়া শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি-বলে কিরূপে অপরের মধ্যে ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতেন, ঠাকুরের ভৈরব-ভক্ত গিরিশচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "রাখাল টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানসপুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানি আরম্ভ হল, তখন খুব জ্বর, দুবল হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্বনেশে ভাবের উদয় হ'ল—ঠাকুর একজন মানুষ, একজন সাধুপুরুষমাত্র ছিলেন। তখনি মনে হ'ল গুরুতে মানুষ-জ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা ত' গেছি। মনে দারুণ অশান্তি—কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্বুদ্ধি এলো না। অনেককে বললাম, যে সব ত্যাগী গুরুভাইরা আমাকে দেখতে আসত, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাকত। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনের সঙ্গে সবদা লড়াই করছি, তবু ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি যায় না। এই সময় হঠাৎ একদিন রাখাল দেখতে এল। সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছেন মশায়?' নানা কথার পর আমি তাঁকে কাতরভাবে বললাম, 'ভাই আমার সর্বনাশ উপস্থিত। এত গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ শুনছি, ভগবানকে দিনরাত ডাকছি; অথচ

১ Days in an Indian Monestery, pp. 150-51 বঙ্গানুবাদ: আহা ভগিনী, আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম তদপেক্ষাও সুন্দর ঐ অভিজ্ঞতা। মাত্র ৫ মিঃ তাঁহার নিকটে ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চমৎকার ও উৎসাহব্যঞ্জক কয়েকটি কথা বলিলেন, তিনি আমার হাত তাঁহার দুইহাত দিয়া ধরিলেন। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি, সে সময় নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়া গেল। তাঁহার ঘর হইতে যখন বাহির হইলাম, আমার মনে হইল আমার বয়স ২০ বৎসর কমিয়া গিয়াছে, জীবনসংগ্রামের জন্য আশাভরসায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে। নূতন বিশ্বাস হইল, যাহা ঘটিয়াছে তাহা সবই সত্য। আমার নিকট দিনটি অতুলনীয়। সেইক্ষণ হইতে আমার অন্তঃকরণ সুখশান্তিতে ভরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিকট ও অপর সকলের নিকট ইহা ঘটিতে সাহায্য করিবার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।"

ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি হ'ল। কিছুতেই এটা যাচ্ছে না, আমার নরকযন্ত্রণা উপস্থিত হ'য়েছে, এ কি হ'ল? উপায় কি?' রাখাল আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হেসে বললে, 'ও আর কি? ঢেউ যেমন হুস্ করে উঁচু হয়, আবার নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শীঘ্রই আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা উচ্চস্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হ'চ্ছে। কিছু চিন্তা করবেন না।' রাখালের কথা শেষ হতে না হতে ন' দিদি তাকে খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল। যাবার সময় হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না, কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের উপর থেকে ভূতটা যেন চলে গেল— ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্‌বুদ্ধি এলো। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পেছনে ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেইরকম হাবভাব কথাবার্তা কতক কতক পেয়েছে!"

যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনি গোষ্ঠীর মধ্যে মহারাজ শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করিতেন। গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দজী বলেন, "অনেক লোককে একসঙ্গে উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ে যাবার শক্তি মহারাজের আছে।" একটি ঘটনা বিবৃত করা যাউক। কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন প্রতিকৃতি পরিবর্তন করিয়া একটি নূতন প্রতিকৃতি স্থাপন করা প্রয়োজন হইল। তদুপলক্ষে মহাসমারোহের সহিত একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের উপস্থিতিতে উৎসবের ভাবগাম্ভীর্য শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। ষোড়শোপচারে পূজার্চনাদি সম্পন্ন হইল। অতঃপর মহারাজ উপস্থিত সাধু ব্রহ্মচারীদের আদেশ করিলেন, "তোরা ঐ গানটা গা—এসেছে নূতন মানুষ।" সমবেতকণ্ঠে ভজন শুরু হইল,

এসেছে এক নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদাই ঝুলে। ইত্যাদি

সুরতাললয়ে গান জমিয়া উঠিল। ভজনটি সমাপ্তপ্রায়, দেখা গেল ভাবোন্মত্ত মহারাজ হঠাৎ দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। পূর্ণোদ্যমে ভজন চলিতে লাগিল, এদিকে যেন আবিষ্ট হইয়া শরৎ মহারাজ ও রুগ্নদেহ হরি মহারাজও নৃত্যে যোগ দিলেন।

অপরূপ সেই দৃশ্য! সকলেই ঘনীভূত এক ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা, আনন্দে আত্মহারা। সেই সময়ে জনৈক ভক্ত আসিয়া হরি মহারাজের কাছে যাইয়া নিম্নস্বরে বলিল যে, খাবার প্রস্তুত, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া ভক্তটিকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। আরও কিছুক্ষণ ভাবোন্মত্ততা চলিবার পর, আসর ভাঙিল। হরি মহারাজ পরে মন্তব্য করেন, "লোকটা কি বোকা! এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে - ভাগ্যের কথা! আর সে কিনা খাওয়াটাই বেশী দরকারী মনে করে।" তিনি আবার বলিলেন, "মহারাজ অধিকাংশ সময় তাঁর ভাব গোপন রাখেন, আজ তার প্রকাশ পেয়েছে, তিনি আমাদের সকলের চেতনাকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তুলে দিয়েছেন।"

এইরূপ অসাধারণ উপায়ে অপরের মধ্যে ভাব-সঞ্চালন কখন কখনও করিলেও সাধারণতঃ তিনি লৌকিক ভাবানুলম্বনে আর্ত জিজ্ঞাসু সকলের মধ্যে সৎভাব সচ্চিন্তার সঞ্চার করিয়া দিতেন, নানা উপায়ে ঈশ্বরের পথে প্রেরণা দান করিতেন, সংসার-তাপে দগ্ধ নরনারীর প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। তিনি ছিলেন ধর্মভাবের মূর্ত প্রতীক—তাঁর কথাবার্তা চালচলন সবকিছুর মধ্য দিয়া ভগবদ্ভাবই স্ফুরিত হইত। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁহার উপস্থিতিমাত্রে আনন্দের হাট বসিত, কখনও বা হাসি তামাসা স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটিত; আবার অকস্মাৎ পটের পরিবর্তন হইত—হাস্যলাস্যময় মহারাজ প্রশান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিতেন, কখনও ভাব গভীরতর হইলে তাঁহার মন বাহ্যজগৎ হইতে ছুটি লইয়া অলৌকিক জগতে বিচরণ করিত, উপস্থিত ব্যক্তিগণও তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অন্তরের অন্তস্তলে অননুভূত আনন্দলাভ করিত। মহাপুরুষ সংশ্রয়ই সংসার-মরুপথে ছায়াশীতল মরূদ্যান। মহাপুরুষের সৎসঙ্গে সংগৃহীত হয় শুভচিন্তার বীজ। মহারাজ নিজমুখে বলিয়াছেন, "ঠিক ঠিক সাধু হয় তো তার সঙ্গ করার ফল আছে বৈ কি! মহাপুরুষ যদিও ফচ্‌কিমি টচ্‌কিমি করেন তথাপি তার সঙ্গ ছাড়বে না। কারণ, সময়বিশেষে তাঁর মুখের এক একটা কথায় তোমার জীবনধারা বদলে যেতে পারে।"

আরেকবার বেলুড় মঠে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। তাঁদের দেখলে, তাঁদের কথা শুনলে, মনে ধর্মভাব ও সদ্ভাব জেগে ওঠে এবং সংশয় সব দূর হয়ে যায়। তাঁদের পবিত্র জীবন, ভাবময় জীবন দেখে মন যতটা impressed (প্রভাবিত) হয়, শত বই পড়লেও তা হয় না। অধর সেন প্রায়ই একজন স্কুল সব-ইন্‌স্‌পেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসতেন।

সেই সঙ্গীটির প্রায়ই ভাব হত। একদিন ঠাকুরের নিকট আসার একটু পরেই ঠাকুর সমাধিস্থ হন। তাঁর মুখে এমন হাসি, যেন আনন্দ আর ধরে না। তখন অধর বাবু সেই সঙ্গীটিকে বলেছিলেন, 'তোমাদের ভাব দেখে, ভাবের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়েছিল। কেননা, তোমাদের ভাব দেখে বোধ হয় যেন ভিতরে কত যন্ত্রণা। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? এঁর ভিতরে আনন্দ দেখে আমার চোখ ফুটল। এঁর ভাবও তোমাদেরই মত দেখলে, এখানে আর আসা হত না।' ঠাকুরের কাছে না এলে, তাঁর এই 'ভাব' না দেখলে অধর বাবুর মনের সংশয় কখনও যেত না। এই হলো সাধু সঙ্গের ফল।"[১] তিনি একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "সময় পেলেই এখানে আসবি। তাতে তোর লোকসান হবে না।" ভক্ত এই উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়াছিলেন। জনৈক যুবক মহারাজের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি সুযোগ দেখিয়া মহারাজের নিকট কিছু ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে কিছু প্রাথমিক উপদেশ দিয়া পরে বলিলেন, "তোর নূতন জীবন হবে।" তিনি বলেন যে, সেইদিন হইতে তিনি অনুক্ষণ অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহার অন্তরে একটি দীপ জ্বলিতেছে এবং উহার আলোতে অধ্যাত্মভাণ্ডার প্রকাশিত হইতেছে।[২]

ইহা সুপ্রচলিত যে মহারাজ সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু আগুনের নিকট গেলে তাপ অনুভূত হইবেই। অগ্নিকুণ্ড যত বড়, উত্তাপ তত অধিক দূর হইতে অনুভূত হয়। মহারাজ যেখানেই অবস্থান করিতেন, তাহার চতুর্দিকে একটি ভাবসম্পৃক্ত পরিবেশ রচিত হইত। হরি মহারাজ বলিতেন, "মহারাজ যেখানেই যান তাঁহার চতুর্দিকে একটি ঘনীভূত ভাবের সৃষ্টি হয়। কেহ যেভাবেই হোক ঐ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য।"[৩] তাঁহার পূত সান্নিধ্যে সমীপাগতের অশান্ত মন শান্ত হইত, দুঃখযন্ত্রণা সাময়িকভাবে হইলেও বিদূরিত হইয়া প্রশান্তিতে মন ভরিয়া উঠিত, যাহারা অনেক কিছু প্রশ্ন লইয়া আসিত তাহারাও আপনা হইতে আকারে ইঙ্গিতে উহার উত্তর পাইয়া শান্তভাব ধারণ করিত। ছোট একটি ঘটনা। সেবক স্বামী ধীরানন্দ

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৩৬

২ স্বামী অখিলানন্দের স্মৃতিকথা

৩ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত। তিনি পূজ্যপাদ হরি মহারাজের নিকট ইহা কয়েকবার শুনিয়াছিলেন

মারফৎ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ নিবেদন করিলেন যে, মহারাজের নিকট তাঁহার কিছু জিজ্ঞাস্য রহিয়াছে। তিনি মহারাজের চরণদর্শন করিলে মহারাজ মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তুই সাধুপুরুষ দেখেছিস, তাঁকে প্রণাম করেছিস, তাঁর পায়ের ধূলো নিয়েছিস, আর তোর কি প্রশ্ন থাকতে পারে?"[১] অবশ্য একথা বলা বাহুল্য, অন্তর্দ্রষ্টা মহারাজ প্রয়োজন মত ধর্মপথাশ্রয়ীকে উপদেশাদি দিতেন, কেহ আন্তরিকভাবে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে পদে পদে পথের নিশানা দিতেন। কেহ হয়ত দুই চারদিন সাধুসঙ্গ করিয়া বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না—এই অভিযোগ তুলিয়াছে, মহারাজ এইরূপ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "সাধুসঙ্গের ফল হাতে হাতে পেতে চাও নাকি? একি মুদীখানার নগদ সওদা নেওয়ার মত—এক হাতে টাকা দিলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে জিনিস হাতে পেয়ে গেলে! এই যে সৎসঙ্গ করছো, সৎপ্রসঙ্গ শুনছো—এর একটা ছোপ্ মনে ধ'রে রইল। এরপরে বুঝতে পারবে—realise (অনুভব) করতে পারবে কেন সাধুসঙ্গের এতো সুফল। সাধুর আঁচ্ যার লেগে যায়, তার নতুন ছাঁচ্ তৈয়ারী হোয়ে যায়। জানতো গুব্‌রেপোকা ফুলের সঙ্গগুণে দেবতার চরণে গিয়ে পড়ে, তেমনি সাধুর কৃপায় লোকে দেবতার চেয়ে উঁচিয়ে যায়।"[২] যাহারাই কোন প্রকারে মহারাজের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাভিমুখীন করাই ছিল সদ্‌গুরু মহারাজের জীবনব্রত, কিন্তু তিনি উহা করিতেন তাঁহার স্বকীয় অতুলনীয় পদ্ধতিসহায়ে।

নরনারী বিবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহায়ে মহারাজ সমীপাগতের মানস-প্রকৃতি, ধর্মভাব ধারণের সামর্থ্য, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বুঝিয়া লইতেন। তিনি দেখিতেন যে, অধিকাংশই 'কড়াই ডালের খদ্দের', তিনি যে অমূল্য সম্পদের পসার লইয়া বসিয়াছেন তাহার যোগ্য খরিদ্দার খুবই কম। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমাকে অনেকে বলে, আশীর্বাদ করুন, কৃপা করুন। শুনে আমার হাসি পায়। যা করতে বলব তা করবে না, সামনে থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের মত যা ইচ্ছা করে, আর মনে করে নিজে একজন মস্ত সমঝদার। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,

১ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের স্মৃতিকথা
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা ২য় সং, পৃঃ ৫০১

যেমনটি বলেছিলুম করবার চেষ্টা করছ ত? হয় বলে, সময় হয় না; না হয় বলে, আমার মত দুর্বল, পাপীর দ্বারা কি হয়? যদি বিশ্বাসই নেই, কথাও মানবি নে, তা হলে যা ইচ্ছা কর না বাপু। কেবল ফাঁকি মারবার চেষ্টা। এইরকম লোক যারা আমার কাছে আসে তাদের নিয়ে আমি ঠাট্টা-তামাসা ও বাজে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিই। কেন মিছেমিছি বকে মরি। আর যারা দু চার জন খাটবে-খুটবে ও কথা নেবে মনে হয়, তাদের সাধনভজনের কথা বলে দিই, তারাও ঠিক ঠিক ভাবে করবার চেষ্টা করে।"[১] কিন্তু তিনি সমীপাগতদের সম্পর্কে যাহাই মনে করুন বা তাহাদিগকে যেভাবেই গ্রহণ করুন, সর্বদাই দেখা যাইত কি এক আকর্ষণে বহু নরনারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি যেন ছিলেন পুরাণ-কথিত কল্পতরু। তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া ভক্তজন নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ফল সংগ্রহ করিত, তৃপ্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরিত, কিন্তু সর্বদাই মনের এক অংশ রাখিয়া যাইত মহারাজের পাদপদ্মে। দেখা যাইত, আফিমের মৌতাতের ন্যায় যে একবার আসিত, সে পুনরায় আসিত, বারংবার আসিয়াও ক্লান্ত হইত না।

মহারাজ সমীপাগত উপযাচকের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, ভাবগ্রহণের যোগ্যতা ইত্যাদি নির্ধারণ করিতেন লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ে। চেহারায় শুভলক্ষণাদি দেখিয়া তিনি অপর সকল বাহ্যিক লক্ষণাদি, যেমন হাতের সম্মুখভাগ ওজন করিয়া দেখা ইত্যাদি উপায়ের আশ্রয় লইতেন। যুবক অমূল্যচরণকে[২] প্রথম দর্শনের পরেই তাঁহার হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া ওজন পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, হবে।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধরনের যেসকল পরীক্ষাদি করিতেন মহারাজও সেগুলি প্রয়োগ করিতেন; এই সকল প্রাথমিক পরীক্ষা ব্যতীতও তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে উপযাচকের অভিরুচি, তাহার ঈপ্সিত আরাধ্যের স্বরূপ ইত্যাদিও জানিয়া লইতেন। ফলে তিনি প্রার্থীকে কৃপা করিয়া যাহা দিতেন তাহা অব্যর্থ শক্তিতে কাজ করিত। মহাপুরুষ মহারাজ মহারাজের কৃপা সম্বন্ধে বলিতেন, "এঁর কৃপা অমোঘ।" 'গুরু' প্রবন্ধে মহারাজ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে; তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে যে পথে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৪৭-৪৮

২ পরবর্তীকালে মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী

পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধনকালীন নানাপ্রকার বিঘ্নের সময় শিষ্যকে বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চ উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন।"[১] একবার জনৈক যুবক কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বরে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল, উদ্দেশ্য—ত্যাগব্রতগ্রহণ। তিনি যুবককে দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা মর্কটবৈরাগ্য মাত্র, কিছুকাল পরেই চলিয়া যাইবে। তিনি যুবককে কয়েকদিন মঠে আদরযত্নে রাখিলেন এবং পরে তাহাকে বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামী প্রভবানন্দ অপর একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যাহাতে মহারাজের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভবানন্দ (তখন তাঁহার নাম অবনী) ও অপর দুইজন ত্যাগী সন্তান মহারাজের নিকট সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে একজন দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিয়াছিলেন, মঠের সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। সন্ন্যাসের জন্য প্রাথমিক ক্রিয়াদি আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁহারা মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলেন। মহারাজ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখানে কেন? আমি তোমাকে সন্ন্যাস দেব না। চলে যাও।" উপস্থিত সকলেই হতচকিত হইলেন, সঙ্গীরাও অন্তরে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি পরে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন জনের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া তাঁহার তপস্যা সম্বন্ধে খুব গর্ব হইয়াছিল, অন্তর্দ্রষ্টা মহারাজের কঠোর আচরণ ঐ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তি মহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই ধরণের ঘটনা সচরাচর ঘটিত না। তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার নিজের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "কে কি রকম, সব বুঝতে পারি, কাউকে কিছু বলি না—পাছে মনে কষ্ট পায়। উপায় হচ্ছে—Love and sympathy for all, আর ছোট ছোট দোষ overlook করা। মন্দকে যদি ভাল করতে না পারা গেল তা হ'লে আর কি হ'ল?" তিনি বিভিন্ন উপায়ে আশ্রিতজনকে প্রেয়ের কুক্ষি হইতে টানিয়া আনিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া

১ উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ

যাইতেন ; বারংবার সফলকাম না হইলেও তিনি অসীম সহানুভূতির সহিত কৃপাপ্রাপ্তকে রক্ষা করিতেন, কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেন।

ধর্মগুরু হইবেন রাসভারি গম্ভীরপ্রকৃতির, সাধুত্বের চিহ্ন বাহিরে দেখিয়াই চেনা যাইবে—এইরূপ মনগড়া ধারণা লইয়া অনেকে মহারাজের নিকট আসিত। কিন্তু তাহাদের ধারণার সহিত মিল না হওয়ায় তাহারা ভুল বুঝিত। মহারাজ 'রসে বশে' থাকিতেন, ভক্তিভক্ত লইয়া আনন্দের হাট জমাইতেন। আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক না হইলে বা মহারাজ দয়া করিয়া স্বয়ং ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে সহজে চিনিতে বুঝিতে পারিত না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'বর্ণচোরা' আম বলিতেন। তাঁহার ন্যায় আপাত-রহস্যময় পুরুষের কৃপাভিক্ষা বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপদেশ অনুসরণীয়। "তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায় ; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায় ; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তা হ'লে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বল্‌তে হয়,—সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।"[১] অজ্ঞানের অন্ধকারে, মামুলী ধারণার জমাট কুয়াশায় সাধারণ মানুষ মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারে না। শুভসংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিতে ভুল করিয়াছে, পরে মহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। দুই একটি ঘটনার আলোচনা করিলে আলোচ্য বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

মেদিনীপুর হইতে সেখানকার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বেলুড় মঠের অধ্যক্ষের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মঠে আসিয়াছেন। মঠে পৌঁছাইয়া বাবুরাম মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভদ্র-লোককে বসিতে বলিয়া কার্যান্তরে গেলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া ভদ্রলোক অধৈর্য হইয়া উঠিলেন এবং নানাজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিরূপে তিনি মঠাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে পারিবেন। একজনের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন যে, মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী মঠ প্রাঙ্গণেই হাঁস পুকুরের ধারে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন। ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক হতাশ হইলেন, তিনি আর কাহাকেও

১ কথামৃত, ১।৪।৭

কিছু না বলিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। এই খবর মহারাজের কানে উঠিল। বিচিত্র ঘটনা। ভদ্রলোক গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু অজানা এক অস্বস্তিতে দিন কাটাইতে থাকেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে থাকে, "মঠাধ্যক্ষের সহিত দেখা না করিয়া আসা উচিত হয় নাই।" কয়েকদিন পরে তিনি পুনরায় মঠে আসিলেন এবং বাবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতায় প্রীত হইয়া বাবুরাম মহারাজ ভদ্রলোককে মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে মনের আকুতি নিবেদন করিলেন। তাঁহার আন্তরিকতায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। সাতদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

আর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী নির্বাণানন্দ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক মহারাজ সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য একদিন বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজের কোন সেবক তখন কাছে ছিল না, ভদ্রলোক সোজাসুজি মহারাজের থাকিবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন; দেখিলেন, উত্তম পালঙ্কে শয্যার উপর সিল্কের একটি আলখাল্লা পরিয়া মহারাজ আনমনা হইয়া বসিয়া আছেন এবং গড়গড়া হইতে তামাক সেবন করিতেছেন। এই সকল বিলাসব্যসনের মধ্যে খ্যাতনামা সাধুপুরুষকে দেখিয়া তিনি হতাশ হইলেন, দুঃখিত মনে নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন, বিমূঢ় হইয়া একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। ভক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিজ্ঞানে সেবাপূজা করিতেন, তিনি মহারাজের জন্য রেশমী আলখাল্লা ইত্যাদি করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে মহারাজের সেবক সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ও আগন্তুক ভদ্রলোক মহারাজের দর্শনপ্রার্থী মনে করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মহারাজকে দর্শন করিতে চান?" অধ্যাপক একটু ভাবিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং সেবকের সঙ্গে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে সাদরে আহ্বানপূর্বক সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে অধ্যাপক হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহারাজের ঘর হইতে বাহির হইলেন। সেবককে দেখিয়া বলিলেন, "জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ধর্ম সম্বন্ধে আমার

নিজের ধারণা অনুযায়ী বাহ্যিক লক্ষণ দিয়ে মহারাজকে বিচার করতে বসেছিলাম ; ···আর এখন দেখছি আমার জীবনের জটিলতম সমস্যা মহারাজের কৃপায় সমাধান হয়ে গেল।" পরে ঐ ভদ্রলোক মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষাও লাভ করেন।

ইহা সুবিদিত যে, মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ দুরূহ ব্যাপার ছিল। তিনি সহজে মন্ত্রদীক্ষা দিতে সম্মত হইতেন না। কেহ দীক্ষাদির বিষয় তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলে তিনি সাধারণতঃ গম্ভীর হইয়া যাইতেন বা প্রসঙ্গান্তর আলোচনায় রত হইতেন। মহারাজ বলিতেন, "শিষ্যের স্বভাব ভালরূপে পরীক্ষা করে নেওয়াই গুরুর কর্তব্য।···যাহার যথার্থ সদ্গুরু করিবার ইচ্ছা, তাহার যতদিন না গুরুকে যথার্থ সাধু বলিয়া ধারণা ও বিশ্বাস হয়, ততদিন দিনরাত্র তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করা কর্তব্য।" গুরুকরণের পূর্বে শিষ্যের যেরূপ কর্তব্য গুরুকে ভালভাবে জানা, সেইরূপ গুরুরও কর্তব্য শিষ্যের চরিত্রবল, আগ্রহ, উপদেশধারণের সামর্থ্য প্রভৃতি ভালরূপে যাচাই করিয়া শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কেশবচন্দ্রের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাবধানবাণী : "তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?"[১]—মহারাজ ষোল আনা মানিয়া চলিতেন। "ন কুর্বীত বহূন্ শিষ্যান্" এই শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদাও তিনি রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ সাধারণতঃ মন্ত্রদীক্ষা দিতে চাহিতেন না কেন, সে-সম্বন্ধে শ্রীমার একটি মূল্যবান উক্তি অনুধাবনযোগ্য। শ্রীমা বলিয়াছেন, "মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়। কারও বা হঠাৎ উন্নতি হয়, কারও বা ক্রমে হয়। তা যার যেমন সংস্কার। রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না। বলে, 'মা, মন্ত্র দিলে অমনি শরীর অসুস্থ হয়। মন্তরের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে।"[২] তিনি উপযাচককে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে করণীয় কিছু প্রাথমিক উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রথমতঃ আমি

১ কথামৃত ১।৬।২
২ শ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৫৭-৫৮

সাধারণভাবে নিত্য কিছু করবার জন্য বলে দিয়ে থাকি। যদি দেখি সে তা ঠিক ঠিক করছে, তবে তাকে দীক্ষা দেই।" প্রার্থীর আন্তরিকতা নিষ্ঠাদি পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে তবেই তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। এইরূপ পরীক্ষাদি করিয়া তিনি প্রার্থীকে দুই তিন বৎসর পরে, এমন কি আরও দীর্ঘকাল পরে দীক্ষা দিয়াছেন।

মহারাজ নিজমুখেই বলিয়াছেন, "মন্ত্র নিবার ও দিবার পূর্বে গুরুশিষ্যের অনেকদিন পরস্পরকে পরীক্ষা করা দরকার, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। এ-ত দু-এক দিনের সম্পর্ক নয়। আমার কাছে কেহ মন্ত্র চাইলে আগে তাকে হাঁকিয়ে দিই। যদি দেখি ছাড়ে না, তখন বলি, এই 'নাম' এক বৎসর প্রত্যহ অন্ততঃ হাজার বার জপ কর, পরে দেখা করো। অনেকে এতেই ভেগে যায়। ····· আজকাল মন্ত্র নিয়ে অনেকেই কোন কাজ করে না, যাকে তাকে মন্ত্র দেওয়া ঠিক নয়।"[১] দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরির পর যাহারা মহারাজের কৃপা পাইয়াছে তাহাদের ব্যাকুলতা তীব্র হইবার ফলে মন্ত্রশক্তি দ্রুত কার্যকরী হইয়াছে।

মহারাজ মাঝে কিছুকাল কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই—ইহা শুনিয়া শ্রীম মন্তব্য করেন, "রাখাল কি ক'চ্ছে? সে দীক্ষা দেয় না?" এই ঘটনার নিকটবর্তী কোন এক সময়ে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ভক্ত অপরেশবাবুর রচিত 'রামানুজ' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে দেখিতে যান। আচার্য রামানুজ আচণ্ডালে কৃপা-বিতরণ করিতেছেন—এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া মহারাজ অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন। কথিত আছে, এই দুই ঘটনার পরে মহারাজ দীক্ষা-দান বিষয়ে উদারহস্ত হইয়াছিলেন। একদিন দীক্ষাদানের পর জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "যে আসবে তাকেই তাঁর নাম দিয়ে যাব। এতে মঙ্গল হবেই।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহারাজ সদলবলে পূর্ববঙ্গে গমন করেন। সঙ্গী স্বামী প্রেমানন্দজী তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপূর্বক একটি পত্রে লিখিলেন,[২] "মহারাজের স্বাস্থ্য পূর্ববঙ্গে বেশ ভালই ছিল। খুব আনন্দে ছিলেন। মহারাজ ঢাকায় দেখেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সহরের মাঝখানে দুই হাত তুলে আনন্দে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৩৩-৩৪
২ ৯।৩।১৬ তারিখে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত

নৃত্য করিতেছেন। অকাতরে কৃপা বিতরণ করে মহারাজ অনেককে কৃতার্থ করেছেন। ইতিপূর্বে আমি মহারাজকে এরূপ আর দেখি নাই। অশেষ করুণা তাঁর দেখে আমি অবাক। কত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কালেভদ্রে কাকেও দীক্ষা দেন, কিন্তু ঢাকায় আমি যাহাদের জন্য অনুরোধ করেছি তাকেই কৃপা; ঠাকুর সকলকে চৈতন্য করিয়ে দিন, এই প্রার্থনা।

"…আমাদের মহারাজ সে মহারাজ নাই; অন্য দুটিকে দীক্ষা দিলেন। সকলের প্রতি অশেষ অনুকম্পা। এমনটি আর দেখি নাই।"

অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় মন্ত্রদান ব্যাপারেও তিনি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য করিতেন। একদিন তিনি নিজমুখে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের আদেশে আমি নাম দিচ্ছি।" প্রার্থীকে কৃপা করিতে সমুৎসুক হইলেও তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত দীক্ষার্থীর ইষ্টমূর্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইতেন ততক্ষণ মন্ত্র দান করিতেন না। তিনি সাধারণতঃ উপযাচককে মন্ত্রদীক্ষা দিতেন; তবে কোন কোন উপযুক্ত প্রার্থীকে তন্ত্রমতে অভিষিক্তও করিয়াছিলেন।

কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে মহারাজের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। একজন ভক্তিমতী মহিলা এইরূপ স্বপ্নযোগে মন্ত্র পাইলেন। তিনি উহার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে করিতে বেলুড় মঠে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় মহারাজ মঠবাড়ীর বারান্দায় কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। উপবিষ্টদের মধ্যে মহারাজকে চিনিতে পারিয়া মহিলাটি তাঁহার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন এবং প্রাপ্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইলে মহারাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া নিজেই উহা উচ্চারণ করিলেন। স্বপ্নে লব্ধ মন্ত্রবর্ণের সহিত হুবহু মিলিয়া যাওয়াতে মহিলার বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

'গুরু' প্রবন্ধে মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "যাহারা প্রকৃত গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত, সদ্‌গুরুর মন্ত্রদানে ও সাধারণ কুলগুরুর মন্ত্রদানে বিশেষ পার্থক্য আছে। সদ্‌গুরুগণ মন্ত্রদানের সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন এবং সেই মন্ত্রও সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন।" পরোক্ষভাবে প্রদত্ত তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির মর্মার্থ তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তির শুদ্ধ চিত্তপটে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সদ্‌গুরু সিদ্ধ মন্ত্র দেন, যে মন্ত্রে যোগীঋষি সিদ্ধ হইয়াছেন ও যাহা গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। মহারাজ বলিতেন, "ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গুরুর পূজা, গুরুর ধ্যান ও চিন্তা করতে করতে দেহ মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন গুরু শিষ্যকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিয়ে সরে যান।"[১] নায়ক নায়িকার মিলনের কাজে যেমন একজন ঘটকের দরকার, ভগবান ও জীবের মিলনের জন্য তেমনি গুরুর দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "গুরু যেমন সেথো ; হাত ধরে নিয়ে যান।"[২] গুরুবাক্যে ষোল আনা বিশ্বাস করে আন্তরিকভাবে "তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।"[৩] গুরু-বাক্য অনুসরণ করে কিভাবে ইষ্টদর্শন হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' গ্রন্থকার সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে তাহা বুঝাইয়াছেন, "মনে কর পাখী একটা ডিম পাড়লে। কিছুদিন ঐ ডিমে তা দিতে দিতে তার ভিতর থেকে একটি ছানা বেরুলো। এখানেও অবিকল তাই। গুরু কানে মন্ত্র দিলেন ; সেই মন্ত্রের মধ্যে একজন ইষ্ট আছেন। এখন সেই মন্ত্রে সাধন, ভজন, ধ্যান, জপ ইত্যাদি তা দিতে দিতে তার ভিতর থেকে শাবকরূপ ইষ্ট-মূর্তি বেরিয়ে পড়েন। যখন ইষ্ট বেরুলেন, তখন আর গুরু নেই, ছানাটি বেরুলে ডিমটি আর থাকে না।" গুরু সখীর ন্যায় ; রাধা কৃষ্ণের মিলন হলে যেমন সখীর ছুটি, তেমনি জীব ও পরমাত্মার মিলন না হওয়া পর্যন্ত গুরু রয়েছেন শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে।

মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ হইবার জন্য যে মনরূপ আধারে সযত্নে 'মন্ত্র' ধারণ লালন পালন করিতে হয় সেই মন তৈয়ারী হওয়ার উপর সাফল্য নির্ভর করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গান গাহিতেন,

> "আমি জানি যে মন্তোর (মন্ত্র), দিলাম তোরে সেই মন্তোর
> এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই।"

মহারাজও সাধকের মনের ভূমিকাটি সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "গুরু ত যথেষ্ট কৃপা করেছেন, ভগবানের কৃপায় সদিচ্ছাও জেগেছে, সাধুসঙ্গও মিলেছে, এখন একের দয়া কিনা মনের দয়া হলেই হয়। মনকে বশে আনতে পারলে তবে এঁদের দয়া বুঝতে ও ধারণা করতে পারা যায়। যে কোন

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৭৯
২ কথামৃত ৫।৫।১
৩ কথামৃত ৪।১৯।২

উপায়ে মনকে বশে আনতে হবে। মন যদি বশে না এল ত সব গেল।”[১] এইভাবে সাধককে উদ্বুদ্ধ করিয়া মহারাজ তাহাকে গুরুকৃপা ধারণে সমর্থ করিয়া তুলিতেন।

দীক্ষাদানের সময় মহারাজের মধ্যে সময় সময় গভীর ভাবান্তর উপস্থিত হইত, ভাবের গাম্ভীর্যে চতুর্দিক যেন গমগম করিত। তাঁহার সেবক স্বামী অম্বিকানন্দের স্মৃতিকথা হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের একদিনের ঘটনা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। “মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠে থাকাকালে দুইজন ভক্তকে দীক্ষা ও অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া মহারাজ আমাকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে বলিলেন। আমি আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলাম যে, সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তিনি আসিলেই মূল কর্ম হইবে। তিনি আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আমাকে মন্ত্রপাঠ করিতে বলিলেন। তিনি অভিষিক্ত করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র তিনি ‘আহা! আহা! মা, মা, দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী’ বলিতে বলিতে চমকাইয়া উঠিতে লাগিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে যাইতেছেন, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল, অর্দ্ধেক হয়ত বলিলেন, যেন ঘুমাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। অভিষেক-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং মন্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট লাগিবে। অথচ তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় কি করিয়া ব্যাঘাত করি, কিন্তু কার্যও সম্পূর্ণ হওয়া চাই। খানিকক্ষণ পরে তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মাতালের ন্যায় আড়ষ্টভাবে বলিলেন, ‘ফের, আবার বল।’ আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, পুনরায় তিনি বলিতে বলিতে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্র চলিতে লাগিল। যাহাদিগকে মহারাজ অভিষিক্ত করিতেছিলেন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাহাদের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে এবং তাহারা অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।”

এইরূপে সন্ন্যাস প্রদানের সময়েও মহারাজ গভীর অন্তর্মুখ হইতেন, চারিপাশে এক দিব্য পরিবেশ রচিত হইত। সেই সময়ে কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্বামী যতীশ্বরানন্দ স্মৃতিকথায় নিজ

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৮০

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন, "সন্ন্যাসের দিন শ্রীশ্রীমহারাজ এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক-ভাবে vibrate করিতেছেন অনুভব করিলাম। হোম প্রভৃতি হইবার পর যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট সত্তার বোধ আনিয়া দেন। তিনি, আমি, জগৎ—যেন এক অনন্ত সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুর যে কি স্বরূপ তাহার আভাস দিলেন। তখন 'অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'—ইহার সত্যতা অনুভব করিলাম।"

যাহারা মহারাজের অভয়পদে আশ্রয় পাইয়াছে তাহারাই 'উত্তম গুরু' মহারাজের অতুলনীয় আশ্রিতপালন দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যে গুরু বা আচার্য ধর্মশিক্ষা দিয়ে শিষ্যের কোন খোঁজ খবর না নেন সে গুরু বা আচার্য অধম; আর যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য বার বার বুঝাতে থাকেন, যাতে তাঁর উপদেশ সব ধারণা করতে পারে, ও ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম গুরু। আর শিষ্যেরা ঠিক ঠিক শুনছে না বা পালন করছে না দেখে যে আচার্য খুব জোর জবরদস্তি পর্যন্ত করেন, তিনি উত্তম আচার্য।"[১] মহারাজের মধ্যে এই উত্তম আচার্যের লক্ষণাদি দেখা যাইত।

তিনি আশ্রিতজনকে সম্পদে বিপদে নানাবিধ উপায়ে সাহায্যপূর্বক ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ করিতেন, যাহাতে আশ্রিত ব্যক্তির সর্বতোভাবে কল্যাণ হয় তাহার জন্য ব্যগ্র হইতেন। "আমায় ভালবাসিস্ ত?" প্রেমের এই হাতছানিতে অন্তরঙ্গদের আকর্ষণ করিয়া করুণাময়ী জননীর ন্যায় সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে আগলাইয়া রাখিতেন;[২] তাঁহার অতুলনীয় স্নেহের আস্বাদন লাভ করিয়া আশ্রিতজন অভাব অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইত। ত্যাগী সন্তানগণ সাধনভজন, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার—সকল বিষয়ে যাহাতে চৌকশ হয় সে বিষয়ে তিনি উৎসাহ দিতেন, উপদেশ দিতেন, প্রয়োজনবোধে শাসন করিতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগে যে নূতন ধরণের সন্ন্যাসী প্রয়োজন তাহার উপযোগী করিয়া ত্যাগী যুবকদের জীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার অন্তরের ভাবটি গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজী

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ', ১৬শ সং, পৃঃ ৩৪-৩৫
২ The Eternal Companion Brahmananda, 3rd Edn., p. 77.

অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের অনুজ্ঞা সঠিকভাবে বুঝিতে না পারায় সেবক তাঁহার আদেশ যথাযথ পালন করিতে পারেন নাই। মহারাজ সেইজন্য সেবককে ধমক দিলেন। সারা অপরাহ্নকাল তিনি মাঝে মাঝে বকিতে থাকিলেন। রাত্রে খাইবার সময় সেবক মহারাজ ও হরি মহারাজকে পাখা করিতেছিলেন, তখনও চলিয়াছিল ধম্‌কানি। হরি মহারাজ সেবককে বলিলেন, "তুমি বুঝতে পারছ, মহারাজ তোমার উপর কেন এত কঠোর হচ্ছেন?" সেবক নিবেদন করিলেন, 'না, সত্যি কথা বলতে কি, বুঝতে পারছি না, আমার কি এমন দোষ হয়েছে।' হরি মহারাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, তিন শ্রেণীর শিষ্য আছে। অধম শ্রেণীর শিষ্য শুধুমাত্র গুরুর আদেশ পালন করে। মধ্যম শ্রেণীর শিষ্যকে মুখে কিছু বলতে হয় না; গুরুর মনে কোন চিন্তার উদয় হলেই শিষ্য তা বুঝে নিয়ে কাজ করে। আর উত্তম শ্রেণীর শিষ্য গুরুর চিন্তা করবার আগেই তাঁর ইচ্ছা পালন করে। মহারাজ চান, তোমরা সকলে উত্তম শিষ্য হও, বুঝেছ'?"

তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য মহারাজ যেমন তিরস্কারাদি করিতেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যসেবকদের তিরস্কারাদি সহ্য করিবার শক্তিও প্রদান করিতেন। আশ্রিতজনের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত কৃপা ও জননী-সদৃশ স্নেহ কৃপাপ্রাপ্তজনের চতুর্দিকে কল্যাণেচ্ছারূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ইহা অনুভব করিয়া সেই ব্যক্তি আশা ভরসায় বুক বাঁধিয়া দোষ-ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান হইত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের স্মৃতিকথা হইতে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশী সেবাশ্রমের জনৈক প্রবীন সন্ন্যাসীকে তাঁহার দোষের জন্য মহারাজ তীব্র ভর্ৎসনা করেন। পরে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার নিকট বিনীতভাবে বলেন, "মহারাজ আপনি আমাদের দোষত্রুটিতে যদি এত অসন্তুষ্ট হন তো আমরা যাই কোথা? আপনি তো জানেন আমরা দুর্বল, সেইকারণে ভুলভ্রান্তি করে থাকি।" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঠোঁট কামড়াইয়া বলিলেন, "এইসব—আমার রাগটাগ ঠোঁট থেকে মাত্র (তিনি তাঁহার ঠোঁট স্পর্শ করিলেন), এগুলি ভেতর থেকে নয় (তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিলেন)।" সকলেই জানিতেন বুঝিতেন মহারাজের অন্তর হইতে উৎসারিত হইতেছে শুদ্ধ কল্যাণেচ্ছা মাত্র।

যাহারা কোনপ্রকারে তাঁহার অভয়চরণে একবার আশ্রয়লাভ করিত, তাহারাই

মনে বলভরসা পাইত, নূতন উৎসাহে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইত। প্রত্যেক আশ্রিত ব্যক্তি অন্তরে অনুভব করিত, বিপদে সম্পদে সর্বাবস্থায় মহারাজ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাঁহার আশ্রিত স্বামী অখিলানন্দ লিখিয়াছেন, "মহারাজ আমাদের প্রত্যয় দিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জাগরণ ও ভগবানলাভ কঠিন কিছু নয়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা সামান্য চেষ্টা করলেই অফুরন্ত সহায়তা পাব ও সহজেই লক্ষ্যস্থলে পৌছাব।"

অপরের নিন্দা-গঞ্জনা ও বিবিধ আপদ-বিপদ হইতে তিনি তাঁহার আশ্রিতদের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তেমনি তাহাদের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া ঈশ্বর-সেবার যোগ্য করিয়া তুলিতেন। পূজক যেরূপ কীটদুষ্ট ফুল বাছিয়া দেবতার চরণে অর্পণ করে, মহারাজও সেইরূপ তাঁহার আশ্রিতদের দোষত্রুটি শোধন করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন। তিনি আশ্রিতজনের আচার-ব্যবহারের প্রতি নজর রাখিতেন, নানাবিধ উপায়ে তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে সাহায্য করিতেন। সাধারণতঃ তিনি দোষী ব্যক্তিকে স্বাধীনতার লম্বা দড়ি ছাড়িয়া দিয়া তাহার শেষপ্রান্ত ধরিয়া থাকিতেন, তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, সে নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে এবং আত্মশক্তিসহায়ে ক্রমে দোষমুক্ত হইতে পারে। তাঁহারই লেখা হইতে তাহার শাসন-শোধন পদ্ধতি জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখনও কাহারও মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায় আপনি দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন।"[১] তাঁহার আশ্রিতজনের শাসন ও পালন ব্যাপারে ইহাই ছিল তাঁহার মূল নীতি। বাগানের মালী চারাগাছ সযত্নে রক্ষাপূর্বক তাহাদের প্রয়োজনীয় আলো জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং অন্যান্য অন্তরায়গুলি দূর করিয়া গাছের সহজাত বৃদ্ধির শক্তিকে পুষ্ট করে। মহারাজও সেইরূপ তাহার আশ্রিত ব্যক্তি যাহাতে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করিয়া ধৈর্য সহকারে খাদ-মিশান সোনা হইতে খাদ দূর করিতে পারে এবং ক্রমে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য, অধিকাংশ সময়ে নীরবে শিষ্যের অজ্ঞাতসারে,

১ 'গুরু' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দান করিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দয়াময় শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে প্রায়ই বলিতেন, "ছাখ, ঠাকুর করুণার সাগর। তিনি তোমার দোষ একবার ক্ষমা করবেন, তুবার দশবার করবেন, হাজারবারও হয়ত ক্ষমা করবেন। কিন্তু একবার যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে কাউরির সাধ্য নেই যে তাকে রক্ষা করে।"[১]

আর একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অন্য দুই তিনজন সেবক মহারাজের নিকট কয়েকটি বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি স্থিরভাবে সমস্ত কিছু শুনিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন, তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার। আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে। এই দেখ না, আমার কাছে ভাল মন্দ কতরকম লোক আসে, সকলকে সমানভাবে আদর যত্ন করি। মন্দ লোক এলে তাকে দূর ছাই করলে সে যায় কোথায়। সনক, সনৎ-কুমার, সনন্দদের মত লোক নিয়ে সকলেই থাকতে পারে। সব রকমের লোককে নিয়ে থাকাই আসল। খুব সহ্যগুণ রাখবে। সহ্য করলে ক্রোধ পালিয়ে যায়। সহ্য করার চেয়ে সংসারে আর কিছু নাই। ঠাকুর বলতেন, 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহ্য করবে। বিনীতভাব জীবনগঠনের পরম সহায়। নীচু জায়গায় জল জমে, উঁচু থেকে গড়িয়ে যায়। যে বিনয়ী তার মিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণ আপনি ফুটে ওঠে।"

তাঁহার মুখে মহাপ্রভু-উচ্চারিত উপদেশটি প্রায়ই শুনা যাইত, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥" মাঝে মাঝে ঠাকুর-কথিত গল্পটি তাঁহার স্বভাবমিষ্ট সুরে বলিতেন, "কোনও গভীর অরণ্যে এক দাবানল জ্বলে উঠেছিল। সেই জঙ্গলের ধারে একটা বড় গাছের পাতায় অনেকগুলি পিঁপড়ে বাসা করেছিল। তারা দেখলে তাদের বাঁচবার আর উপায় নেই, কারণ তলার চারিদিকে আগুন ঘিরেছে। এমন সময় একটি হাতী দাবানল থেকে বেরিয়ে সেই গাছটির নিকট দিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে পিঁপড়েরা বল্লে—ভাই তুমি তো নিরাপদে দাবানল থেকে বেরিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছ। আমরাও সবংশে বাঁচি যদি তুমি শুঁড় দিয়ে এই ডালটি ভেঙ্গে দাবানলের বাইরে ফেলে দাও। হাতীটা এসে দাঁড়াল এবং তাই করলে। কিছুকাল কেটে গেল। পরে পিঁপড়েরা একদিন জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা কাতর ধ্বনি শুনতে পেলে।

১ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

স্বরটা যেন তাদের চেনা-চেনা ঠেকলো। সারবন্দী হয়ে এগিয়ে তারা দেখলে সেই হাতীটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। কিছু বুঝতে না পেরে তারা তার শুঁড়ের ভিতরে গিয়ে দেখে যে হাতীর মাথায় একটা কীট আছে যার দংশনে সে অস্থির হয়েছে। এই দেখে তারা সকলে মিলে কীটকে টুকরো টুকরো করে কেটে বের কল্লে। হাতীটাও যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেলে। কার দ্বারা কি উপকার হয় তা কে বলতে পারে?" অপরের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ, বিদ্বেষে উত্তপ্ত ব্যক্তি মহারাজের স্নিগ্ধ উপদেশে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইত। অবাক হইয়া দেখিত, উদারহৃদয় মহারাজ সব কিছু জানিয়াও সকলকে আপনার করিয়া লইতেন, দোষীকে তাহার দোষসমেত গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহার স্বভাবমধুর স্বরে বলিতেন, 'যে যতই ছোট হোক্ কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই।'

সাধুব্রহ্মচারীদের ছোটখাট আচার-আচরণ পর্যন্ত বহুদর্শী মহারাজ কখনও মিষ্ট কথায়, কখনও সদাচরণ দেখাইয়া, প্রয়োজনবোধে তিরস্কার করিয়া শিখাইয়া দিতেন। রান্না কি ভাবে উপাদেয় করা যায় বা সামান্য চেষ্টাতেই রান্নার স্বাদ আরও ভাল কি ভাবে করা যায়, ইহার পরামর্শ তিনি দিতেন। ভাঁড়ারে হয়ত বিশেষ কিছু নাই—মহারাজ শুনিতে পাইয়া এইটার সহিত ঐটা জুড়িয়া পাঁচরকম তরকারীর ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, ঠাকুরের ভোগের সমস্যা সহজেই মিটিতে দেখিয়া সেবক আহ্লাদিত হইতেন। সেবকদের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রদীপ জ্বালাইতে কেহ একাধিক কাঠি ব্যবহার করিয়াছে দেখিলেও মহারাজ বিরক্ত হইতেন। গৃহীভক্তদের নিকট হইতে শিষ্য-সেবক কেহ কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি সেবকদের বলিতেন যাহার যাহা প্রয়োজন যেন তাঁহার নিকটে চাহিয়া লয়। একদিন তিনি জনৈক সেবককে বলিয়াছিলেন, "আমরা আর কি ভোগ করলুম! তোদের ভোগের সীমা পরিসীমা থাকবে না— তোদের গদীর পর গদী, মঠের পর মঠ, ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য হবে। দিনকতক চেপেচুপে থাক। একটু সংযম কর।" বাড়ীর গেটের নক্সা হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলগাছের চাষ, ঠাকুরসেবা হইতে আইন-আদালত পর্যন্ত বিভিন্ন ছোটবড় সমস্যা লইয়া সাধুব্রহ্মচারিগণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইত এবং ধর্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ঐ সকল সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায় শিখিয়া যাইত; যাহার যে-কোন সমস্যা হউক সে একবার উহা মহারাজের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিত।

ধর্মসেবীদের অনেকেই দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মধ্যেও অলৌকিকত্বের অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয় এবং যাচাই না করিয়া সব কিছু মানিয়া লইতে প্রয়াসী হয়, ফলে অনেক সময় কুসংস্কারের আবর্তে বদ্ধ হয়। মহারাজ সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে তাঁহার আশ্রিত জন এই দোষে দুষ্ট না হয়। একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন স্বামী প্রভবানন্দ। জনৈক সাধুকে বিছা কামড়ায় এবং একটি মন্ত্রসহায়ে অলৌকিকভাবে তিনি যন্ত্রণামুক্ত হন। সেবক মহারাজকে এই ঘটনা নিবেদন করিলে মহারাজ তাহাকে বাগানে লইয়া গেলেন এবং একটি গাছ দেখাইয়া বলিলেন যে, "দেখ, এই গাছের রসে বিছার কামড়ের যন্ত্রণা সেরে যায়।" এই ভাবে ছোটখাট বিষয় হইতে সুরু করিয়া গভীর ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ে মহারাজ তাঁহার আশ্রিতজনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি সাধুব্রহ্মচারীর সর্ববিধ উন্নতিবিধানের জন্য যেরূপ ব্যগ্র ছিলেন, গৃহী-ভক্তদের কল্যাণের জন্যও তদ্রূপ উদ্গ্রীব হইতেন। গৃহীভক্তদের শুধুমাত্র পার-লৌকিক কল্যাণসাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, বর্তমান জীবনেও যাহাতে তাহারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতে পারে তাহার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেন। ভক্ত-পরিবারের সাংসারিক খবর জানিয়া তিনি নানাবিধ পরামর্শ দিতেন, তাহারাও সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া সংসারের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেন। কেহ হয়ত সাংসারিক অশান্তির বিষয় মহারাজকে নিবেদন করিল, মহারাজ তাহাকেও সদুপদেশ দিয়া সুপথে পরিচালিত করিতেন। কেহ হয়ত অত্যধিক অর্থকষ্টে পড়িয়াছে, মহারাজ অপর কাহাকেও বলিয়া বা নিজেই তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। ভক্তপরিবারের কেহ চাকুরী পাইতেছে না জানিয়া তিনি অপরকে বলিয়া চাকুরী জুটাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান। তাঁহার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু সেদিকে ডাক্তারের বিশেষ ভ্রূক্ষেপও ছিল না। একদিন ডাক্তার মহারাজের অঙ্গসংবাহন করিতেছিলেন, মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "এত লোকের আমরা করে দিলাম, ডাক্তারের কিছু হচ্ছে না। আচ্ছা, এরপর খুব পসার হবে।" ডাক্তার প্রার্থনা জানাইলেন, "টাকার চেয়ে প্রেমভক্তি যাতে হয় সেই আশীর্বাদ করুন।" মহারাজ বলিলেন, "সে তো আছেই, কিন্তু টাকা না হলে সংসার চলবে কি করে?" দেখা গেল, বাস্তবিকই ডাক্তারের পসার অল্প কিছু সময়ের মধ্যে বাড়িয়া গেল।

মহারাজের বিশেষ স্নেহের পাত্র শ্যামবাবু[১] কয়লার খনির ব্যবসায়ে খুবই উন্নতি করেন, প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন। মহারাজের সেবাযত্নের জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এমন কি মহারাজের মহাসমাধির পর 'ব্রহ্মানন্দ মন্দির' তৈয়ারী করিবার জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মহারাজের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরেই ঐ পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যায়।

কিন্তু সকল বিষয়ের মধ্য দিয়া আশ্রিতজনকে ঈশ্বরের পথে প্রেরণাদান ছিল মহারাজের প্রধান জীবনব্রত। ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য. এই সত্যটি শিষ্যবর্গের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া তিনি বলিতেন, "বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস যদি না থাকে, শুধু মন্ত্র-তন্ত্রে কিছু হবে না। বেড়ালের ছানার মত পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার হবে করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন।...তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন।"[২] মহারাজের মুখ হইতে এই 'অভীঃ' বাক্য শুনিয়া আশ্রিত-ব্যক্তির মনের খেদ দূর হইত, ধর্মজীবনের কঠিন পথে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয় বলভরসা পাইত।

সদ্‌গুরু মন্ত্রদীক্ষার মধ্য দিয়া শিষ্যকে তাঁহার সাধনালব্ধ যে তত্ত্ব ও শক্তি দান করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ধৈর্য নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে সাধনভজন করিলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যায়। সাধনভজনের জন্য চাই গভীর আত্মপ্রত্যয় ও পুরুষকার। সাধকের সুপ্ত শুভ-বুদ্ধি, অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া মহারাজ জোরের সঙ্গে বলিতেন, "তোমাদের একটা self-reliance (আত্মবিশ্বাস) নেই। সাধনপথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো।...একমাত্র মানুষজন্মেই ভগবানলাভ হয় এবং করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে

১ ইনি ঠাকুরের পরম ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। তিনি সকল বিষয়েই ছিলেন মহারাজের মুখাপেক্ষী।

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১২৯

হবে যেন আর জন্মাতে না হয়।"[১] প্রবর্তক সাধকের দীর্ঘকালের সমস্যা, মন স্থির হয় না। বাসনাবিক্ষুব্ধ মন-স্রোতস্বিনীকে শান্ত করিবার উপায় কি? ধৈর্য ধরিয়া মহারাজ শুনেন প্রবর্তক সাধকের বাধা-বিপত্তির কথা। সিদ্ধগুরুর জীবনের গগনস্পর্শী উচ্চতা ও প্রবর্তকের নিম্নতার মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা যেন লুপ্ত হইয়া যায় করুণা ও সহানুভূতিতে। তিনি বুঝাইয়া বলেন মন স্থির করিবার মূল নীতি। "মনকে দুই উপায়ে স্থির করতে হয়। প্রথম কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে মনকে সংকল্প-বিকল্পাদি-রহিত করে ধ্যান-ধারণা করা। দ্বিতীয়, ভাল ভাল thought (বিষয়) নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনকে develop (উন্নত) করা। গরুকে খাওয়ালে যেমন দুধ দেয়, মনকে সেইরূপ food (খাদ্য) দিতে হয়, তবেই মন শান্ত থাকে। মনের food হচ্ছে ধ্যানজপ, সৎচিন্তা ইত্যাদি।"[২] সাধন-ভজন সম্বন্ধে সকলের জন্য এক নিয়ম খাটে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মতি-গতি, হাব-ভাব অনুযায়ী তাহাকে বিশেষ উপদেশ দিতেন, কিন্তু সাধন-ভজন সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে কয়েকটি উপদেশ দান করিতেন: প্রথমতঃ ভগবানে বিশ্বাস চাই; এইটি মনে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে, ভগবানলাভ দ্বারা মনুষ্যজন্ম কৃতকৃতার্থ হয়; দ্বিতীয়তঃ চাই ব্রহ্মচর্য, কারণ ব্রহ্মচর্য ছাড়া কোন বড় ভাবের ধারণা হয় না; তৃতীয়তঃ চাই জিহ্বার সংযম; চতুর্থতঃ সাধনভজনের সুন্দর সময় সন্ধিক্ষণ ও নিশীথ রাত্রি; প্রথম বয়সেই খেটেখুটে সাধনভজন করে নিতে হয়।[৩]

শাশ্বত গুরুশক্তির অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল মহারাজের অধ্যাত্মজীবনে; তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শশিনিকেতনে মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছিল, "এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু-আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবানলাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে ত? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না, ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা যদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১১০-১১
২ ঐ পৃঃ ১৩৭
৩ ঐ পৃঃ ৬৪-৬৮

তবে তিনিই তাদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন।"[১] এই সুস্পষ্ট আশ্বাসবাণী শুনিয়া আশ্রিত ব্যক্তিগণ সকল কিছু ছাড়িয়া সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে শরণাগতি লইবার জন্য ছুটিয়া আসে, আসিবার পথে যে বাধাবিপত্তি কখন কখনও দেখা দেয় তাহাও গুরুবলে কাটাইয়া অগ্রসর হয়, শেষ পর্যন্ত শরণাগতির শান্তি আস্বাদন করিয়া জীবন ধন্য করে।

সাধুব্রহ্মচারী যাহারা ভগবানের নামে ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, মহারাজ তাহাদের ডাকিয়া বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মত করতে হবে। জাহাজ যে দিকেই থাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না।"[২]

মহারাজ কোন এক ভক্ত মহিলাকে লিখিয়াছিলেন, "ভাব বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ না তাঁর কাছে পৌছান যায়, ততক্ষণ সব আলুনী।

"কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ মলিনতা তায় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমমুখচাঁদ উদয় নাহি হয় হে॥"

অহঙ্কার-মদে মত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ 'প্রেমমুখচাঁদ'-এর দর্শন সহজে পায় না। কিন্তু সেই অপরূপ রূপের দর্শন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সোয়াস্তি নাই, যে কোন উপায়ে সেই দুর্লভ দর্শন লাভ করিতেই হইবে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মই জীবের আসল ঠাই, সেই ঠাই-এর সন্ধানে মানুষকে প্রবোধিত করেন সদ্‌গুরু। ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত দেখিলে সেই ব্যক্তিকে মহারাজ বলিয়া দিতেন গুহ্য তত্ত্ব। "মহামায়া কত রকমে যে মানুষকে ভুলিয়ে রাখেন তা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু জানি, ভগবানের ভাবকে 'ইতি' করতে নেই। তিনি অনন্তভাবময়। তিনি মন ও বুদ্ধির অগোচর। তিনি যাকে দেখান, জানান, বোঝান, সেই তাঁকে দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে। তাঁকে জানলে জ্ঞানের কপাট খুলে যায়, সকল গাঁট আল্‌গা হয়ে যায়। মানুষ যখন এই অবস্থা লাভ করে, তখন তার ঠিক ঠিক ধারণা হয় যে, আমি তাঁর—তিনি আমার।"[৩]

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১২৯
২ ঐ পৃঃ ৯১
৩ ঐ পৃঃ ৪৯-৫০

শ্রীগুরুর শুদ্ধ-সত্ত্ব-মন শিষ্যসন্তানদের কল্যাণের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয় তাহার একটু ধারণা মহারাজের মুখের একটি বাণী হইতে পাওয়া যাইতে পারে। একদিন তিনি কাশী অদ্বৈতাশ্রমে বলিয়াছিলেন, "কখন কখন মনের এমন অবস্থা থাকে—মনে হয় যে, পায়ে ধরে বলি, বাবা, এই কর, এই কর। আবার কখন কখন মনে হয়—আমি কি করব? ঠাকুর আছেন—তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি হচ্ছে। আর কাকেই বা বলি। তিনি করণ, কারণ, তিনিই সব। আর বললেই বা লোকে নেবে কেন? তবে কি জান, সে-দিক থেকে যদি প্রেরণা আসে তবে বললে লোকে নেয়।"

বাস্তব ঘটনারাজি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ গুরুশক্তি নানাবিধ উপায়ে মহারাজকে আশ্রয় করিয়া জীবের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত ছিল। সকলকে অভয় প্রদানপূর্বক মহারাজ বলিতেন, "শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত—এ ছাড়া আর গতি নেই। কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করতে হবে। সেই শক্তি-সামর্থ্য, ত্যাগ-তপস্যা ও সাহস নেই, মন দুর্বল, কাজেই ভোগাসক্তি বেশী। তা সত্ত্বেও কিন্তু ভগবানকে পেতে হবে, তা না হলে এ জীবনটা বৃথা গেল, কেবল আসা-যাওয়া সার হ'লো। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া এ-যুগে সহজ রাস্তা আর নেই।"

'ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণের সকলের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট যে, যদিও তাঁহাদের প্রেম ও করুণার ধারা পাপীতাপী ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সমানভাবে বর্ষিত হয়, তবু সাধারণতঃ সমাজে যাহারা অনাদৃত অবহেলিত, তাহারা সহজেই মহাপুরুষের আশীর্বাদের পাত্র হয়। আশিসধারা বর্ষণের ফলে ঘৃণিত অবহেলিত ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে পুণ্যপীযুষ আস্বাদন করিয়া নূতন জীবন লাভ করে, তাহার রুদ্ধপ্রায় হৃৎকুণ্ডে লুক্কায়িত শুভসংস্কারসকল তীব্রগতিতে জাগ্রত হইয়া উঠে। মহাপুরুষের কৃপার বশে পাথরের অহল্যা প্রাণ পায়, পাপীতাপীদের অশ্রুবারিতে সিঞ্চিত মহাপুরুষের দয়াসৌধ মহত্ত্বের জয়গান করে। রঙ্গালয়ের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তদানীন্তন সমাজের অবহেলা, ঘৃণা ও দুর্ব্যবহারে জীবন দুঃসহ বোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজের কৃপালাভে তাঁহার জীবনে কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত স্মৃতিকথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলে ধারণা করা যাইবে। "মন বড় খারাপ, অশান্তি—অশান্তি, কিছু ভাল লাগে না, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে দেবালয়ে যাই

—সংসার ক্রমশঃ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এম্‌নি যখন মনের অবস্থা—একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড় মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী—বাঙ্গলা নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে, যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনিই আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান—মঠেও ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী।" মধ্যাহ্ন-আহারের পরে তাহারা মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, আদরযত্ন করিয়া প্রসাদ ধারণের ব্যবস্থা করিলেন। তারাসুন্দরী এইভাবে মহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তাঁহার প্রাণের আকুতি, "...এইত জুড়াবার স্থান, এইত এমন এক জন দরদী আছেন—যাঁর কাছে আমি পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি—যার কেউ নাই তার আপনার জন—ঐ আমার মহারাজ, ঐ আমার পিতা, আমার স্বর্গ, আমার শান্তি, আমার ভগবান। জ্বালা জুড়াইল...।"[১] খরবৈশাখরৌদ্রদগ্ধ তৃষিত জীবন কৃপা-বরিষণে যেন সঞ্জীবিত হইল। তিনি ভুবনেশ্বরে গৃহ নির্মাণ করিয়া একটি ঘরে মহারাজের প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক পূজা-অর্চনাদি করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সতীশ্বর সেন (টাবু) মহারাজের স্নেহভাজন। মহারাজকে অতি আপনার জন জ্ঞান করিত, প্রতিদিনই মহারাজ অথবা তাঁহার সেবকদের নিকট আসিয়া সময় কাটাইয়া যাইত, নানা ফাইফরমাস খাটিত। সেই টাবু অকস্মাৎ একটি লজ্জাকর ঘটনায় জড়াইয়া পড়িল, ভয়ে সঙ্কোচে সে মহারাজকে এড়াইয়া চলিতে থাকিল। একদিন ঘটনাক্রমে সে মহারাজের সামনে পড়িয়া যায়, তাহার গা ঢাকা দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আড়ষ্ট টাবুকে মহারাজ ডাকিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, বলতে পারিস মোষের শিঙের উপর যদি অনেকগুলো মশা বসে, মোষ কি জানতে পারে, না তার কষ্ট বোধ হয়? আমাদেরও তেমনি জানবি।" টাবু আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় মহারাজের নিকট যাতায়াত করিতে থাকে।

লাঞ্ছিত ও পতিতদের প্রতি গুরুশক্তির অপার করুণা দেখা যায়, সেই করুণা-রসে সিঞ্চিত হইয়া শুষ্কপ্রায় জীবনতরু নূতন প্রাণ লাভ করে। গুরুকৃপায় তাহারা অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হয়, কালক্রমে তাহাদের জীবনবৃক্ষ ফুলফলে সমৃদ্ধ

১ 'উদ্বোধন' ২৪ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৮৩, ২৮৫

হইয়া সার্থকতা লাভ করে। মহারাজের অপার কারুণ্যরসে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে অনেক শুষ্কপ্রায় প্রাণ; তাহাদের ইতিবৃত্ত সংযোজিত করিলে অধ্যাত্মগুরু মহারাজের ঐশীশক্তির ঐশ্বর্যই প্রকাশিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ-লিখিত একটি পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব গুরুর করুণাশক্তি প্রাকৃত নিয়মের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে কার্য করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,[১] "ঠাকুরের কৃপার কাছে গণ্ডি-ফণ্ডি, বেড়া-টেড়া সব ভেঙ্গে যায়। তাঁর কৃপাবারির বেগ অতি প্রবল—নীচের ধারাও উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে pumping system (পাম্পের কল) চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে। বিজ্ঞান ও স্বভাবের সহিত সংগ্রাম চলেছে। তোমাদের প্রেমবারি এ পাহাড় কেন, অতি দুর্গম দুরূহ অবিদ্যার পর্বতকেও উল্লঙ্ঘন করে জীবকে ধন্য করে।...

"একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বসে এক মারোয়ারী ভক্তের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আসক্তি সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হবার পরে শেষে প্রভু তাকে বলেছিলেন যে, সাধুর সমস্ত বৃত্তিই যায়, থাকে কেবল এক বৃত্তি—তা 'দয়া'। আমাদের ভাষায় আমরা তাকেই প্রেম বলি, যদ্দারা প্রভু তাঁর বিভিন্ন প্রকৃতির ভক্তদের চিরকালের জন্য বেঁধেছেন।" মহারাজের দয়ার প্রস্রবণও এইরূপ নিয়ম-কানুনের নিগড় অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মহারাজের কৃপাবারি যে হৃদয়-জমিতেই একবার পড়িয়াছে তাহা ক্রমে উর্বর হইয়া উঠিয়াছে, উর্বরা জমিতে গুরুদত্ত অমোঘ মন্ত্র অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে কল্যাণবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃপাধন্য ব্যক্তি নিজের জীবন সার্থক করিয়াছে, অপরের শান্তির কারণ হইয়াছে। অন্য দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কৃপাধন্য ব্যক্তি মহারাজের অনন্ত প্রেমের ফল্গুধারায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরানুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে এবং সর্বগতির আশ্রয় ভগবৎ-পাদপদ্মে সর্বাত্মক শরণাগতি লইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

অশেষ অধ্যাত্মশক্তির আধার মহারাজের গুরুশক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে ভুল করা হইবে। লোকসংগ্রহার্থ স্বপার্ষদ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সামগ্রিক অবতারলীলার এক অভিব্যক্তিই এই গুরুশক্তি। ইহা সাধারণ গুরুর

১ আলমোড়া হইতে ১২।১০।১৫ তারিখে প্রেমানন্দজীকে লিখিত।

শক্তির সহিত তুলনীয় নহে। ঈশ্বরের করুণা তাঁহার অবতার ও ঈশ্বরকোটি পার্ষদদের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করে। মহারাজের নিজের উক্তি, তাঁহার আচরণ ইত্যাদি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, ঈশ্বরীয় শক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত মহারাজ যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্ররূপে কার্য করিয়াছেন। তিনি নিয়ত অনুভব করিতেন, ঠাকুর সদাসর্বদা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আছেন। ঠাকুরের নির্দেশ বা ইঙ্গিত না পাইয়া তিনি কিছুই করিতেন না। ঠাকুরের ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই তাঁহার মধ্যে গুরুশক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। এই দৃষ্টিতে না দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব না, কেন প্রাণপ্রতিম গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দজীর আন্তরিক অনুরোধেও কোন কোন ব্যক্তিকে মহারাজ দীক্ষাদি দিতে সম্মত হন নাই। আবার কেন কোনরূপ অনুরুদ্ধ না হইয়াই তিনি যাচিয়া কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়াছেন। যুবক সুরেন্দ্র মহাপুরুষজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। মহারাজ মহাপুরুষজীর নিকট হইতে যুবকটিকে চাহিয়া লন, তাহাকে নিজে কৃপা করিবেন বলিয়া।[১] যুবক মহারাজের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; পরবর্তীকালে স্বামী নিবেদানন্দ নামে সুপরিচিত এই যুবক দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণ সংঘের সেবা করিয়াছিলেন।

সাধারণভাবে ঠাকুরের ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া মহারাজ সদাসর্বদা চলিতেন ফিরিতেন, তাহা ছাড়াও তাঁহার মধ্যে কখনও কখনও বিশেষ ভাবের প্রকাশ হইত, যখন সকলে সুস্পষ্ট অনুভব করিত, ঠাকুর সেই সময়ে তাঁহার মধ্যে যেন বিশেষভাবে আবির্ভূত হইয়া করুণাদান করিতেছেন। দুইটি ঘটনার উল্লেখ দ্বারা বক্তব্য পরিষ্কার করা যাইতে পারে। সেবক ঈশ্বর মহারাজ তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন।

"একদিন মহারাজের ঘরে সমবেত ভজনে যোগ দিয়া ও মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিয়া পূজার যোগাড় করিতেছি এমন সময় হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আসিয়া বলিলেন, 'চল বেটা, তোকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই।' একরকম টানাহেঁছড়া করিয়াই তিনি আমাকে দোতলায় মহারাজের ঘরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, 'নে, মহারাজকে পেন্নাম কর।' মহারাজ তখন নিজের খাটে বসিয়া ছিলেন, বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, এই বেটা বড্ড রাগী,

১ স্বামী নির্বেদানন্দ—জীবনী ও রচনাদি সংগ্রহ, পৃঃ ১-১৮

আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে। তুমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও যাতে ওর মাথা ঠাণ্ডা থাকে।' মহারাজ নিজের হাত এ-পিট ও-পিট করিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'আজ আমার হাতটা ঠিক নাই, আজ হবে না। বরং তুমিই একটু দেখ।' বাবুরাম মহারাজ তখন ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিয়া আমাকে মহারাজের পায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। দিতেই, মহারাজ স্থির হইয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার কোমল করপদ্ম আমার মাথায় বুলাইয়া দিলেন। 'ওদের কি দোষ মহারাজ, আমি বকে বকে ওদের মাথা গরম করে দি। বয়স হয়েছে, মঠের সব কাজকর্ম দেখতে হয়, আমারও মাথার ঠিক থাকে না, তুমি আমারও মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।' এই বলিয়াই মহারাজের কোলের উপর নিজের মাথা রাখিলেন, আর মহারাজও নির্বিকারভাবে হাত বুলাইয়া দিলেন। চারি পাঁচজন সাধু ব্রহ্মচারী তখনো মহারাজের ঘরে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথায় হাত বুলানো হইল। বাবুরাম মহারাজ তখন নিজের ঘরের জানালা হইতে চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওরে, মহারাজ আজ কল্পতরু হয়েছেন, তোরা সবাই আয়, আয়।' সেই ডাক শুনিয়া যে যেখানে ছিল, মায় সোনা ও কেনা উড়িয়া চাকর দুইটি, সকলেই আসিয়া মহারাজের মৌন আশীর্বাদ লাভ করিল। কোন্নগরের বিপিন ডাক্তার, টেরা ও খোঁড়া, পায়খানা হইতে আসিয়া হাতে মাটি দিতেছিল, সে আসিতে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন ও একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে উপরে লইয়া আসিলেন। মহারাজ তখন আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন, ডাক্তার আসিতেই বলিলেন, "যো আয়া থা সো চলা গিয়া।"[১]

মহারাজ সাধারণতঃ ভাব খুবই চাপিয়া রাখিতেন। কিন্তু ভাবের আতিশয্য এই চেষ্টার বাঁধন ছিড়িয়া কখনও কখনও উপছাইয়া পড়িত। ময়মনসিংহের একটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন: পূজনীয় মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ নদীর ধারে কাছারির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ: বাবুরামদা, দেখছো, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর নদী, বেশ জায়গা। হু হু করে বাতাস বইছে, এসব দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে।

বাবুরাম মহারাজ: হবে বৈ কি! শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'হৃদয়ের বাড়ীতে মাঠ

১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা

আছে, তাই সেখানে থাকতে ভালবাসি, মাঠ দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।'

মহারাজ: জয় গুরু, শ্রীগুরু।

বাবুরাম মহারাজ: হরিবোল, হরিবোল।

মহারাজ: বিশ্ব, একটা ভগবানের নাম কর না।

অন্য একজন ব্রহ্মচারীকে বল্লেন, 'তুই বল না?' তখন ব্রহ্মচারী একটি স্তব পাঠ করলেন।

মহারাজ: এটা কোন্ দিক?

সকলে বলিলেন, 'উত্তর-পূব কোণ'। মহারাজ ঐ দিকে প্রণাম করিলেন। আর একজন একটা স্তব পাঠ করিলেন।

মহারাজ: এ সব জায়গাতে সন্ধ্যা ও সকালে ধ্যান করা ভাল। মন পবিত্র হয়। ভগবানের নামই সত্য। আর যা দেখছো সবই মিথ্যা। তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁর গুণগান এই জীবনের ধর্ম।

এই কথাগুলি তিনি খুব ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলে মহারাজ বারণ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ বিনীতভাবে বলিলেন, 'তোমার যখন এই অবস্থা, ওরা একটু প্রণাম ক'রে নিক। (ভক্তদের দিকে চাহিয়া) এই সময় তোরা একটু প্রণাম করে নে। মহারাজ, তুমি একটু দাঁড়াও।' সকলে প্রণাম করিলে মহারাজ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'কালে দেখছি এইসব ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে'।

মহারাজের অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাগণ ও ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অনেকে স্পষ্টভাবে বা আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুরের গুরুশক্তি কার্য করিতেছে। সকলের অনুভবকে ব্যক্ত করিয়াছেন হরি মহারাজ ছোট একটি বাক্যে, "মহারাজের সঙ্গ দুর্লভ ও অমোঘ।" অবতারলীলার অন্যতম মুখ্য পরিকর মহারাজের দিব্য গুরুভাব জগৎসংসারে বিরল একটি ঘটনা। মহারাজ ভাবস্থ হইয়া তাঁহার এক অন্তরঙ্গ শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মধ্যে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান, আমি তার সংযোগ সেতু।"[১]

এই মহান গুরুশক্তি ক্ষণিকের নহে। মহারাজের আশ্রিত একজন সন্ন্যাসী

১ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ-কথিত।

শিষ্য লিখিয়াছেন, মহারাজের মায়িক শরীর খসিয়া পড়িলে, স্থূল বাধাবিপত্তি দূর হওয়ায়, অনন্তভাবময় মহারাজের নিত্য-সান্নিধ্য লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইতেছেন। ইহাতে সকল ভক্তজনের প্রাণের কথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই মহান ঐশী শক্তিকে কৃতাঞ্জলিপুটে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের বর্ণালি

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের বর্ণালি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উপমার সাহায্যে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির পার্থক্য বুঝাইয়াছেন ঃ "এক এক রকম তুবড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাট্‌ছে, তার পর আবার আর এক রকম। তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না! আর এক রকম তুবড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ করে উঠে ভেঙ্গে যায়! যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আস্‌তে বা এসে খপর দিতে পারে না।"[১] এই উপমার যথার্থ উপমেয় লোকোত্তর পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্র। সূর্যকিরণ আকাশে, মেঘে, জলে, পাহাড়ে, বনানীর প্রান্তরে বর্ণচ্ছটার মায়াজাল বুনিয়া অপূর্ব শোভার বিস্তার করে, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ-চরিত্র-মাধুর্য উত্তুঙ্গ আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্য হইতে সুখদুঃখ-মিশ্রিত সংসারজীবনের সর্বত্র আনন্দরেণু ছড়াইয়া দিয়াছে; চতুর্দিকে রঙবেরঙের ফাগ যে রঙীন প্রহেলিকা বিস্তার করিয়াছে তাহার প্রতিটি কণা বিবিধ আনন্দ-বিচ্ছুরিত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

জীবের কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় আনন্দময় ভগবানের সপার্ষদ অবতরণ—এই লীলাতত্ত্ব, কার্যকারণ যুক্তিদ্বারা বুঝা যায় না, শুধুমাত্র বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে, "তুমি নিজে না দিলে দেখা, কে তোমারে জানতে পারে"—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভক্তমন কাতরভাবে প্রার্থনা জানায় ঃ "কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।" প্রার্থনায় সন্তুষ্ট অবতার-পুরুষ ও পার্ষদবর্গ যখন তাঁহাদের নিজের ও পরস্পরের স্বরূপ দেখাইয়া দেন, তখন ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে চিনিতে পারে এবং প্রকৃত প্রেম-ভক্তি-জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হয়।

১ কথামৃত ২।১৬।১।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী অনুসরণ করিয়া আমরা জানিতে পারি, অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তির আধার স্বামী ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে যে অবস্থা, সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ঘোলের উপর ভাসমান মাখনখণ্ডের মত, তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বঘন মনকে সংসারে ভাসাইয়া রাখিয়াছিলেন। "ঈশ্বর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা—বাৎসল্য-ভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান।"[১] আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্য থাকিলেও বিজ্ঞানীর সহিত প্রবর্তকের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। "বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে!...তাঁকে চিন্তা ক'রে, অখণ্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ,—আবার মন লয় না হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।"[২] ইহা অনস্বীকার্য, সর্বোচ্চ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের ইতরবিশেষ নাই—"এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ", কিন্তু জ্ঞানাতীত বিজ্ঞানীর অবস্থার মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্যভেদ বিদ্যমান। অসীম-অনন্ত-ভাবময় ঈশ্বরের যেমন ইতি করা যায় না, বিজ্ঞানীর অধ্যাত্মবিজ্ঞানাগারে তত্ত্ব ও তথ্যের বৈচিত্র্যেরও তেমনি শেষ করা যায় না।

শ্রীভগবানের লোককল্যাণরূপ নরলীলায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ অত্যুচ্চ এক দিব্যভাব আশ্রয় করিয়া তাঁহার লীলার সহায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বার্থী সাধক দেখিতে পায় তিনি 'ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান' লইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া বলিতেন: "ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে।" ব্রহ্মজ্ঞানীর এই ধরণের দ্বৈত ব্যবহার অতি আনন্দদায়ক, সকল দুঃখশোকের অপহারক। শাস্ত্র বলেন—

দ্বৈতং বন্ধায় নূনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যা যৎ কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

ইহা সত্য যে, জ্ঞানলাভের পূর্বে দ্বৈতভান্ বন্ধনের হেতু। কিন্তু জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয়পূর্বক যে কল্পিত উপাস্য-উপাসকাত্মক দ্বৈত ব্যবহার, তাহা অদ্বৈত অপেক্ষা সুখদায়ক ও সুন্দর। এই সকল মহাপুরুষগণের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একীভূত হইবার ফলে তাঁহাদের ব্যবহারাদি সর্বদাই

১ কথামৃত ৩।২০।৩।
২ ঐ ৩।৯।৩।

ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বসন্তানিলের ন্যায় সর্বতোভাবে লোককল্যাণে নিয়োজিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে দুইটি সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছে,—একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্তা ও অপরটি তাঁহার ভক্ত-সত্তা, এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান। স্বামী ব্রহ্মানন্দের গুরুভাবের মধ্যে রামকৃষ্ণ-সত্তাটির প্রাধান্য, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহার ভক্ত-সত্তা আনন্দোচ্ছল শিশুর মত বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে অভিনিবিষ্ট। রামকৃষ্ণ-ভাবে রঞ্জিতাকার ভক্ত-সত্তাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একীভূত হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ সাধারণের প্রতি করুণায় বিগলিত হইয়াছে, বন্ধুজনের দরদ লইয়া অপরের দুঃখে-কষ্টে, দুর্বলতায়-অক্ষমতায় সমব্যথী হইয়াছে, হাস্যলাস্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে আবার সশ্রদ্ধ ভক্তি লইয়া তীর্থসেবা করিয়াছে, পূজাপার্বণে যোগদান করিয়াছে। সামগ্রিকভাবে এই দুই ভাবধারার সুসমঞ্জস সহাবস্থানে যে মহান ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইয়াছে তাহার আংশিক বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীউদ্ধবের 'সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তিতে—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥[১]

মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে কি সুন্দর সমাবেশ। তিনি কৃপালু, অপরের প্রতি অকৃতদ্রোহ, ক্ষমাবান, সত্যপরায়ণ, অনিন্দ্যকর্ম ও সকলের উপকারক। তিনি কামনা দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলচিত্ত, সদাচার, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভোজ, শান্ত, স্থিরচিত্ত, ভগবদ্‌মাত্র-আশ্রয় ও মননশীল। তিনি সদা সাবধান, গম্ভীরাত্মা, ধৈর্যশীল, ষড়্গুণ অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু জয় করিয়াছেন, তিনি অমানী অথচ অন্যের মানদাতা, দক্ষ, মৈত্র,

১ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।২৯-৩১

কারুণিক, কবি অর্থাৎ জ্ঞানী। এই গুণরাশির সমন্বয় সৃষ্টি করিয়াছে রসময় পুরুষের ব্যক্তিত্ব।

মহারাজকেও অনুরূপ ভূমিকায় দেখিতে পাই। কখনও তিনি সাধনমার্গের গুহ্যতম রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কখনও বাহ্যজগৎ হইতে ছুটি লইয়া ইন্দ্রিয়াতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। কখনও পতিত, তাপিতদের প্রতি অপার করুণায় বিগলিত হইয়াছেন, আবার কখনও সঙ্ঘ-পরিচালনায় তীক্ষ্ণ রাজবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট মুখ্যু মানুষ' বলিয়া দীনভাবে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অবাক হইতে হয়, সেই মহারাজই বাঘের চামড়া গায়ে জড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া শিশুদের সহিত খেলিয়াছেন, অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সহিত ফষ্টিনাষ্টি করিয়াছেন, কখনও বা ভাল পোষাকে সাজগোজ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, আবার কখনও ভাবস্থ হইয়া দেবদেবীর বিগ্রহের সম্মুখে ভাবের ঘোরে দাঁড়াইয়া আনন্দোদ্ভাসিত বদনে দেবদেবীর সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন।

মহৎ-জীবনমাত্রই একটি মহান ভাবের দ্যোতনা। প্রধান একটি ভাব অবলম্বনপূর্বক বিকশিত হয় চরিত্র। ঐ ভাবরসে পুষ্ট হইয়া জীবনবৃক্ষ বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ফুলফলে মণ্ডিত হয়। দেখা যায় মহৎ-জীবনের প্রতিটি আচার-আচরণ মূল ভাবরসে সমৃদ্ধ। অধ্যাত্মপুরুষের জীবনে ভাবের আধাররূপে বিদ্যমান থাকেন ভাবময় শ্রীভগবান। শাস্ত্রকার বলিতেছেন,

> ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন কাঞ্চনে
> যত্র ভাবস্তত্র হরিস্তস্মাদ্ভাবং হি কারয়েৎ ॥[১]

সেই কারণে মহাপুরুষের জীবন-আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন ঐ মূল-ভাবটির দিকে, যে ভাবের বিবিধ ব্যঞ্জনারূপে বিকশিত হয় তাঁহার ধ্যানধারণা ও আচার-ব্যবহার।

প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে তাঁহার চরিত্রের অশেষ বৈচিত্র্য। ইহার কোন নির্দিষ্ট অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়াও তাঁহার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অপর মানুষ—শিশু, যুবক, প্রবীণ, বৃদ্ধ সকলেই—এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গকামী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করিলে কেহই স্পষ্টভাবে বলিতে

১ গর্গ-সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; ১৩৩৩ সাল; অশ্বমেধখণ্ডম্‌ ৬১।৩৮

পারিত না কিসের জন্য এই আকর্ষণ; অথচ তাঁহার প্রভাব অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক মজার ধোপার কাহিনী বলিতেন। "লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত। গামলায় রং গোলা আছে; কিন্তু যার যে রং দরকার ঐ গামলাতে কাপড় ডোবালেই সেই রং হ'য়ে যেত। একজন তাই দেখে অবাক হ'য়ে রংওয়ালাকে বলছে, 'এখন তুমি যে রংয়ে রঙেছ সেই রংটি আমায় দাও।'" [১] ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার রাখালরাজকে ঐ বিচিত্র রঙে ছোপাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার ব্যক্তিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অসংখ্য রঙের অপরূপ বর্ণালি; আর সেই কারণেই বোধকরি তাঁহার প্রতি সকলে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিত।

রামকৃষ্ণ-ভাবানুরঞ্জিত মহারাজের প্রতিটি আচার-আচরণের মধ্য দিয়া ভগবৎ-প্রেমই বিচ্ছুরিত হইত। সেই প্রেমের ছিল অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
> নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥[২]

এই সকল মহাপুরুষ অবিনাশী ঈশ্বরের গুণগান করিয়া কখনও রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দপ্রকাশ করেন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও তাঁহার নাম গান করেন, কখনও গুণানুকীর্তন করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করেন। এইরূপ ভগবদ্ভাবে অনুরঞ্জিত জীবন স্বভাবতঃই অপরকে আকর্ষণ করে। মহারাজের এই প্রেমের আকর্ষণে সমীপাগতদের মন ভগবন্মুখী হইত; বিষয়ী এবং বহির্মুখীনদের মনও পরিশ্রুত হইয়া শ্রেয়ের দিকে প্রবাহিত হইত। ঐ প্রেমের সম্মোহনী আবর্তে আশ্রিতবর্গ নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভগবৎ-পদে ভক্তি লাভ করিত, প্রেমরসে পুষ্টিলাভ করিয়া সাধনপথের দুর্গমতাকে সাদরে বরণ করিয়া লইত। প্রেমময় মহারাজ বলিতেন, "ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন?—আমরা তাঁকে ভালবাসব ব'লে।"

মহারাজের চেহারায় ছিল রাজকীয় আভিজাত্যের ছাপ; পোষাক-পরিচ্ছদে আচার-ব্যবহারে দেখা যাইত মর্যাদার ছন্দ, প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে অন্তর্মুখীন

১ কথামৃত ৫।১০।২।
২ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩২।

দৃষ্টি—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, ডিমে তা দিতেছে এমন পাখীর মত তাঁহার ফ্যালফেলে দৃষ্টি। দশজনের মধ্যে থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ মহারাজকে চিনিতে কাহারও কষ্ট হইত না। যে তাঁহাকে দেখিত সে-ই আকৃষ্ট হইত। স্বামী যতীশ্বরানন্দের ভাষায় মহারাজের চতুর্দিকে ছিল একটি Charming Circle (মধুর আবর্ত), যে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত সে-ই আবর্তের আনন্দধারায় সিক্ত হইত। সমীপাগতের নিজের চিন্তা-ভাবনা ক্ষীয়মাণ হইত, সকলকেই মহারাজের ভাবে ভাবিত হইতে হইত; সকলেই তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে প্রাণে এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিত।

তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দিনের পর দিন লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত। একবার তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলে কেহ বড় সহজে উঠিতে চাহিত না। সকলেই মনে একটা অজানা আনন্দ, একটা প্রাণের টান অনুভব করিত। আর এই টান ছিল আফিমের মৌতাতের মত। যে একবার আসিত, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত আফিমখোর ময়ূরের মত সে পুনরায় না আসিয়া থাকিতে পারিত না। মহারাজের সান্নিধ্যলাভে ধন্য বিভিন্নস্থানের নরনারীকে বলিতে শোনা যাইত, "আমরা অনেকরকম মানুষ দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। তিনি যেন কত আপনার জন।"

মহারাজের প্রেমের মোহিনী শক্তি ভক্তহৃদয়কে কিরূপ আকর্ষণ করিত তাহা নিম্নবর্ণিত স্মৃতি-চিত্র হইতে কতকাংশে ধারণা করা যাইবে। মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত কেদারবাবু মহাপুরুষ মহারাজকে বলেনঃ "আপনাকে কি বলব, এমন আমাদের সব ঘটনা হয়েছে—রাত্রিতে বাড়ীতে শুয়ে আছি, প্রাণ ছটফট করতো মহারাজকে দেখবার জন্য। একদিনের ঘটনা বলিঃ সেদিন পূর্ণিমা-রাত্রি; এগারোটা, হঠাৎ মন বড় ব্যাকুল হ'ল মহারাজকে দেখবার জন্য। তখনই বাসা হ'তে রওনা হলুম। কুমারটুলী ঘাটে এসে দেখি ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি আরও দু'তিন জন মহারাজের ভক্ত ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? উত্তর দিলেন—মশাই, মহারাজকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। আমি তো শুনেই বুঝে নিলুম, এঁদের মনের অবস্থাও আমারই মত; সকলে একসঙ্গে একখানা নৌকা করে বেলুড় মঠে এলুম। মঠে পৌঁছে মহারাজকে দর্শন করতে চললুম মহারাজের ঘরে। তখন অনেক রাত্রি, মঠের সাধুরা সব ঘুমিয়েছেন। আমরা আস্তে আস্তে মহারাজের ঘরে ঢুকলুম।

দেখি, মহারাজ যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা এতরাত্রে কি করে গেলাম। কষ্ট হয় নাই তো? মহারাজ পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে ডাকলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের কিছু প্রসাদ দিতে পার, বাবুরামদা?' বাবুরাম মহারাজ জানালেন চার পাঁচ জনের মত প্রসাদ তৈরীই আছে। আমরা প্রসাদ পেলুম। মহারাজকে প্রণাম করে অনেক রাত্রিতে রওনা হলুম।"

মহাপুরুষ মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "অন্য লোক মহারাজের ভালবাসার কথা বুঝতে পারবে না সত্যিই। মহারাজের এমনই আকর্ষণ ছিল ভক্তদের জন্য।"

কেদারবাবু বলিলেন, "মহারাজই আমাদের সব। এমন কি জপধ্যানও বেশী করতে পারি না। কেবল তাঁর অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ করে চোখের জলে ভাসি। এমন ভালবাসা আর পাব না।"

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ধ্যানজপের আর দরকার কি? তোমরা তাঁর স্মরণমনন করছো, তাঁর অহেতুক কৃপার কথা ভাবছ, আবার কি? তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। তিনি তোমাদের ভার নিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সব দেখছেন। তোমরা সব আনন্দে থাক।"

মহারাজের এই আকর্ষণ-শক্তি স্মরণ করাইয়া দেয় গোবিন্দদাসের পদ—

এ সুখ সায়রে লুব্ধ জগ-জন মুগ্ধ ইহ দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখন বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥[১]

'বিন্দু কণ আধ লাগিয়া' সকলে ছুটিয়া আসিত, সাময়িকভাবে তৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিত, কিন্তু আনন্দের রেশ কাটিত না। ভক্তহৃদয় অনুভব করিয়াছে মহারাজের 'প্রেমে মিটিয়াছে সকলের সর্বপ্রেম তৃষ্ণা।' যিনি ব্রজের মাঝে কৃষ্ণসখা রাখাল-রাজা তিনিই ভক্তজনের অন্তরে ছিলেন রাজার রাজা।

*   *   *   *

মহারাজের জীবনে বিবিধ ভাবের প্রকাশ। স্থানকালের বিভিন্নতায় সেই ভাব নানা রূপ ধারণ করিত। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই অনুরণিত হইত ভগবদ্‌ভাব। ভগবদ্‌ভাবের সহিত জড়িত স্থানসমূহে তাঁহার মন গভীরভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিত, উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতাইয়া তুলিত।

১ বিমানবিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ১৯৬১, পৃঃ ১৮

অন্যান্য ধর্মাচার্যদের ন্যায় মহারাজেরও তীর্থসেবায় ছিল বিশেষ প্রীতি। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥[১]

ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম পুরুষেরা তীর্থে যাইয়া ঐসকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে ঐসকল স্থানে অবস্থান করেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশাদি দেখিয়া আনন্দলাভ করেন। তাঁহাদের ঐরূপে তীর্থসেবার ফলস্বরূপ কোন স্থানের ভগবদ্‌ভাবের পূর্বপ্রকাশ অধিক বর্ধিত হয়, ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষও ব্যাকুল অন্তরে ভক্তিভাব লইয়া তীর্থস্থানে আসিলে ঈশ্বরের ভাবের বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনা পাইয়া থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জান্‌বি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ! যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাত্‌কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।"[২]

মহারাজ বলিতেন, "এক এক স্থানে এক একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—ঐ সময় সাধন-ভজনের অনুকূল। ঐ সময় বেশ একটা spiritual current (আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ) বয়। তখন জপধ্যান করতে বললে মন সহজে স্থির হয়ে যায়, বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।"[৩] তিনি তাঁর তিনটি প্রিয় তীর্থস্থান—বৃন্দাবন, কাশী, পুরী

১ শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।১৩।১০

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃষ্ঠা ১১৮;

৩ শ্রীমা বলিতেন, "কখন যে ক্ষণ বয়, বলা যায় না।...'যা না করে ধনে জনে, তা করে ক্ষণের গুণে।'...ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না।"—শ্রীমায়ের কথা; ২য় ভাগ, পৃঃ ২৭৩।

—সম্বন্ধে বলিতেন, "বৃন্দাবনে মহানিশা, কাশীতে ব্রাহ্মমুহূর্ত ও পুরীতে অপরাহ্ণ-কাল জপধ্যানের প্রশস্ত সময়।"

তাঁহার সূক্ষ্ম মানস-যন্ত্রে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য সহজেই ধরা পড়িত। মহারাজ তখন কনখলে—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। একদিন ঐ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন : "এস্থান বড় পবিত্র; এখানে জপধ্যান জমাতে বড় কষ্ট পেতে হয় না—very atmosphere-ই ভাল। মা গঙ্গা রয়েছেন, আর হিমালয়ের এমন গম্ভীর ভাব—আপনা থেকে মন যেন শান্ত গম্ভীর হয়ে আসে। হাওয়াতে অনাহত ওঙ্কার-ধ্বনি হচ্ছে।" কাশীধাম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন! একবার তিনি কাশী সম্বন্ধে বলেন : "কাশী হচ্ছে জগৎ-ছাড়া—মহা চৈতন্যময় স্থান। এখানে বসে ভজন করলে যা করা যায়, তার দশগুণ বেড়ে যায়। আর খুব শীঘ্র শীঘ্র মন্ত্র-চৈতন্য হয়। কাশী মুক্তিক্ষেত্র—এখানে বাবা বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে জীবকে মুক্তি দিচ্ছেন। এখানে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, যেই হোক না কেন, সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। জো সো করে এখানে পড়ে থাকতে পারলেই হয়।"

অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন করে—কত শত লোক ঐ সকল স্থানে যাইতেছে, বসবাস করিতেছে। তাহারা স্থান-মাহাত্ম্য কিছু অনুভব করে না কেন? পূর্ব হইতেই অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তিভরে পোষণ না করিলে এবং ব্যাকুলতা না থাকিলে তীর্থাদিতে সাধারণতঃ ফল পাওয়া যায় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : "ওরে যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।" তিনি আরও বলিতেন : "যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে?"

মহারাজের দেহ-মন সু-উচ্চ গ্রামে বাঁধা। সেইজন্য তীর্থস্থানে তাঁহার নানা-প্রকারের ভাবের উদ্দীপন হইত। তিনি একটা ঘনীভূত ভাবে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। তিনি তপস্যাকালীন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহু দেবস্থানে গিয়াছিলেন। যেস্থানেই যাইতেন, অতি অকিঞ্চনভাবে অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস করিতেন, অন্তরের ভাবের ঐশ্বর্য লইয়া দেব-দেবী দর্শনাদি করিতেন। ভিক্ষায় যখন যাহা জুটিত তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের স্মরণমননে দিনাতিপাত করিতেন। এইকালের তাঁহার তীর্থস্থানে দর্শন-অনুভবাদি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাহার প্রধান কারণ—মহারাজ নিজের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ করিতে

চাহিতেন না। পরবর্তীকালে মহারাজের তীর্থদর্শনাদি সম্বন্ধে সঙ্গীসাথীদের বিবরণ হইতে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটি এস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

মহারাজ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া ভক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমাবস্যার গভীর নিশীথে তিনি মহামায়ার দর্শনে বালক নীরদকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। মহারাজের তেজঃপূর্ণ প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া পাণ্ডারা মহারাজকে সাদরে সর্বাগ্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। অপূর্ব সুন্দর বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্তি, পুষ্পমাল্যে সুশোভিতা দেবী ভক্তদের অভয়দান করিতেছেন! দেবীর সম্মুখে মহারাজ ক্রমেই ভাবস্থ হইতেছিলেন। তাঁহার আদেশে নীরদ গান ধরিল—

"কৃপাময়ী কালকামিনী ঘোর কালভয় নিবারিণী,
কালী মহাকাল-বক্ষঃ-বিহারিণী,
করালী ঘনবরণা শিবানী শবাসনা
নরমুণ্ড-বিভূষণা,
শ্মশান-শোভনা প্রসীদ প্রিয়কামিনী।"

গান শুনিতে শুনিতে মহারাজ ভাবোন্মত্ত হইয়া "আহা, আহা, মা জগদম্বে, ব্রহ্মময়ী, দয়াময়ী," উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি গভীর ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ পাণ্ডারা মহারাজকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল যাহাতে অন্য যাত্রীরা কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে।

ভক্ত যোগীনবাবুর অনুরোধে মহারাজ বিন্ধ্যাচলে দুই সপ্তাহের উপর বাস করিয়াছিলেন। একদিন যোগীনবাবুর পরিবারস্থ সকলে পাহাড়ে যাইয়া বন-ভোজনের আয়োজন করিলেন; মহারাজও যোগদান করিলেন। সকলে রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত, সেই সময় মহারাজ বালক নীরদকে লইয়া পাহাড়ের উপরে এক গুহার মধ্যে শ্রীশ্রীঅষ্টভুজাদেবীর মূর্তি দর্শন করিতে গেলেন। অন্ধকারপ্রায় নীরব নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেবীমূর্তির পাশে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরে আদিষ্ট হইয়া নীরদ পর পর কয়েকটি মাতৃসঙ্গীত গাহিল। গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন; দেহে কম্পন, পুলক দেখা দিল, গণ্ড বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। স্থির ঋজু দেহে বাহ্য জ্ঞানের সকল চিহ্ন লুপ্ত হইল। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তবে তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি দেখা দিল।

নীলাচল তীর্থ মহারাজের বিশেষ প্রিয় স্থান। ঠাকুর একবার রাখালচন্দ্রের গয়াধামে যাইবার প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলিয়াছিলেন, "না, না, ও গয়ায় যাবে না, ও পুরীতে যাবে। গয়ায় গেলে শরীর থাকবে না।" ঠাকুরের নির্দিষ্ট এই তীর্থস্থলীতে মহারাজ অনেকবারই[১] আসিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে মোট প্রায় পাঁচ বৎসর চার মাস বাস করিয়াছেন। পুরীধামে পৌছিয়াই তিনি সহজ অনাড়ম্বরভাবে এক দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া বিভিন্নভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন ; তাঁহার চোখ-মুখ দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, হাত-মুখ নাড়িয়া আপন মনে কথা কহিতে থাকিতেন। সঙ্গীরা তাঁহাব এই অলৌকিক আচরণ দেখিয়া আনন্দ-শিহরণ অনুভব করিত।

তিনি সাধারণতঃ রথযাত্রার সময় পুরীধামে অবস্থান করিতেন। কি এক দিব্য ভাবে তিনি কয়েকটি দিন কাটাইতেন! কোন এক বৎসরের (১৯১৭) কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মহারাজের আমন্ত্রণে স্নান-যাত্রার পূর্বদিন হরি মহারাজ, তাঁহার সেবক, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি পুরীতে আসিলেন। স্নানযাত্রার দিন শ্রীমন্দিরে যাইয়া মহারাজ ও হরি মহারাজ স্নান দর্শনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামকে দর্শন-স্পর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। রাত্রিবেলা সকলে ভক্তিভাবে মহাপ্রসাদ ধারণ করিলেন ; ২০শে জুন বুধবার নবযৌবন-দিবস। ভক্ত-সমাগমে মন্দির-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখর। মহারাজ সদলবলে ভোর ছয়টায় মন্দিরে উপস্থিত। তিনি তন্ময়ভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন-স্পর্শন করিলেন। পরদিন রথযাত্রা। যাহাতে শরীর অবসাদগ্রস্ত না হয় সেইজন্য সকলকে তিনি ভাত খাইতে নিষেধ করিলেন। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাইয়া সকলে জগন্নাথ-বল্লভ মঠে উপস্থিত হইলেন। প্রায় দেড়টার সময় রথ তিনখানি উপস্থিত হইল। চতুর্দিকে জনারণ্য, ইহার মধ্যে হরি মহারাজ তাঁহার চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া দৌড়াইলেন ও রথের রজ্জু ধরিলেন। মহা-রাজের নির্দেশে দুইজন সেবক যাইয়া হরি মহারাজকে ভিড়ের মধ্যে আগলাইতে

১ পুরীধামে মহারাজের অবস্থানকাল :

১৮৮৮ আগস্টের শেষভাগ হইতে নভেম্বর—প্রায় চার মাস ; ১৯০৪ নভেম্বর হইতে দুইমাস ; ১৯০৬ জুন হইতে ডিসেম্বর—সাত মাস ; ১৯০৭ মে হইতে ১৯০৮ জানুয়ারী—নয় মাস ; ১৯০৮ জুন হইতে অক্টোবর—চার মাস ; ১৯০৯ জুন হইতে ১৯১০ ফেব্রুয়ারী—নয় মাস ; ১৯১০ জুন হইতে নভেম্বর—ছয় মাস ; ১৯১১ মে হইতে ডিসেম্বর—সাত মাস ; ১৯১৫ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর—নয় মাস ; ১৯১৭ মে হইতে নভেম্বর—ছয় মাস ; ১৯১৯ কয়েকদিন এবং ১৯২০ দুই সপ্তাহ।

থাকিল। মহারাজ নিজে তখন ভাবে মাতোয়ারা, হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ, শরীর রোমাঞ্চিত। রথ নিকটবর্তী হইলে মহারাজ রজ্জু ধারণ করিলেন এবং অল্প দূর যাইয়া উহা ছাড়িয়া দিলেন। এইভাবে তিনখানি রথ টানা হইল। নবমীর দিন তিনি ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের লইয়া গুণ্ডিচাবাড়ীতে গেলেন। পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী ভোগের মহাপ্রসাদ একটি ঘরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজ ও হরি মহারাজ মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। সকলে চারিধারে বসিয়া একসঙ্গে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ধারণ করিলেন। ২৯শে জুন পুনর্যাত্রা। জ্বর হওয়াতে হরি মহারাজ যাইতে পারিলেন না। মহারাজ অন্যান্যদের সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ-বল্লভ মঠে যাইয়া রথ ও রথী দর্শন করিলেন। কয়েকটি দিন মহারাজ যেন এক আনন্দ-ধারায় ডুবিয়া থাকিলেন।

শশি-নিকেতনের প্রাঙ্গণ হইতে তিনি সাধারণতঃ প্রতিদিন প্রাতে ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিতেন, প্রণাম করিতেন ; বিশেষ দিনে মন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেন। মহারাজ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে সদাসবদা একটি ভাবের ঘোরে ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি ভাবাবেশে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, দেখ, সব চৈতন্যময়,—সব চৈতন্যময়।"

অবিমুক্তপুরী কাশীধামও তাঁহার বিশেষ প্রিয় তীর্থভূমি।[১] ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীধামে আসিয়াছিলেন। এই মহাতীর্থে এই তাঁহার শেষ আগমন। সেই সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন : "এমনি ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য যে, যেই bridge পার হয়ে আসা অমনি একটা মাধুর্য অনুভব করলুম—কি আর বলব! শিব-ক্ষেত্র—শিবই গুরু। একদিকে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে বাইরের অভাব দূর কচ্ছেন, অন্য দিকে বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম দিচ্ছেন। ঠাকুরের নিকট দাড়িওয়ালা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে কাশী-মাহাত্ম্য সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মহাকাল ভৈরব। ঠাকুরের দেহটা তখন পড়েছিল।" বিভিন্ন সময়ে আসিয়া

১ তিনি ১৪।৭।১৫ তারিখে স্বামী অচলানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার স্থান।...শেষ জীবনটা ৺কাশীবাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার এখন ইচ্ছা। ৺কাশীর কথা মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশী আর কি বলিব? একান্তে স্থির হইয়া বসিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই ৺কাশীবাসের চরম ফল।" উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, পৃঃ ২৩২।

তিনি তিন বৎসরাধিক কাল এই পুণ্যভূমিতে অতিবাহিত করেন।[১] তিনি বলিতেন, "স্বয়ং বিশ্বনাথ এখানে জীবের মন্ত্রদাতা গুরু।" কাশীধামে তিনি কখনও দীক্ষা দিতেন না।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ, ৺শিবচতুর্দশীর দিন। মহারাজ পায়ে হাঁটিয়া বিশ্বনাথ দর্শনে চলিলেন—আশ্রমের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী তাঁহার অনুগমন করিল। মহারাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিতেন ; এখানেও অন্যথা হইল না। তিনি দেখিলেন, ঝাড়ুদারেরা মন্দির-অঙ্গন পরিষ্কার করিতেছে। তিনি একজনের নিকট হইতে একটি ঝাড়ু চাহিয়া লইয়া অতি দীনভাবে অঙ্গন মার্জনা করিতে লাগিলেন। চেহারায় রাজোচিত আভিজাত্যের ছাপ, ভিতরে বৈরাগ্য ও অহঙ্কারশূন্যতার দীপ্তি—এই পটভূমিতে মহারাজকে দেখিয়া সঙ্গী ভক্তগণ ও তীর্থ-সেবীরা মুগ্ধ হইল। কিরূপ অভিমানশূন্য হইয়া দীনকাতরভাবে মহেশ্বরের ভজনা ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় তিনি নিজে তাহার নজীর স্থাপন করিলেন। বাবা বিশ্বনাথের দর্শন-স্পর্শন করিয়া ভাব-বিহ্বল মহারাজ মাতা অন্নপূর্ণার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জগন্মাতা রাজরাজেশ্বরীবেশে দুই হস্তে জ্ঞান-ভক্তি বিতরণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া ভাবে আবিষ্ট মহারাজ অর্ধনিমীলিত নয়নে স্থির-ভাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহার আদেশে আশ্রমিকগণ কালীকীর্তন আরম্ভ করিল। একটি জমজমাট আধ্যাত্মিক ভাব দর্শনার্থীদের মনে আনন্দের দোলা দিল। জনমণ্ডলী একবার দেখিতেছে করুণাময়ী বরাভয়া দেবী অন্নপূর্ণাকে, আবার দেখিতেছে জগন্মাতার সম্মুখে তাঁহার বরপুত্র 'মহারাজ'কে—মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ জোতিঃ, গণ্ডদেশ বাহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে, সর্বাঙ্গে একটি আনন্দ-হিল্লোল খেলা করিতেছে। তীর্থসেবিগণ স্থান-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া তাহার সুখ-স্মৃতি হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে রাখিয়া ঘরে ফিরিল।

৪ঠা মার্চ, ১৯১৩ সাল। একাদশী তিথি। ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের বড় একটি দল লইয়া মহারাজ মহাত্মা তুলসীদাসের সাধনভূমিতে অবস্থিত সঙ্কটমোচন মন্দিরে

১ কাশীধামে মহারাজের অবস্থানকাল :

১৮৮৯ ডিসেম্বর—এক মাস ; ১৯০৩ মধ্যভাগে এক মাস ; ১৯০৮ খ্রীঃ তিন সপ্তাহ ; ১৯১০ খ্রীঃ এক মাস ; ১৯১০ অক্টোবর হইতে ১৯১১ নভেম্বর—চৌদ্দ মাস ; ১৯১২ নভেম্বর হইতে ১৯১৩ এপ্রিল—ছয় মাস ; ১৯১৩ অক্টোবর হইতে ১৯১৪ নভেম্বর—প্রায় এক বছর, এবং ১৯২১ জানুয়ারীর মধ্যভাগ হইতে মার্চের মধ্যভাগ—দুই মাস। মোট প্রায় তিন বৎসর দুই মাস।

গেলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মধুর রামনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মধ্যস্থলে বসিলেন মহারাজ—অধরে দিব্য মধুর হাসি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এক পলিতকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া স্থিরভাবে বসিলেন ও তন্ময়ভাবে কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। সৌম্যসুন্দর বৃদ্ধটি কিন্তু কীর্তন-সমাপ্তির মুখে আসর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। জমজমাট কীর্তন ক্রমে শেষ হইলে মহারাজ বলিলেন, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে স্বয়ং মহাবীর উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিস্মিত পুলকিত কয়েকজন সাধুভক্ত আশপাশে খুঁজিতে গেলেন; কিন্তু বৃদ্ধকে কেহ দেখিতে পাইলেন না।

ব্রজেশ্বরের লীলাস্থলী বৃন্দাবনধামকে মহারাজ অতি আপনার বোধ করিতেন। তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের নূপুরধ্বনি সতত অনুরণিত হইত, বৃন্দাবনধামে গোপীবল্লভের নিত্যলীলা ভাবচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি সহজেই আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল।" ভগবানের এই বিশেষ লীলাবিলাসভূমিতে মহারাজ, বোধ করি, তাঁহার স্বরূপের আভাস পাইতেন; সেই কারণে এই দেবস্থান তাঁহার এত প্রিয় ছিল। প্রধানতঃ সাধনভজনের উদ্দেশ্য লইয়া মহারাজ বিভিন্ন সময়ে প্রায় দুই বৎসর চার মাস বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।[১] এই সময়কার তাঁহার দিব্য জীবনের ঘটনাবলী প্রায় অজ্ঞাত। যে দুই একটি ঘটনা জানা যায় তাহা হইতে অধ্যাত্মভাবে সম্পৃক্ত ব্রজমণ্ডলে সাধকদের কত রকমের আনন্দবিলাস ঘটিয়া থাকে তাহা কিছু পরিমাণে ধারণা করা যাইবে।

রাসযাত্রা উপলক্ষে মহারাজ লালাবাবুর কুঞ্জে যান এবং দেখেন যে রাসমঞ্চের সম্মুখে নৃত্যগীতের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। মঞ্চের নিকটে বসিয়াছিলেন একজন বৃদ্ধ বাবাজী; তিনি মহারাজকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। নৃত্য-ভজনাদির মধ্যেও বাবাজী একান্তমনে মালা জপ করিতেছিলেন। তাঁহার পাশেই বসিয়া মহারাজ তন্ময় হইয়া ভজন শুনিতেছিলেন, হঠাৎ বাবাজী আগ্রহভরে

১ বৃন্দাবনে মহারাজের অবস্থানকাল:

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিন মাস; ১৮৯০ জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ হইতে সেপ্টেম্বর আট মাস; ১৮৯৩ খ্রী: ২২শে আগষ্ট হইতে জুন—দশ মাস; ১৮৯৪ আগষ্টের শেষ হইতে ১৮৯৫ জানুয়ারী—পাঁচ মাস; ১৯০৩ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বরের প্রথম ভাগ—দুই মাসের কিঞ্চিদধিক কাল— মোট প্রায় দুই বৎসর চার মাস।

মালার মেরুটি মহারাজের ললাটে স্পর্শ করাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জপান্তে প্রতিবারই বাবাজী ঐভাবে মালার মেরু স্পর্শ করাইতে লাগিলেন, রোমাঞ্চিত দেহে মহারাজ গভীর অন্তর্মুখ হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকিলেন।

মহারাজের সাধা জীবন-বীণা দিব্যভাব ধরিতে ও ধারণ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। দেবভাবে অনুরঞ্জিত মন লইয়া তিনি তীর্থসেবা করিতে যাইতেন ; তখন তাঁহার জীবন-বীণায় স্বভাবতঃই নানা সুরতান ঝঙ্কৃত হইত। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গুরু-ভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ব্যবস্থাপনায় মহারাজ রামেশ্বর দর্শন করিলেন। একশত আটটি করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র-বিল্বপত্রে মহেশ্বরের অর্চনা করিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন। ক্ষেত্রবিধি অনুযায়ী মা পর্বতবর্ধিনীকে ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগাদি নিবেদন করিয়া দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইল। মহারাজের প্রেরিত বিল্বপত্রাদি পাইয়া বেলুড়মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন, "শ্রীযুক্ত মহারাজজীর প্রেরিত শ্রীশ্রীরামেশ্বরজিউর বিভূতি, বিল্বপত্র ও কুমকুম্ লইয়া আমরা তাহা মস্তকে ধারণ ও ভক্তদের বিতরণ করিয়াছি। মহারাজজী যে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন, তাহাতে আমরাও অতিশয় প্রীত হইলাম।…অনেকস্থান দর্শন না করিয়ে তুমি বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছ। শ্রীশ্রীপ্রভু পশুশালা হইতে কেবল সিংহ দর্শন করেই ফিরেছিলেন। নানাস্থানে উঠা নামাতে মহারাজের কষ্ট হইত।"

ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ ৺মীনাক্ষীদেবী ও ৺সুন্দরেশ্বর মহাদেব দর্শন করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দজী ও অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া মাদুরায় উপস্থিত হইলেন। মন্দির দর্শনের দিন সকালেই তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে বলিলেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব ভাব আসছে, যেন কিছু একটা ঘটবে।" তিনি মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরে যাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, দেবীর সম্মুখে শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। সহসা তিনি এক অতীন্দ্রিয় ভাবে বিহ্বল হইয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন ; তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইল। পাশে দণ্ডায়মান রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের দেহ ধারণ করিয়া রহিলেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই সময়ে মন্দিরের সেবাকার্যাদি বন্ধ রহিল। দেবীদর্শনার্থিগণ দেবীর সন্তানের মধ্যে দেবী-লীলা সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইল।

পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম, দেখলাম জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহারাজ সদলবলে কাশী হইতে অযোধ্যায় গমন করেন ও পাঁচদিন তন্ময়ভাবে ঝুলন-লীলা সন্দর্শন করেন। তাঁহার আদেশে দলের সাধুব্রহ্মচারীগণ হনুমানগড় মন্দিরে রামনাম সঙ্কীর্তন করিলেন। কীর্তনের আসবে ধ্যানতন্ময় মহারাজের উপস্থিতি সকলের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একদিন সন্ধ্যার পরে স্থানীয় এক মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভজনগান শুনিতেছিলেন, তিনি এমন তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড বারিবর্ষণেও তাঁহার তন্ময়তা হ্রাস পাইল না। প্রকৃতই মহাপুরুষদের সঙ্গে তীর্থসেবা করিলে নানা উদ্দীপনায় হৃদয় আলোড়িত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তের তীর্থস্থান কন্যাকুমারীতে মহারাজ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াছিলেন। তিনি সাতদিন সেইস্থানে অবস্থান করিয়া দিনের বিভিন্ন সময়ে দেবী-বিগ্রহ দর্শন করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই একটি গভীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। সেখানকার মন্দিরে কষ্টিপাথরে খোদাই-করা শ্রীজগন্মাতার বালিকা-মূর্তি। শ্বেতচন্দনে চর্চিত অঙ্গরাগে আনন্দময়ী মায়ের রূপমাধুরী দর্শন করিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অল্পক্ষণ জপ করিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন; তাঁহার ভিতর দিবা বালকভাব ফুটিয়া উঠিত, তিনি ছোট বালকের ন্যায় জগন্মাতার সহিত কথা বলিতে থাকিতেন। এক আনন্দপূরিত দিব্যভাব চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত; কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলেও উপস্থিত সকলে হৃষ্ট উৎফুল্ল হইত। মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহারাজ তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কন্যাকুমারীতে আমার ভিতরটা যেন হাসিতে ফেটে পড়ছিল—আট-দশ বছরের মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। ভারী সুন্দর মূর্তি—অপূর্ব, জীবন্ত!"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ মহারাজ দক্ষিণদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ তিরুপতিতে গমন করেন। বালাজী বেঙ্কটেশ্বরের বিগ্রহ প্রথমদিন দর্শন করিবার সময় তিনি ভাবচক্ষে দেখিলেন—যদিও শ্রীবালাজী বিষ্ণুবিগ্রহরূপে অর্চিত হইয়া থাকেন, তবু উহা বাস্তবিক এক দেবীমূর্তি। মহারাজের সঙ্গিগণ পরে অনুসন্ধানাদি করিয়া জানিলেন যে মহারাজের দর্শনই সত্য, আদিতে ঐ বিগ্রহ দেবীমূর্তিরূপে পূজা

গ্রহণ করিতেন। মহারাজ বলিয়াছিলেন যে তিরুপতি মহা জাগ্রত চৈতন্যময় স্থান। সেখানে তিনি সাতদিন অবস্থান করেন। বালাজীর বিগ্রহের সামনে তিনি যখন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন ভাবের ঘোরে তাঁহার দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকিত, এবং সেই ভাবের রেশ সারাদিনব্যাপী চলিত।

* * * *

মহাপুরুষগণ মানুষ-ভাব ও দৈব-ভাবের মাঝামাঝি একটি ভাব অবলম্বন করিয়া তীর্থসেবাদি করিয়া থাকেন। বহু সাধকের সাধন-ভজনে পবিত্রীকৃত তীর্থস্থান ছাড়াও পূজা-মন্দির ও উৎসব-প্রাঙ্গণে তাঁহাদের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সকল স্থানে মহারাজ অপূর্ব দিব্যভাবে মাতোয়ারা হইতেন ; তাঁহার নরদেহে দৈবলীলা দেখিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এক অননুভূত আনন্দ আস্বাদন করিতেন, তাঁহাদের মন এককালে উচ্চ উচ্চ ভাবভূমিতে উন্নীত হইত। তাঁহার ন্যায় মহাজন যথার্থই চলমান তীর্থ। তিনি যেখানে যাইতেন, যেখানে থাকিতেন, সেখানেই পবিত্রতা, অন্তর্মুখীনতা, ভগবদ্ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি হইত। তদুপরি উৎসব-অনুষ্ঠানাদি যে অধিকতর দিব্য-প্রেরণা যোগাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের কথা। কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইল। সারারাত্রি ধরিয়া পূজা ও হোম চলিল। রাত্রিশেষে পূজাঙ্গন প্রায় জনশূন্য, সেই সময় আশ্রমাধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজ দেখিলেন, মহারাজ আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পরে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "ওমা দয়াময়ী, মাগো—কৃপা কর, করুণাময়ী" ইত্যাদি বলিয়া ভাবে তন্ময় হইয়া মহারাজ শ্রীজগন্মাতার নিকট বালকের ন্যায় কত রকমের প্রার্থনা, আবদার করিতে লাগিলেন। কি মনোহর সেই দৃশ্য !

সেই সময় কাশীতে তুরীয়ানন্দজী, শিবানন্দজী, প্রেমানন্দজী, ও অদ্ভুতানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। পরদিন বেলা বারোটা পর্যন্ত অমাবস্যা থাকায় প্রাতে পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হইল। ভোগের পর আরাত্রিক আরম্ভ হইলে মহারাজের আদেশে অম্বিকানন্দ "হের হর-মনোমোহিনী, কে বলেরে কালো মেয়ে,"—ভজনটি আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ উহাতে যোগ দিল। সমবেতকণ্ঠে ভজন জমিয়া উঠিয়াছে—হঠাৎ দেখা গেল, মহারাজ চামর হস্তে দেবীর সম্মুখে তালে তালে মধুর নৃত্য করিতেছেন। ভাবতরঙ্গ উপস্থিত সকলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, অন্যেরাও নৃত্য যোগ দিলেন। মহারাজ ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন।

মনোরম সেই দৃশ্য-মাধুরী! অনেকক্ষণ ধরিয়া আরাত্রিক চলিবার পর সকলে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে'···ইত্যাদি প্রণাম-মন্ত্র ধরিলেন, তখন মহারাজের বাহ্যস্ফূর্তি আসিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে শ্রীমায়ের সম্বর্ধনার জন্য তোরণ সাজান হইল, শ্রীমায়ের গাড়ী আসিয়া থামিলে প্রাঙ্গণে লাল সালু বিছাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীমা প্রাঙ্গণের ভিতর চলিয়া আসিলে, মহারাজ প্রবেশ-দ্বারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, ঠাকুরঘরে যাইবার সিঁড়ির নিকট পূজক স্বামী আত্মানন্দ শ্রীমাকে কর্পূর দিয়া আরতি করিলেন। সেবকেরা মহারাজকে রেশমী বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছিল; আনন্দিত বালকের ন্যায় তিনি মঠপ্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিলেন। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আন্দুলের কালীকীর্তন দল গান আরম্ভ করিল। কীর্তন জমিয়া উঠিলে প্রেমানন্দজী মহারাজকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া কীর্তনের আসরে লইয়া গেলেন। তখন গান চলিতেছিল—'আর কেন মন এ সংসারে।' তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গানের সঙ্গে অনুপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভাব গভীর হইলে তিনি ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ যাইয়া তাঁহার দেহধারণ করিলেন। বাহিরের কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু সর্বাঙ্গ তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে দুলিতে লাগিল। তাঁহাকে আসর হইতে মঠবাড়ীর নীচের ঘরে আনা হইল, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি নানা-ভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভাবের উপশম হইল না।[১] অনেক সময় চলিয়া গেল। তিনি জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। সকলে চিন্তিত হইয়া শ্রীমাকে সংবাদ দিলেন। তিনি মহারাজের জন্য কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। গুরুভ্রাতারা সেই প্রসাদ তাঁহার সামনে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে অনেক ডাকাডাকি করিলেন; অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। শ্রীমাকে পুনরায় সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিয়া মিষ্টস্বরে ডাকিলেন, "ও রাখাল, প্রসাদ দিয়েছি, খাও।" মহারাজের যেন চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন মা তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া; তাঁহার সর্বাঙ্গ

১ কথিত আছে শ্রীমা এ-সম্পর্কে বলিয়াছিলেন: "দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি করে একবার সম্মুখে পশ্চাতে চেয়ে নৃত্য করছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এইভাবে নৃত্য করে তাঁর অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে পারবে না।" (উদ্বোধন, ৭২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৬-৭)

রোমাঞ্চিত হইল। তিনি শ্রীমায়ের পাদবন্দনা করিলেন। শ্রীমা চলিয়া যাইলে পর মহারাজ প্রসাদ ধারণ করিলেন; সকলে নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর। মহারাজের আদেশে ভগিনী দেবমাতা খ্রীষ্ট-সন্ধ্যা উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদেব সহিত মহারাজ মাদ্রাজ সহরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত বেদীর সম্মুখে বসিয়া দেবমাতা বাইবেল হইতে দেবশিশু যীশুর জন্মবৃত্তান্ত পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে এক অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার দৃষ্টি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর পড়িল। তিনি স্থির অপলক দৃষ্টিতে বেদীর উপর তাকাইয়া রহিয়াছেন, অধরে হাসি, স্পষ্টই প্রতীতি হইল তাঁহার মন কোন ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। উপস্থিত সকলে নির্বাক বসিয়া রহিল। কুড়ি মিনিট কি তাহার কিছুক্ষণ পরে মহারাজের মন বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিল—তিনি যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।" উৎসব সমাপ্তির পর বাহিরের ভক্তেরা প্রসাদ ধারণ করিয়া চলিয়া গেলে মহারাজ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি প্রসাদ ধারণ করিতে বসিলেন। মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "ভগিনী, আজ তোমার বাড়ীতে এসে খুব কৃতার্থ হয়েছি।" ভগিনী দেবমাতা বলিলেন, "সে কি স্বামীজী, আপনার আগমনে আমি ধন্য বোধ করছি।" মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "তুমি বুঝলে না। আজ সন্ধ্যায় আমি কৃপালাভে ধন্য হয়েছি। যখন তুমি বাইবেল পাঠ করছিলে, সহসা যীশুখ্রীষ্ট নীল রংয়ের আলখাল্লা প'রে বেদীর সামনে উপস্থিত হলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হ'ল। কত পবিত্র সেই মুহূর্তগুলি!"[১] উপস্থিত ব্যক্তিগণ এই অপার্থিব অভিজ্ঞতা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইলেন।

তীর্থস্থানে, পূজা-প্রাঙ্গণে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মহারাজের অলৌকিক দর্শন, ভাব-তন্ময়তা ইত্যাদি তাঁহার দিব্য-জীবনের সাধারণ ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল বিশেষ স্থান ও কাল ব্যতীত সহজভাবে থাকিয়াও মহারাজ অলৌকিক জগতের সঙ্গে সর্বদাই যেন যুক্ত হইয়া থাকিতেন। কত সামান্য উদ্দীপনাতেও তাঁহার মন বাহ্যজগতের লৌকিক রীতিনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করিত, তাঁহার

১ Days in an Indian Monastery, pp. 159-161

চতুষ্পার্শে দিব্যভাবের আনন্দ ছড়াইয়া পড়িত, নিম্নে বর্ণিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

ভগিনী দেবমাতা তাঁহার গ্রন্থে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় হলঘরের একপ্রান্তে কম্বলের উপর বসিয়া মহারাজ ঠাকুরের সন্ধ্যারতি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল মহারাজের শরীর নিশ্চল, নয়নযুগল মুদিত, ওষ্ঠে দিব্য হাসি—চতুর্দিকে এক মধুর পরিবেশ। পরে রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট দেবমাতা শুনিলেন যে মহারাজ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে একদিন সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণানন্দজীর বারংবার সানুনয় অনুরোধে মহারাজ ভাবে-উদ্বেলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে নিজহস্তে সন্ধ্যারতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। মনোহর সেই দৃশ্যের স্মৃতি যে ভক্তজনের মূল্যবান বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৩১৯ সালের পৌষ মাসে শ্রীমা কাশীতে ভক্ত কিরণ দত্তের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। সেবাশ্রম হইতে মহারাজ আসিয়া শ্রীমায়ের খোজখবর লইতেন। একদিন তিনি আসিয়া নীচের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছেন, সেই সময় গোলাপ-মা উপরের বারান্দা হইতে মহারাজকে বলিলেন, "রাখাল! মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" এই বলিয়া তিনি গান ধরিলেন,

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে॥ ইত্যাদি

গান গাহিতে গাহিতে মহারাজ বালক-ভাবে আত্মহারা হইয়া নৃত্য শুরু করিলেন। শ্রীমা ও অন্যান্য সকলে আনন্দ বিস্ময়ে 'রাখালরাজে'র খেলা দেখিতে লাগিলেন। গানের শেষে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। কোন ভাবরাজ্যে যে তিনি থাকিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, শুধু ঘটনামাত্র শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হই।

শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন গ্রাম সম্পর্কে তাঁহার পিসী—সকলের পরিচিত ভানু-পিসী। মহারাজ একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়া বাড়ীর উঠানে পিসীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি রঙ্গরসিক মহারাজ পিসীর সহিত নানারকমের ফষ্টিনাষ্টি

শুরু করিলেন। রসিকা ভানুপিসীও হটিবার পাত্র নহেন। তিনি হাত নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি বালগোপাল বিষয়ক গান ধরিলেন—

কাল বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে
তোরা ধরে দে গো ললিতে।··· ···
দই খেয়েছে, ভাঁড় ভেঙেছে, মুখ পুঁচেছে কাঁথাতে॥

এই গান শুনিয়া মহারাজের রঙ্গরস করা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, দুই নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাঁহার জামা ভিজিয়া গেল।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমা ভানুপিসীকে পরে বলিলেন, "পিসী, তুমি তো সামান্য নও—যে রাখাল মহাসাগর, তাকেও তুমি তোলপাড় ক'রে দিলে।"[১]

মাধুর্যমণ্ডিত অপর একটি ঘটনা। স্থান বেলুড়মঠ, মহারাজের ঘর। কালীপূজার পরদিন সকালবেলা। রামলালদাদা উপস্থিত আছেন। মহারাজ বলিলেন, "এসো দাদা, আজ সাহেবী কায়দায় মায়ের প্রসাদ ধারণ করা যাক্।" দুইজনে চেয়ারে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ মহারাজের দৃষ্টি নিকটবর্তী সুগায়ক অম্বিকানন্দের উপর পড়িল। তাঁহার আদেশে অম্বিকানন্দ গান ধরিলেন—

"ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে··· ···" অল্প সময় পরে দেখা গেল মহারাজ স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তখনও মুখে এক টুকরা লুচি—বদনমণ্ডলে আনন্দ-দীপ্তি, অবিরলধারে আনন্দাশ্রু পড়িতেছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে 'মা' 'মা' বলিতেছেন। অপরূপ মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে-ই নিজেকে চিরধন্য জ্ঞান করিয়াছে।

* * * *

স্থূল জাগতিক ব্যাপারে মহারাজের বহুদর্শিতা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। তদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার ভূয়োদর্শন সকলকে বিস্মিত করিয়াছে, সাধারণের অজ্ঞাত নূতন জগতের সন্ধান দিয়াছে। লৌকিক ও অলৌকিক রাজ্যের মধ্যে তাঁহার ছিল অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দেবদেবীর বিষয়ে তিনি বলিতেন যে, তাঁহারা সত্যসত্যই

১ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৬৭২;

আছেন, কল্পনার কথা নহে। তিনি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন।" মহারাজের শ্রীমুখেও শোনা যায়, তিনি বলিতেছেন, "ভগবান্ আছেন, ধর্ম আছে—এ সব কথার কথা বা morality-নীতি রক্ষার জন্য নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।"[১] মহারাজের ন্যায় সত্যদ্রষ্টাগণের বিবৃতির মধ্যে থাকে প্রত্যক্ষদর্শনজনিত সত্যের দৃঢ়তা ও উপলব্ধি-জনিত শুদ্ধ-জ্ঞানের অভেদ্য শক্তি, যাহার দ্বারা শ্রদ্ধাবান শ্রোতার মনের সংশয় দূর হয়। সংশয়দগ্ধ ভক্ত প্রশ্ন করে, "মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন?" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "তোর দেখছি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এই ভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তিনি সব সময়েই আছেন।... ..."; পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, "আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?" করুণাময় মহারাজ উত্তর দেন, "তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই। তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে।"[২] অনন্ত ভগবান্ সম্বন্ধে ভাবের ইতি টানিয়া দেওয়া যায় না। মহারাজ বলিতেন, "সাধক ভগবানকে শুনে একরূপ বোঝে, সাধনা করে অন্যরূপ বোঝে, আবার সিদ্ধ হয়ে আর একরূপ বোঝে।" এই নিত্য সত্য ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি মূর্তি। এই সকল রূপ যে যথার্থই বিদ্যমান, তাহা তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[৩]

অন্তর্মুখ মহারাজ প্রায়ই বিভিন্ন সময়ে নানা দেবদেবী দর্শন করিতেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন, বিবিধ ভাবের আদানপ্রদান করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি ভাব-চক্ষে এইসকল দিব্য দর্শনাদি করিতেন, আবার সাধারণ জাগতিক ভূমিতেথাকিয়াও তাঁহার অনুরূপ দর্শনাদি হইত। জড় ও চৈতন্যের যে বিভাগ আমরা কল্পনা করি, মহারাজের চেতনভূমিতে তাহা লুপ্ত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে তিনি ছিলেন ভাব-সেতু। তাঁহার দর্শনাদি অবলম্বন করিয়া আমরা অলৌকিক রাজ্যের খোঁজখবর পাই, সেই

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৫১
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৫৬,
৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ২৫

রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, সেই রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়া থাকি।

মহারাজের নিকট হইতে জানা যায়, দেবতা বহু প্রকারের। তাঁহাদের মধ্যে বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধককে সাহায্য করিয়া থাকে, আবার কেহ সূক্ষ্মভাবে ভোগের জন্য সাধকের সূক্ষ্ম মন আশ্রয় করিয়া তাহাকে বিপথগামী করে। আবার এক শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ আছেন; তাঁহারা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্মপথে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। মহারাজের সূক্ষ্ম বিষয়-অনুভব-সক্ষম মনে রাডারের (radar) ন্যায় অলৌকিক রাজ্যের অন্যান্য তথ্যাদি, এমন কি ভূত-ভৌতিক প্রসঙ্গেও নানা তথ্য ধরা পড়িত।

পুরীতে শশি-নিকেতনের বারান্দায় মহারাজ বসিয়া ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুন্সেফ বিহারীলাল সরকার ও কয়েকজন সাধুভক্ত। সময় সন্ধ্যাকাল। হঠাৎ সকলে একটি মনোরম সুগন্ধ পাইলেন; কিন্তু নিকটে কোন ফুলগাছ ছিল না, হাওয়াও ছিল না। ঐ গন্ধের দিকে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলিলেন, "যখন দেবতারা শূন্যপথে যাতায়াত করেন, তখন এইরূপ সুগন্ধে দিক আমোদিত করেন।"

পুরীতে অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে আরাত্রিকের পর ভজনগান আরম্ভ হইল। প্রাঙ্গণে মহারাজ বসিয়াছিলেন, তন্ময়ভাবে ভজন শুনিতেছিলেন। কয়েকজন সাধু ও স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অকস্মাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে এক আর্তনাদ উঠিল। অটলবাবু অন্দরমহলে ছুটিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মহারাজকে নিবেদন করিলেন যে, বাড়ীর মহিলারা ভজনগান শুনিতেছিলেন, হঠাৎ লাল কস্তা-পেড়ে শাড়ি ও অলঙ্কারাদি পরিহিত এক অপরিচিতা রমণী সিঁড়ি দিয়া হন্ হন্ করিয়া তাঁহাদের সামনে দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপরে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া কাহাকেও দেখা গেল না। সব শুনিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ আর বুঝতে পারছেন না? এই শুভদিনে ভজন হচ্ছে ও সকলে একাগ্রমনে তাঁর চিন্তা করছে—এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমহামায়া ছাড়া আর কে আসতে পারে?"[১] মহারাজের আদেশে ভজন খুব উৎসাহের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

১ স্বামী শঙ্করানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

কাশী সেবাশ্রমে থাকাকালীন মহারাজ গ্রীষ্মের সন্ধ্যাকালে সময় সময় সম্মুখের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে খাটিয়ার উপর দুই-এক ঘণ্টা শয়ন করিতেন। সেইস্থানে একটি বেলগাছ ছিল। সেই গাছটি দেখাইয়া তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কেহ ঐ গাছ নষ্ট না করে বা পাতা না ছিঁড়ে। তিনি বলিতেন, "ঐ বেলগাছে একজন সূক্ষ্মদেহী আছেন, কারুর অনিষ্ট করেন না।"[১]

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহারাজের কাশী অদ্বৈতাশ্রমে থাকাকালীন আরেকটি ঘটনা জানা যায়। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মহারাজের সেবক ফিরিতেছেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় চাঁদের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সিঁড়ির শেষ ধাপ হইতে উঠিয়া গায়ে চাদর, লম্বা একটি লোক, বেশ সৌম্য চেহারা, মহারাজের ঘরের দিকে না যাইয়া ছাদের আলসের উপর দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন মহারাজের ঘরে ছিলেন। মহারাজের সেবকের ডাক শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন লোক মহারাজের ঘরে গিয়াছিল কিনা। নেতিবাচক উত্তর শুনিয়া সেবক চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সেবক মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুই জিতেনকে ডাকছিলি কেন?" সেবক ঘটনাটি আনুপূর্বিক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশীতে ত' ভূত থাকে না, এটা কি দেখলাম?" মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয়েকদিন আগে রাত্রিবেলা প্রস্রাব করতে বাইরে বেরিয়েছি—দেখলাম ঐ সূক্ষ্ম দেহীকে। এঁরা দেবতার স্থানে সূক্ষ্মশরীরে থাকেন। সাধন-ভজন করে আনন্দলাভ করেন।"[২]

আর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন রায় অতুলপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁহার স্মৃতিকথায়। মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও অপর কয়েকজন সাধুসহ ঢাকায় ৯নং ট্রেণিং কলেজ রোডের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা জমিদার রায় সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অতিথি। সারদাবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র একদিন মহারাজের পদসেবা করিতেছিলেন, তখন মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাশের ঘরে তোমার এক খুড়তুতো ভাই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে কি?" মহারাজের মুখে এই কথা শুনিয়া অতুলপ্রসাদ অবাক হইলেন। ইহা সত্য যে, কিছুকাল

১ স্বামী শঙ্করানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।
২ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

পূর্বে সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র সৌরেন্দ্রপ্রসাদ ঐ ঘরে আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করে, কিন্তু মহারাজ তাহা জানিলেন কি ভাবে? মহারাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে থাকিলেন, "ছেলেটি সরল ছিল, আত্মহত্যা করার দরুণ শান্তি পাচ্ছিল না। যা হোক, দুঃখ ক'রো না, আমি যা হয় ওর জন্য করে দিয়েছি।" এই সংবাদ শুনিয়া সারদাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অনেকটা শান্তি পাইয়াছিলেন। মহারাজের আদেশে তাঁহারা মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে গয়াধামে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ধরণের বহু ঘটনা মহারাজের জীবনপাতা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এইসকল ঘটনা হইতে ধারণা করা যায়, পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক রাজ্যে মহারাজ কি স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতেন।

* * *

মহারাজের স্বভাবজ অন্তর্মুখীন মন উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিয়া সাত্ত্বিক বস্তুর অনুসন্ধান করিত। দেখা যাইত মহারাজের আশেপাশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ভজন-কীর্তন, স্তব-স্তুতি-পাঠ ইত্যাদির এক মধুর পরিবেশ। ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন, "স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি চ ভক্তান্।"[১] ঈশ্বরের নামগুণানুকীর্তন ভক্তের অতি প্রিয়, ঈশ্বরের মহিমা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভক্ত আনন্দরস আস্বাদন করে। মহারাজের নিকটে দেখা যাইত সুমধুরকণ্ঠ গায়কবৃন্দকে। তাঁহার উৎসাহে শিষ্যসেবকগণ অনেকেই কীর্তন-ভজন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন। মহারাজের ব্যবস্থায় সুকণ্ঠ নীরদ মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারে যাইয়া গান শিখিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট প্রায় আট বৎসরকাল সঙ্গীত সাধনা করিয়াছিলেন। যোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি সমবেত সংকীর্তনাদি করিবার জন্য সকলকে উৎসাহ দিতেন, নানাভাবে সাহায্য করিতেন, কখনও বা নিজে পাখোয়াজ[২] সঙ্গত করিতেন। মঠ-মিশনের প্রত্যেক কেন্দ্রে রামনাম-সংকীর্তন, কালী-কীর্তন বা অন্যান্য ভজনগানের যে প্রচলন দেখা যায়, ইহার প্রবর্তক ও সংগঠক ছিলেন মহারাজ। এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য অম্বিকানন্দ (নীরদ মহারাজ)।

১ নারদীয় ভক্তিসূত্র, ৮০।

২ "and he (Swami Brahmananda) himself frequently accompanied the singing by playing on tuned drums or the tamboura". Days in an Indian Monastery, pp. 158

মহারাজের আশৈশব কীর্তনে ভজনে অনুরাগ ছিল। ভাবের রাজা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি তাল-লয়-মূর্ছনার দ্বারা প্রকাশ-দ্যোতক সঙ্গীতের ভাব ধারণা করিতে শিখিয়াছিলেন। যে ভাব-লহরী রূপ হইতে অরূপের সন্ধান দেয়, দৃশ্য প্রপঞ্চের মধ্যে দৃশ্যাতীত প্রপঞ্চকারের ইঙ্গিত দেয়, সুর-ঝঙ্কার ধরিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বস্তুর দিকে লইয়া যায়, তাহারই মূল্য দিতেন মহারাজ। একদিন জনৈক সঙ্গীতশিল্পী মার্গ-সঙ্গীতের আলাপ করিতেছিলেন, মহারাজ তন্ময়ভাবে শুনিতেছিলেন। জনৈক ভক্ত ভক্তিমূলক গান হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ তুলিল। মহারাজ বিরক্তি বোধ করিলেন। বলিলেন, "শব্দ ব্রহ্ম—এ কি তুই জানিস না?" তিনি বলিতেন, "বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে যায়।" 'নীরব বিশ্ব-মাঝে কাহার বাঁশরী বাজে'—সেই বাঁশরীর মধুর ধ্বনি হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিলে, বাহিরের সুরসাধনা তুচ্ছ বোধ হয়। তিনি সহজ অবস্থাতে সঙ্গীতাদির আসর উপভোগ করিতেন, কিন্তু বোধ হয় সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি সঙ্গীত বিচার করিতেন না। তাঁহার নিজস্ব ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহারই কথিত দক্ষিণেশ্বরের একটি ঘটনা হইতে। তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন দুপুরবেলা আমি যখন পঞ্চবটিতে ধ্যান করছি, পরমহংসদেব তখন শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করছিলেন। সেই সব বিচার শুনতে শুনতে গাছের পাখীগুলি পর্যন্ত বেদে যে-সব গান রয়েছে সে-সব গান করছে, শুনলুম।"[১] সঙ্গীত ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ, তাঁহার জীবন-সঙ্গীতের সঙ্গতের ন্যায়।

মহারাজ নিজে সঙ্গীত-সাধক না হইয়াও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বড় সমঝদার ছিলেন। বরাহনগর মঠে, এমন কি পরবর্তীকালেও স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর বা স্বামীজীর গীত কোন গানের সুর তুলিলে মহারাজের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা ছাড়িতেন না। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যে স্থলে মহারাজ কোন কোন স্থানে সুর সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কাশীধামে তাঁহার অবস্থানকালে খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ অঘোরবাবু প্রতিদিন সকালে অদ্বৈতাশ্রমের প্রাঙ্গণে গান গাহিতেন, মহারাজ তন্ময় হইয়া শুনিতেন। সাধক সুর-তালের মাধ্যমে হৃদয়ের আকুতি পরমেশ্বরের পদে অঞ্জলি প্রদান করে, সেই কারণে সঙ্গীত পরমেশ্বরের আরাধনার

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৭৭।

অঙ্গ। মহারাজের প্রিয় উপদেশ "সাধন ভজন মন কর তাঁর নিরন্তর।"—ইহা অঘোরবাবু সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছিলেন! অমিয়কণ্ঠ অঘোরবাবুর সঙ্গীত শুনিয়া মহারাজ বলিতেন, 'আহা! ভজনের ভাব আর স্বর যেন এক হয়ে গেছে।"

ঢাকা সহরে সারদা রায়চৌধুরীর বাড়ীতে অবস্থানকালে মহারাজের প্রীতির জন্য একদিন সঙ্গীত ও বাদ্য-বিশারদদের এক আসর বসে। উহাতে ভগবান, ইন্দ্রনাথ ও শ্যাম সেতারীরা তিন ভাই, গায়ক ও এসরাজ-বাদক মহতাব, তবলা-বাদক গোলাপ, বিখ্যাত বংশীবাদক আফতাবুদ্দিন মিঞা প্রভৃতি যোগদান করেন। মহারাজ ভগবানদাসের সেতার ও গোলাপ তবলচির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেইদিন ঐ আসরে বিখ্যাত সরোদবাদক আলাউদ্দিন তাঁহার রসসম্ভার পরিবেশন করেন। একটি বাজনা শেষ হইতে মহারাজ উহা বেলোয়ারী স্বর বলিয়া চিহ্নিত করিলে বিশেষজ্ঞগণ মহারাজের তীক্ষ্ণ স্বরবোধ জানিয়া মুগ্ধ হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ঘটনা। একদিন সঙ্গীতজ্ঞ নীরদ মহারাজ 'শঙ্করা' রাগে একটি গান গাহিতেছিলেন। পরে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ বেহাগটি বেশ গাইলে, নীরদ।" শঙ্করা ও বেহাগের মধ্যে মাত্রার সামান্য পার্থক্য। গায়ক বুঝিতে পারিলেন মহারাজের কানে যখন ধরা পড়িয়াছে তখন অবশ্যই কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। পরে ভাবিয়া তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, ভুলক্রমে শঙ্করার পরিবর্তে বেহাগ সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। এমনই সূক্ষ্ম ছিল তাঁহার সুরবোধ। মহারাজ গান না গাহিলেও প্রায়ই তাঁহার মিষ্ট কণ্ঠে কোন না কোন গানের কলি ভাবের রেশ টানিয়া দিত।

সমবেতকণ্ঠে ভজন-কীর্তনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। প্রথমবার দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে তিনি ব্যাঙ্গালোরে রামনাম-সংকীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার সাধ হইল বাংলাদেশেও ঐ সুমধুর রামনাম প্রচার করেন। সেই সঙ্গে ত্যাগ ও ভক্তির আদর্শ-চরিত্র মহাবীরের পূজা প্রবর্তনের সংকল্পও করিলেন। মহারাজের আদেশে অম্বিকানন্দ নাম-রামায়ণ সংগ্রহ করিয়া উহাতে সুর-সংযোগ করিলেন ও অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদের উহা শিখাইলেন। মহারাজ নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সকলে মিলিয়া ভক্তিরসাপ্লুত রামনাম গান পবিবেশন করিল। উহার সহিত তুলসীদাস-রচিত স্তোত্রাদি সংযুক্ত করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠ হইতে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহারাজের

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় ঐ সংকীর্তনের মধ্যে "ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম" স্তোত্রটি যুক্ত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। উহা বিনামূল্যে ভক্ত সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঐ পুস্তিকার ভূমিকায় মহারাজ 'নিবেদনে' লিখিলেন, "পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে ব্রহ্মচর্যমূর্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্তিত হয়। সেইজন্য আমরা মঠে এই নাম-সংকীর্তনের পূর্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করিয়াছি। অনুরোধ, অপর সকলেও ইহার অনুবর্তন করেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক ভগবৎ-প্রীতির অধিকারী হইয়া জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, ইহাই হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা।"

গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সহিত মহারাজ শেষবার ব্যাঙ্গালোরে আসিয়া 'শিবনাম সংকীর্তন' শুনিয়া খুবই প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল প্রীতিপ্রদ ঐ সংকীর্তন বাংলাদেশের ভক্ত-হৃদয়ে স্থানলাভ করুক। পরবৎসর বেলুড় মঠ হইতে আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। বাংলা ১৩২৯ সালের ২৯শে পৌষ স্বামী শিবানন্দ ঐ পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিলেন, "মহারাজ গত বৎসর আবার দাক্ষিণাত্যে যান এবং আমরা অনেকে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এবার ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থানকালীন 'শিবনাম সংকীর্তন' শুনিয়া মহারাজ প্রমুখ আমরা সকলে বড়ই প্রীত হই। মহারাজ ইচ্ছা করিলেন যে, ইহাও রামনাম কীর্তনের ন্যায় বাংলাদেশে প্রচারিত হউক। সেইজন্য 'শিবনাম কীর্তন'ও মুদ্রিত হইল। আমাদের ইচ্ছা বঙ্গবাসী নরনারী ইহা কীর্তন করিয়া ধন্য হউন।"

ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মত ভগবৎ-স্তুতিস্তব মহারাজের বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। প্রতিদিনই তাঁহার কোন শিষ্যসেবক নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজের নিকট স্তবস্তুতি পাঠ করিত। তিনি সকলকে সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে নিয়মিত স্তোত্রপাঠ করিতে বলিতেন। মহারাজের সুললিত কণ্ঠে স্তবস্তুতি সুমধুর আরাধনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করিত। তিনি সেবকদের বাছাই-করা স্তোত্র শিখাইতেন। স্তোত্রাদি কণ্ঠস্থ করিবার জন্য তিনি সাধুব্রহ্মচারীদের সর্বদা বলিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান-কথিত

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥[১]

---

১ গীতা ৯।১৪

এই বাণীর নজির মহারাজের নিজের দিব্য জীবন। ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ভক্ত সদাসর্বদা ভগবানের গুণগান কীর্তন করিয়া ভক্তিপূর্বক নমস্কারাদি দ্বারা সদা-সমাহিত হইয়া ভগবানের উপাসনা করেন। সেবক স্বামী শ্যামানন্দ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটি চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় মহারাজ প্রতিদিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় উঠিয়া বসিতেন। তাঁহাকে তামাক দিয়া, তাঁহার আদেশে সেবক সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥

অর্ধ-নিমীলিত নয়নে মহারাজ বসিয়া থাকিতেন ; কখনও গভীর অন্তর্মুখ হইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন, নলটি মুখ হইতে খসিয়া পড়িত। ভাবে গম্‌গম্ করিত ঘরের আবহাওয়া। সেই সময় কখনও কখনও স্বামী প্রেমানন্দজী নীরবে ঘরে প্রবেশপূর্বক মহারাজকে প্রণাম করিয়া যাইতেন।[১]

মহারাজের প্রেরণায় ভক্ত অটলবিহারী মৈত্র বত্রিশখানা উপনিষৎ, গীতা ও চণ্ডী একত্র সংকলনপূর্বক 'শ্রুতিসার-সংগ্রহ' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। সেইরূপ ভক্ত বিহারীলাল সরকারও তাঁহার প্রেরণায় গীতা, ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ সাধারণের উপযোগী সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ ও বিতরণ করেন। যখনই সুযোগ ঘটিত তখনই মহারাজ শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করিতেন এবং নিজে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। পুরীতে তুরীয়ানন্দজী উপস্থিত হইলে কয়েকমাস ভাগবত-পাঠ চলিয়াছিল। তেমনি কাশীতে অবস্থানকালে মহারাজের ইচ্ছানুসারে জনৈক সেবক ভাগবত পাঠ করিতেন এবং তুরীয়ানন্দজী প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করিতেন। শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ যাঁহাদের জীবনে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহারাই শাস্ত্রের মর্মার্থ যথার্থ উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা টীকা-টিপ্পনী শুনিলে মর্মার্থ নূতন আলোকে হৃদয় স্পর্শ করে।

পূর্বে বর্ণিত দ্বৈতসত্তার মধ্যে মহারাজের ভক্তসত্তাটি সাধারণতঃ বালকভাব

১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃঃ ৫৩

অবলম্বনপূর্বক প্রকাশ পাইত। বিচিত্র ঘটনা! একদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে উপস্থিত হইলেন। মঠের পশ্চিমের বারান্দায় একটি বেঞ্চের উপর মহারাজ বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিলেন। শরচ্চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ হঠাৎ বলিলেন, "চক্রবর্তী, তুমি ঠাকুর ও স্বামীজীর কত স্তবগান বেঁধেছ; কৈ আমার কোন গান বাধনি?" শরচ্চন্দ্র নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আপনার নামেও একটি গান তৈরী করেছি, তবে সব কলি এখন মনে নেই।"

মহারাজ—যা মনে আছে তাই গেয়ে ফেলো।

শরচ্চন্দ্র গান ধরিলেন—

"কে তুমি রাখালরাজা সাজিয়ে নরের সাজে
গোলকে আসন ছাড়ি এসেছ গুরুর কাজে।
সরল বালকমতি মায়ামুক্ত মহারতি
বালগোপাল মূরতি অন্তরে সদা বিরাজে।"

মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "বেশ, বেশ! হবে না কেন? ও কেমন গুরুর চেলা!" উপস্থিত সকলে মহারাজের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। উপরি-উক্তগানের শেষ কলি কয়টি নিম্নরূপ—

"বাহিরে বালক হাস, ভিতরে ব্রহ্মবিকাশ
কে চিনিতে পারে তোমা, চেনা নাহি দিলে নিজে।
তব পদে করি নতি মাগিছে গুরু-ভকতি।
গুরুদত্ত মন্ত্র যেন নিয়ত হৃদয়ে রাজে॥"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহারাজও ভক্তিমূলক যাত্রা, নাটক[১] দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য অপরেশ মুখোপাধ্যায় কোন নাটক লেখা হইলে মহারাজকে উহা পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহার উপদেশ-অনুযায়ী পরিবর্তন ও

১ বিখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "থিয়েটার কেবল আমোদাগার না হইয়া ইহা যে জাতীয় শিক্ষালয়ের মানুষ তৈয়ারী করিবার একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এ বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি থিয়েটার দেখিতে যাইতেন; নট-নটীকে উৎসাহ দিতেন; তাহাদের নৈতিক কল্যাণ কামনা করিতেন। তাহারা যাহাতে সমাজের কল্যাণকর কাজে জীবন অতিবাহিত করে, সে বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করিতেন।" (নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়: শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ, পৃঃ ১০৩এ উদ্ধৃত)

পরিবর্ধন করিতেন। 'রামানুজ' নাটক সম্বন্ধে অপরেশবাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "শুনিলাম 'রামানুজ' লেখা হচ্ছে শুনে মহারাজ খুব খুশী হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কে লিখেছে, আমাদের সেই অপরেশ?' ······ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে রামানুজের পুঁথি বগলে করিয়া বলরাম-মন্দিরে গেলাম মহারাজকে শুনাইতে—তাঁহার আশীর্বাদ আনিতে। চাহিবার পূর্বে যে আশীর্বাদ অকৃপণ করে ঢালিয়া দিয়াছেন—তাহা তো জানি না। স্থানে স্থানে শুনিলেন—কি আনন্দ, কি উৎসাহ! নীরদ মহারাজকে টেলিগ্রাম করিলেন; তিনি তখন মুর্শিদাবাদে। মহারাজের ইচ্ছা তিনি গানের সুর দেন। মহারাজেরই আদেশে রামনামের গানটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করি।"[১] কথিত আছে, রামানুজ-নাটক দেখিতে যাইয়া আচার্য রামানুজের অকাতরে কৃপা বিতরণ দর্শন করিয়া মহারাজ ভাবাবেশে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন।

মহারাজের অন্তরের আনন্দ-উৎসার প্রায়ই বাহিরে প্রকাশ পাইত এবং তাহা সঙ্গীত, স্তব-স্তুতি, আরাধনা, কখনও বা বালকোচিত হাসিস্ফূর্তি, ফষ্টিনাষ্টির মধ্যে প্রস্ফুরিত হইত। মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দজীর উক্তি, 'মহারাজ যখন যেখানে থাকেন সেখানে যেন একটা আনন্দধারা দিনরাত বয়ে যাচ্ছে।'[২]

* * *

মহারাজ যখন সহজ অবস্থায় থাকিতেন তখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হইত। স্বভাবতঃ অন্তর্মুখ মহারাজ অপলক দৃষ্টি লইয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার আঁখিযুগল যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কাহারও বিশেষ ভরসা হইত না। আবার যখন আনন্দের উচ্ছলতায় আঁখিযুগল চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন বালক বৃদ্ধ সকলে তাঁহার চারিদিকে ছুটিয়া আসিত। আসিয়া শুনিত মহারাজ বলিতেছেন, "পুঁই চচ্চড়িতে কুঁচো চিংড়ী—কি চমৎকার জমে"; "কচি আমে সরষে ফোড়ন দিয়ে ফটিক-জল অম্বল কি মধুর"; "গলদা চিংড়ী নারকেলের রসে কেমন সুসিদ্ধ হয়!" ইত্যাদি। ইহার কারণ, আমরা জানি, ঈশ্বরকোটি পুরুষ বাসনাহীন; কৌতুকেই তাঁহার আনন্দ। মায়াবদ্ধ জীবের নিকট এই সংসার "ধোঁকার টাটী"—সংসারের বিষয় সকলের মধ্যে ইতরবিশেষ বুঝিতে না পারিয়া সকল বিষয় গুরুগম্ভীরভাবে দেখিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধপুরুষের নিকট

১ 'উদ্বোধন', ২৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৯৯-৩০০।
২ 'স্বামী সারদানন্দ—যেমন দেখিয়াছি', পৃঃ ৩০৩

এই সংসার "মজার কুটী", তিনি সকল কিছুর মধ্যেই আনন্দময় ঈশ্বরের আনন্দচ্ছটা দেখিতে পান এবং ভক্তদের মধ্যে সেই আনন্দরস নানাভাবে পরিবেশন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সমাধিপ্রবণ বিশুদ্ধ মনকে নামাইয়া রাখিবার জন্য অন্তরঙ্গ যুবক ভক্তদের লইয়া আমোদ-আহ্লাদ, ফষ্টিনাষ্টি, হুটোপুটি করিতেন। ঠাকুরের এই সহজ আনন্দময় ভাবটি তাঁহার মানসপুত্রের মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ উৎফুল্ল হইতেন, তাঁহাদের মনে ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইত, তাঁহারাও মহারাজের সহিত আনন্দে যোগ দিতেন।

মহারাজের গভীর চিত্তহ্রদে হাসি-কৌতুকের উচ্ছলতা সময় সময় যে মনো-হরণকারী আনন্দ-তরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার কয়েকটি ঘটনা চয়ন করা যাইতেছে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তখন মঠে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণকার্য তদারক করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও তখন মঠে বাস করিতেছিলেন। শীতের সকালবেলা, মহারাজ মঠবাড়ীর দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জন্য কলিকাতা হইতে একটি পাঞ্জাবী তৈয়ারী করিয়া আনা হইয়াছে। পাঞ্জাবী দেখিয়া মহারাজ খুশী হইলেন, সেবক স্বামী নির্বাণানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ সুয্যি, 'পেসন'-কে নিয়ে একটু মজা করতে হবে। তুই গঙ্গাজলের পাত্রটা ঠিক করে রাখ। পেসন-কে জামাটা সম্প্রদান করতে হবে।" হঠাৎ দেখা গেল রামলালদাদা মঠের ঘাটে নৌকা হইতে নামিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ খুব খুশী, স্থির হইল রামলালদাদাই সম্প্রদান করিবেন। রামলালদাদা দোতলায় উপস্থিত হইলে তাহার সহিত দুই-চারিটি কথার পর মহারাজ তাঁহাকে সম্প্রদান-পদ্ধতির মহড়া দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ রামলালদাদার সহিত নিম্নস্বরে কতাবার্তা বলিতেছেন শুনিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল তাঁহাকে লইয়া হয়ত কোন ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তিনি সরাসরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে নিয়ে কি সব মতলব হ'চ্ছে ?" মহারাজ সাদাসিধাভাবে উত্তর করিলেন, "তোমার জন্য একটা জামা আনিয়েছি, সেটা তোমায় দেব। মতলব আর কি ?" বিজ্ঞানানন্দজী নূতন জামা গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত মহারাজ রাজী করাইলেন। মহারাজের আদেশে বিজ্ঞানানন্দজী টুপি, গলাবন্ধ, কোট ইত্যাদি খুলিয়া নূতন গরম

পাঞ্জাবীটা পরিধান করিলেন। মহারাজ ইঙ্গিত করিয়া রামলালদাদাকে বলিলেন, "তবে দাদা এবার হোক্।" রামলালদাদা কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মহারাজ-রচিত উদ্ভট এক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। বিপদগ্রস্ত বিজ্ঞানানন্দজী দৌড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। মহারাজও চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে ধাওয়া করিলেন। অপরদিক হইতে অভেদানন্দজী সেই সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। দুইজনের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞানানন্দজী ছোট ছেলের মত হাত-পা ছুঁড়িতে থাকিলেন। স্ফূর্তির ফোয়ারা সকলের মধ্যে বিমল আনন্দ ছড়াইয়া দিল।

কাশীশ্বরানন্দ তাঁহার একটি অভিজ্ঞতা স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "কচিৎ কখনও ছেলেদের মধ্যে এমন খুব দুষ্ট ছেলে দু' একটি দেখা যায়, যারা চোখে হাসে। মহারাজেরও এই গুণটি ছিল। তাঁর ঐ চোখের হাসি দেখলে আমি ও ইন্দু[১] ভয়ে পালাতুম। কারণ, তখন তাঁর ছোট দুষ্টু ছেলের মত যে কিভাব উঠবে তা তিনিই জানেন, আর তাঁর সঙ্গে আমাদেরও জড়াবেন। মঠে স্বামীজীর ঘরের সামনে গঙ্গার ধারে দোতলার বারান্দায় একদিন সকাল দশটায় সময় মহারাজ আরাম কেদারায় স্বামীজীর ঘরের দিকে মুখ করে বসে আছেন। ইন্দু ও আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কিরণ দত্তের বাড়ীর একটি ছেলে এলো। তার বয়স আমাদের চেয়ে চার-পাঁচ বছর বেশী হবে। তাকে দেখলে মহারাজের ছেলেমানুষি ভাব জেগে উঠত। তাকে দেখেই মহারাজ চোখে হাসতে শুরু করেছেন। আমরা দু'জনে তা লক্ষ্য করে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি। আমাদের যেতে দেখে মহারাজ বলে উঠলেন, 'পালাচ্ছিস্ কোথা? দাঁড়া!' আমরা হাসতে হাসতে ভাবছি, এইবার সেরেছেন আর কি! ইতিমধ্যে মহারাজ চেয়ার থেকে উঠে এসে তাঁর ঘরের সামনে, নিজে পা ফাঁক করে এঁকে-বেঁকে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনকেও ঐরূপ পা ফাঁক ও অঙ্গভঙ্গী করে দাঁড়াতে বললেন। বাধ্য হয়ে ঐভাবে দাঁড়াতে হ'লো। তারপর তিনি কি একটা খোলের বোল বলে কিভাবে নেচে ঘুরতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন। আমরা তিনজনেই তাই করলুম। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার পুরানো সংকীর্তনের ছবি যদি দেখে থাকেন, যাতে ইয়া লম্বা ও মোটা টিকিওয়ালা ন্যাড়ামাথা বৈষ্ণবেরা মুখ ও অঙ্গভঙ্গী ও পা ফাঁক করে খোল বাজাচ্ছে, তাহ'লে মহারাজের দেখানো ঐ ভঙ্গিমার খানিকটা কল্পনা করতে পারবেন। কতো ছেলেমানুষ! অবোধ!"

১ পরে স্বামী দেবাত্মানন্দ।

মহারাজ আমন্ত্রিত হইয়া কোচবিহারের মহারাজার আলিপুরস্থিত বাড়ী 'উডল্যাণ্ড'-এ কয়েকদিন অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্ণে মহারাজ ফষ্টিনাষ্টির এক আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। তিনি রামলালদাদাকে লইয়া পুরানো দিনের খিস্তিখেউর আলোচনা করিতেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও উপস্থিত। সেই সময় জনৈক ভদ্রলোক মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, আসর পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর আলোচনা থামিল। মহারাজের দৃষ্টি অভ্যাগতের উপর পড়িল। তিনি ভদ্রলোককে বলিলেন, "মাফ করবেন, আমরা রোজ এইরকম করি না, অন্য কিছুও হয়।" মহারাজের এইরূপ সরল ব্যবহারে ভদ্রলোক বিস্মিত হইলেন, তিনি এতক্ষণ যাহা ভাবিতেছিলেন নিমেষে তাহা পরিবর্তিত হইল। তিনি মহারাজের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের পক্ষেই এইরূপ আচরণ সম্ভব।

তাঁহার হাস্য-কৌতুকের অন্যতম লক্ষ্যস্থল ছিলেন গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ। একবারের ঘটনা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ডানন্দজী সারগাছিতে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য মহারাজ দুইজন সেবককে সারগাছিতে পাঠাইয়া দিলেন। ব্যাধির উপশম না হওয়াতে তাঁহাকে কলিকাতায় বলরামভবনে লইয়া আসা হইল। প্রায় সাতমাস চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার পরে তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন; এপ্রিল মাসে (১৯১৮) তিনি সারগাছি ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ সে-সময়ে বলরামভবনে। তিনি কখনও হাসি-ঠাট্টা করিয়া, কখনও বা নানা কলা-কৌশল করিয়া অখণ্ডানন্দজীর যাওয়া পিছাইতে লাগিলেন। যে-দিনই যাত্রার দিন স্থির হয় সে-দিনই দেখা যায়, কেহ কাঁকড়ার ছবি বা অমঙ্গলসূচক কোন ছবি বা খবর দিয়া গেল, কোনদিন বা কেহ ভোরবেলায় একচোখ দেখাইয়া গেল, এবং এইভাবে যাত্রাভঙ্গ হইতে লাগিল। দুই গুরুভ্রাতার এই প্রীতির খেলা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইল।

কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি মহারাজের রঙ্গ রসিকতা পূর্ণ চিঠিপত্রের লক্ষ্যস্থল ছিলেন। মহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে রামলালদাদাকে ৺বিজয়ার চিঠিতে লিখিয়াছেন, "দাদাগো, তোমার জন্য কোলা ব্যাঙ্ আর কুলি বেগুন পাঠাইলাম; অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবে।" স্বামী শঙ্করানন্দ মুর্শিদাবাদে আর্তসেবা করিতে-ছিলেন (১৯০৮ খৃঃ); মহারাজ তাঁহাকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন, "গঙ্গাধর

মহারাজকে আমার বহুৎ বহুৎ আদাবট্ জানাইবে।" এই ধরণের কৌতুকের অপর এক লক্ষ্যস্থল ছিলেন কোন্নগরের বিপিন ডাক্তার।[১] ডাক্তার কখনও কখনও পোস্টাল পার্সেলে মহারাজের প্রীতি উপহার পাইতেন। বাক্সের প্যাকিং খুলিতেই দেখা যাইত, একটি সাপ ফণা ধরিয়াছে অথবা একটি গিরগিটি লাফ দিয়া মাথায় চড়িয়াছে। কাশী হইতে চন্দ্র মহারাজ স্প্রিং-এর খেলনা পাঠাইয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেছেন ভাবিয়া ডাক্তার খুব চটিয়া যাইতেন। রামলালদাদা একটি চিঠিতে মহারাজকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মহারাজের চিঠির উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "এমত চিঠি লিখিতে কেহই পারিবে না, ও কেহ দিতেও জানে না। আপনি রসময় ও রসিকশেখর এবং সর্বজ্ঞ রসিকচূড়ামণি। প্রভুদেবের অপার করুণা আপনাতে সম্পূর্ণ বিরাজ করিতেছে, তাই আপনার তুলনা আপনাতেই। সাধারণ হইতে একেবারেই তফাৎ।" মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত গোকুলদাস দে রসরাজ মহারাজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "হাস্যরসের সৃজন করিতে তাঁহার মত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি আনন্দময় জগতের রাজরাজেশ্বর ছিলেন সুতরাং মর্ত্যবাসীর নিকট সেই মহামূল্য স্থানের কিঞ্চিৎ কণা ছড়াইয়া দেওয়া আর তাঁহার পক্ষে বিচিত্র কি!"[২]

সকলসময়ে শুধু রসসৃষ্টির জন্যই রসিকতা করিতেন না, সময় সময় তিনি এই ধরণের রসিকতার সাহায্যে অনুপম পদ্ধতিতে মানুষের দোষ-ত্রুটিও সংশোধন করিয়া দিতেন। দুইটি যুবক মহারাজের নিকট যাতায়াত করিত। একবার তাহারা মহারাজের নিকট কিছু মিথ্যা বলে। পরে একদিন মহারাজ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি গল্প বলিলেন। "কয়েকদিন আগে কলকাতার বন্দরে একটা বড় জাহাজ এসেছিল মিথ্যার বেসাতি নিয়ে। তারা সেই জিনিষ কলকাতার বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করলে, কোন খদ্দের পেল না। শেষকালে অমুক আর তমুক সেই সব জিনিষ সস্তায় কিনে নিলে।" মজার গল্প শুনিয়া অপরাধী দুইজন খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল বটে, কিন্তু নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে অবিলম্বে সজাগ হইল এবং ক্রমে নিজেদের স্বভাব সংশোধন করিল।

১ সেই সময়ে ইনি বেলুড় মঠেই বাস করিতেন। তাঁহার চোখ ট্যারা ছিল, একটি পা খোড়া ছিল।

২ উদ্বোধন, ২৪ বর্ষ, ৫ম-সংখ্যা, পৃঃ ২৮০

বালকস্বভাব মহারাজের ক্রীড়া-কৌতুকের একটি ঘটনা স্বামী সম্ভবানন্দ তাঁহার স্মৃতিলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ, মহারাজ তখন ব্যাঙ্গালোরে। একদিন সন্ধ্যার পরে তিনি শব্দ-রচনা লইয়া খেলা শুরু করিলেন। খেলায় একপক্ষ একটি শব্দ বলিলে প্রতিপক্ষকে মিল রাখিয়া শব্দ যোজনা করিতে হইবে। উত্তর না দিতে পারিলে বা ভুল শব্দ বলিলে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। সেবক বরদানন্দ রান্নাঘরে ব্যস্ত, মহারাজ তাঁহার সহিত শব্দ-রচনা-খেলা আরম্ভ করিলেন। সম্ভবানন্দ (তিনি তখন ব্রহ্মচারী) তাঁহাদের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর লেনদেন করিতে লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক খেলা চলিল। অবশেষে কর্মব্যস্ত বরদানন্দ ক্লান্ত হইয়া বাহক মারফত নিবেদন করিলেন, 'It is late at night'। বাহক মহারাজের প্রত্যুত্তর আসিল 'Tell him good night'। যেমন ধর্মবিষয়ে উপদেশ নির্দেশ দানের সময় বা সঙ্ঘের কাজকর্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম পরামর্শ প্রদানের সময়, তেমনি ক্রীড়া-কৌতুকেও তাঁহার বিভিন্নমুখী উদ্ভাবনী-শক্তির প্রকাশ সকলকে চমৎকৃত করিত।

বালকের ন্যায় খেয়ালী মহারাজের দুইটি বিষয়ে ভারী সখ ছিল, মাছধরা ও তাসখেলায়। অবশ্য কোনটাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে বালকস্বভাব মহারাজ যেমন সময় সময় ফষ্টিনাষ্টি করিতেন, তেমনি কখনও কখনও মাছধরা ইত্যাদি লইয়া আমোদ করিতেন মাত্র। তাস খেলায় তিনি জিতিলে ছোট বালকের মত স্ফূর্তি করিতেন, সেইসময় যাহারা উপস্থিত থাকিত, তিনি তাহাদের বলিতেন 'পয়মন্ত'। খেলায় হারিয়া গেলে বালকের মত কখনও বা চটিয়া যাইতেন, আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেন কোন 'অপয়া' ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁহার পরাজয়ের জন্য দায়ী। তাঁহার তাসখেলার সঙ্গী ছিলেন তুলসীবাবু, গঙ্গাধর মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ প্রভৃতি। গম্ভীর-প্রকৃতি হরি মহারাজ কখনও কখনও মহারাজকে আনন্দ দিবার জন্য খেলায় যোগ দিয়াছেন। সাধারণতঃ রংয়ের খেলা চলিত। খেলিতে বসিয়া মহারাজ পার্শ্ববর্তী খেলুড়ে হরি মহারাজের হাতের তাস দেখিবার চেষ্টা করিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। একদিন তিনি মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ আপনার সঙ্গে আর খেলতে বসব না। আপনার এসব লীলা; কিন্তু মনে থাকে না বলে চটে যাই।" শরৎ মহারাজ হয়ত কোন কাজ লইয়া মহারাজের নিকট আসিয়াছেন। হঠাৎ মহারাজের খেয়াল হইল, তিসি তাঁহার সহিত খেলিতে বসিলেন। শরৎ মহারাজ স্বেচ্ছায় হারিতে থাকিলে মহারাজ বলিতেন, "তুমি একেবারেই খেলতে জান না, শরৎ।"

মহারাজের তাসখেলার সঙ্গে জড়িত চমৎকার একটি ঘটনা! পুরীতে শশি-নিকেতনে দোতলার ঘরে একদিন অপরাহ্ণে তাসখেলার আসর বসিয়াছে। বালকের মত মহারাজ খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। মহারাজের দর্শনপ্রার্থী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিকাল চারিটার সময় উপস্থিত হইলেন। মহারাজের নিকট খবর গেল, তিনি সেদিকে মন দিলেন না। এদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভদ্রলোক অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মহারাজ নীচতলায় আসিয়া ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিলেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর মহারাজ বলিলেন, "মাফ্ করবেন, তাস খেলছিলাম, তাই দেরী হয়ে গেল।" তাঁহার সত্যবাদিতা ও অভিমানশূন্যতা দেখিয়া ভদ্রলোক স্তম্ভিত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন।

যদিও তিনি কদাচিৎ মাছ ধরিতে পারিতেন, তবু মাছ ধরার ব্যাপারেও তাঁহার সমধিক উৎসাহ ছিল। নানাপ্রকারের প্রস্তুতি করিয়া বেলুড়মঠের গোয়ালপুকুর ও হাঁসপুকুরে মাছশিকারের অভিযান চলিত। তিনি ছিপহাতে নিবিষ্টমনে বসিয়া থাকিতেন, কখনও দুই একটি মাছ ধরা পড়িলে শিশুর মত আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিতেন। গুরুভ্রাতা শিবানন্দজী তাসখেলা ও মৎস্য-শিকার এই দুইটি সখ হইতে মহারাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। সেইজন্য শিবানন্দজীকে লুকাইয়া, কখনও বা সম্মুখে দেখা হইলে 'ছেলেদের একটু উৎসাহের জন্য' ইত্যাদি অজুহাত দেখাইয়া মাছ ধরিতে যাইতেন।

মহারাজের অপর একটি সখ, ফুলফলের গাছের প্রতি প্রীতি, তাঁহার পরিণত বয়সে যেন বাড়িয়া গিয়াছিল। নানাবিধ ফুলফলের গাছ দেখিয়া তিনি খুবই প্রসন্ন হইতেন, কখনও ভাবের আবেগে পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহারাজ তখন বারাণসীতে। সে বছর স্বামী কালিকানন্দের পরিশ্রমে সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে অজস্র চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি ফুটিয়াছে। একদিন বিকালে প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিবার সময় মহারাজ ভাবাবেশে সবুজ ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া ফুলগাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠে শোনা গেল, "আহা! আহা! বিরাটের কি সুন্দর পূজা হচ্ছে! তাঁহার সেবক ও স্বামী কালিকানন্দ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিস্মিতভাবে দেখেন মহারাজের দেহটি যেন বড় হইয়া গিয়াছে, পা দুইটি যেন লম্বা হইয়া গিয়াছে—ভাবাবিষ্ট মহারাজ সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন।"[১]

১ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

ব্যাঙ্গালোরে ফুলফলের গাছে সাজান আশ্রম প্রাঙ্গণে মহারাজ বেড়াইতেন। প্রায়ই দেখা যাইত তিনি ভাবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বদনমণ্ডল উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে, তিনি অস্ফুটস্বরে যেন কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন। কখনও তিনি মহীশূর মহারাজের বিখ্যাত উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। প্রস্ফুটিত ফুলগাছের পাশ দিয়া যাইবার সময় প্রায়ই বলিতেন, "দেখ্‌ছ, দেবকন্যারা যেন হাসছেন।"

নানাবিধ ফুলফলের গাছের চাষ ও তাহাদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়াতে মহারাজের গভীর প্রীতি দেখা যাইত। বেলুড় মঠের প্রথম অবস্থায় তিনি নিজ-হস্তে বিবিধ প্রকারের ফুলগাছের চাষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি একস্থানের প্রসিদ্ধ ফুল বা ফল গাছের চারা মঠ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাইতেন, গাছের যত্ন কিভাবে লইতে হইবে তাহার বিস্তারিত নির্দেশ পাঠাইতেন। ব্যাঙ্গালোরের লালবাগ হইতে দামী ফুল ও ফল গাছের চারা সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশী সেবাশ্রম ও ভুবনেশ্বর মঠে পাঠাইয়া দেন। ভুবনেশ্বর মঠের গাছপালাশূন্য কাঁকরভর্তি জমি তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় অল্পসময়ের মধ্যে ফুলফলের গাছে পরিপূর্ণ হয়, মরুভূমিতে যেন নন্দনকাননের সৃষ্টি হয়। ভুবনেশ্বর মঠ প্রাঙ্গণের কোথায় কোন গাছ বসিবে তাহার একটি নক্সা প্রস্তুত করাইয়া স্বামী শঙ্করানন্দকে দিয়া তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে বাছাই গাছের চারা ও বীজ সংগ্রহ করিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে সাহায্য করেন। যাহারা গাছপালার যত্ন লইত তিনি তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া সুন্দর একটি ভাব সংযুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, গাছ কখনও নিমকহারাম হয় না। পারলে যে যত্ন করে তাকে ফুল ফল দিয়ে সেবা করে, না পারলেও ক্ষতি করে না।"

মহারাজ শিশুদের সহিত ঠিক শিশুদের মত হইয়া ব্যবহার করিতেন, বিবিধ খেলাধূলার উদ্ভাবন করিতেন। তাঁহার ভাবময় জীবনের গগনচুম্বী উচ্চতা ও শিশুদের সহজ সারল্যের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান তাহা সত্য সত্যই যেন সাময়িকভাবে অপসারিত হইত, ফলে মহারাজের যে শিশুমূর্তি দর্শকের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইত তাহা আপাতঃ অবোধ্য হইলেও যে চিত্তবিনোদকারী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন, "একদিন বলরাম-মন্দিরে গিয়াছি। সেদিন মহারাজ মহানন্দে ছোটদের সঙ্গে খেলায় রত। তিনি হলঘর এবং বারান্দার মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছেন এবং ছেলের দল মহারাজের পিছু লইয়াছে। হঠাৎ

মহারাজ তাঁহার নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, ছেলের দল কোলাহল করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজ ঘরে ঢুকিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন, ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার শয়নঘরে একটি বিকটাকৃতি মুখোশ ছিল। তিনি সেটি পরিয়া আপাদমস্তক কালো কম্বলে আবৃত করিলেন এবং হঠাৎ দরজাটি খুলিয়া বিরাট এক 'হুম্' শব্দ করিয়া হলের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্তি দেখিয়া ছেলের দল চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ ঐরূপ দেখিয়া আমরাও ভয়ে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে যখন সেই বিকট আবরণ দূরে ফেলিয়া মহারাজ আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন চারিদিকে হাসির তুফান ছুটিতে লাগিল। ঘটনাটি সেদিন যাহাদের প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, বালকস্বভাব মহারাজের বালকভাবটি তাহাদের অন্তরে চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকিবে।"[১]

মহারাজের শিশুসুলভ সরলতা ও কৌতুকপ্রিয়তার একটি মনোহর স্মৃতি চয়ন করিয়াছেন স্বামী নির্বাণানন্দ। বেলুড়মঠে থাকাকালীন মহারাজ একদিন সেবককে বলিলেন যে, তাঁহার সামান্য বদহজম হইয়াছে, রাত্রিতে কিছু খাইবেন না। মহারাজের শয়ন ঘরের পাশের ছোট ঘরে একটি পাত্রে বেশ কিছু সন্দেশ ছিল। ভোর রাত্রিতে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মহারাজ নিজে সেই পাত্রের সন্দেশগুলি খাইয়া ফেলেন। সকালবেলা প্রেমানন্দজী তাঁহাকে প্রণাম ও যথারীতি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ছোট ছেলের মত অভিযোগ করিলেন, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে এখনও কিছু খেতে দেয়নি।" প্রেমানন্দজীর আদেশে সেবক তাড়াতাড়ি কিছু খাবার সংগ্রহের জন্য ছুটিলেন। তিনি পাশের ঘরে সন্দেশের পাত্রটি খুলিয়া দেখিলেন পাত্র শূন্য; তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। প্রেমানন্দজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, পাত্রটির ঢাকনা খোলা ছিল কিনা, বিড়াল সন্দেশ খাইয়াছে কিনা, ইত্যাদি। মহারাজ হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাবুরামদা, একটা খুব বড় বিড়াল এসেছিল; বিড়ালটি এত বড় যে পাত্রটি খুলে সন্দেশ খেয়ে আবার বন্ধ করে রেখেছে।" বড় বিড়াল বলিবার সময় ইঙ্গিতে নিজেকে দেখাইলেন, ঘটনা শুনিয়া হাসির লহরী উঠিল।

তাঁহার এইসকল শিশুসুলভ চপলতা দেখিয়া নবাগত আগন্তুক কল্পনা করিতে

১ উদ্বোধন, ৬৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; পৃঃ ৪২০;

পারিত না যে ঐ পুরুষই ভাবের গভীরতায় দেহজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার মুখের একটি কথায় মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে বিশাল রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ ও ততোধিক সংখ্যক ভক্তবৃন্দ।

*　　*　　*　　*

মহারাজের উপস্থিতিমাত্রে আনন্দের হাট বসিত। তাঁহার আকর্ষণে ভক্ত-সমাগম, পূজা-পাঠ-উৎসবের আনন্দ বৈচিত্র্যের মেলা জমিয়া উঠিত। তাঁহার উপস্থিতিতে প্রত্যেকস্থানই নিত্যোৎসবের আকার ধারণ করিত। কিন্তু প্রত্যেকটীর অনুষ্ঠান মহারাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভূষিত হইত। মহারাজ স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার সকল আচার আচরণে, এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁহার স্বকীয়তা লক্ষণীয় ছিল। দুই তিনটি ছোটখাট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খাওয়ার সময় তাঁহাকে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করা হইলে তিনি প্রত্যেকটি হইতে সামান্য গ্রহণ করিতেন। পরে সকল ব্যঞ্জন একটি বাটিতে মিশাইয়া একটি বিচিত্র স্বাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন 'উইলিয়ম ভট্'। উৎসবের দিনে তাঁহার নির্দেশে জাফরান, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদি মিশাইয়া চা তৈয়ার হইত, তাহার নাম ছিল "মোগলাই চা"। আবার কখনও নানাবিধ তরিতরকারী মসলাপাতি দিয়া পাতলা খিচুড়ি রান্না করা হইত, তাহার নাম ছিল "গোপাল-গাপ্পা"। এইভাবে কত বিচিত্র উপায়ে মানুষকে আনন্দদানের তাঁহার যে অফুরন্ত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহার স্মৃতি রোমন্থন করিয়া ভক্তগণ এখনও আনন্দ-লাভ করেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেন, "মহারাজ নিজে নানারকম খেতে ভালবাসতেন, আর সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। আহা! তিনি যখন মঠে আসিতেন, তখন যেন আনন্দের মেলা—কত লোকজন! সাধুভক্তদের নিয়ে ধ্যানজপ, পূজাপাঠ, ভজন-কীর্তন, রঙ্গরস, খাওয়া-দাওয়া নিত্য চলেছে—যেন আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। 'সে একদিনই গেছে' মহারাজের মত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই লোককে এমন নানাভাবে আনন্দ দেওয়া সম্ভব।"[১]

মহারাজ কখনও কখনও মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে থাকিলেও মহারাজ ছিলেন পদ্মপত্রে জলের মত নির্লেপ।

১ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ১৭৬ পৃঃ

মহারাজের এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "সাধুর ঠিক ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাজ অতি চমৎকার একটী কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, সন্ন্যাসী যখন অট্টালিকায় বাস করবে তখন ভাববে, 'আমি গাছতলায় রয়েছি'; আর যখন চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাবে তখনও মনে মনে ভাববে, 'আমি পবিত্র ভিক্ষান্ন খাচ্ছি'। তার মানে এই যে, সাধু সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত থেকে অন্তরে তপস্যার ভাব জাগিয়ে রাখবে।"[১] মহাপুরুষ মহারাজের উক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে মহারাজের বৈরাগ্যোজ্জ্বল অন্তরের অনিকেত সত্তাটির দীপ, যাহার দ্যুতি 'সব কিছুর মধ্যে থাকিয়াও সব কিছুরই ঊর্ধ্বে' অবস্থিত তাহার স্বরূপটি কখনও কখনও প্রকট করিয়াছে।

নানাবিধ ভাববিলাসের মধ্যে বিচ্ছুরিত লোকোত্তরপুরুষের চরিত্র মাধুর্য। লৌকিক ও অলৌকিক সত্তার টানা-পোড়েনে বোনা তাঁহার দেবমানব চরিত্রের প্রতিফলন তাঁহার প্রতিটি আচার-ব্যবহারে। তাঁহার মনোহর জীবনকাহিনীর আনন্দমধুর ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাপ্লুত ভক্তহৃদয় যেন শুনিতে পায় তাঁহার আকুতি,

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব।
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

তাঁহার জীবননদীতে উত্থিত সকল উর্মিমালা বিচিত্র হিল্লোলে সচ্চিদানন্দ সাগর-অভিমুখে প্রবাহিত। সেই পুণ্য তোয়ধিতে স্বেচ্ছায়-পরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে যে মানবজীবন চিরকৃতার্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩০।

অষ্টম অধ্যায়

কলমির দলে

অষ্টম অধ্যায়

কলমির দলে

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবতার পুরুষের অন্ত্যলীলার আসর বসিয়াছে। আসরে জমায়েত হইয়াছেন ভক্তিলুব্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। আসরের মধ্যমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত। যে দেহ ভাবহস্তীর প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল, তাহা ব্যাধিতে জীর্ণ, শীর্ণ, পর্যুদস্তপ্রায়, তবুও আনন্দঘন পুরুষোত্তমের প্রতি আচার-আচরণে ক্ষরিত হয় আনন্দসুধা, ত্রিতাপ-পীড়িত জগৎ-বাসীকে ভক্তিমুক্তি বিতরণের শুদ্ধ কল্যাণেচ্ছা। করুণার ভারে কৃপা-কল্পতরু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ চতুর্দিকে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, পূর্ণকাম শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষ করুণার দায়ে, নিজের গরজে যেন, অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও লোকহিতব্রতে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। কবি অক্ষয়কুমার সেন লিখিয়াছেন :

বড় দায়গ্রস্ত প্রভুদেব-অবতারে।
দয়ার মূরতি ধরি আসিয়া সংসারে॥
তাই বারিপূর্ণ চক্ষে আকুল পরাণ।
মহাদুঃখে গাইতেন নীচে লেখা গান॥
এসে পড়েছি যে দায়
সে দায় বলবো কায়।
যার দায় সে আপনি জানে
পর কি জানে পরের দায়॥[১]

মুমুক্ষু নরনারীকে নিঃশ্রেয়সের পথ প্রদর্শন, পাপী-তাপী অবহেলিতদের হতাশপ্রাণে আশার আলোকদান, জনসাধারণের স্তিমিত ধর্মবিশ্বাস প্রবুদ্ধ করিয়া লোকহিতব্রত-সংগঠন, সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে লোকশিক্ষা দিয়া যুগোপযোগী ধর্মপ্রবর্তনের দায়

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ৫ম সং, পৃঃ ৩২১,

বহন করিয়া কপালমোচন অধমতারণ ভগবান্ নরলীলার বিলাস করেন। ঈশ্বরের অতুলনীয় সৃষ্টি মানুষ দৈব ও জৈব ভাবের সংমিশ্রণ। সেই কারণে ভক্তের বেশে ভক্তরাজ শ্রীভগবান্ যখন ভক্তসঙ্গে মর্ত্যলীলা করেন, তখন সেই লীলারঙ্গে উদ্ভূত আনন্দলহরীর রসমাধুরী হয় অতুলনীয়। শুদ্ধভক্তদের লইয়া অবতারের অন্তরঙ্গলীলা, "সিন্ধুর যেমন রঙ্গ লয়ে ঊর্মিমালা।"[১] অবতার পুরুষ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া মর্ত্যের মঞ্চে নাচিয়া গাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া ভক্তমানসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করেন, সাধারণ মানুষকে ভগবদাভিমুখীন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় সমীপাগত পার্ষদদের সম্বন্ধে শ্রীমাতাঠাকুরানী বলিয়াছেন, "ঠাকুর বলতেন, 'তারা কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকূপ থেকে, কেউ হাত-পা থেকে বেরিয়েছে। তারা সব সঙ্গের সঙ্গী।' যেমন যখন রাজা কোথাও যায়, সব সঙ্গের লোকজন তথায় যায়। আমি যদি জয়রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের যারা তারা সব যাবে না? তেমনি যারা আপনার, তারা সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তারা ব্যাথার ব্যথী।' এই সব ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।' তিনি যখন আসেন, তখন সব হাজির।"[২] পুঁথিকার বলেন—

ভক্তগণ-মধ্যে তাঁর সতত বিহার।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি শ্রীঅঙ্গের আপনার॥[৩]

পুরুষোত্তম ভক্তরূপ বিবিধ পুষ্পরাজি প্রেমসূত্রে গাঁথিয়া নিজ গলে ধারণ করেন, সেইহেতু লীলারসে এত মাধুর্য।

এইরূপ ভক্তদের লইয়া 'লীলার বাজার' জমিয়া উঠিয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ, সোমবার সকালবেলা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল প্রভৃতি বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কখনও আস্তে আস্তে ইসারা করিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মৃদু হাসিতেছেন, বলিতেছেন, "বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেলো। এলো-গেলো কেউ চিনলে না।" ঠাকুর ও অপর সকলে ঈষৎ হাস্য

১ পুঁথি, পৃঃ ৩০৯
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৬-৯৭
৩ পুঁথি, পৃঃ ৩০৯

করিলেন। এইবার অবতারের গুপ্তভাবে আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেমন রাজা সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঢ্যাঁরা পিটে নগর দেখ্‌তে বেরোন, আবার যখন ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ দেখ্‌বার জন্য বেরোন এবং যেই প্রজারা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাকে—'ইনিই রাজা—ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন' অমনি সেখান হতে পালান, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জান্‌বি।"[১]

নরলীলায় অবতারের সঙ্গে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের পরিচয় কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যারা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ ক'রে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন।"[২] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গীদের কাহাকেও ঈশ্বরকোটী নিত্যসিদ্ধ, কাহাকেও অখণ্ডের ঋষি, কাহাকেও বিভিন্ন দেবদেবীর অংশে জাত, এইরূপ বলিয়াছেন। যেমন, নরেন্দ্র সপ্তর্ষির নরনারায়ণ ঋষি, রাখালচন্দ্র ব্রজমণ্ডলের কৃষ্ণসখা, নিরঞ্জনের জন্ম রামচন্দ্রের অংশে, বাবুরামের শ্রীরাধিকার অংশে; যোগীন অর্জুনের অবতার, শরৎ ও শশী ঋষি কৃষ্ণের দলভুক্ত; 'শ্রীম'কে দেখা গিয়াছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে ইত্যাদি। আবার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও কলা, অংশ, আবেশ ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের অবতার ভিন্ন অপর কেহ নহে, ইহা সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন পুঁথিকার—

অন্তরঙ্গ পারিষদ অবতারশ্রেণী।
এইবারে প্রভুদেব নিজে খোদে তিনি॥
মহালীলা শ্রীপ্রভুর লীলার প্রধান।
ভক্তবেশে অবতারদলে আগুয়ান॥
ঈশ্বরকোটীর ভক্ত যতগুলি সনে।
এক এক অবতার দেখা যায় গুণে॥

১ স্বামী সারদানন্দ: ভারতে শক্তিপূজা, ৯ম সং, পৃঃ ৩৬;
২ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী: স্বামি-শিষ্য সংবাদ, উত্তর কাণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৫১

রামকৃষ্ণসাগরের খণ্ডাংশ প্রত্যেকে।
কেবল নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের থাকে॥

*   *   *

কোন্ ভক্ত কেবা আর কার অবতার।
আবেশে প্রত্যক্ষ সব হইত তাঁহার॥[১]

শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে পার্ষদগণ বিভিন্ন দেবদেবী বা প্রাগাবির্ভূত কোন অবতারপুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গো ছিলেন, এই অলৌকিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ বর্তমান অবতারলীলায় কিঞ্চিৎ অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন,[২] "রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ঈশ্বরাবতারগণের কথায় পুরাণসমূহ বলেন যে, এইসকল দেবমানব নিজ নিজ মতানুবর্ত্তিদের লইয়া যেন বিশেষ বিশেষ ভাবসমন্বিত এক একটি ধর্মপরিবার সৃষ্টি করিয়া যান। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তদের লইয়া গঠিত সম্প্রদায়, বুদ্ধ কিংবা যীশু ও তাঁহার মতানুবর্তিদের লইয়া গঠিত সম্প্রদায় হইতে একটি পৃথক এবং বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সমস্ত ধর্মপরিবারের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করিলে উহার প্রবর্তক কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি দেবমানবের সহিত একীভূত হইয়া যাইবেন; এবং সেই বিশিষ্টরূপ হইতেই ঐ ব্যক্তি কালে অরূপ-সত্তা উপলব্ধি করিবেন। বর্তমান যুগের দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক আদর্শসমূহ সর্বতোভাবে একীভূত করিয়া যেন একটি সর্বভাবসমন্বিত বিশিষ্ট ধর্মপরিবার প্রবর্তিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণের বিশিষ্ট ভাব-সমন্বিত সূক্ষ্মশরীর প্রত্যক্ষ করিয়া কে কোন দল হইতে আসিয়াছেন তাহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবলোকের বা দ্বৈতপ্রপঞ্চের বহু ঊর্ধ্বে যে সব মুষ্টিমেয় পুরুষ অখণ্ড সত্তায় মিলিতপ্রায় হইয়া আছেন, তাঁহাদের অন্যতমরূপে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শ্রীকৃষ্ণের সখারূপে দেখিয়াছিলেন। অন্য সকলের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। এইসকল ব্যক্তি (শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ), যাহারা পূর্বে বিভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন,

১ পুঁথি, পৃঃ ৫৭৭-৭৮

২ স্বামী সারদানন্দজী কর্তৃক ১৫'৫।১৯২৫ তারিখে Mrs. Cook কে লিখিত পত্রের অংশ, ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র সঙ্কলিত ও দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "স্বামী সারদানন্দ", ১৯৩৬, পৃঃ ২৫৫-৫৬-তে উদ্ধৃত।

তাঁহারা বর্তমান দেবমানবকে গ্রহণ করিয়া এই উচ্চতর আদর্শ বা রূপ লাভ করিয়াছেন। ঐ রূপ হইতে তাঁহারা অরূপ-সত্তায় উপনীত হইবেন।”

বিভিন্ন গোষ্ঠী হইতে সমাগত আধিকারিক পুরুষদের লইয়া গঠিত হইয়াছে এক ‘অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়’—শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের এই বৈশিষ্ট্য ধর্মেতিহাসে অতুলনীয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই অনুপম গোষ্ঠী সম্বন্ধে শ্রীমকে বলিতেন, “এখানে সব আস্‌ছে—যেন কল্‌মির দল—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হরিশ-টরিশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ—তা কি আলাদা বাসা হবে?”[১] কলমিদলের প্রত্যেকটি কলমিলতা রসময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে প্রেমরস সংগ্রহ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেমে গ্রথিত করিয়াছে। এই প্রেমরস সম্বন্ধের যে লীলাতত্ত্ব রসিকের পরমভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন পরিবারে গৃহকর্তার সহিত অপর সকলের সাধারণ আত্মীয়তার অতিরিক্ত সম্বন্ধ থাকে; যেমন তিনি কাহারও স্বামী, কাহারও ভাই, কাহারও পিতৃব্য ইত্যাদি। সেইরকম অবতার-গোষ্ঠীতে, অবতারের সহিত তাঁহার পরিকরদের সাধারণ ভক্ত-দাস সম্পর্ক ছাড়াও প্রত্যেকের সহিত তাঁহার একটি বিশেষ ভাবের সম্বন্ধ থাকে এবং তদনুযায়ী তাঁহার সহিত ব্যবহারাদি পৃথক হইয়া থাকে। আবার গোষ্ঠীর অপর সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহাও অবতার পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান-মান অনুযায়ী।

এই সম্পর্কের রেশ ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে আচার-ব্যবহার, ভাবের আদান-প্রদান। ব্যবহারিক জগতে পরস্পরের আচার আচরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ উর্মিমালার অন্তরালে সদাসর্বদা যে গম্ভীর প্রশান্ত রামকৃষ্ণ প্রেমসাগর তাহাই বিশেষ লক্ষণীয়। রামকৃষ্ণ লীলোদ্যানে অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ‘রাখালরাজের’ সহিত অপর সকলে যে মনোহর লীলাখেলা খেলিয়াছেন তাহার একটা সামগ্রিক চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দুই অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকোটি পার্ষদ—স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহারা যথাক্রমে স্বামীজী ও মহারাজ

১ কথামৃত ৪।৮।২

আখ্যায় সুপরিচিত। লৌকিক সম্বন্ধে তাঁহারা এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের পরম আত্মীয়তার স্থত্রে চির-গ্রথিত হইয়াছিলেন। বয়সে স্বামীজী মাত্র নয় দিনের বড়। কলিকাতার সিমলাপল্লীতে তাঁহাদের কৈশোর অতিবাহিত হয়। এক কুস্তির আখড়ায় আলাপ-পরিচয় হয়, ক্রমে সখ্যতার বন্ধনে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। দুজনেই সুস্থ সবল দেহ, আশৈশব ভগবদ্‌ভাবে আকৃষ্ট, ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, কিন্তু সহজাত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহারা ছিলেন অনেকাংশে ভিন্নমুখী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া খাপখোলা তলোয়ার নরেন্দ্রনাথ যেন জ্ঞান-কৃপাণ লইয়া খেলিয়াছেন, এদিকে স্বভাবকোমল রাখালচন্দ্র ভক্তির রজঃ লইয়া মাতিয়াছেন। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় স্বামীজীর ভাস্বর-শক্তি অন্যায় অশুচি নাশ করিয়া জগতে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে, অপরপক্ষে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রমার ন্যায় মহারাজের অনাবিল প্রেমধারা সংসারবাসীর হৃদয়ে শান্তিসুধা সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্‌ভিমুখীন করিয়াছে। স্থূলদৃষ্টিতে ভিন্নধর্মী মনে হইলেও তাঁহারা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক।

রামকৃষ্ণাবতারলীলায় তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজস্ব ভূমিকা নিখুঁতভাবে পালন করিয়াছেন, 'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্রমাত্র' ভাব অবলম্বন করিয়া দুইজনেই যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকল্পনা রূপায়ণে তনু-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তথাপি এই সকল সুসংহত প্রচেষ্টার মধ্যে দুই মহাজনই তাঁহাদের স্বকীয়তার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন জীবন-লীলার ঘাটে-বাটে। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যরাজি ঊর্মিমালার ন্যায় অবতার-লীলা-সাগরের সামগ্রিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

তাঁহারা পরস্পরের উচ্চ গুণগ্রামের সত্যিকারের সমঝদার ছিলেন। স্বামীজীর মহিমা খ্যাপন করিয়া মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ হয়েছেন, তাঁর কথা ঠাকুরের কথা বলে জানবি। ঠাকুর এত বড় ছিলেন যে সাধারণ মানুষের মন দিয়ে তাঁকে বুঝা শক্ত।- স্বামীজী সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সর্বসাধারণের সামনে তাঁকে ধরে গেছেন।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারা প্রচারে স্বামীজীই সর্বজনস্বীকৃত নেতা। প্রচার-আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন স্বামীজী, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তাঁহার গুরুভ্রাতৃবৃন্দ।

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৮৬

অপরপক্ষে মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, "রাজার spirituality (আধ্যাত্মিকতা) আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাঁকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন, তাঁর কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—সত্যিই আমাদের রাজা।"[১] লাটু মহারাজের স্মৃতিকথায় জানিতে পারি, তিনি বলিতেছেন, "তাইতো বিবেকানন্দ ভাই বলেছিলো, আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।"

তাঁহাদের মধ্যে যে অপার্থিব প্রেমসম্বন্ধ তাহা সাংসারিক রীতিনীতির মানদণ্ডে বুঝা যাইত না। অবতারবরিষ্ঠের ধর্মস্থাপনকার্যে তাঁহারা একজন অপরের উপর নির্ভর করিতেন। পরিকল্পনা উদ্ভাবনে সাধারণতঃ মহারাজ স্বামীজীর মুখাপেক্ষী হইতেন। অপরদিকে স্বামীজী গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে মহারাজের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। অনেক সময় মহারাজের অভিমত প্রায় নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন। প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামীজীর ইচ্ছা-পূরণ করিবার জন্য মহারাজ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। শুধুমাত্র স্বামীজী নহেন, তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত মহারাজের নিকট-আত্মীয়ের সম্পর্ক সদা-সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। স্বামীজীর পিতৃবিয়োগের পর আত্মীয়স্বজন সুযোগ বুঝিয়া পরিবারটিকে ভিটাত্যাগ করাইতে চাহিয়াছিল, সেই দুর্দিনে মহারাজ নিজে লোকজন সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দখল রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার জননী ও ভ্রাতাদের নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের দায়িত্ব মহারাজ নিজস্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য গুরুভ্রাতা রাখালচন্দ্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন ও যাহাতে তাঁহার নেতৃত্বের ভূমিকা সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করে সেবিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন, অপরপক্ষে মহারাজ নায়ক স্বামীজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সর্বদা বিশ্বস্ত সহচরের ন্যায় সাহায্য করিয়াছেন, স্বামীজীর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারে অগ্রসর

১ স্বামীজী বলিতেছেন, "অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের জানবি। আমি এদের ঐভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মতো spirituality আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা।"

(স্বামি-শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড, পৃঃ ২৪৮)

হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও গভীর বিশ্বাস যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মসংঘ সংগঠনের কার্যে মহারাজের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপন কার্যের প্রসারে স্বামীজীর উপদেশ নির্দেশ অনুযায়ী মহারাজ পরিচালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাজ যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হইতেছে না ভাবিয়া স্বামীজী সময় সময় অধৈর্য হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার আবেগ উচ্ছ্বাস সমস্ত কিছু ঢালিয়া দিতেন মহারাজের উপর। স্বামীজী একটি চিঠিতে মহারাজকে লিখিয়াছেন, "আমার রূঢ়তার জন্য মন খারাপ করো না। মুখে যাই থাকুক—তুমি তো আমার হৃদয় জানো।" মহারাজও জানিতেন, স্বামীজীর অন্তরের ভাব! সেইজন্য স্বামীজীর আবেগ, ক্ষোভ বা রূঢ় আচরণ গায়ে মাখিতেন না। দুরন্ত ঝঞ্ঝাবাত্যার মত স্বামীজীর কর্মচাঞ্চল্যের অন্তরালে যে গভীর প্রেম ছিল, মহারাজের সহিত যে নিগূঢ় সম্বন্ধ চিরবিদ্যমান ছিল তাহা স্বামীজীর লিখিত একটী পত্র হইতে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "গুরুদেবের কাজ এগোচ্ছে না—এই দুঃখ। তাঁর কাজ কিছুই আমার দ্বারা হ'ল না—এই আপসোস! তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি—আমি মহা নরাধম! আজ তাঁর (ঠাকুরের) জন্মদিনে তোমাদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও—আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।"[১] স্বামীজী বলিতেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমি জানি, রাজা আমাকে কখনও ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগাল সহ্য করে থাকে সে একমাত্র রাজা।"

দীর্ঘকাল অমানুষিক পরিশ্রমে স্বামীজীর সবল সুঠাম দেহ একবার যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বহু চেষ্টাতেও তাহা কখনও সারিয়া উঠে নাই। তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য মহারাজ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া, কখনও নিজহাতে সেবা শুশ্রূষা করিয়া, কখনও দার্জিলিং আলমোড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া এবং তাঁহাকে কর্মসংগঠনের চিন্তাভাবনা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া সুস্থদেহে আনন্দিত মনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী সামান্য সুস্থবোধ করিলেই পুনরায় কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন এবং অল্পদিনের মধ্যে শয্যাগ্রহণ

১ সানফ্রানসিসকো হইতে ১২।৩।১৯০০ তারিখে লিখিত পত্র।

করিতেন। তবুও তাঁহাকে সুস্থ রাখিতে মহারাজের চেষ্টার বিরাম ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহস্রদলপদ্ম নরেন্দ্রনাথ ছিলেন মহারাজের প্রাণের প্রাণ, স্বামীজীর সুখে তিনি সুখ বোধ করিতেন।

তাঁহাদের এই গভীর প্রেম-সম্পর্কের জন্যই দুই মহাপুরুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে কোন ভুল বোঝাবুঝি হইলে প্রেমঘনমূর্তি স্বামীজীর তর্জনগর্জনের পরেই প্রচুর প্রেমবর্ষণ হইত যাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়জমিতে স্নিগ্ধ শ্যামলিমার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা স্মরণ করিয়া ভক্তগণ আজও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেন। দুই একটী ঘটনার আলোচনা করা যাইতে পারে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড়মঠের বারান্দায় বসিয়া একদিন স্মৃতিচারণ করিতেছিলেন।[১] তিনি বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজী···মহারাজকে···খুবই ভালবাসতেন, খুব মান্যও করতেন। ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এইভাব। তা বলে কারো একটু দোষ বা ত্রুটি দেখলে তা সইতে পারতেন না। যে রাখাল মহারাজকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসতেন, তাঁকেই একবার এমন গালমন্দ করলেন যে মহারাজতো একেবারে কেঁদে আকুল। অবশ্য সে ব্যাপারে পুরোপুরি দোষ ছিল আমারই। আমায় বাঁচাতে গিয়ে মহারাজ নিজের উপর দোষটা টেনে নিলেন। তখন গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাটের কাজ চলেছে। স্বামিজী আমায় বলেছিলেন—পেসন, সামনে একটা ঘাট হওয়া খুব দরকার এবং সে-সঙ্গে গঙ্গার ধারে পোস্তাও খানিকটা বাঁধতে হবে। তুই একটা প্ল্যান করে খরচের একটা আন্দাজ আমায় দিবি তো! আমি একটা প্ল্যান করে কত খরচ পড়বে তারও একটা হিসাব দেখালাম। স্বামিজীর ভয়ে আমি খরচ কম ধরে তাঁকে প্ল্যানটা দেখিয়ে বললাম—এই হাজার তিনেক টাকা হলেই বোধ হয় সব হয়ে যাবে। স্বামিজীও তাতে ভারি খুশী। তখনই মহারাজকে ডেকে বলেছেন—কি বল, রাজা! এই সামনেটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে বেশ হয়। পেসন তো বলছে, তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বলতো কাজ আরম্ভ হতে পারে। মহারাজও বললেন—তা তিন হাজার টাকায় হয়তো এ টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

"কাজ তো আরম্ভ হল। আমিই কাজকর্ম দেখাশুনা করছি। হিসাবপত্র সব মহারাজ রাখছেন আর টাকাকড়ির জোগাড়ও করতেন তিনিই। কাজ যত

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯২-১৯৬

এগুচ্ছে—স্বামিজীরও তত আনন্দ। মাঝে মাঝে হিসাবপত্র দেখে—টাকা পয়সা আছে কিনা খোঁজ খবর করেন। এদিকে কাজ যত এগুতে লাগল ততই দেখা গেল যে, তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হবে না। আমি বেগতিক দেখে মহারাজকে গিয়ে বললাম—দেখুন, স্বামিজীকে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম যে তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু একাজ শেষ করতে খরচ হবে ঢের বেশী। এখন উপায় কি বলুন!" মহারাজ নেহাৎ ভালমানুষ ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তাঁর খুব দয়া হল। তিনি সাহস দিয়ে বললেন, তার আর কি করা যাবে? কাজে হাত যখন দেওয়া হয়েছে, তখন যে করেই হোক শেষ করতেই হবে। তুমি তার জন্য ভেবো না, যাতে কাজ ভাল হয় তাই কর। আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে যে, এক সময় স্বামিজীর গালাগাল খেতেই হবে। এমনি সময় স্বামিজী একদিন কাজের খরচপত্রের হিসাব দেখতে চাইলেন। মহারাজ হিসাব খুবই সুন্দরভাবে রাখতেন। হিসাব দেখতে গিয়ে যখন দেখলেন যে তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ শেষ হতে ঢের বাকী তখন তিনি মহারাজের উপর খুব একচোট নিলেন। মহারাজ একটি কথাও বললেন না, চুপ করে সব সয়ে গেলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর ভারি দুঃখ হয়েছিল। স্বামিজী চলে যেতেই তিনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে নিজের ঘরে এসে একটু পরেই স্বামিজীর মনে হল যে, রাজাকে এতটা গালমন্দ করা ঠিক হয়নি।...আমি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম যে, আমার জন্যই তো মহারাজকে এতটা মনঃকষ্ট পেতে হল! স্বামিজী হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, দেখ তো পেসন, রাজা কি করছে? আমি মহারাজের ঘরের কাছে গিয়ে দেখি যে দরজা জানালা সব বন্ধ। দু'-একবার মহারাজ মহারাজ বলে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামিজীর কাছে এসে তাই বলতেই তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুই তো ভারি বোকা! তোকে বললাম দেখতে যে, রাজা কি করছে আর তুই কিনা এসে বলছিস, তাঁর ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ! দেখ শিগ্‌গির, রাজা কি করছে। আমি আবার এসে ডেকে সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেখি যে মহারাজ বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, মহারাজ, আজ আপনি আমার

জন্যই এত কষ্ট পেলেন। মহারাজ তখনও কাঁদছিলেন। তিনি আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, দেখ তো হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বল তো? অথচ তিনি কখন কখন এমন কড়া কথা বলেন যে, তা আর সওয়া যায় না। এক এক সময় মনে হয় যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথাও পাহাড়ে চলে যাই!

"আরও দু'চার কথার পর স্বামিজীর কাছে ফিরে এসে বললাম যে, মহারাজ শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। শুনেই স্বামিজী একেবারে পাগলের মতন ছুটে মহারাজের ঘরে গেলেন। আমিও গিয়েছি পেছনে পেছনে। দেখি যে স্বামিজী মহারাজের ঘরে গিয়েই মহারাজকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর, ভাই। আমি রাগের মাথায় কী অন্যায়ই না করেছি, তোমায় গালাগাল দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, ভাই। মহারাজ ততক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়েছেন। কিন্তু স্বামিজীকে অমনধারা কাঁদতে দেখে তিনি তো অবাক। কি যে করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শেষটায় বললেন, তুমি অমন করছ কেন? গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? আমায় ভালবাস বলেই তো এসব বলেছ! স্বামিজী তখনও মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আর বারবার বলছেন, আমায় ক্ষমা কর, ভাই। ঠাকুর তোমায় কত আদর করতেন, তিনি কখনও তোমায় একটা কড়া কথা বলেন নি। আর আমি কি না ছাই কাজের জন্য গালাগাল করেছি, তোমার মনে এমন কষ্ট দিয়েছি! আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই! চলে যাই হিমালয়ে, সেখানে গিয়ে নির্জনে কোথাও থাকব।

"মহারাজ তখন বলিলেন—সে কি কথা স্বামিজী, তোমার গালাগাল তো আমাদের আশীর্বাদ। কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকব?"

"এইভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে দুজনে শান্ত হলেন। সেদিনকার দৃশ্য জীবনে আর ভুলতে পারব না। স্বামিজীকে অমন অধীর হয়ে কাঁদতে আর কখনও দেখিনি। তাঁদের পরস্পরের প্রতি কী টান, কী ভালবাসা!"

অপর একটী ঘটনা। ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে সেই সময় স্বামিজী ও মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন। বহুমূত্ররোগে পীড়িত স্বামিজীর অধিকাংশ রাত্রেই ঘুম হইত না। একদিন দিনের বেলা নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় স্বামিজীর বাল্যকালের এক পুরাতন দাসী আসিয়া উপস্থিত, নরেনের সঙ্গে দেখা

করিবে। স্বামিজী নিদ্রিত জানিয়া সে চলিয়া গেল। স্বামিজী ঘুম হইতে উঠিলে মহারাজ তাঁহাকে ঝির সংবাদ দিলেন। স্বামিজী ভাবিলেন, তাঁহার জননী বোধ হয় বিশেষ কোন কারণে ঝিকে পাঠাইয়াছিলেন, 'রাজা' অযথা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে! তিনি মহারাজকে কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিলেন ও একখানি গাড়ী আনাইয়া জননীর নিকট চলিয়া গেলেন। জননীর নিকট জানিলেন যে, তিনি ঝিকে পাঠান নাই। ঝিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাইল, 'আমি বাগবাজার চিৎপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ভাবলাম একবার নরেনকে দেখে আসি। রাখাল আমাকে বল্লে তুমি ঘুমুচ্ছ, তাই ফিরে চলে এলুম।' এই সকল শুনিয়া স্বামিজীর চক্ষে জল আসিয়া গেল; তিনি জননীকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার নাম করিয়া রাখালকে গাড়ী পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ উপস্থিত হইলে স্বামিজী অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'রাজা বড় অন্যায় করেছি, তোকে শুধু শুধু গালাগাল দিয়েছি। কেবল তুই বলেই আমি ওরকম কটু কথা বলতে পেরেছি।' মহারাজ হাসিয়া উড়াইয়া দিলে স্বামিজীর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি শান্ত হইলেন।

এলাহাবাদে আশ্রম প্রাঙ্গণে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পুরান দিনের আর একটা কাহিনী বলিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি রাখাল মহারাজের আওতাতে থাকতাম বলে স্বামিজীর বকুনি বড় বেশী খাইনি। একবার স্বামিজী বলছেন যে, এক হিসাবে বলতে গেলে ভারতের অধঃপতন ঋষিমুনিদের জন্যই হয়েছে। আমি আর কি বুঝি! আমি মনে করলাম—স্বামিজী মুনিঋষিদের নিন্দা করছেন। এই মনে করে তার প্রতিবাদ করে বললাম—না মশাই, আপনি ঋষিমুনিদের সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন। দেখলাম, স্বামিজীর মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। রাখাল মহারাজ সেখানে পায়চারী করছিলেন। তাঁকে বললেন—'রাজা, দেখ পেসন বলে যে, আমি কিছুই জানিনে, বুঝিনে।' রাখাল মহারাজ তাতে উত্তর দিলেন—'তুমিও যেমন! পেসনের কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? ও তো ছেলেমানুষ ও কি বোঝে', অমনি স্বামিজী ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন—একেবারে বালকের মতন! রাখাল বলেছে, পেসন ছেলেমানুষ—ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে, ব্যস্ তাতেই সব মিটে গেল।"[১]

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৪১

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে[১] পাওয়া যায় একটী ঘটনা। ইহাতে দেখা যাইবে সন্ন্যাসী সংঘ কিরূপ প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, গুরুভাইদের মধ্যে প্রেমের টান কত গভীরই ছিল। মঠে নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, ভোর চারটায় উঠিয়া সবাইকে ধ্যান করিতে হইবে। বাবুরাম মহারাজকে লইয়া একদিন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। লাটু মহারাজ বলিয়াছেন : "একদিন ত বাবুরামভাই ঠিক সময় মত উঠতে পারলে না। স্বামিজী সে খবর পেয়ে একজনকে বললে—'যা, তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।' সে তাই করলো, বাকী তাতেও বাবুরামভাই উঠলো না। তখন স্বামিজী নিজে গিয়ে তাকে তুলে দিলো। চা খাবার সময় স্বামিজী বাবুরামভাইকে বললো—'দেখ! তোরা হচ্ছিস মঠের চালক, তোদের বেশী কোরে নিয়ম মানতে হবে। নিয়ম করে তোরা যদি সে নিয়ম না মানিস, তাহলে অপরে তোদের নিয়ম মানবে না। নিজে মেনে অপরকে শেখাতে হয়।' স্বামিজীর মুখে এই কথা শুনে বাবুরামভাই নিজে থেকে বললে—'আজ উঠতে পারি নি, আমার জন্য সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি; তা' তুমি ভাই এর জন্য একটি নিয়ম কর—যে উঠতে পারবে না তার শাস্তি হবে।' বাবুরামভায়ের কথা শুনে স্বামিজী গম্ভীর হয়ে বললে—'তোকে আমি শাস্তি দেবো, একথা তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম!' স্বামিজীর চোখে জল দেখে বাবুরামভাইও কাঁদতে লাগলো। রাজার কাছে এ খবর গেলো, রাজা ত ভেবেই অস্থির। সেখানে এসে বললে—'তোমাদের এত কান্নাকাটি কেন? সেদিন ত নিয়ম হয়েছে—ঘণ্টা বাজলে যে বিছানা থেকে উঠবে না, তাকে সেদিন মঠে খেতে দেওয়া হবে না—মাধুকরী কোরে খেতে হবে।' একথা শুনে বাবুরামভাই ভারী খুশী, বললে—'রাজা ঠিক কথা বলেছে। আমি আজ মাধুকরী করবো।' দেখো তো ওদের মধ্যে কেমন ভালবাসা ছিলো—একজন নিয়ম ভাঙ্গলে বলে শাস্তি চাইলে, আর একজনের সেই কথা শুনে চোখে জল এলো। শেষে আর একজন শাস্তি দিলো, তাতে যে নিয়ম ভেঙ্গেছিলো, সে খুশী হোলো। এমনি ভালবাসা না থাকলে কি একটা মঠ চলে?"

স্বামিজী ও মহারাজের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা তাহা পাতান ভালবাসা নয়, একই প্রেমসূত্রে উভয়েরই সত্তায় সুগ্রথিত। দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, পৃঃ ৩৫৬-৫৭

প্রসঙ্গান্তরে যাইব। অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনান্তে স্বামিজী খুবই অসুস্থ হইয়া শিষ্য সদানন্দের সহিত মঠে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার রুগ্ন শরীরের অবস্থা দেখিয়া মহারাজ গভীর উদ্বিগ্ন হইলেন। সারাদিনে স্বামিজীর অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, চিন্তিত মহারাজ ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবু ও অন্যান্য ভক্তেরা বিকালবেলা মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে স্বামিজী মন্থর গতিতে নীচের তলায় বারান্দায় নামিয়া আসিলেন। চমকিত গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এ কি স্বামিজী, তুমি নীচে নেমে এলে যে! শুনলুম, তোমার বড় অসুখ!" স্বামিজী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "কি করি বল? শুয়ে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দেখি রাজা প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। তার মুখখানার সেইভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না—আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি বেড়াচ্ছি দেখে রাজার মুখে যদি হাসি বেরোয়।" ইহা শুনিয়া গিরিশবাবু মন্তব্য করিলেন, "রাজার মুখ ভার হবে না তো আর কার হবে!" ইতিমধ্যে মহারাজ সেইস্থানে ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইলেন ও ব্যগ্রভাবে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি উঠে এলে যে! শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?" স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "রাজা শালা আমাকে রোগী করে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি? যা, আমি এখন বেশ ভাল আছি।" মহারাজের মুখে হাসি ফুটিল। কয়েকদিনের সেবা-যত্নে স্বামিজী পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে যে সকল হাস্য পরিহাস, কৌতুক, প্রেমকলহ হইত তাহাও কতই না মাধুর্যমণ্ডিত। স্বামীজীকে লেখা মহারাজের চিঠি লুপ্তপ্রায়, তাহার কারণ স্বামীজী অপরের চিঠিপত্র গুছাইয়া রাখিতেন না। মহারাজ স্বামীজীর অধিকাংশ চিঠি সযত্নে রাখিয়াছিলেন। দেখা যায়, স্বামীজী একটা চিঠিতে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "তুমি ত রাজা হে, তোমার মন্ত্রিবর্গ হচ্ছে ন্যাংটা পোঁদো চার বৎসরের বাগবাজারের ছেলেগুলো, আমার তোমা অপেক্ষাও যত কাপুরুষ দল।" স্বামীজীর জীবজন্তু প্রতিপালনের সখ ছিল। তিনি মঠে গরু, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস, হরিণ, লালমাছ ইত্যাদি পালন করিতেন। ইহারা ছিল তাঁহার অবসর বিনোদনের সঙ্গী। স্বামীজী আদর করিয়া তাহাদের বিচিত্র নামকরণ করিয়াছিলেন, যেমন কুকুরের নাম ছিল বাঘা, ছাগলের নাম হংসী ইত্যাদি। অপরপক্ষে মহারাজের সখ ছিল ফল-ফুলের ও শাকসব্জীর বাগান। স্বামীজীর আদরপুষ্ট গরু, ছাগল, হাঁস

কখন কখনও মহারাজের গোলাপফুলের বাগানে সব্জীর বাগানে ঢুকিয়া উৎপাত করিত। সমস্যা সমাধানের জন্য জীবজন্তুদের চরিবার মাঠ ও বাগানের মধ্যে একটী সীমারেখা টানিয়া স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে একটী রফা হইল। এই চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া স্বামীজীর পালিত কোন জন্তু মহারাজের বাগানে অনুপ্রবেশ করিলে মহারাজ প্রবল আপত্তি তুলিতেন, স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে বালকের মত প্রেমকলহ লাগিয়া যাইত। দুই মহাপুরুষের বালকবৎ আচরণ দেখিয়া মঠবাসিগণ অননুভূত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

পরবর্তীকালে মহারাজ পুরীতে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর সবই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই চৈতন্যময় পুরুষের কাছে সব সময় ঘেঁষা যেত না। আবার এক এক সময় কত নিকটের মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রেমের খেই আমরা পেতাম না।"

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকোটী পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দকে ভাবচক্ষে দেখিয়াছিলেন, "দেবীমূর্তি, গলায় হার, সখী সঙ্গে।" মহারাজ তাঁহার চাইতে বয়সে কিছু বড় প্রেমানন্দজীকে 'বাবুরামদা' ডাকিতেন। প্রেমানন্দজী তাঁহাকে ডাকিতেন 'মহারাজ' এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে যে গাঢ় প্রেমের বিলাস প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সত্যই দুর্লভ।

ভগবদবতারের নিত্যসঙ্গী এই দুইজন পার্ষদের অন্তঃকরণে চির সমুদ্ভাসিত প্রেমাভক্তি এবং তাহাদের পরস্পরের প্রেমসম্বন্ধের মধ্যে প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণই শোভা পাইয়াছেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণভারতে প্রচারকার্যে প্রেরিত হইলে প্রেমানন্দজী মঠের ম্যানেজারের কর্মভার গ্রহণ করেন। রসিকচূড়ামণি মহারাজ একটী কৌতুকপ্রদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেমানন্দজীর জন্মোৎসব পালন করিলেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে উহার বর্ণনা লিখিয়া পাঠাইলেন। "এখানে তোমার post-এ যিনি permanent হইয়াছেন তিনি ঠাকুরসেবা বেশ সুচারুরূপে চালাইতেছেন। তবে তাঁহার শরীরটা একটু delicate। সেইজন্য তোমার মত energetically হয় না। গতকল্য নতুন মোহন্তের জন্মতিথি উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। চেলির কাপড় পরিধান করাইয়া ও velvet serge এর গায়ের কাপড় গায়ে দিয়া নানা ব্যঞ্জন সমন্বিত বৃহৎ কদলিপত্রে স্তূপাকারে স্থাপিত অন্নের

সম্মুখে অতি বৃহৎ পশমী আসনে উপবিষ্ট করান হইয়াছিল। সম্মুখে ধূপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্নাহার করিতে বসিবামাত্র শঙ্খধ্বনি করা হইয়াছিল। আহার করিবার সময় খোল করতাল লইয়া সংকীর্তন করা হইয়াছিল। এই সমারোহের description পাঠ করিয়া তোমার বিশেষ আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই।"[১]

স্বামিজীর মহাসমাধির পর হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহারাজের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রকট হইয়া ধর্মসংস্থাপন কার্য করিতেছেন, ইহাই ছিল প্রেমানন্দজীর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ভক্তসাধারণের নিকট বলিতেন, "মহারাজ বৃন্দাবনের রাখাল বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ঠাকুরের লীলাভিনয়ে তাঁর পালা গাইতে মহারাজ অবতীর্ণ হয়েছেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় মহারাজ! বহুজন্মের তপস্যার ফলে কেউ মহারাজের মত মহাপুরুষের কৃপালাভ করে।"[২]

মহারাজের উপস্থিতিতে মঠ-জীবনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সবাই যেন ঝিমাইয়া পড়িত। নবীন প্রাচীন সকলেই সাগ্রহে মঠে মহারাজের উপস্থিতি প্রার্থনা করিত। প্রেমানন্দজী মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছেন, "মহারাজের শরীর কেমন আছে? তিনি কি আমাদের ভুলে গেলেন! শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মোৎসব আগতপ্রায়। মহারাজ না থাকিলে যে কার্যে উৎসাহ হয় না। তাঁর শুভাগমন যে একান্ত প্রার্থনীয়, সকলেই মহারাজ কবে আসিবে জানিতে উৎসুক।"[৩] আবার অন্য একটি পত্রে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, "দেখ, রাখাল ভায়া মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে শুনলে আমার ভিতরটা যেন ফাঁক হ'য়ে খালি খালি বোধ হয়।"[৪]

কখনও কখনও মান-অভিমান, ভুল-বোঝাবুঝির অনুপ্রবেশের ফলে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের লীলা সরস হইয়া উঠিত। একবার অনেকদিন গত হয়, মহারাজ বেলুড় মঠে আসেন নাই। সাধুদের মধ্যে কথা উঠিল, মহারাজ বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়া মঠে আসিতেছেন না। গভীর-চরিত্র মহারাজের আচরণের রহস্যভেদ করা দুঃসাধ্য ছিল। সারদানন্দজীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেমানন্দজী

১ আলমবাজার মঠ হইতে ৩।১২।১৮৯৭ তাং লিখিত।

২ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

৩ মহারাজ তখন রামকৃষ্ণানন্দজীর আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রেমানন্দজী বেলুড় মঠ হইতে ১২।২।১৯০৯ তারিখে লিখিয়াছেন।

৪ বেলুড় মঠ হইতে ২৭।৪।১৯১৬ তাং লিখিত।

স্থির করিলেন যে, তিনি নিজে বারাণসীতে মহারাজের নিকট যাইবেন। যাত্রা করিবার পূর্বে মঠের নবাগত ব্রহ্মচারীগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "তোরা তো আমাকে ভালবাসিস্, মহারাজকে দেখলে আর আমাকে তোদের ভাল লাগবে না।" তাহারা বলিল, "সে কি মহারাজ?" তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যারে সত্যি বলছি। ঠাকুরের মানসপুত্র তিনি, ঠাকুর তাঁর এই বালগোপালের ভিতর দিয়েই এখন কাজ করছেন!" ৺শ্যামাপূজার পূর্বেই প্রেমানন্দজী বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ৺শ্যামাপূজার পর মহারাজ সদলবলে বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বেকার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দজীও তাঁহাদের সঙ্গ লইলেন। সেখান হইতে প্রেমানন্দজী মহানন্দে মহারাজকে সঙ্গে লইয়া মঠে পৌছাইলেন। মহারাজের উপস্থিতিতে বেলুড় মঠ উৎসব-মুখর হইয়া উঠিল। মহারাজের শুভাগমনে মঠের দিনগুলির চেহারা কিরূপ পরিবর্তিত হইত তাহা বর্ণনা করিয়া প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "মহারাজ এখানে আসিয়া ভাল আছেন।……মঠে এখন খুব ভিড়, লোকে লোকারণ্য। উপরে নীচে জায়গা নাই। নিত্য উৎসব চলেছে।"[১]

রাধাপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমানন্দজীর সহিত মহারাজের অলৌকিক প্রেম-সম্বন্ধ। মাধুর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। একদিন মহারাজ মঠে চায়ের টেবিলে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ প্রেমানন্দজী একগাছি ফুলের মালা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। "মহারাজ, দেখ কেমন সুন্দর মালাটি" বলিতেই মহারাজ সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই অবসরে তিনি মহারাজের গলায় মালাটি পরাইয়া দিলেন। দুইজন দুইজনের মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। দুইজনেরই বদনমণ্ডল প্রেমানন্দে ঢলঢল, দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ আনন্দদ্যুতি। কি মনোহর সেই দৃশ্য! কিছু সময় পরে তাঁহারা উভয়েই যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ আসাম ও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। ভক্তিপ্রধান পূর্ববঙ্গের ভক্তদের নিকট প্রেমময় প্রেমানন্দজীকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের ভার যেন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রেমানন্দজীও পূর্ববঙ্গবাসীদের নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, অক্লান্তভাবে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত ভ্রমণকালে দুই গুরুভ্রাতার পরস্পরের

১ বেলুড় মঠ হইতে ১৭।১২।১৯১৫ তাং লিখিত।

সান্নিধ্যে সময় সময় যে দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি হইত তাহার উজ্জ্বল স্মৃতি বহু ঘটনার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা হইতে একটি দৃশ্য উপস্থাপিত করা যাইতেছে। "মহারাজ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের বাড়ী দর্শন করিতে পদব্রজে গমন করিলেন। খোল করতাল লইয়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অনেক ভক্ত তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিলে স্বামী প্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া গাত্র হইতে জামা উন্মোচন করিয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিলেন। ভক্তেরা খোল করতালসহ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজ একস্থানে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, 'নাগ মহাশয় শুদ্ধা, অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ মূর্তি ছিলেন', সেই সময়ে ভাবোন্মত্ত প্রেমানন্দ তাঁহার নিকটে আসিয়া অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে 'মহারাজ, এদের একটু কৃপা'—এই বলিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া কীর্তনের স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় কীর্তন চলিতেছিল—'হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে' ইত্যাদি। যখন 'গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাওরে' পদটা গীত হইতেছিল তখন মহারাজ হুঙ্কার দিয়া ভাবের ঘোরে কীর্তন মণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতে গিয়াও নৃত্য করিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমেই তিনি গভীর ভাবসমাধিতে একেবারে মগ্ন হইলেন। মহারাজের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দুই হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, শরীর কঠিন কাষ্ঠবৎ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, সকলের হৃদয়ে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ বহিল। তাহারা মুগ্ধভাবে মহারাজের এই অপার্থিব দিব্যভাবের অবস্থা অপলক নেত্রে ও ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে দেখিতে লাগিল। মহারাজের ভাব সম্বরণ হইলে পর তথায় বাতাসা প্রভৃতি আনিয়া হরিলুট দেওয়া হইল।"

ময়মনসিংহে ভক্ত জিতেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহারা অবস্থান করিতেছিলেন। জিতেনবাবু প্রেমানন্দজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র। মহারাজ একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বাবুরামদা, কিছু হিকমত দেখাও যাতে জিতেন এই শরীরেই ঠাকুরকে লাভ করতে পারে।' এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে স্বামীজী অদ্ভুতানন্দজীর সম্মুখে প্রেমানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবুরাম! চেলাটেলা করিস নি। শেষে চেলায় চেলায় ঝগড়া হয়ে কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। এখন থেকে রাজাই সকলকে দীক্ষা দেবে, আমরা আর কাউকে দীক্ষা দেবো না।"[১] পূর্ববঙ্গ হইতে

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬১

বেলুড়মঠে ফিরিয়া প্রেমানন্দজী একটি পত্রে[১] লিখিলেন, "পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলার ধূম দেখিয়া আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি।"

রসিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ সুযোগ পাইলেই হাসির রস পরিবেশন করিতেন। প্রেমানন্দজী প্রায়ই 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিতেন। একদিন মহারাজের সামনে তিনি 'হরিবোল' বলিয়া উঠিলেন। উহা শুনিয়া মহারাজ ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নদের চাঁদ এলো কোত্থেকে?"[২] হাসির ছটাতে চারিদিক মুখর হইল।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ তাঁহার স্মৃতিকথায় একটা সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক যুবক সাধুসঙ্গলাভের জন্য ছুটিতে বেলুড়মঠে বাস করিতেছিল। প্রেমানন্দজীর পূত সাহচর্যে যুবক তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগত হইয়াছিল। ছুটি ফুরাইল, তাহার বাড়ীতে যাইবার দিন উপস্থিত হইল। যুবক মহারাজের নিকট বিদায় লইতে গেল। তখন মহারাজ মঠবাড়ীর পূর্বদিকের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাবুরাম মহারাজের কাছে বিদায় নিয়েছ?" অতঃপর সে প্রেমানন্দজীর নিকট যাইতেছে জানিয়া রসিকপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, 'শোন, যখন বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করবে, সঙ্গে এই মন্ত্রটা বলবে।' মহারাজ মুখে মুখে একটা প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়া দিলেন। তাহার সারকথা, 'ঘরে ফিরিতে মোর মন নাহি চায়, প্রাণের আকুতি শরণ লইনু চরণে তোমার'। কোন্ ভঙ্গীতে বলিতে হইবে, কি ভাবে প্রণাম করিতে হইবে সে বিষয়েও বিস্তারিত নির্দেশ দিলেন। যুবক প্রেমানন্দজীর অনুসন্ধানে গেলে স্মৃতিকথাকার তাহার অনুসরণ করিল। যুবক প্রেমানন্দজীর সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইল, কিন্তু সহসা কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সদ্য শেখা মন্ত্র মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িল। প্রেমানন্দজী যুবকের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, বিড়বিড় করে কি বলছিস? মুখ ফুটে বল।' যুবক নির্বাক, এদিকে হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্মৃতিকথাকার হাসিয়া উঠে। তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমানন্দজী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, যুবকের মুখেও হাসি ফুটিল।[৩]

১ ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ২৯।২।১৯১৬ তারিখে লেখা।
২ স্বামী অনুভবানন্দের ডায়েরী হইতে।
৩ The Eternal Companion Brahmananda, p. 78-80.

"লীলার বাজারে এক প্রেম বেচা-কেনা"[১]—বিভিন্ন প্রেমের হাটে এই দুই প্রেম-ব্যাপারীর নিকট হইতে ভগবদ্-প্রেম সংগ্রহ করিয়া কত সহস্র নরনারী যে মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

* * * *

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বা শশী মহারাজ ঋষি কৃষ্ণ অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের সহিত মর্তধামে লীলা করিয়াছিলেন, ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত। বরাহনগর মঠের প্রাণ সেবানিষ্ঠ রামকৃষ্ণানন্দজী সর্বদাই মহারাজকে ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার প্রতিও মহারাজের অনুজের প্রতি জ্যেষ্ঠের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা পরিলক্ষিত হইত।

কর্তব্য ও দায়িত্বের নির্দেশপূর্ণ চিঠিপত্রের মধ্যেও তাঁহার প্রতি মহারাজের প্রীতি উপছাইয়া পড়িত। মহারাজ প্রীতিভাজন রামকৃষ্ণানন্দজীকে বিবিধ সরস সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন, যেমন-"ভাই শশী" "My dear Mohantaji," "My dear old Mohanta of the Alambazar Math," "My dear Mohantaji Maharaj of Madras" ইত্যাদি।

মহারাজ দক্ষিণদেশের কর্মকেন্দ্রসকল ও প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার যোগ্য সম্বর্ধনা ও সেবাযত্নের জন্য সোৎসাহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিলেন। মঠবাড়ীতে যে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন সেইটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়া উহা সাজাইলেন এবং তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহারাজ আসিয়া এই ঘরটি ব্যবহার করিবেন স্থির হইল। মহারাজের সম্বর্ধনার প্রস্তুতি চলিতেছিল। সেই সময়ে একদিন তিনি মঠবাসীদের ডাকিয়া বলিলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান—এইটি সর্বদা মনে রেখো। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তাঁর কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন তা ঈশ্বরের প্রেরণায়। আমরা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্রজ্ঞানে ভক্তি করি। ঠাকুর তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনও কখনও এক মশারির ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোন ছিন্নবস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে

---

১ পুথি, পৃঃ ৪৪৭।

ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই?' ঠাকুরের জন্য কেউ ফল-মিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও—আমি তার মুখে খাই। ওকে খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ান হবে।'[১]

মহারাজকে আনিবার জন্য তিনি পুরী যাইয়া কয়েকদিন সেখানে অবস্থান-পূর্বক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া মান্দ্রাজ রওনা হইলেন। এই সময় পুরীতে থাকাকালীন ২১শে অক্টোবর রামকৃষ্ণানন্দজী পরমানন্দকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের মন শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের মনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। আহা, তাঁহার কি সুন্দর ভাব! কি অনির্বচনীয় মহত্ত্ব! তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি তাঁহার স্নেহপাত্র।...... শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গ অনেক ভাগ্যে লাভ হয়। আমি দেবদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।" ধীর প্রশান্ত ও বালসুলভ সরলতা-মণ্ডিত, আবার অতল সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর ভাবের সমন্বয় মহারাজের মধ্যে দেখিয়া দক্ষিণদেশবাসী বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে চিনিতে, বুঝিতে বা ধরিতে না পারিলেও কি এক দুর্বার টানে ধনী-নির্ধন উচ্চ-নীচ সকলে তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিল। মহারাজকে ঠাকুর 'বর্ণচোরা আম' বলিতেন। তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না, এই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া রামকৃষ্ণানন্দজী এক চিঠি লিখিলেন। ইহার উত্তরে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ১২।১২।১৯০৮ তারিখে লিখিলেন, "আমার ধারণা যে ভাগ্যবান রাখালকে চিনিবে সে সেইদিনই মহারাজের (অর্থাৎ শ্রীঠাকুরের) কৃপাপ্রাপ্ত হইবে—তাঁহার মানুষজন্ম সফল হইবে। ভাগ্যধর ব্যক্তি ব্যতীত রাখালকে বা মহারাজের[২] আশ্রিত অপর কোন মহাপুরুষকে চিনিতে কে পারিবে?"

শশী মহারাজ দক্ষিণদেশে ঠাকুরের ভাব কি ভাবে দ্রুত সম্প্রসারণ হইতেছে তাহা জানাইলেন। এই সুযোগে মহারাজের পূত আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া আশ্রমের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি মঙ্গলকার্য সমাধা করা হইল এবং ইহা দ্বারা শ্রীঠাকুরেরই আশীর্বাদ লাভ হইল জ্ঞান করিয়া শশী মহারাজ আনন্দ করিতে

১ Days in an Indian Monastery, pp. 146 47
২ গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'মহারাজ' বলিয়াছেন।

লাগিলেন। মহারাজের ইচ্ছানুসারে শশী মহারাজ অতি যত্নের সহিত মহারাজকে কয়েকটী প্রধান তীর্থস্থানে লইয়া গেলেন। সর্বদা ভাবে তন্ময় মহারাজের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে তিনি নিজে লক্ষ্য রাখিতেন।

মান্দ্রাজে মহারাজ আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমাতাঠাকুরানী শশীমহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল এইখানে আছে আমি শুনিয়া বড়ই খুশী হইলাম। রাখালকে লইয়া তোমরা আনন্দ কর, রাখাল আমার দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক এবং তোমরাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, তাহা হইলেই আমার আনন্দ।"

মান্দ্রাজে থাকাকালীন প্রতিদিন আরাত্রিকের পর শশী মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিতেন। জনৈক ভক্ত একদিন ঠাকুরের জন্য কিছু ফল ও ফুল আনিলে রামকৃষ্ণানন্দজী উহা মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটাকে পরে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়াই ঠাকুর উহা গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন নিম্নবর্ণের জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ ভক্ত মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাইল তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য। 'ভক্তের কোন জাত নাই' ইহা জাতিপ্রথা উৎপীড়িত দক্ষিণদেশীয়দের নিকট প্রমাণ করিবার জন্যই যেন মহারাজ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৃহস্থ ভক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সাধুদের পরিচর্যা করিলেন; বহু আমন্ত্রিত ব্যক্তি সানন্দে ভোজন করিলেন। ভোজন-শেষে মহারাজ আসন ত্যাগ করিলে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট হইতে রামকৃষ্ণানন্দজী কিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন, অপর সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁহার অনুসরণ করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গদের মধ্যে সম্পর্কের মাধুর্য প্রকট হইয়া উঠে অনেক ছোট-খাট ঘটনার মাধ্যমে। মহারাজ মান্দ্রাজ থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দের 'Inspired Talks' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যাপারে মহারাজ উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, পত্রিকায় সমালোচনার জন্য প্রথমত মান্দ্রাজে 'হিন্দু' পত্রিকাতে একটী বই পাঠাইতে, এই পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশ হইবার পর সেই সমালোচনাসহ আরেকটী বই 'বোম্বাই ক্রনিকেলে' সমালোচনার জন্য পাঠাইতে। রামকৃষ্ণানন্দজী জোর দিয়া বলিলেন যে দুইটী পত্রিকাতেই একসঙ্গে সমালোচনা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল, হঠাৎ মহারাজ চুপ করিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন, "তা বটে, তুমি এই মঠের মোহান্ত, এই সব তোমারই দেখার

কথা। আমি দেখছি এ বিষয়ে মাথা ঘামান আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।" রামকৃষ্ণানন্দজী ঘটনার এই পরিণতিতে মর্মাহত হইলেন, কিন্তু যখন দুই দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন মহারাজ মঠের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অত্যধিক উদাসীন হইয়া গিয়াছেন এবং যখন জানিলেন যে মহারাজ পুরী ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সকালবেলা মহারাজকে প্রণাম করিয়া নতজানু হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তুমি যদি আমাকে আশীর্বাদ না কর, কে করবে? তোমার কৃপা ভিন্ন আমার কিছু মূল্য আছে? ইচ্ছা মাত্রে তুমি হাজারো শশী সৃষ্টি করতে পার। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না?" মহারাজ স্বস্থ হইলেন, তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং শশী মহারাজও স্বস্তি বোধ করিলেন। বিনয়ী শ্রদ্ধা-সম্পন্ন গুরুভ্রাতাকে মহারাজ আলিঙ্গন দান করিয়া তাঁহার সকল দুঃখ অপনোদন করিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাজ মান্দ্রাজ হইতে পুরীধামে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দক্ষিণদেশ ভ্রমণপ্রসঙ্গে মহারাজ ভক্তদের বলিলেন, "শশীর কাছে ছিলাম, কি সুখেই দিন কেটেছে। শশীর মত ঠাকুরের ভাব এমন করে কেউ নিতে পারে নি। দক্ষিণে বেড়াতে সে আমার জন্য এক হাজার টাকা খরচ করলে।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পুরীধামে মহারাজের নিকট কয়েকদিন বাস করিয়া বেলুড়মঠে গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা দুর্গাপূজার পূর্বেই মান্দ্রাজে ফিরিবেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ৩০শে অক্টোবর মহারাজ তাঁহাকে একটী চিঠিতে লিখেন, "এ পুরীধাম হইতে চলিয়া গেলে; তাহাতে প্রকৃত বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তোমার অনুপস্থিতিতে তথায় (মান্দ্রাজে) ক্ষতি হইবে। এখন দেখিতেছি বাবুরাম দাদার প্রতি গাঢ় প্রেমবশতঃ হউক অথবা অতি যত্নের দরুণ হউক তোমার কার্য ইত্যাদি সব ভুলিয়া-টুলিয়া বেশ কয়েকদিন সাধুসঙ্গে কাটাইতেছ।" ইহার পূর্বে ১৪ই অক্টোবর তাঁহাকেই লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুত বাবুরাম দাদা তোমাকে যত্ন করিতেছেন জানিয়া পরম আনন্দিত হইলাম।"[১]

---

১ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মহারাজ, প্রেমানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর মধ্যে যে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তাহার মধ্যে রঙ্গরসের অনুপ্রবেশ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিত। একবার পুরীতে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ আছেন। ১১।৫।১৯০৭ তারিখে মহারাজ

পরম নিষ্ঠাবান কর্মবীর গুরুভ্রাতার প্রতি মহারাজেরও ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ প্রেম। মহারাজ একজন নবাগত সাধুকে বলিয়াছিলেন, "শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বৎসর কাটাও, তাহলে সাধু জীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।"

অবিরত কঠোর পরিশ্রমের ফলে রামকৃষ্ণানন্দজী কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, মহারাজ পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। অবিলম্বে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিতে রামকৃষ্ণানন্দজীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হইলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া মহারাজ পুরী হইতে খুরদা রোড ষ্টেশনে গেলেন এবং মধ্যরাত্রে মান্দ্রাজমেল উপস্থিত হইলে পীড়িত শশী মহারাজের সঙ্গে দেখা করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিলেন, "শশী এসব কি? অসুখ-বিসুখ সব ঝেড়ে ফেলে দেও।" রামকৃষ্ণানন্দজী উত্তর করেন, "রাজা তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামকৃষ্ণানন্দজীও পুনরায় অনুরূপ উত্তর করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে চিকিৎসার যথাবিধি উপদেশ দিয়া ও তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিদায় লইলেন। ইহাই তাঁহাদের মর্ত্যধামে শেষ সাক্ষাৎ। আগষ্ট মাসে রামকৃষ্ণানন্দজীর মহাসমাধির দুঃসংবাদ আসিলে মহারাজ বিষাদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "একটী দিক্‌পাল চলে গেল, দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" পরবর্তীকালে মহারাজ যখন মান্দ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলেন সেইসময় একদিন বলিয়াছিলেন, "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মত এদেশে জ্বলজ্বল করছে।"

* * * *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে স্বামী সারদানন্দকে ঋষি কৃষ্ণের অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের দলে দেখিয়াছিলেন। সংঘনায়ক মহারাজকে সম্মুখে রাখিয়া সারথি সারদানন্দজী সবল হস্তে দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণসংঘ-রথ চালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সংঘাধ্যক্ষের দক্ষিণ হস্ত।

বয়সের হিসাবে শরৎ মহারাজ মহারাজ অপেক্ষা তিন বছরের ছোট। তিনি

শশী মহারাজকে লিখিলেন: "চার পাঁচ দিন হইল পুরীতে আসিয়াছি। এক্ষণে আমি স্বামী প্রেমানন্দের অতিথি।......প্রেমানন্দ অনুরোধ করিতেছেন এখানে কিছু আম পাঠাইবার জন্য তোমাকে লিখিতে।" (ইংরেজী হইতে অনূদিত)

মহারাজকে শুধু জ্যেষ্ঠগুরুভ্রাতা বা ঠাকুরের মানসপুত্র জ্ঞান করিতেন না, মহারাজের মধ্যে তিনি দেখিতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতীক বিগ্রহ। দৈনন্দিন জীবনের যে কোন ঘটনা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে শরৎ মহারাজ সর্ববিষয়ে এই ভাবটী কিরূপে ধরিয়া রহিয়াছিলেন। মহারাজ তখন বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন। জনৈক যুবা সন্ন্যাসী কোন একটী জটিল বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য শরৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে শরৎ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "বলরাম মন্দিরে যাও ও মহারাজকে জিজ্ঞাসা করো। মহারাজের কথাই ঠাকুরের কথা। মহারাজ আমাদের যা কিছু বলেন আমরা মনে ভাবি যে সে সব ঠাকুরের নিকট হতেই আসছে, ঠাকুর ও তাঁর মানস-সন্তান এক, কোন প্রভেদ নাই।"

সারদানন্দজী দেখিতে পাইতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাতাঠাকুরানী অপ্রকট হইবার পর মহারাজের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। অপূর্ব এক ঘটনা—শ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর মহারাজ একদিন 'উদ্বোধনে' বেড়াইতে আসিলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ, মায়ের অসুখের সময় একদিন মা মুড়ি ও ছোলাভাজা খেতে বসেছিলেন, সে সংবাদ পেয়ে আমি এসে মার কাছ থেকে উহা ভিক্ষা করেছিলাম। মাকে মুড়ি ও ছোলাভাজা খেতে দেই নাই। আজ তোমাকে খাইয়ে মাকে মুড়ি ও ছোলাভাজা খাওয়াতে ইচ্ছা হয়েছে।' তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মহারাজ সহাস্য বদনে বলিলেন, 'নিয়ে এস, আজ মুড়ি ও ছোলাভাজা খাব।'

মহারাজ আনন্দ করিয়া মুড়ি ছোলাভাজা খাইতে বসিয়াছেন। শরৎ মহারাজ বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সজল নয়নে মহারাজের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। মহারাজের খাওয়া শেষ হইলে শরৎ মহারাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ শিষ্যসেবকদের অনেকবার বলিয়াছেন, 'মহারাজের মধ্যে ঠাকুর, মা রয়েছেন। মহারাজের সেবা ঠাকুর ও মার সেবা বলে বিশ্বাস করবে।'[১]

অপরদিকে শান্ত ধীর স্থির সারদানন্দজীকে নিকটে পাইলে মহারাজ নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন। মহারাজ দীর্ঘকাল টাইফয়েড রোগে ভুগিবার পর হইতে সম্প্রসারণশীল সঙ্ঘের কাজকর্মের সরাসরি দায়িত্ব শরৎ মহারাজের হাতে তুলিয়া

১ স্বামী সারদানন্দ—যেমন দেখিয়াছি, পৃঃ ২৬২-৬৩

দিয়াছিলেন। কর্মকোলাহলে মহারাজ বিব্রত বোধ করিলে শরৎ মহারাজ তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মহারাজও ইহাতে নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ যাহা কিছু করিতেন তাহা মহারাজের অনুমোদন লইয়া করিতেন অথবা মহারাজের আপত্তি হইবে না নিশ্চিত জানিয়া তবেই করিতেন। নতুবা মঠ মিশনের ছোট বড় প্রত্যেকটা কাজে যেখানেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইয়াছে সেখানেই শরৎ মহারাজ মহারাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। নতুন বাড়ীর প্ল্যান এসটিমেট হোক্, কোন কর্মী বা সাধুর ব্যক্তি-জীবনের সমস্যাই হোক্ সর্ববিষয়ে তিনি মহারাজের অভিমতের অপেক্ষা করিতেন। মাথার উপরে ঠাকুরের প্রতিনিধি মহারাজ রহিয়াছেন—এই ভাবটী লইয়া শরৎ মহারাজ কাজ করিতেন। যে কোন বিষয়ে মহারাজের ইচ্ছা বা অভিমতই ছিল শরৎ মহারাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।[১] এইরূপ ঘটনাও বিরল নহে যে মঠের ট্রাস্টিগণের সভায় সকলে মিলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, হঠাৎ শরৎ মহারাজের খেয়াল হইল যে মহারাজ কোন অভিমত দেন নাই। শরৎ মহারাজের প্রার্থনায় মহারাজ তাঁহার অভিমত জানাইলে হয়তো দেখা গেলো উহা পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত, তবুও শরৎ মহারাজের নির্দেশে পূব সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া মহারাজের অভিমতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। ইহাও দেখা গিয়াছে, ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহারাজের অভিমত সর্বদাই কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। শরৎ মহারাজ সাধুব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "যখন আমি কোন কথা বলব তা তোমরা বরং যাচাই করে নিও, কিন্তু মহারাজের কথা ঠাকুরের আদেশ বলে নির্বিকারে মেনে নেবে।"

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় এই মহাশক্তিধর পুরুষ আবার দৈনন্দিন জীবনে শরৎ মহারাজের উপর কতটা নির্ভরশীল হইতেন। মহারাজ একবার দীর্ঘকাল টাইফয়েড জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। মহারাজ আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই স্নান করিতে চাহিতেন না বা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইতে রাজী হইতেন

১ অন্যতম উদাহরণস্বরূপ মহারাজকে লেখা সারদানন্দজীর ১২।১২।১৯০৮ তারিখের পত্রাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন: "জানিনা ঐরূপ করাই তোমার অভিপ্রায় কি না। তুমি যেরূপ বলিবে, এক্ষেত্রে আমি নিজ বুদ্ধি বিবেচনা না খাটাইয়া তাহাই করিয়া দিতে চাহি। কারণ এতিদিন বুদ্ধি খাটাইয়া কিছুমাত্র ফল পাই নাই। অতএব পত্রোত্তর শীঘ্র দিবে এবং ঐ বিষয়ে যাহা করিতে হয় জানাইবে।"

না। শরৎ মহারাজও তখন বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন। এই কালের অভিজ্ঞতার কথা শরৎ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "মহারাজের পেটের চামড়ার ভাঁজে ঘামে পচিয়া ঘা হইয়াছে, দুর্গন্ধ। কিছুতেই মহারাজ স্নানের নাম করেন না। একদিন দুই বালতী জল না এনে মহারাজকে বুঝিয়ে ত নিয়ে এলাম। জল দেখেই মহারাজ বলে উঠলেন—তুমি বুঝছ না শরৎ, স্নান করলেই আবার জ্বর হবে। কত বুঝালাম—শেষে কিন্তু হাতে ধরে নিয়ে আসতে হল। সেই চামড়ার ভাঁজে কত সন্তর্পনে সাবানজল দিয়ে ধুইয়ে দিলাম—তখন মহারাজ খুব খুশী। এই ভাবে একদিন অন্তর স্নান চলাতে মহারাজের ঘা সেরে গেল। কিন্তু গঙ্গার ধারে যেতে বল্লে বলেন, 'শরৎ বুঝছ না, গাড়ীতে উঠতে গেলেই heart fail করবে'। 'বেশত উঠেই দেখ না কেমন heart fail করে' বলে যখন হাত ধরে এনে গাড়ীতে বসালাম তখনও মহারাজ বলছেন, 'শরৎ বুঝছ না, গাড়ী চলতে আরম্ভ করলেই heart fail করবে!' এইভাবে শরৎ মহারাজের অক্লান্ত চেষ্টায় মহারাজ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই বালসুলভ ভীতি মহারাজের আচার-ব্যবহারে এমন সুন্দর মানাইত যে ইহা স্নায়ুদৌর্বল্য বলিয়া কেহ মনে করিত না। মুরুব্বি কেহ হাত ধরিলেই বালক যেমন ভরসা পায়, শরৎ মহারাজের উপর নির্ভর করিয়া মহারাজের সেই ভাবটী ফুটিয়া উঠিত।

শরৎ মহারাজের এক সেবক মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যদীক্ষা প্রার্থনা করে। কৌতুকপ্রিয় মহারাজ প্রার্থীকে জানাইলেন স্বামী সারদানন্দ বড়লোক, তাঁহার সেবককে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য পারিশ্রমিক চাই ১০৮৲ টাকা। হতাশ সেবক শরৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সব কিছু নিবেদন করিলেন। নিরভিমান শরৎ মহারাজ একটী পত্রে লিখিলেন, "পূজনীয় মহারাজ, আমি আপনার, উদ্বোধনের যা কিছু সবই আপনার। আপনি যাহা চাইবেন তাহা তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইবে।"[১] বলা বাহুল্য সেবকের আবেদন মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না এবং কোন অর্থেরও প্রয়োজন হইল না।

মহারাজের মর্তলীলা সম্বরণের পর রেঙ্গুণ প্রত্যাগত জনৈক সন্ন্যাসী শরৎ মহারাজকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের বাকী অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে শরৎ মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঠাকুরের শরীর যাবার পর

১ স্বামী অশেষানন্দের স্মৃতিকথা।

মাকে আশ্রয় করেছিলুম, মায়ের অন্তর্ধানে মহারাজকে ধরেছিলুম, এখন মহারাজ চলে যাওয়াতে আমার ডান হাত পড়ে গেছে। আর কিছু লেখা সম্ভব নয়।"

আনুগত্যের প্রতিমূর্তি শরৎ মহারাজের সহিত প্রশান্ত গম্ভীর মহারাজের সম্পর্ক ছিল অনবদ্য, অপর সকলের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

* * * *

মঠ হইতে মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিতেছেন, "মহাসাধু শ্রীশ্রীহরি মহারাজ এখন এখানে আছেন।" কঠোর বৈদান্তিক তুরীয়ানন্দজী মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় মানসপুত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধার জ্ঞান করিতেন। তুরীয়ানন্দজী তখন কাশীধামে। মহারাজের একজন সেবক কাশীধামে আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ-দর্শন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। তুরীয়ানন্দজী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি মহারাজকে ফেলে বিশ্বনাথ-দর্শন করতে এসেছ? সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ছেড়ে বিশ্বনাথ-দর্শন?" তিনি এত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন যে সেবকটী ভয়ে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেলেন। তুরীয়ানন্দজী নিজমুখে বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার নিজস্ব এক অভিজ্ঞতা। মহারাজ চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তুরীয়ানন্দজী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনি হঠাৎ দেখিলেন মহারাজের স্থানে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যতই নিকটবর্তী হইলেন, ততই তাঁহার দর্শন স্পষ্টতর বোধ হইল। অতঃপর তিনি মহারাজের সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।[১] অপবদিকে মহারাজ তুরীয়ানন্দজীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও গভীরভাবে ভালবাসিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আদেশ কবিয়াছিলেন ত্যাগবীর তুরীয়ানন্দের সঙ্গ করিবার জন্য। বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন ও তপস্যা করিবার সময় তাঁহারা দুইজন প্রায় ছয় বৎসর পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করিয়াছিলেন। জহুরী জহর চেনে। মহামানব মহৎ হৃদয়ের সমাদর বোঝেন, উভয়ে উভয়ের গুণানুকীর্তন করিয়া আনন্দ বোধ করিতেন।

ঠাকুরের মানসপুত্র তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সকলের শুধু প্রিয়তম ছিলেন বলিলে যথেষ্ট বলা হইল না, প্রত্যেকেই মহারাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন। ছোট একটা ঘটনা, কিন্তু কতই না অন্তরস্পর্শী! মহারাজ ও তুরীয়ানন্দজী পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। দুপুরবেলা একদিন আহারের পর মহারাজ একটী গাছের গোড়ায় যাইয়া মুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় তুরীয়ানন্দজী

১ Swami Ashokananda : Swami Brahmananda, p. 32-33.

ছুটিয়া আসিয়া মহারাজের মাথায় একটা ছাতা ধরিলেন ও সেবককে বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না, মহারাজের মাথায় রোদ্দুর লাগছে?" তাহার দিকে তাকাইয়া আবার মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আপনি কেন ধরছেন, ছাতাটা ওর হাতে দিন, দেখুন দিকিনি, আপনি খালি পায়ে ছুটে এসেছেন, কাঁকড়-টাকর ফুটে একটা কাণ্ড করবেন দেখছি।" তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তপশ্চর্যার পরবর্তীকালে যখনই মহারাজের সহিত তুরীয়ানন্দজীর দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই একটী আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। সর্বদাই লক্ষ্য করা গিয়াছে, মহারাজের সমক্ষে হরি মহারাজ সমস্ত মনটা লইয়া কথাবার্তা বলিতেন বা আচরণ করিতেন। মহারাজের সম্মুখে ভুলেও তিনি অন্যমনস্ক হইতেন না। ইহা ছাড়াও উৎসবাদিতে বা কোন সময়ে মহারাজ আধ্যাত্মিকভাবে বিভোব হইলে হরি মহারাজ তাঁহার শরীরের অসুখ-বিসুখ সব ভুলিয়া সেই আনন্দের ভাগীদার হইবার সুযোগ কখনও ছাড়িতেন না।

চমৎকার একটী ঘটনা। পুরীতে হরি মহারাজ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সারদানন্দজী দুর্গাপদ ডাক্তারকে লইয়া কলিকাতা হইতে আসিলে মহারাজ একটু স্বস্তি বোধ করিলেন। মহারাজ একদিন তুরীয়ানন্দজীর সেবকদের ডাকিয়া শিখাইয়া দিলেন কিভাবে রুগীর পরিচর্যা করিতে হইবে, কখন কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি। মহারাজ বলিলেন, "দেখ হরি মহারাজ চটে গেলে চুপ করে থাকবে, আর বেশী চটে গেলে হাত জোড় করে বলবে, আজ্ঞে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করুন।" এইভাবে সেবকদের নানা যুক্তি-পরামর্শ দিলেন। একদিন সেবক প্রিয়নাথ হরি মহারাজের সামনে চৌকিতে বসিবার সময় বেশ জোরে শব্দ হওয়ায় হরি মহারাজ তাঁহাকে খুব ধমক দিয়া উঠেন। সেবক এইবার মহারাজের শেখান বিদ্যা প্রয়োগ করিল, হাতজোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, হরি মহারাজ শান্ত হইয়া গেলেন। পরদিন অপর একজনকে হরি মহারাজ ইহা উল্লেখ করিলে জানিতে পারিলেন যে, মহারাজ তাহাকে ঐরূপ শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই ফস্ করে বলতে পেরেছে। দেখেছ, মহারাজের কি রকম দূরদর্শিতা, এইরকম অসংখ্য ব্যাপারে দেখেছি।"[১]

১ স্বামী প্রবোধানন্দের স্মৃতিকথা হইতে গৃহীত।

গুরুভাইদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহার তুলনা সংসারে বিরল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। মহারাজ, তুরীয়ানন্দজী ও সারদানন্দজী কাশীতে বাস করিতেছিলেন। একদিন হঠাৎ মহারাজ সারদানন্দজীকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ, ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করি। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি কিরূপ সুস্থ আছেন।" কিছুক্ষণ পরে শরৎ মহারাজ উঠিলেন ও সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মনে মনে বলিলেন, "এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না, হরি মহারাজকে প্রণাম করে আসি।" গরমের দিন বলিয়া হরি মহারাজের ঘরের দরজার পর্দা দেওয়া ছিল। তিনি দুপুরের আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। "কে প্রণাম কচ্ছে?" হরি মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি শরৎ, তুমি এখানে আছ, মহারাজের ইচ্ছা তোমাকে প্রণাম করেন, আমিতো ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পারলুম না।" অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তুত করলে! আমি কি জানিনা তুমি কে?"

* * * *

স্বামী শিবানন্দের বাহিরের গাম্ভীর্য ও আপাতকাঠিন্যের পশ্চাতে ছিল বিরাট দরদী হৃদয়। তাঁহার সহিত মহারাজের সম্পর্ক ছিল অতি মধুর। শিবানন্দজী মহারাজকে ঠাকুরেব সাক্ষাৎ প্রতিনিধিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। বেলুড়মঠে শিবানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন, "মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মনে করবে যে, ঠাকুরেরই আশীর্বাদ পেয়েছ। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তাঁর ভেতর দিয়ে জগৎ পাচ্ছে।"[১] অপরপক্ষে বয়সে বড় শিবানন্দজাকে মহারাজ 'তারকদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সর্বদাই সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ব্যবহারাদি করিতেন। অপর একদিন (২৫শে মাঘ, ১৩৩৮ সাল) তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ খুব দিন, মহারাজের জন্মতিথি। এঁরা হলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। বহুকাল পরে এরকম উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ সংসারে আসেন জগতের হিতের জন্য। সমস্ত পৃথিবী তাঁদের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে যায়।"[২]

ঠাকুরের এই দুই পার্ষদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গুণাগ্রহিতা মিশ্রিত যে প্রেম

১ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৮
২ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৫৬

বিদ্যমান ছিল, তাহা কতভাবেই না প্রকাশ পাইয়াছে। মঠ-মিশনের দ্বিতীয় সংঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ। সংঘ পরিচালনা কালে তিনি বলিতেন, "...মহারাজেরই তো এই মঠ; আমরা আবার কে? এ মঠের জন্য তিনি কত করেছেন, কত খেটেছেন! প্রত্যেক ইটখানিতে মহারাজের স্মৃতি বিজড়িত। তিনিই তো বুকের রক্ত জল করে এসব করেছেন। এখনও তিনি সব করছেন। আমি তো তাঁর চাকর—তাঁর পাদুকা মাথায় করে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন, আমিও তেমনি মহারাজের পাদুকা মাথায় করে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি। আহা, স্বামীজীর কি শ্রদ্ধা ভালবাসাই না ছিল মহারাজের ওপর, ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এই ভাব।"[১]

মহারাজ যখনই তীর্থভ্রমণে বা কর্মকেন্দ্র পরিদর্শনে দূরদেশে যাইতেন, তখনই তিনি শিবানন্দজীকে সাদর আহ্বান জানাইতেন। শিবানন্দজীও প্রীতির আহ্বানে সাড়া দিয়া মহারাজের সঙ্গী হইতেন। পুরী, কাশী, কনখল, দক্ষিণ-দেশে[২] বহু স্থানেই দুইজনকে একত্রে দেখা গিয়াছে। শিবানন্দজীর যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য শিষ্যসেবকদের তিনি সর্বদা সজাগ করিয়া দিতেন।

পরস্পরের সান্নিধ্যে অনেক তাৎপর্যবহ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাদের কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগন্নাথ মহাপ্রভু সম্বন্ধে শিবানন্দজীর দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ পরিবর্তিত হয় সেই কাহিনী তিনি নিজে বলিয়াছেন। "একবার হরি মহারাজের খুব অসুখ, মহারাজও পুরীতে রয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্য আমরা পুরীতে উপস্থিত হলাম। সকলেই জগন্নাথদর্শন করে এলেন; আমার কিন্তু দর্শন করতে যাবার তেমন ইচ্ছা হল না। স্বামিজী অনেক সময় 'দারুমূর্তি, চকানয়না' ইত্যাদি বলে জগন্নাথকে ঠাট্টা করতেন: তাই শুনে আমারও মনে কেমন-যেন-একটা ভাব হয়েছিল। একদিন মহারাজ বলেই ফেল্লেন, 'কই তারকদা আপনি জগন্নাথদর্শন করতে গেলেন না?' আমি মনের ভাব প্রকাশ না করে বল্লাম, 'তা দেখা যাবে

১ স্বামী অপূর্বানন্দ: মহাপুরুষ শিবানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১৯৭

২ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিভ্রমণেও মহারাজের সহিত মহাপুরুষ মহারাজের দাক্ষিণাত্যে যাওয়া স্থির হইয়াছিল। মহাপুরুষ মহারাজ তখন দার্জিলিংএ। ধ্বস নামিয়া রেলপথ অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি কলিকাতায় সময়মত আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই।

এখন।' শেষকালে মহারাজের পীড়াপীড়িতে একদিন যেতেই হল দর্শন করতে। কিন্তু যেই মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথদেবের সামনে দাঁড়ালাম, অমনি এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। এমন একটা গম্ভীরভাব মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, তা আর কি বলব!" এই বলিয়াই তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন, "জগন্নাথ খুব জাগ্রত দেবতা।"[১]

মহাপুরুষজী মহারাজের নির্দেশকে ঠাকুরের নির্দেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। কি আধ্যাত্মিক, কি লৌকিক, ছোটবড় সকল বিষয়েই মহারাজের সিদ্ধান্ত তাঁহার কাছে ছিল চূড়ান্ত। দক্ষিণদেশ হইতে চিঠি লিখিয়া মহারাজ মহাপুরুষজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, মঠের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিবার জন্য। মহাপুরুষ মহারাজ সম্মত হইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঠাকুরের তিথিপূজার পূর্বে মঠে আসিলেন এবং ঐ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবৎসর জুলাই মাসে প্রেমানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর মঠ-বিভাগ তত্ত্বাবধানের পূর্ণ দায়িত্ব মহাপুরুষ মহারাজ বহন করেন।

স্বামীজীর উৎসবের দিন বেলুড়মঠে এক ঘটনা। মঠবাড়ীর নীচের বারান্দায় বেঞ্চির উপর মহারাজ বসিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ মহারাজ বলিলেন, "তারকদা, একটা কাজ করতে হবে। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ছড়ি হাতে স্বামীজীর মন্দির পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতে হবে। কেউ টের পাবে না, বেশ মজা হবে।" মহাপুরুষজী মহারাজকে খুশী করিবার জন্য এই কঠিন প্রস্তাবেও রাজী হইয়া গেলেন। পূর্ব হইতেই সবকিছু আয়োজন করা ছিল; গিলে করা ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, সঙ্গে সোনার বোতাম, পকেট-ঘড়ি এবং হাতে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রবীণ সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজ মঠপ্রাঙ্গণ দিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জানাইলেন যে কেহই চিনিতে পারে নাই। ইহা শুনিয়া ছোট ছেলের মত মহারাজের খুব স্ফূর্তি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ মঠে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজার আয়োজন হইয়াছিল। পূজোপলক্ষ্যে মহারাজ মহাষ্টমীর দিন হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত মঠে বাস করিয়াছিলেন। নবমীর দিন সারদানন্দজীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যারতির পর মাতৃভজনে তিনজনেই যোগদান করিলেন। 'খ্যাপার হাট-বাজার মা, তোদের খ্যাপার হাট-বাজার' গানটি চলিতেছিল, দেখা গেল মহারাজ ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৪০ ফুটনোট।

পরে মহারাজের আদেশ "সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমির তিমির-বরণী" গানটী আরম্ভ হইলে সকলে মাতিয়া উঠিলেন। 'আহা! আহা!' বলিতে বলিতে মহারাজ ভাবের আতিশয্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও মুদিত নয়নে তালে তালে করতাল সহযোগে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপুরুজী ও সারদানন্দজীও উহাতে যোগ দিলেন। একটুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, অপর সাধুব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দও তানপুরা বা অন্য বাদ্যযন্ত্র হাতে লইয়া নাচিতে শুরু করিয়াছে। সমবেত ভাবময় নৃত্যে মনোরম এক পরিবেশ সৃষ্টি হইল। এই সঙ্গীতের আসর সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চলিয়াছিল। মহারাজের সঙ্গে এইরূপ বিভিন্ন পরিবেশে মহাপুরুষজী যোগদান করিয়া মধুময় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দসহ মহাপুরুষজী ঢাকা সহরে গিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ভক্তিভাব, আন্তরিকতা দেখিয়া মহাপুরুষজীর মধ্যে গুরুভাব স্ফুট হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বে তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম হয় নাই। এইবার তিনি সংঘাধ্যক্ষ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা-দানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ উত্তরে লিখিলেন, "খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন, আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" এই পত্র পাইয়া মহাপুরুষজী প্রায় একশত প্রার্থীকে মন্ত্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

'মহারাজ তো আছেন' এই ভাবিয়া মহাপুরুষজীর সর্ববিষয়ে ছিল একটা নিশ্চিন্তভাব। তিনি বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করিয়াছেন, ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উদ্বেগশূন্য হইয়া বরাবর মহারাজের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। মহারাজের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিলে তিনি ঢাকা হইতে চলিয়া আসিলেন ও মহারাজের রোগশয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। চিকিৎসক ও সেবকগণের প্রচেষ্টার বিরাম নাই। মহাপুরুষজী বলরাম মন্দিরে নিত্য বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া শ্রীঠাকুরের নিকট কাতরভাবে মহারাজের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতে থাকিলেন। তাঁহার মহাসমাধির তিনদিন পূর্বে গভীর ধ্যানকালে মহাপুরুষজী তিন তিনবার শ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। কিন্তু প্রতিবারেই শ্রীঠাকুরের গম্ভীর ও মৌন আবির্ভাব এবং মহারাজের রোগমুক্তির প্রার্থনার কোন সাড়া না দিয়া মুখ ঘুরাইয়া অন্তর্ধান হওয়াতে মহাপুরুষজী স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রকে আর মর্ত্যধামে রাখিবেন না। মহারাজ সকল প্রেমবন্ধন ছিন্ন

করিয়া মহাসমাধিযোগে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ১০ই এপ্রিল, ১৯১২। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একপ্রাণ হইয়া বাস করিয়াছিলেন ; এক্ষণে মহারাজের অভাব মহাপুরুষজীর হৃদয়ে গভীর শূন্যতাবোধ আনিয়া দিল। ২৮।৬।২২ তারিখেও দেখা যায় তিনি গুরুভ্রাতা মহারাজের বিরহসন্তাপ সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজের মহাসমাধির পর হইতে আমাদের মন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্যমশূন্য হইয়া রহিয়াছে।"

* * * *

বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গেও মহারাজের ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া একবার ১৯০৬ এবং পরে স্থায়ীভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চলিয়া আসিলে, স্বামী অভেদানন্দের যাহাতে উপযুক্ত আদরযত্ন হয়, তাহার জন্য মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মহারাজ সাধারণতঃ তাঁহাকে 'কালী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

অভেদানন্দ নিউইয়র্কে পৌঁছাইবার কিছুকাল পরে মহারাজের লিখিত একটী চিঠি পাইলেন। তাহার উত্তরে তিনি একটী চিঠি লিখিলেন, সম্বোধন করিলেন 'Rajasaheb'। চিঠিতে লিখিলেন, "বহুকাল পর তোমার পত্র পেয়ে যে কি পর্যন্ত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না"। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। অভেদানন্দজী সংবাদ পাইলেন প্রেমানন্দজী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মর্মাহত অভেদানন্দজী ১৪ই নভেম্বর মহারাজকে লিখিলেন, "তুমি কেবল একমাত্র প্রাণের সখা রহিয়াছ······আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের সৎসঙ্গে এ জীবনের বাকী অংশটা কাটাইতে পারি। প্রচারকার্য খুব করিয়াছি, আর ভাল লাগে না।" এই চিঠির উত্তরে মহারাজ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯১৯ তারিখে লিখিলেন, "পরমস্নেহাস্পদেষু ভাই কালী, বহুকাল পর সেদিন তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।······ আমি তোমাকে পূর্বে অনেকবার কত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা না হইলে ত' কিছু হইবার নহে। যাহা হউক তিনি যে এখন তোমার হৃদয়ে এইরূপ অভিপ্রায় জাগরূক করিয়াছেন ইহাতে যে আমরা কতদুর আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব।······ক্রমশঃ একে একে প্রভুর সন্তান সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। বাবুরাম ভায়া দারুণ ব্যথা দিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন। আমাদের শরীরও সব ভাল নহে।······এখন তুমি সেখানকার সকল

হাঙ্গামা সত্বর মিটাইয়া এখানে চলিয়া আইস, ইহাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছা জানিবে। প্রচারাদি কার্য প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইবার হইয়াছে ; এখন চিরদিনের যিনি, তাঁহাকে লইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া দেওয়া যাউক্। ......যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। তোমার আসা পথ চাহিয়া রহিলাম।"

মহারাজ সম্বন্ধে অভেদানন্দজীকে বহুবারই বলিতে শোনা গিয়াছে, "Love was the dominant theme of his character. As the first President of the Ramakrishna order he enforced no other law but love ; and by that sheer force of love he could dominate over one and all."[১]

আবার তাঁহাদের মধ্যে কত রকমের যে রঙ্গরস চলিত, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একদিন মহারাজের আহারের সময় হঠাৎ কালী মহারাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ কি তুমি করেচ? সবাই কেবল তোমার নাম করবে, তুমি বল্লেই তবে করবে, আর কেউ বল্লে করবে না—তুমি কি এদের slave তৈরী করেছ? কেবল মহারাজ! মহারাজ!!" মহারাজ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমাকে কেউই মানে না। সত্যিকার এরা মানে শ্রদ্ধা করে হরি মহারাজকে। আর কিছু মানে শরৎ মহারাজকে।......আর আমাকে যে মানে বলচ, সেটা আর কিছুর জন্য নয়, এই যে দেখচ, (থালার চারিপাশের বাটিগুলি দেখাইয়া), সবই পড়ে থাকবে, এরই জন্য।" তাঁহার কথায় ও মুখের ভাবে সকলেই হাসিয়া উঠিল। "তোমার সব কথায় ঠাট্টা তামাসা" বলিয়া কালী মহারাজও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।[২]

* * * *

বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা বিজ্ঞানানন্দজীকে মহারাজ গভীর স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন ; তাঁহাকে তাঁহার পূর্বনাম 'হরিপ্রসন্ন' বা 'পেসন' বলিয়া ডাকিতেন। বিজ্ঞানানন্দজী তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সমীহ করিয়া চলিতেন ; আবার পরম প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া সহজ স্বাভাবিক ভাবে মহারাজের সহিত মেলামেশা করিতেন।

বেলুড়মঠে জমি সংগ্রহ হইলে মহারাজের নেতৃত্বাধীনে বিজ্ঞানানন্দজী মঠবাড়ী নির্মাণকার্য, পরে পোস্তা বাঁধান, গঙ্গায় নামিবার সিঁড়ি তৈয়ার ইত্যাদি

১ বিশ্ববাণী, ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

২ সেবক স্বামী মনীষানন্দের স্মৃতিকথা হইতে গৃহীত।

করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর বিজ্ঞানানন্দজী অধিকাংশ সময় এলাহাবাদ রামকৃষ্ণমঠে অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু যখনই মহারাজ আদেশ করিয়াছেন, তখনই তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে যাইয়া গৃহ নির্মাণকার্য তদারকি করিয়াছেন। কাশী সেবাশ্রম, কনখল সেবাশ্রমের প্রথম দিককার বাড়ীঘর বিজ্ঞানন্দজীর তদারকিতে নির্মিত হইয়াছিল। এমন কি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ যখন তাঁহাকে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য মঠে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন তিনি সানন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠ হইতে মহাপুরুষ মহারাজ ৩।৪।২০ তারিখে লিখিয়াছেন, "এলাহাবাদ হইতে হরিপ্রসন্ন মহারাজকে মহারাজ ডাকিয়া আনিয়াছেন। খুব সম্ভব শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি মন্দিরটী এবার নির্মিত হইবে।...... ১০।১৫ দিনের মধ্যে প্রভুর ইচ্ছায় কাজ আরম্ভ হইবে।"

স্বামীজীর সমাধি-মন্দির নির্মাণকালের এক অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানানন্দজী বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন[১], "রাখাল মহারাজের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একবার ইঁটের অভাবে স্বামিজীর মন্দিরের কাজের অসুবিধা হচ্ছিল। মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি পেসন, কাজকর্ম কেমন চলছে? আমি বললাম—ইঁটের জন্য বড় অসুবিধেয় পড়েছি। খবর পাঠান হয়েছে কিন্তু ইঁট এখনও এসে পৌছায়নি। শুনে মহারাজ বললেন—তা আজ রাত্রেই নৌকা এসে যাবে, দেখবে। আমি এমনই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম যে তাঁর ঐ কথা আদৌ বিশ্বাস করিনি। বড় দুর্ভাবনা চলছে। সারারাত না ঘুমিয়ে কিছুক্ষণ পরে পরে বেরিয়ে এসে দেখি, নৌকা এল কিনা। ভেবেছিলাম, নৌকা এলে মাঝিদের বলব যে এখন ঘাটে লাগিও না; ভোর হলে ঘাটে লাগাবে। আমি ভোর চারটা পর্যন্ত দেখে ভাবলাম, এখন আর আসছে না। তাই গিয়ে একটু শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই রাখাল মহারাজ আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন—পেসন, কৈ তোমার নৌকা এল? আমি বললাম, কোথায় নৌকা, মশাই? আপনিও যেমন! তারা আর আসছে! বলাও যা অমনি মহারাজ বললেন—ঐ দেখ, নৌকা এসেছে। এসে দেখি সত্যিই নৌকা ঘাটে লেগেছে।" মহারাজের বিষয়ে আরও অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা তিনি সেইদিন বলিয়াছিলেন।

মহারাজ সম্বন্ধে তাঁহার আর একটী অভিজ্ঞতা গদাধর আশ্রমে বর্ণনা করিয়া-

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৭৯—১৮০

ছিলেন। "স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও খুব শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। একদিন তিনি খুব গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। শরীরটা খুব শক্ত করে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। আমি কাছে বসেছিলাম; দেখি যে, আমার ভিতরও ঐ ভাব এসে যাচ্ছে। স্নায়ুর মধ্যে কেমন যেন টান ধরেছে। এ কি কম শক্তির খেলা? একজনের শক্তি অপরের ভিতর অজ্ঞাতসারে গিয়ে কাজ করে। তিনি যেমন শক্তিমান ছিলেন, আবার তেমনি রসিকও। আমরা দেখেছি—স্বামিজী এবং রাখাল মহারাজ—এ দুটি মহাপুরুষের কি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! জোর করে যেন তাঁদের দিকে টেনে নিচ্ছেন! এঁদের শক্তিপ্রভাবের সীমারেখার ভিতর যারা যাবে তাদের যে অশুভ সংস্কার এবং অজ্ঞানের আবরণ থাকে সে সব আস্তে আস্তে কোথায় যেন চলে যায়! এঁদের ইচ্ছাশক্তিতে জীবের সব অশুভ সংস্কার ক্ষয় হয়।"[১]

মহারাজও জানিতেন তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতার আধ্যাত্মিকতা কত গভীর। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ। বিজ্ঞানানন্দজী কোন কার্যোপলক্ষে মঠে আসিয়াছিলেন। মঠ-বাড়ীর উপরতলায় স্বামিজী ও মহারাজের ঘরের মাঝখানে যে ছোট ঘর সেটিতে থাকিতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত। সেই সময় মহারাজও মঠে বাস করিতেছিলেন। একদিন তিনি জনৈক কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "হরিপ্রসন্ন মহারাজ এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছেন? যান, যান, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে আসুন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভিতর; আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে রয়েছেন। ওঁকে চেনা বড় মুস্কিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।"

মহারাজ গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বিজ্ঞানানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজীকে লইয়াই সবচেয়ে বেশী ফষ্টিনাষ্টি, স্ফূর্তি, আমোদ করিতেন। ঐ বিষয়ে দুইজনেই সর্বদা হুঁসিয়ার থাকিতেন, তবুও প্রায়ই দেখা যাইত তাঁহারা মহারাজের পরিকল্পিত স্ফূর্তির চক্রান্তে পড়িয়া নাস্তানাবুদ হইয়াছেন এবং সকলের আনন্দের কারণ হইয়াছেন।

* * * * *

মহারাজ গুরুভ্রাতাদের সকলের অতি প্রিয় অখণ্ডানন্দজীকে অধিকাংশ সময়ই তাঁহার পিতৃদত্ত নাম গঙ্গাধর বলিয়া ডাকিতেন। অপরপক্ষে অখণ্ডানন্দজী

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১২৯—৩০

ডাকিতেন 'রাখাল মহারাজ' বা শুধু 'মহারাজ'। মহারাজের সহিত তাঁহার এই গুরুভ্রাতাটীর সম্পর্ক সবচেয়ে স্নেহপ্রীতি ও রঙ্গরহস্যপূর্ণ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অখণ্ডানন্দজী মহুলায় সেবাব্রতে নিযুক্ত, কেন্দ্রস্থান হইতে মহারাজ সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। কর্মক্লান্ত অখণ্ডানন্দজী গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজকর্মের বিষয়ে মহারাজের লিখিত পত্রের মধ্যেও যখন My dear Swamin, My dear brother Swami, My dear Khanda Dada, প্রভৃতি সম্বোধন দেখিতেন তখন তাঁহার অন্তর মহারাজের উষ্ণ স্নেহের স্পর্শে উৎসাহিত হইত। আবার কোন চিঠিতে মহারাজ লিখিয়াছেন, "Good morning Dear Brother!" ইহা ছাড়াও পুরী, কোঠার, মান্দ্রাজ, বলরাম মন্দির ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে মহারাজের কৌতুকপূর্ণ চিঠি অখণ্ডানন্দজী পাইতেন। শেষবার মহারাজ যখন বলরাম মন্দিরে যান, তখন সেখান হইতেও তাঁহাকে রহস্যপূর্ণ একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ। শিবনগর অনাথ আশ্রম হইতে অখণ্ডানন্দজী কলিকাতায় আসিয়াছেন, বলরাম ভবনে মহারাজের নিকট আছেন। একদিন এই আশ্রমের অপর সাধুকর্মী সুরেশ্বরানন্দের এক চিঠিতে মহারাজ জানিলেন যে, সেখানকার ভজন একঘেয়ে, তাহার ভাল লাগে না, ইত্যাদি। চিঠি পড়িয়া মহারাজ দুঃখিত হইলেন। বড় হলঘরে মহারাজ এবং তাঁহার সম্মুখে কয়েকজন ভক্তও বসিয়াছিলেন। এমন সময় অখণ্ডানণ্ডজী আসিয়া মহারাজের নিকট বসিলেন। মহারাজ তাঁহাকে চিঠিখানির কথা বলিলেন ও অনুরোধ করিলেন, আশ্রমে যে সকল ভজন হয়, সেগুলি তাঁহাকে শোনাইতে। অখণ্ডানন্দজীও ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গানাম, শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র, মন সম্বন্ধীয় বেদের একটি স্তোত্র, শিখদের ভজন, তেজ-বল-বীর্য প্রার্থনা মন্ত্র,—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হল' গান ইত্যাদি একের পর এক করিয়া পরমাত্মার একটি প্রণাম মন্ত্র বলিয়া শেষ করিলেন। তন্ময় ও ভাবাবিষ্ট হইয়া মহারাজ শুনিতেছিলেন। অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি অখণ্ডানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর ভজন। বলে কিনা একঘেয়ে। দেখ, তোমার ছেলেরা তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ শিখে কি করবে বলতে পারি না, কিন্তু দুবেলা যদি এই ভজন করে, তবে তারা তরে যাবে, তরে যাবে।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। ঘটনাক্রমে পুরীধামে মহারাজ, শিবানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, রামকৃষ্ণানন্দজী, অভেদানন্দজী ও প্রেমানন্দজী মিলিত হইয়াছেন। ছয় গুরু-ভ্রাতার মিলনে মহা আনন্দের পরিবেশ রচিত হইল। এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ একদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর দর্শনলাভ করেন এবং গৃহে ফিরিয়া মহারাজকে উহা জানান। মহারাজ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মায়ের কৃপায় তোমার আশ্রমে অভাব অনটন হবে না।" মহারাজের মুখে এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়া তাঁহার গভীর বিশ্বাস হইল। ফলতঃ ইহা আক্ষরিকভাবে সত্যও হইয়াছিল।

একবার গঙ্গাধর মহারাজ উড়িষ্যার কোঠারে আসিয়াছেন মহারাজের সাদর আহ্বানে। কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া তিনি সারগাছি ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন ও যাত্রার দিন স্থির করিলেন। মহারাজ অনেক অনুরোধ করিয়াও অখণ্ডানন্দজীর যাইবার দিন পরিবর্তন করাইতে পারিলেন না। নির্দিষ্ট দিনে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি রাত্রিতে আহারের পর পালকিতে চাপিলেন; মাইল দশেক পালকিতে যাইয়া স্টেশনে ট্রেন ধরিতে হইবে। কিছুদূর যাইয়াই গঙ্গাধর মহারাজ ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে পাল্কির বাহকেরা মহারাজের পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে কিছুদূর ঘুরিয়া কোঠারের কাছারী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। অখণ্ডানন্দজী ইহা টের পাইলেন না, তাঁহার ঘুমের কোন ব্যাঘাত না করিয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর মহারাজ বুঝিতে পারিলেন ইহা সব 'রাজার' কাণ্ড, কিন্তু সময় না থাকাতে সেই রাত্রিতে আর যাওয়া হইল না। অনুরূপ আরেকটী ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন, "একবার গঙ্গাধর মহারাজ (মঠে) এসেছেন, কয়েকদিন পরেই ফিরে যাবেন মুর্শিদাবাদে। রাখাল মহারাজ ওঁকে কিছুতেই যেতে দেবেন না, অথচ তিনিও যাবেনই স্থির করেছেন। নৌকা ভাড়া করা হল, গঙ্গাধর মহারাজ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নৌকায় যাত্রা করেছেন, এদিকে রাখাল মহারাজ মাঝিকে টিপে দিলেন। নৌকায় উঠেই গঙ্গাধর মহারাজ তো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে উঠে দেখেন যে, নৌকা ঘাটেই বাঁধা আছে। আর রাখাল মহারাজ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।"[১]

১ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৫৯

গঙ্গাধর মহারাজের নিকট মহারাজ সংক্রান্ত একটী অলৌকিক ঘটনাও শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী প্রেমানন্দজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া অখণ্ডানন্দজী মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারদিন পরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে বিশেষ সংকীর্তন ও ভোগ রাগাদির ব্যবস্থা হইল। উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হইলে তিনি নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেতে ধ্যানে বসিলেন; রাত্রি প্রায় শেষ, তিনি দেখিলেন লাল শাড়ী পরা কপালে সিঁদুর এক মাতৃমূর্তি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'তোমার দাদার কাছে যাবে? তবে এদিকে এস।' তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। অকস্মাৎ দেখেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, 'কোথায় যাবে ভাই? আমরা তো রয়েছি। তোমার যে এখনও ঢের কাজ বাকী।' ইহার পর অখণ্ডানন্দজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল ও তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। অখণ্ডানন্দজী তাঁহার এই দৈব অভিজ্ঞতা বলরামভবনে হলঘরে বসিয়া বর্ণনা করিতেছিলেন। বারাণ্ডায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন। মহারাজের কানে ঐ কাহিনীর কিছু কিছু অংশ পৌঁছাইয়াছিল। রসিক মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চিনলে না, হে গঙ্গাধর, চিনলে না।"

* * * *

মহারাজ ঠাকুরের নিকট আসিবার কিছু সময় পরেই সেখানে অদ্ভুতানন্দজী (লাটু মহারাজ) আসিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে মহারাজের সহিত বিশেষ ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া তিনিও মহারাজকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন।

অদ্ভুতানন্দজী ছিলেন কঠোরী সাধু। তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদিও অন্য কাহারও নিকট চাহিতেন না। কিন্তু মহারাজ দিলে উহা সানন্দে গ্রহণ করিতেন। তিনি মহারাজের সহিত সখ্যভাবে মিলিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, কুস্তি করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে। পরবর্তীকালে মহারাজ সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিলে তিনি তাঁহাকে নেতার সম্মান ও মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি সর্বদাই মহারাজকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অদ্ভুতানন্দজী তখন বলরামভবনের নীচের তলায় একটা ঘরে থাকেন। দুই চারিজন পুরুষ ভক্ত তাঁহার নিকট সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে আসিতেন, মহিলা-

ভক্তদের সামনে পারতপক্ষে তিনি উপদেশ করিতেন না। একদিন শরৎ মহারাজ শ্রীমায়ের একজন সেবিকাকে অদ্ভুতানন্দজীর নিকট পাঠাইলেন ধর্মোপদেশ গ্রহণের জন্য। নানা কথা বলিয়াও লাটু মহারাজ মহিলাকে ঐ স্থান হইতে সরাইতে পারিলেন না। মহিলা ভক্ত উপদেশের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ অবশেষে বলিলেন, "শরোট হামার কাছে কেনো পাঠালো? হামনে রাজাকে জানাবো, রাজার হুকুম হলে তোমায় ঠাকুরের কথা শুনাবো। বাকী তার হুকুম না পেলে হামনে কোন কথা বলবে না।" মহারাজ তখন বলরামভবনে উপরের তলায় একটী ঘরে আছেন। অদ্ভুতানন্দজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি লাটু ভাই! তুমি যে আজ না ডাকতেই এলে। অন্যদিন ত ডেকেও সাড়া পাই না।" লাটু মহারাজ বলিলেন, "এই দেখো না, অমুক ঘরে গিয়ে দিক্ করছে; বললুম যাও মার কাছে, বাকী উঠলো না, তাই হামনে তোমার কাছে চলে এলুম।" ইতিমধ্যে ঐ মহিলা ভক্তটীও তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বুঝিলেন, শরৎ মহারাজ রঙ্গরস করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি মহিলা ভক্তটীকে লাটু মহারাজকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিলেন, লাটু মহারাজও শান্ত হইয়া তাঁহার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

একবার মহারাজ জানিতে পারিলেন অদ্ভুতানন্দজীর দুই চোখেই ছানি পড়িয়াছে। সর্বতোভাবে অপরিগ্রহ অদ্ভুতানন্দজী অপরের কোন সাহায্য লইতে চাহিতেন না। মহারাজ আদেশ করিলে উহা মানিয়া লইতেন। ১৯০৯ ও ১৯১০ খৃঃ দুই চোখের এক একটি করিয়া অস্ত্রোপচারের সকল ব্যবস্থা মহারাজ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকের নিকট অর্থাদি চাহিয়া অদ্ভুতানন্দজী তাহা গরীব ও দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। একবার এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে যাইয়া তিনি খুবই অপমানিত হইলেন, কিন্তু গায়ে মাখিলেন না। এই খবর মহারাজের কানে উঠিল। মহারাজের আদেশে কয়েকজন ভক্ত মহারাজের ইচ্ছা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থাদি গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

মহারাজ ভক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "লাটুর কাছে ঘেঁস্‌তে ভয় কিসের? অমন কঠোর-ব্রতধারী সাধু ক'জন দেখতে পাওয়া যায়? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়াইবার জন্য কিন্তু ওর ভেতরটা

একেবারে ক্ষীরে ভরপুর। দিনকতক মেলামেশা করলে বুঝতে পারবে ওর ভেতর সাধু ব'লে একটুও অভিমানের গন্ধ নেই। বহু সুকৃতি থাকলে এমন সাধুর সঙ্গ মেলে। এই ছাখনা, তুমি কোথায় জন্মেছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলুম, কিন্তু ঠাকুরের কৃপার টানে তুমি আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছো! আমরা যেমন তাঁর সন্তান, লাটুও তাঁর সন্তান—সেই সম্বন্ধটাই বড়। তুমিও সেই সুবাদে এখানে এসে থাক। এই সঙ্গের ফল এক সময়ে ফলবেই।"[১] মহারাজের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তিনি অদ্ভুতানন্দজীর নিকট-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, যাহার অন্যতম ফলশ্রুতি 'শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানি।

* * * * *

নিষ্ঠার প্রতীক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বা সারদা মহারাজ ছিলেন মহারাজের সোদর প্রতিম প্রিয়পাত্র। ত্রিগুণাতীতানন্দজীও মহারাজকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, সঙ্ঘাচার্যরূপে তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

একটি অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া ত্রিগুণাতীতানন্দজীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, শ্রীঠাকুর 'রাজা মহারাজের' মধ্য দিয়া কার্য করিতেছেন। স্থান বরাহনগর মঠ। এক রাত্রিতে মহারাজ, ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও সুবোধানন্দজী একই শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী ত্রিগুণাতীতানন্দজী গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন! উদ্দেশ্য, নির্জন শ্মশানে গোপনে তান্ত্রিক সাধনা করিবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মহারাজ স্বপ্নযোগে হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে সারদা, যাস্‌নি, যাস্‌নি।" উপস্থিত সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ত্রিগুণাতীতানন্দজীর আর যাওয়া হইল না। প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ জানাইলেন যে স্বপ্নে শ্রীঠাকুর ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে শ্মশানে তান্ত্রিক সাধনা করিতে নিষেধ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে ত্রিগুণাতীতানন্দজীর বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে, 'রাজা মহারাজে'র মধ্যে প্রকট হইয়া শ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। বলাবাহুল্য, ত্রিগুণাতীতানন্দজীর তান্ত্রিক সাধনার প্রচেষ্টা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ত্রিগুণাতীতানন্দজী কঠোর পরিশ্রম করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা ভাষায়

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫০১

মুখপত্র পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রকাশন-কার্য সংগঠন করেন। অর্থের অনটনে তাঁহাকে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু স্বামীজীর আশীর্বাদ ও মহারাজের অফুরন্ত ভালবাসা সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সাহায্য করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ত্রিগুণাতীতানন্দজী পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের জন্য যাত্রা করিলেন। মহারাজ তাঁহার স্নেহের 'সারদা'কে প্রীতিভোজ দিলেন এবং নিজে তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে বিদায় অভ্যর্থনা জানাইলেন। ত্রিগুণাতীতানন্দজীর নিষ্ঠাগুণে সানফ্রানসিস্কোতে প্রচারকার্য শীঘ্রই জনপ্রিয় হইয়া উঠে, আমেরিকায় প্রথম হিন্দু মন্দির স্থাপিত হয়। এই গর্বের সংবাদ শুনিয়া মহারাজ গুরুভ্রাতাকে প্রাণভরা আশীর্বাদ করিয়া পত্র লিখিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। একদিন মহারাজ বেলুড়মঠে দোতলা ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ ভাবচক্ষে দেখিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁহার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অল্প সময় পরেই সেই মূর্তি অদৃশ্য হইল। এই ঘটনায় মহারাজ গভীর চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার আদেশে তার (cable) পাঠান হইল। কয়েকদিনের মধ্যে জানা গেল, জনৈক উন্মাদ যুবকের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে ত্রিগুণাতীতানন্দজী গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছেন। কয়েকদিন পরে মহারাজ তাঁহার সেবককে তাঁহার দর্শন এবং ঘটনার বিষয় আনুপূর্বিক বলিলেন।[১] পরে জানা গেল পনেরো দিন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি ১০ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রিয় গুরুভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে মহারাজ গভীরভাবে ব্যথিত হইলেন।

* * * * *

করুণানিধান শ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা দিয়াছিলেন, "তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদের টেনে নেবেন।"[২] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ অপ্রকট হইলে সাময়িকভাবে গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই বিভ্রান্ত হইলেও ক্রমে ক্রমে অধিকাংশের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের মধ্য দিয়াই "ভক্তাধীন, ভক্তিপ্রিয়, প্রভু ভগবান" তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীর লালনপালন করিতেছেন। ত্যাগী সাধকবৃন্দের ন্যায় গৃহী ভক্তগণও মহারাজের মুখাপেক্ষী হইলেন। অধিকাংশের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে মহারাজের প্রসন্নতালাভ করিতে

১ স্বামী নির্বাণানন্দজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

২ কথামৃত ৪।২০।৭

পারিলেই তাঁহারা শ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তদের প্রত্যেকের সহিত যে বিশেষ ব্যবহারাদি করিতেন মহারাজ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলকে অদৃশ্য দৃঢ় প্রেমের ডোরে বাঁধিয়াছিলেন।

এই পর্যন্ত সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মহারাজের বিশেষ সম্পর্ক তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এখন কয়েকজন গৃহী ভক্তের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ উল্লেখপূর্বক রামকৃষ্ণগোষ্ঠীর মধ্যমণি মহারাজকে অবলম্বন করিয়া ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রেম-সম্বন্ধ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইবে।

ভক্ত বলরাম বসু ছিলেন রামকৃষ্ণাবতারলীলার অন্যতম রসদ্দার। রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীতে এক নিকটজন। তাঁহার গৃহে নিত্য জগন্নাথের সেবা। তাঁহার ভবনে[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেকবার আসিয়াছেন, রাত্রিযাপনও করিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বলরাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ রাখাল প্রভৃতি শুদ্ধসত্ত্ব যুবক ভক্তদিগকে নিজেদের গৃহে লইয়া ভোজনাদি করাইতেন। নানা-ভাবে সেবাযত্ন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্যতম রসদ্দার ভক্ত বলরামকে সিমলায় কাঁসারীপাড়ায় পাঠাইয়াছিলেন রাখালচন্দ্রের সহিত আলাপ করিবার জন্য। পুঁথি-প্রণেতা লিখিয়াছেন—

পরস্পর দেখাশুনা, মন-আকর্ষণ।
শুভক্ষণে দুঁহু জনে হইল মিলন॥
নিকট সম্বন্ধ দোঁহে ভিতরে ভিতরে।
দিন দিন যায় যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে॥

... ...

সাদরে রাখেন তিনি রাখালে ভবনে।
সৌভাগ্যবানের ঘরে রাখাল যে দিনে॥[২]

ভক্ত বলরামের সহিত পরিচিত হইবার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর মধ্যে মহারাজ

১ বহু পুণ্যস্মৃতির স্বাক্ষরবাহী বলরামভবন সম্বন্ধে কথামৃতকার লিখিয়াছেন, "ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন—যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন।......এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের খেলা হইয়াছে।"

২ পুঁথি, পৃঃ ৩১৩—১৪

অনেকবার স্বল্পদিন বা দীর্ঘদিন কলিকাতায় বলরামভবনে, বসু পরিবারের উড়িষ্যায় কোঠারস্থিত জমিদারীতে ও পুরীতে শশি-নিকেতনে বাস করিয়াছেন। বসু পরিবারে প্রত্যেকেই মহারাজকে পরম আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতে তপস্যাকালীন মহারাজ একমাত্র বলরামবাবুর সঙ্গে পত্রে কিছু যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন। সে-সময়ে লেখা মহারাজের কয়েকটী চিঠিতে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অকৃত্রিম প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট তাহাতে বুঝা যায় বলরামবাবু মহারাজকে অনুজবৎ শুধুমাত্র ভালবাসিতেন না, ধর্মজীবনে তাঁহার উপদেশাদি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। তিনি মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণলোকে' গমন করেন। তাঁহার কৃতী সন্তান রামকৃষ্ণ বসু পিতার ধারা বজায় রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সেবা যত্ন করিতেন, অধিকন্তু মহারাজকে জীবন-সর্বস্ব-জ্ঞানে পূজা ও সেবাদি করিয়া পরমতৃপ্তি পাইতেন।

* * * *

গঙ্গার পশ্চিমপারে রামকৃষ্ণপুরে ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ প্রায় সকলেই কোন না কোন সময় গিয়াছেন, কেহ কেহ কিছুদিন সেখানে বাস করিয়াছেন। শ্রীমা বৃন্দাবনধামে ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন নবগোপাল বাবুর স্ত্রী ভক্তিমতী নিস্তারিণী দেবী ৺ রাধারমণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। এই ভক্তিমতী নারী মহারাজকে গোপালবোধে সেবাযত্ন করিতেন। তিনি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই মহারাজকে গৃহে আনিয়া প্রাণমন ঢালিয়া সেবা করিয়াছেন। প্রীতির সেবায় পরিতুষ্ট মহারাজ বলিতেন, "নীরদের মায়ের সেবায় বাঁধা পড়ে আছি।" ১৩২৬ সালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন মহারাজ ঐ বাড়ীর তেতলায় নবনির্মিত ঠাকুর-ঘরে শ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। নবগোপালবাবুর তৃতীয়পুত্র শ্যাম মহারাজকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার প্রীতিলাভের জন্য সবতোভাবে চেষ্টা করিতেন। জীবন-সায়াহ্নকাল পর্যন্ত মহারাজ বিভিন্ন সময়ে গুরুভ্রাতা বা শিষ্যসেবকদের লইয়া এই ভক্তিভাজন পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার বলরাম ভবনের পর এই বাড়ী মহারাজের দ্বিতীয় বৈঠকখানা ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

* * * * *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পাঁচসিকে পাঁচ আনা"

ভক্তির জন্য সুপরিচিত। প্রেমানন্দজী বলিতেন, "গিরিশবাবু পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন।" তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস সকলকে বিস্মিত করিত। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। তিনি মহারাজকে খুবই ভালবাসিতেন, আবার ঠাকুরের মানসপুত্রজ্ঞানে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার হেতু বিবৃত করিয়া তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 'সদ্‌গুরু' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের বাড়ী ছিল ত্যাগী ভক্তদের আনন্দের ঠাঁই। গিরিশবাবু অর্থসাহায্য করিয়া, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বিপদে-সম্পদে ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকের মাধ্যমে লোকের কল্যাণ হইতেছে। তাঁহার নাটকের একজন বড় সমঝদার ছিলেন মহারাজ। তিনি তাঁহার প্রত্যেক নাটক মঞ্চস্থ হইবার পর উহা দেখিবার জন্য মহারাজকে আহ্বান করিতেন। ভূয়োদর্শী মহারাজের মত ছিল তাঁহার নিকট বিশেষ মূল্যবান। গিরিশজীবনী-প্রণেতা অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় চৈতন্যলীলার জগন্নাথ-চরিত্র সম্বন্ধে মহারাজের মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "মায়িক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে—এ চরিত্র, গিরিশবাবু, তুমি মহাগুরুর কৃপায় চিত্রিত করেছ।"[১]

মহারাজের নির্দেশেই গিরিশচন্দ্র 'শঙ্করাচার্য' ও 'তপোবল' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'শঙ্করাচার্য' নাটকটি সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "গিরিশবাবুকে 'শঙ্করাচার্য' লিখিবার জন্য তিনিই (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেন। গিরিশচন্দ্র 'শঙ্করাচার্য' লিখিলেন; অনেকেই বলিলেন, 'মশাই লোকে থিয়েটার দেখতে আসবে, না আপনার বেদান্তের বক্তৃতা শুনতে আসবে? আপনারও যেমন; এ নাটক কি লোকে নেবে?' গিরিশবাবুর কিন্তু গুরুভাইয়ের কথা বেদবাক্য। রাখাল মহারাজ বলিয়াছেন। তিনি নাটক লিখিলেন। সে নাটকের অভিনয়ও হইল। অমন স্বদেশী ঐতিহাসিক নাটকের যুগে সেই বেদান্তবিধৃত নাটক প্রথম স্থান অধিকার করিল। শঙ্করাচার্যের বিক্রম, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশেম, সাজাহানকে ছাড়াইয়া গেল। ইহা গল্প নহে। তখনকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী

১ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: গিরিশচন্দ্র, ১৩৩৪, পৃঃ ৫৬৮—৬৯

মহাশয়ের হিসাবের খাতা ইহার সাক্ষ্য।"[১] শঙ্করাচার্যের ভূমিকায় গিরিশপুত্র দানীবাবুর অভিনয় দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী সঙ্ঘের একান্ত সুহৃদ গিরিশচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলে মহারাজ প্রিয়-বিয়োগজনিত ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব করেন। দুঃখে কাতর তিনি মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য পাঠাইয়া দেন।

* * * *

রামকৃষ্ণলীলার নির্ভরযোগ্য বিবৃতিকারদের অন্যতম 'শ্রীম' বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভক্তমণ্ডলীতে মাস্টারমশাই নামে সমাদৃত। রাখালচন্দ্র কৈশোরে মাস্টার-মশাইয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবিলাসের সাক্ষী মাস্টারমশাই তাঁহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, ঠাকুরের মানসপুত্রজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কিশোর রাখালচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া মাস্টারমশাই ঠাকুরের বাক্যামৃত সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবার জন্য রাখালচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। একদিন রাখালকে কাগজ পেন্সিল লইয়া কথোপকথন লিখিতে দেখিয়া মর্মদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ও কি করছিস্? মাস্টার বুঝি বলেছে? তোর ও-কাজ নয়।" এই ঘটনার পর রাখালচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গে আমবাগানে আমপাতার হিসাব ছাড়িয়া আমের আস্বাদনেই মনোনিবেশ করেন।

উত্তর-জীবনে মস্টারমশাইয়ের ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার সমীপাগত যুবকদিগকে 'শ্রীম' বলিতেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী; তাকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তাঁর যে সকল শিষ্য কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করিতে হয়।" তিনি আরও বলিতেন, "সাধুদের দেখলেই উদ্দীপন হয়।" বিবিদিষু যুবকদের তিনি মহারাজের দিব্যসঙ্গলাভের জন্য মঠে বা বলরাম ভবনে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি নিজেও সুযোগ সুবিধা পাইলেই মহারাজের নিকট যাইতেন ও তাঁহার সান্নিধ্য-সুখ উপভোগ করিতেন।

তাঁহাদের মধ্যে যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাহার কিছু প্রকট

১ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়: শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, পৃঃ ১০২

হইয়াছে পত্রালাপের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ ১।৬।১৯১৮ তারিখে লিখিত মাস্টার-মশাইয়ের একটী পত্রের 'পুনশ্চ' অংশ উদ্ধৃতি করা যাইতেছে।

"পুনঃ 'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ', এটীর পূরণ করিতে লিখিয়াছেন। আমার ও মনে নাই। তবে নিম্নলিখিত পূরণ কিরূপ হয় বলিবেন। মহাজনের পদের মত কি হইয়াছে? যথা—

রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।
গুরুদেব হস্ত যার করেছেন ধারণ॥
কোথা বা কামিনী তার কোথা বা কাঞ্চন।
অনন্তের রাজ্যে সদা করে বিচরণ॥
বিশেষতঃ শ্রীগুরু কৃপায়
মৃত্যুমুখ সদা যেই করে দরশন॥

অথবা, পঞ্চমবর্ষ বালকের অবস্থা যাহার
স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান কেন হবে তার॥

কিরূপ হইল? শ্রীম—"

আবার আমরা দেখি ১৯২০ খ্রীঃ বিজয়াদশমী উপলক্ষে মাস্টারমশাই একটি কবিতায় লিখেছেন:

হে রাখাল প্রিয়বর, ব্রজের রাখাল।
শ্রীরামকৃষ্ণ বংশ ধুরন্ধর এবে,
করহ গ্রহণ স্নেহ উপহার,
আজি বিজয়ার দিনে।
নির্মাল্য-মালা,
গাঁথিয়াছি যাহা হরষ-বিষাদে
অতীব সুন্দর দেবীপক্ষে;
পূজিয়াছি যুগল-চরণ শ্রীপ্রভুর
স্নেহময়ী মায়ের আমার আর,
দয়াময়ী ভক্তপ্রসবিনী যিনি
পিতা-মাতা আমাদের তারা॥

মহারাজের মর্ত্যলীলা সম্বরণের পর মাস্টারমশাই তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ করিয়াছেন একটী প্রবন্ধে। তিনি লিখিয়াছেন.

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, তাঁহার উপস্থিতিমাত্রে সুগভীর পবিত্রতা, শুভাশিস্ ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হইত। ইহার ফলে তাঁহার চরণাশ্রিতগণের অন্তরের দুঃখের ও দুশ্চিন্তার বোঝা তাহাদের অজ্ঞাতসারে অপসৃত হইত।...... শ্রীমহারাজ পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তেমনি তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও চিরবিদ্যমান থাকিবেন। তিনি সাময়িকভাবে দেহরূপ একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে সদা বর্তমান। এইক্ষণে এস্থানেও বর্তমান তিনি, সকল নিষ্ঠাবান ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার কল্যাণময় প্রভাব ছড়াইতেছেন এবং তাহাদিগকে নিঃশ্রেয়সের পথে পরিচালিত করিতেছেন॥"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতমা মহিলা ভক্ত, কথামৃতে উল্লিখিত "শোকাতুরা ব্রাহ্মণী" শ্রীমায়ের প্রধান সেবিকা ছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে তিনি গোলাপ-মা নামে পরিচিত। অন্যান্যদের মত গোলাপ-মা মহারাজকে ঠাকুরের মানসপুত্র ও শ্রীমায়ের আদরের সন্তান জানিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, সমীহ করিয়া চলিতেন। বালকস্বভাব মহারাজ সুযোগ পাইলেই গোলাপ-মাকে লইয়া আমোদ করিতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন গোলাপ-মা বলরাম ভবনে মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কথাবার্তার পর মহারাজের আদেশে তাঁহার সেবক গোলাপ-মাকে তখন নূতন চালু হইয়াছে যে ডিম-সন্দেশ, তাহা খাইতে দিলেন। সরলপ্রাণা গোলাপ-মা সন্দেশ খাইয়া খুব প্রশংসা করিলেন। খাওয়া হইলে মহারাজ বলিলেন, "গোলাপ-মা, তুমি কিন্তু ডিম খেলে। তা তোমার তো খেতে ভালই লেগেছে।" এই তথ্য শুনিয়া গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের গোলাপ-মা খুবই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, ভারাক্রান্ত মনে উদ্বোধনে ফিরিয়া শ্রীমাকে সমস্ত কিছু নিবেদন করিলেন। তিনিও গোলাপ-মা ডিম খাইয়াছেন শুনিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। ইতিমধ্যে বলরামভবনে উপস্থিত একজন সাধু উদ্বোধনে যাইয়া শ্রীমাকে প্রকৃত সংবাদ জানাইলে হাসির রোল উঠিল। শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ রাখালের কাণ্ড, এখনও

১ প্রবুদ্ধভারত, ১৯২২, মে মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত।

রাখালের ছেলেমানুষী গেল না।" প্রকৃত সংবাদ জানিয়া গোলাপ-মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

* * *

শ্রীমায়ের অপর সঙ্গিনী যোগীন-মা সম্বন্ধে[১] শ্রীমা বলিতেন, "যোগেন আমার জয়া—আমার সখী, সহচরী, সাথী।" কথামৃতে 'গন্নুর মা' নামে পরিচিত এই মহিলা মহারাজ অপেক্ষা বয়সে বড় হইলেও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, ঠাকুরের অদর্শনের পর যোগীন-মা মহারাজের দেহে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত তাঁহার আচরণ ছিল সর্বদাই শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত। রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী যোগীন-মা যখনই মহারাজের নিকট আসিতেন তখনই একটী পাত্রে কিছু খাবার লইয়া আসিতেন। মহারাজ তাঁহার আনীত আহার্য দ্রব্য পাঁচ বছরের বালকের মত আনন্দ করিতে করিতে গ্রহণ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন-মা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও কুঁড়ি—ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে! ও যে সহস্রদল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।" তাঁহার জীবনপদ্ম যতই বিকশিত হইতে থাকিল, ততই তাহার মনোরম শোভা দর্শন করিয়া মহারাজ ও গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের মহিমার জয়গান করিতেন।

* * * *

লোকসংগ্রহার্থে ধর্মস্থাপনরূপ লীলাবিলাসের আধার রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য সৃষ্টি। ঠাকুরের এই সৃষ্টিপ্রয়াসের উল্লেখ করিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল।…বলতেন, 'আহা ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য ক'রে বেঁধে দিতে পারতুম!' এতদিন তো এ বলছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলছে 'রাখালবাবু কেমন আছেন?'—এই রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েন নি।"[২] প্রত্যুত তিনি সুপরিকল্পিতভাবে তাঁহার পরিকরদের প্রেমডোরে বাঁধিয়াছিলেন। লীলোদ্যান হইতে বাছাই করা নানাবিধ

১ প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অরূপানন্দ লিখিয়াছেন: শ্রীশ্রীমহারাজ যোগেনমাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যোগেনমাও কত সযত্নে মহারাজকে খাওয়াতেন। দেখেছি হয়ত কোনদিন মহারাজকে যখন শ্রীশ্রীমার বাটীতে খাওয়াবার নিমন্ত্রণ হইত যোগেনমা আনন্দে অধীর হইতেন। কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন, নিজেও দু'একটি তরকারী রান্না করিতেন। ('উদ্বোধন', ২৬ বর্ষ, ৬ সং, পৃঃ ৩৬৯)

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৬৫

বিচিত্র পুষ্প সংগ্রহ করিয়া একটী 'পাঁচ ফুলের সাজি' সাজাইয়াছিলেন। সেই সুন্দর সাজির প্রত্যেকটি পুষ্প বর্ণে গন্ধে সৌষ্ঠবে স্বতন্ত্র। স্বামীজীর উক্তি, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেরা সব এক একটি original ; যে original নয়, সে ঠাকুরের ছেলে নয়।"[১] ইহার যাথার্থ্য ঠাকুরের সংগ্রহে সুপরিলক্ষিত হয়। সেই সাজির অন্যতম বিশিষ্ট সংগ্রহ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। মহারাজ ছিলেন স্বতন্ত্র পুরুষ, মহারাজের তুলনা মহারাজই। যাঁহারা মহারাজকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মুখেই শোনা গিয়াছে, "মহারাজের মধ্যে যেন কোন নিয়মের বাঁধন নেই, তাঁর ভাবেরও ইতি নেই। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ।" তাঁহার জীবন ধরাবাঁধা নিয়মসীমায় আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার চিত্তে পাহাড়ী ঝর্ণার প্রখরতা উচ্ছলতা ছিল না, সাগরের উত্তাল উদ্বেলতা ছিল না, সেখানে ছিল পর্বতবেষ্টিত জলাশয়ের সুনির্মল সমাহিত চারুতা। অধ্যাত্ম-দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁহার নিভৃত সত্তা রসিক; রসিকচেতনাই তাঁহার চরিত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রসসৃষ্টিই তাঁহার অন্তরাত্মার সহজ প্রকাশ। আনন্দবিতরণই তাঁহার গভীর উপলব্ধির অনিবার্য বিকাশ।

১ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৪৯০

নবম অধ্যায়

স্ব-স্বরূপে স্থিতি

নবম অধ্যায়

স্ব-স্বরূপে স্থিতি

অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ ভগবান ভক্তপ্রিয় ভক্তবৎসল। "তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদ্‌দার।"[১] অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তাঁহার মধুর লীলাভিনয় চলে। সেই সকল লীলার আসরেই রসঘন স্বরূপের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। লীলারস-মাধুর্যে আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত পুঁথিকার গাহিয়াছেন,

> স্বতন্তর খেলা তাঁর অন্তরঙ্গ সনে।
> যাহাতে প্রমত্ত-চিত রহে ভক্তগণে॥
> লীলা-রঙ্গ-রস-পানে হয়ে মত্ততর।
> ভক্ত বিনা অন্যে যার জানে না খবর॥
> লীলার প্রাঙ্গণে লীলা-রসের আস্বাদ।
> যতই না ভোগে ভক্ত নাহি মিটে সাধ।[২]

অন্তরঙ্গদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকোটি জীব; নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষ। অশেষ ঐশ্বরিক গুণযুক্ত হইয়াও এইসকল আধিকারিক পুরুষ 'পঞ্চভূতের ফাঁদে' রোগ-শোক-ক্ষুধা-তৃষ্ণার উপাধি ধারণ করেন; লৌকিক রীতিনীতির পোষাক পরিধান করিয়া সংসারলীলায় উপস্থিত হন, আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতই জীবন যাপন করেন। পারা যেমন চাপা থাকে না তেমনি তাঁহাদের জীবনের মধ্যেও অসাধারণত্ব উঁকিঝুঁকি দেয়; ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেম পবিত্রতার ঐশ্বর্য উপছাইয়া পড়ে। বরঞ্চ লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্বের সংমিশ্রণে তাঁহাদের কার্য-কলাপ হয় অনুপম সুন্দর। কার্যকারণের সংকীর্ণ যুক্তিজালে আবদ্ধ মানুষের

১ কথামৃত ৪।৩।১।২
২ পুঁথি, পৃঃ ৬২৭

অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধিতে তাহা ধরা পড়ে না। আটপৌরে জীবনের পটভূমিকায় তাঁহাদের দিব্যজীবনের দ্যুতি শ্রদ্ধালু ভক্তের মানস সরোবরে প্রতিসারিত হয়।

রীতি-প্রমাণ অস্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা বা শাস্ত্র-তর্ক-যুক্তির সাহায্যে অবতারলীলা-মহাকাব্যের রসাস্বাদন করা যায় না। লৌকিক সংসারমঞ্চে অলৌকিকের ছায়া ও ছায়াতপের প্রহেলিকা ভেদপূর্বক যুক্তিবিচার, ঐতিহাসিক গবেষণাদি বিবিধ তথ্য আবিষ্কারে যে সাহায্য করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার দ্বারা অতল লীলাতত্ত্বাভাসের তল পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তত্ত্বরসিক বলেন :

> মায়া লয়ে লীলাখেলা ভক্ত ভগবানে।
> উপলব্ধি হয় লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনে॥
> নিত্য যেন তেন লীলা না হয় প্রকাশ।
> কলমে কালিতে খুলে কেবল আভাস॥[১]

আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত লীলারঙ্গ ঠারে ঠোরে বুঝিতে হয়, শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে আভাস ধরিয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে হয়। কিভাবে "ভক্তি দিয়া ভগবান ভক্তে দেন ধরা"[২] এই ভগবদ্ মহিমা নিজ অন্তঃকরণে অনুভব করিয়া প্রেমসিক্ত ভক্তজন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে, রস-স্বরূপের রস আস্বাদন করিয়া আনন্দময় হইয়া যায়।

লীলা-নাট্যের মধ্যাঙ্কে এক দৃশ্যে দেখা যায় লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের নিকট তাঁহার মানসপুত্রের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইসঙ্গে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন। "রাখাল নিজের স্বরূপ জানতে পারলে আর তাঁর শরীর থাকবে না।" তাঁহারা মধুর এই লীলা-তত্ত্ব সংগোপনে রাখেন, উৎসুক চিত্তে রাখালরাজের জীবনপথের বিকাশ অবলোকন করেন। কিন্তু সকলেই পরম বিস্ময়ে দেখেন যে, শেষ মুহূর্তে রাখালরাজ নিজেই স্বস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আনন্দচঞ্চল কৃষ্ণসখা হাসিতে-হাসিতে মর্ত্য লীলা-মঞ্চ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। দ্রুত সংঘটিত এইসকল ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা ধরিয়া কার্যকারণ বিশ্লেষণ করিলে তথ্যাদির মধ্যে বুদ্ধির ব্যায়ামপ্রসূত কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার

১ পুঁথি, পৃঃ ৩৩৩
২ পুঁথি, পৃঃ ৪০৬

সাহায্যে ভক্তি মাধুর্যমণ্ডিত লীলাস্ফুরণের মহাকাব্য যে লালিত্যমণ্ডিত দিব্য ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে তাহার রসাস্বাদন সম্ভবপর হয় না। রসান্বেষী ভক্ত শ্রদ্ধাপ্লুত-চিত্তে দ্রুত পরিবর্তিত লীলাপটগুলি অবলোকন করে, প্রেমাস্পদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন দর্শন শ্রবণ করিয়া মনপ্রাণ সার্থক করে। আনন্দলোকের লীলা-মধুরিমা ভক্তি-ভাজনের অন্তরলোক বিমল স্নিগ্ধ মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। জীবন মধুময় হইয়া উঠে।

*   *   *

ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। লীলা পালা সাঙ্গ হইয়াছে। লীলা-মহাকাব্যের পাতা উল্টাইয়া দেখা যায়, মধুর মর্ত্যলীলা-সম্বরণের বেশ কিছু সময় থাকিতেই বিদায়-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল। ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া বিদায়পালার প্রস্তুতি আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। কিন্তু ভক্তগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা মহাপুরুষের নিকটসান্নিধ্যে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কি কোন আভাস-ইঙ্গিত পান নাই? বর্তমানকালে মনে হয় তাঁহারা ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, আভাসে বোধ হয় বুঝিতেও পারিয়াছিলেন। যে সদানন্দময় পুরুষের আনন্দ খেলায় সকলে মাতিয়াছিলেন সেই আনন্দ-নিধান চক্ষুর অন্তরাল হইবেন এইকথা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। এই 'অপ্রিয় রূঢ় বাস্তব কেহ সহজে মানিয়া লইতে চাহেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত একটি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন। চন্দ্রালোকে স্বচ্ছ সলিল যেন আনন্দে উচ্ছল। এই সম্মোহনকারী পরিবেশে মৎস্যদল চন্দ্র প্রতিবিম্বকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া মাতিয়া উঠে, বুঝিতে পারে না যে চন্দ্রের বাস আকাশে, জলে নহে।[১] তেমনি আনন্দময় পুরুষের পূতসঙ্গলুব্ধ ভক্তগণ যেন ভুলিয়া বসে যে দিব্যপুরুষের মর্ত্যলীলা স্থায়ী নহে। আনন্দদ্যুতির বিভায় মোহিত মানুষ বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্য যেন স্বীকার করিতে চাহে না।

*   *   *

ভুবনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার[২] পর মহারাজ সেই স্থানেই নিজের ভাবে বসবাস করিতে চাহিতেন। 'ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'

১ দুর্ভাগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।৮

২ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১শে অক্টোবর, ১৯১৯

-ভাব ধারণ করিয়া গভীর অন্তর্মুখ মহারাজ দিব্যভাবে বিরাজ করিতেন; নয়নানন্দকর ফুল-ফল-বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত আশ্রমপ্রাঙ্গণে আপনভাবে চলিতেন, ফিরিতেন, আবার কখনও গভীরভাবে মগ্ন হইয়া যাইতেন। কর্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিলেও সঙ্ঘের কাজের আহ্বান আসিলে উপেক্ষা করিতেন না। স্বামীজীর তিথিপূজার দিন (১২ই জানুয়ারী, ১৯২০) মহারাজের নিকট নয়জন প্রার্থী সন্ন্যাস ও একজন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইল। সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহারাজের নির্দেশ গ্রহণের জন্য ভুবনেশ্বর উপস্থিত হইলেন; কাজকর্ম শেষ করিয়া তিনি মহারাজের ইচ্ছানুসারে দশদিন তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী। ভুবনেশ্বরে তিনি কিরূপ ভাবতন্ময়তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তাহার একটি চিত্রকল্প বিধৃত হইয়া রহিয়াছে একটি আলোকচিত্রে। মহারাজ গড়গড়ায় তামাক সেবন করিতে করিতে ভাবসমাধিতে স্থির নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছেন। সেই দুর্লভ ক্ষণের ছবিটি তুলিয়াছেন জনৈক ভক্ত। অনুরূপ বহু ঘটনার সাক্ষী মহারাজের তৎকালীন সেবকবৃন্দ।

ভুবনেশ্বরে সংবাদ আসিল শ্রীমাতাঠাকুরানী গুরুতরভাবে পীড়িত। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় উদ্বোধনে আনা হইয়াছিল। ব্যাধি নিরাময়ের জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ ৭ই মার্চ ভুবনেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন কলিকাতায় বলরাম ভবনে উঠেন। শ্রীমায়ের অস্থিচর্মসার শরীর দেখিয়া মহারাজ ও অপর সন্ন্যাসিগণ আশঙ্কিত হইলেন। যাহা হউক কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসায় তাঁহার জ্বর দিন পনের পরে বন্ধ হইল। সকলেরই প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইল।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মহারাজ শ্রীমায়ের দর্শনমাত্রে ভাবাবিষ্ট হইয়া যেন বালকের ন্যায় হইয়া যাইতেন, তাঁহার চোখে মুখে আনন্দের বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিত। তিনি পারতপক্ষে শ্রীমায়ের সন্নিধানে যাইতেন না, বোধহয় এই আশঙ্কায় যে ভাবে বিহ্বল হইয়া অপরকে বিব্রত করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ একবারের ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিন সকালবেলা মহারাজ বলরামভবন হইতে উদ্বোধনে আসিয়াছেন মাতৃসন্দর্শনে। সংবাদ পাইয়া শ্রীমাতাঠাকুরানী চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া খাটের উপর বসিলেন ও মহারাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখা গেল মহারাজের পদদ্বয়

কাঁপিতেছে। কম্পিত কলেবরে তিনি শ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিলেন। শ্রীমা তাঁহার চিবুকে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন ও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সংক্ষেপে দুই চারিটি কুশল প্রশ্ন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি যখন নীচতলায় সারদানন্দজীর ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। শ্রীমায়ের প্রেরিত প্রসাদ দুই গুরুভ্রাতা আনন্দ করিতে করিতে গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ বলিতেন, "মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মত থাকেন অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম ?" উৎসবাদি উপলক্ষে শ্রীমা বেলুড়মঠে শুভাগমন করিলে মহারাজ তাঁহাকে জগদম্বা জ্ঞানে আরাত্রিক, সম্বর্ধনা, পূজা ইত্যাদি করিতেন। সর্বোপরি শ্রীমায়ের শুভাগমনে তিনি সদানন্দ বালকের মত আনন্দ-স্ফূর্তি করিতে থাকিতেন।

মহারাজ এইবার বেলুড়মঠে জনৈক ভক্তকে তান্ত্রিকমতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমাতাঠাকুরানীকে কিছুটা সুস্থ দেখিয়া মহারাজ ভুবনেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ২৭শে মার্চ। সঙ্গে রামলালদাদাও আসিলেন ভুবনেশ্বর মঠে মহারাজের পুণ্যসঙ্গ লাভের আশায়। সংবাদ পৌছাইল যে শ্রীমাতাঠাকুরানীর ব্যাধি পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই দুঃসংবাদ আসিল যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'আশ্চর্য ভেল্কী' স্বামী অদ্ভুতানন্দ বারাণসীতে ২৪শে এপ্রিল মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ শোকাভিভূত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে আলাপ-পরিচয়, তাঁহার কত মধুর স্মৃতিই না প্রিয় 'লাটু ভাইয়ে'র সঙ্গে জড়িত! প্রিয় গুরুভ্রাতাদের কয়েকজনই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। স্বামী যোগানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ একে একে লীলামঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছেন। কত স্মৃতি—উঁহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের কত লীলাখেলা স্মৃতিপটে ভিড় করে। কিন্তু প্রিয় গুরুভ্রাতার বিয়োগব্যথা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আবার দুঃসংবাদ আসিল। ভক্ত বলরামবাবুর একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ বসু মহারাজকে দেবতাজ্ঞানে সেবাযত্ন করিতেন, তিনি ৬ই মে হইতে কলিকাতায় বলরাম ভবনে গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সপ্তাহখানেক পরে জানা গেল যে, রামকৃষ্ণ বসু ১৪ই মে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুর সংবাদে মহারাজ স্তব্ধীভূত হইলেন।

সেই দিনটি ছিল ২১শে জুলাই, মঙ্গলবার। রাত্রি প্রায় একটার সময় দেখা গেল, মহারাজ একখানি চাদরে শরীর ঢাকিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তাঁহার মুখমণ্ডল। সেবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তামাক দিবে কি না; কিন্তু তিনি কোন সাড়া দিলেন না। রাত্রি অতিবাহিত হইল। সকালবেলা তিনি অন্যান্য দিনের মত বেড়াইতে না গিয়া সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তার আসিল, পূর্ব রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীমাতাঠাকুরানী ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। দুঃসংবাদে বিহ্বল হইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। কিছু সময় পরে শয্যাত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি হবিষ্যি করব। মায়ের শিষ্য যারা আছে তারা তিনদিন হবিষ্যি করবে, জুতো পরবে না।" মাতৃবিয়োগের গভীর দুঃখ কয়েক দিনের জন্য তাঁহার মুখের আনন্দ-দীপ্ত হাসিটি আবরিত করিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যধিক চাপা। তাঁহার ভাব বাহিরে প্রকাশ পাইত না, শুধু একবার তাঁহার মুখে শোনা গেল "এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।" পাহাড়ের অন্তরাল অপসারিত হইয়াছে, অনিত্য সংসারের প্রহেলিকার ইন্দ্রজালও যেন সেই সঙ্গে খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জীবন-বীণায় অন্তিম রাগিনীর আলাপ যেন স্বরু হইয়াছে।

বৎসরাধিক কাল ভুবনেশ্বরে বাস করিয়া মহারাজ ৪ঠা ডিসেম্বর সকালে মঠে পৌঁছাইলেন। মহারাজের উপস্থিতিতে ভক্তমহলে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। মহারাজ বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন, মাঝে কয়েকদিনের জন্য আলিপুরে ভক্ত শৌর্যেন্দ্রবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ২৪শে ডিসেম্বর মহারাজের উপস্থিতিতে জানবাজারস্থ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস উৎসব-আনন্দে মাতিয়া উঠিল। শ্রীমায়ের জন্মতিথি উপস্থিত হইল। শ্রীমায়ের অপ্রকট হইবার পর এই প্রথম তাঁহার জন্মতিথি উৎসব। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মহারাজ বেলুড়মঠ বা মায়ের বাড়ী 'উদ্বোধনে' যাইতে পারিলেন না।

মহারাজের প্রিয় গুরুভ্রাতাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার যে স্বরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলেন তাহা খুবই গোপনে রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে যাইয়া কিশোর রাখালচন্দ্র অসুস্থ হইলে পাছে সেখানে ব্রজের রাখালের স্বরূপ উদ্দীপন হইয়া তাঁহার তনু-ত্যাগ হয় এই আশঙ্কায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিও সকলের মনে জাগরূক ছিল, তৎসত্ত্বেও প্রমাদবশতঃ স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পঞ্চম ভাগ রচনাকালে মহারাজের স্ব-স্বরূপ

সম্পর্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শনের বিবরণ লিখিয়া মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় পাঠাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ ইহা জানিতে পারিয়া লীলাপ্রসঙ্গ-কারকে ঠাকুরের সাবধানবাণী স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্বামী সারদানন্দ শঙ্কিত হইয়া ছাপাখানা হইতে পাণ্ডুলিপি, প্রুফ ইত্যাদি আনাইয়া অংশবিশেষ নষ্ট করিলেন, এমনকি ছাপাখানায় সাজান মুদ্রাক্ষরগুলি অবিন্যস্ত করাইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

এত সব গোপনীয়তা সাবধানতা সত্ত্বেও মহারাজের স্ব-স্বরূপের উদ্দীপন ঘটিতে পারে এইরূপ ঘটনাসকল একের পর এক আপনা-আপনি ঘটিতে থাকিল। সেই-সকল ঘটনার কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। মহারাজ তখন কলিকাতায় বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন। নূতন বৎসরের সকালবেলা সর্বজনপ্রিয় রামলালদাদা সেখানে উপস্থিত হইলেন। আলাপ-আলোচনা ও মিষ্টান্ন-গ্রহণের পর মহারাজ রামলালদাদাকে ধরিয়া বসিলেন, "আজ সন্ধ্যার পর চপ্‌ওয়ালী সেজো; ঠাকুরের সময়কার গান সবাইকে শোনাতে হবে।"

গৃহস্থের বাড়ী, বাড়ীর লোকজন কি মনে করিবে ভাবিয়া রামলালদাদা সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু মহারাজের অনুরোধ তিনি শেষ পর্যন্ত এড়াইতে পারিলেন না। মহারাজের আদেশে তাঁহার শিষ্য-সেবকরা অন্তঃপুর হইতে শাড়ী অলঙ্কারাদি জোগাড় করিলেন। দাদাকে সাজানো হইল। দাদা শাড়ী-চুড়ি পরিহিত চপ্‌ওয়ালীর বেশে সান্ধ্য আসরে নামিলেন। হলঘর লোকজনে পরিপূর্ণ। সকলের আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে দাদা নাচিয়া নাচিয়া চপ্‌কীর্তনের সুরে মাথুর ধরিলেন :—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত॥
(ও তোর) মন মানেতো থাকবি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
(ব্রজনারীর নয়নজলে জল বেড়েছে হে)
আগে ছিল এক হেঁটো জল, এখন যমুনা অতল, সাঁতার দিতে হবে।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে॥
(বল্‌লেও বলতে পার; আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে॥

হাল্‌কা রঙ্গরসের অবতারণা করিয়া নাচের তালে তালে শরীর দোলাইয়া গায়ক গান গাহিতে লাগিলেন, আসর জমিয়া উঠিল। মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

চপ্‌ওয়ালী 'আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ' পদটির উপর বার বার আখর দিতে থাকিলে অকস্মাৎ মহারাজের হাস্যদীপ্ত বদনমণ্ডল হইতে হাসিটি খসিয়া পড়িল; তাঁহার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, নয়নযুগল ঈষৎ মুদিত হইল, মন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দেহ একটু কাঁপিয়া উঠিল। এদিকে চপ্‌-ওয়ালীর মধ্যেও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার অশ্রুসজল চক্ষু হইতে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে সকলে হাস্যে-লাস্যে মাতিয়া উঠিয়াছিল, ধীরে ধীরে এক গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে পরিবেশ থম্‌ থম্‌ করিতে লাগিল। এই আনন্দানুষ্ঠানে নিত্য ব্রজলীলার আভাস, রাখালরাজের ব্রজে ফিরিবার আকুতি তাঁহার স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে?

গভীর ভাবোদ্দীপনার আবেশে সন্ধ্যার আনন্দানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পরদিন গঙ্গার অপর পারে রামকৃষ্ণপুরে ঠাকুরের ভক্ত ৺নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী ভক্তিমতী নিস্তারিণী দেবীর আমন্ত্রণে মহারাজ সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। আনন্দে উৎসবে সেবক ভক্তসকলে বিগত সন্ধ্যার ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণের অবসর পাইলেন না। নিস্তারিণী দেবী মহারাজকে গোপালবুদ্ধিতে সেবাযত্ন করিতেন। মহারাজের সেবাযত্ন করিয়া ভক্তিমতী মহিলা ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতে থাকিত। সপ্তাহাধিক ঐ ভক্তগৃহে বাস করিয়া, সকলকে অকাতরে আনন্দ-বিতরণ করিয়া মহারাজ ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় বলরামভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কয়েকদিন পরের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বলরামভবনে মহারাজ যে খাটটিতে শয়ন করিতেন, তাহার পাশেই ছিল একটা ছোট খাট। মহারাজ একদিন গভীর রাত্রিতে অকস্মাৎ দেখিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া ছোট খাটটির সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। গম্ভীরবদন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মহারাজকে কোন কিছু না বলিয়াই অন্তর্ধান করিলেন। মহারাজ প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন ও বিবিধ বিষয়ে ইঙ্গিত নির্দেশ ইত্যাদি লাভ করিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এইভাবে ঠাকুরের আবির্ভূত হইয়া নিবাক থাকিবার তাৎপর্য কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। সেই ঘরের মেঝেতে শায়িত ছিলেন মহারাজের সেবক। সেবকের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, মহারাজ ছোট খাটটির উপর উদাসভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেবক জানিতে চাহিলেন মহারাজ তামাক সেবন

করিবেন কিনা। মহারাজ সেবকের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, "হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাকিয়ে দেখি ছোট খাটটির সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বললেন না; কিছুই বুঝতে পারছি নে। কেন তিনি চুপ করে দাড়িয়ে থেকে অন্তর্ধান হলেন।" আরও কিছু সময় অতিবাহিত হইল, সেবক পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহারাজ প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার মনে আর কোনও বাসনা নেই, এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—শুধু শরণাগত শরণাগত!" এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্যেও তিনি লীলাসম্বরণের কোন আহ্বান পাইয়াছিলেন কি?

স্বামী সারদানন্দের বিশেষ অনুরোধে মহারাজ কাশীধামে উপস্থিত হইলেন ২০শে জানুয়ারী (১৯২১)। তাঁহার প্রিয় তীর্থভূমি শিবধাম বারাণসীতে তাঁহার শেষবারের মত আগমন। এইবারেই তাঁহার ভাবোদ্দীপ্ত দিব্যজীবনের ঐশ্বর্য সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছিল, ত্যাগী গৃহস্থ সকল ভক্তই তাঁহার দিব্য-চরিত্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারিলেও সকলেই তাঁহার পবিত্র সঙ্গে যেন অমৃত-সুধা পান করিয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতিথি সারাদিন ধরিয়া সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে মহারাজ কুড়িজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস ও পনেরজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। যোগ্যতাদি বিচার না করিয়া অবারিতভাবে প্রার্থীদের আশা পূর্ণ করিলেন। আনন্দে উচ্ছল বুড়োবাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) একটি বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডার দিলেন, নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আপ্যায়িত করিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসবের আনন্দে সকলে মাতিয়া উঠিল। ভক্তদের উদ্যোগে ও গুরুভ্রাতা হরি মহারাজ ও শরৎ মহারাজের উৎসাহে যেন এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হইল। সকালবেলা সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিয়া গেলেন, অতঃপর ভক্তগণ আসিয়া পাদ-পূজাদি করিলেন। সকাল নয়টার পর 'যোগেন-মা' একটি পাত্রে মিষ্টি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় আহ্লাদিত মহারাজ 'এই যে যোগেন-মা, আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। মহারাজের আদেশে সেবক একটি বসিবার আসন পাতিয়া দিলেন। তিনি মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম

করিলেন। পরে হাত ধুইয়া মিষ্টির পাত্রটি মহারাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, একজন সেবক কমণ্ডলু লইয়া আসিল। মহারাজ হাত ধুইয়া বালকের মত আনন্দ করিতে করিতে মিষ্টিগুলি খাইতে লাগিলেন। কী মহাসমারোহে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা মহারাজের লিখিত একটি পত্রের[১] অংশ-বিশেষ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। "তিথিপূজার আগের রাত্রে উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঠাকুরের প্রসাদ সব একসঙ্গেই পাইয়াছিল। যথা—লুচি, তরকারি, ডাল, পায়েস, পানতুয়া। মোটামুটি উৎসব সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রাত্রে ভজনও হইয়াছিল। পরদিন ভোরে ঠাকুরের বাল্যভোগ। যথা······। বেলা দশটার সময় নানা ফল, মিষ্টান্ন, সিঙ্গাড়া, কচুরী দিয়া জলখাবার ভোগ হইয়াছিল এবং তাহাই সকলকে ঠোঙ্গায় করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। পরে বেলা ১২॥টার সময় ভোগ যথা—সবশুদ্ধ প্রায় দুইশত প্রকার ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। পুরুষ ভক্ত প্রায় ১৭৫ এবং স্ত্রীভক্ত প্রায় ৪০ জনকে বসাইয়া সকল দ্রব্য তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করান হইয়াছে। গান-বাজনাও হইয়াছিল। রাত্রে মায়ের একখানি নয়পোয়া প্রতিমা আনাইয়া পূজা হইয়াছিল। পূজক শর্বানন্দ বেশ ভক্তির সহিত পূজা করিয়াছে। পূজান্তে ভোরে চারজন[২] ব্রহ্মচারী বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় তিনটি কুমারী পূজা হইয়াছিল। একটি আমার, একটি তোমাদের, অপরটি ডাক্তার কাঞ্জিলালের। তাহার কুমারী সেই-ই পূজা করিয়াছিল; অপর দুইটি শর্বানন্দ। পূজান্তে কুমারীদের এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন বৈকালে প্রতিমাখানিকে ব্যাণ্ড বাজাইয়া গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হয়, তথায় একখানি বেশ বড় বজরায় করিয়া মাকে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার পর বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কাজটি সুচারুভাবে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজার দিন এখানকার বিখ্যাত নহবৎ ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল। নানা রাগ-রাগিনী আলাপ করিয়া তাহারা সকলকে আনন্দ দিয়াছে।"

উৎসব-অনুষ্ঠান-মুখর দিনগুলির অন্তরালে প্রবাহিত হইতে থাকে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের ধারা। বিবিধ অধিকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী

১ শ্রীমতী রাণুকে ১২।২।২১ তাং লিখিত

২ ইহাদের অন্যতম চারু, তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হয় স্বামী শুভানন্দ।

আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধিত করিবার জন্য অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ মহারাজের নিত্য-নূতন উদ্ভাবনী শক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। কখনও কখনও ধর্মপিপাসু-গণকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত তেজোদীপ্ত অভয় বাণী, কখনও বা ধর্মজীবনের গুহ্য রহস্য। দৃঢ়কণ্ঠে মহারাজ বলেন, "মনের সব বন্ধন কেটে ফেল, সমস্ত গুটিয়ে সেই দিকে লাগিয়ে দাও। এই ত সাধন। সমস্ত মনটাকে concentrate (একাগ্র) করে সেই দিকে লাগিয়ে দিতে হবে যতদিন না অভিলষিত বস্তু লাভ হচ্ছে। খুব খাট, লেগে পড়—এই ত বয়স, বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না। লাগ দেখি একবার জোর করে। দেখবে, মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ, লাগ। জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়—সবই সমান। একটা ধরে ডুবে যাও।"[১] বিস্মিত ধর্মজিজ্ঞাসুর মনে উদ্দীপ্ত হয় আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি। শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে সাধক শোনে তাঁহার অমৃতময় বাণী, "তার পর জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগৎ। এ-জগৎটা যেন তা ছাড়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়—যেমন উদি (মহারাজের পাচক) কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখে বললে, 'ভুবনেশ্বরটা কিছুই না।' তারপর মন লয় হয়ে যায়—তখন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে তা মুখে বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই—অনন্ত! অনন্ত!!······তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে হয়—এটা কিছু নয় মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'।"[২] অচিন-লোক-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাণী মুমুক্ষুর শক্তি-সামর্থ্য শতগুণে বৃদ্ধি করে। ক্ষুরধার মুক্তিমার্গ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ বিশ্বনাথের মর্ত্যরাজ্য অবিমুক্তপুরী কাশীতে মুমুক্ষু সাধকগণের আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধন করিয়া সাধন-শক্তিরূপ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলেন। সেই পূজাগ্নিতে অস্মিতা-মমতা হইতে উদ্ভূত মালিন্যসকল ভস্মীভূত হইল। ব্যক্তি-সাধকের জীবন ভগবদ্‌নিষ্ঠ হইল, সাধুকর্মিগণের সমষ্টিজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বহু রাগরাগিণীতে বেণু বাজাইয়া 'রাখাল রাজ' সকলকে এতই আমোদিত ও মোহিত করিয়াছিলেন যে, কেহ ভুলক্রমেও আশঙ্কা করিল না যে, পুণ্যধাম কাশীতে

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১০৫-০৬,

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১০২-০৩

তাঁহার এই শেষ আগমন। ১৫ই মার্চ কাশী হইতে যাত্রা করিয়া মহারাজ সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। বাহিরে আনন্দানুষ্ঠান ও ভিতরে গভীরে ভগবদানন্দলাভের শক্তির প্রবোধন, এই উভয় ধারার মিলনে প্রায় দুই মাস কাল কাশীতে আনন্দলোক প্রকটিত হইয়াছিল। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার মাধুর্যময় স্মৃতি সকলকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিল।

দোলপূর্ণিমা উপস্থিত হইল। মহারাজ বেলুড়মঠে বাস করিতেছিলেন। মঠবাসিগণ ও কলিকাতা হইতে আগত ভক্তগণ 'রাখাল রাজ' মহারাজকে লইয়া মধুরানন্দে মাতিয়া উঠিলেন। কীর্তনের রোল, রঙ ও আবিরের মাতামাতি, নৃত্যের উল্লাস এবং আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যস্থলে আনন্দময় মহারাজ যে মধুর বৃন্দাবন রচনা করিয়াছিলেন তাহার পুণ্যস্মৃতি ভক্তজনের হৃদয়ে দুর্লভ ধন রূপে সঞ্চিত রহিল।

দক্ষিণ ভারত হইতে সন্ন্যাসী ও অপর ভক্তগণের বারংবার অনুরোধে সাড়া দিয়া মহারাজ গুরুভ্রাতা শিবানন্দজীকে লইয়া ভুবনেশ্বরে দুই সপ্তাহ কাটাইয়া মান্দ্রাজ উপস্থিত হইলেন। আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল, উৎসব-অনুষ্ঠানে আমোদ আহ্লাদ আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল, এদিকে 'ভাবের রাজা' মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মোৎসুক-গণের ধর্মচেতনা প্রবুদ্ধ হইল, ভক্তগণ বিমল আনন্দে ভাসিতে থাকিলেন। ভাষা বর্ণ জাতি ভুলিয়া সকলেই আনন্দে অংশগ্রহণ করে। ভগবৎ-কেন্দ্রিক আনন্দের সীমা নাই, ফলে যে আসে সে ফিরিয়া যায় না। সকলেই আনন্দে মাতিয়া উঠে।

মহারাজের আদেশে মান্দ্রাজ মঠে প্রতিমায় শ্রীদুর্গাপূজা একটি অভিনব ঘটনা। পূজার্চনা অবলম্বন করিয়া আনন্দময় পুরুষ মহারাজ মুক্তহস্তে সকলকে আনন্দ দান করিয়া মাতাইয়া রাখিলেন। শিবানন্দজী ২১।১০।২১ তারিখে মান্দ্রাজ হইতে লিখিলেন, "... ...এখানে মায়ের পূজা অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ-দেশে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ নূতন—লোকজনে দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছে। সাত্ত্বিকভাবে শাস্ত্রবিহিত পূজায় এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও খুব খুশী। আবার শ্যামাপূজাও প্রতিমায় হইবে মহারাজের ইচ্ছা—প্রতিমা কলিকাতা হইতে আসিবে। বাংলাদেশের দক্ষ কারিগরের হাতে গড়া দেবীমূর্তি সভক্তি পূজোপাসনায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। তামিল, মারহাটি ও বাংলা ভজন-কীর্তনে পূজাপ্রাঙ্গণ স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করিল। মহাষ্টমীর দিন চারিশত ভক্ত প্রসাদ ধারণ করিয়া মহামায়ীর জয়ধ্বনি দেয়। দশমীর সায়াহ্নে

সমুদ্রের তীরে পাঁচ শত ভক্তের উপস্থিতিতে প্রতিমা নিরঞ্জন হইল। বিজয়া দশমীর কোলাকুলি, প্রণাম, প্রীতিবিনিময়ে মুখরিত বিজয়া-উৎসব মান্দ্রাজবাসিগণকে এক নূতন—মধুর অভিজ্ঞতা দান করিল।"

পূজার কয়েকদিন পরের একটি ঘটনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মান্দ্রাজ হইতে একটি পত্রে[১] মহারাজ লিখিয়াছেন, "কাল সন্ধ্যার সময় এখানকার মহারাষ্ট্রীয় ভক্তেরা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমি আর যাই নাই। বাকী সকলেই প্রায় গিয়াছিল। তাহারাও দুইদিন মঠে আসিয়া ভজনাদি করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, দোহারে গায় এবং একজন মাত্র পুরুষ থাকে—বড় চমৎকার গায়, সকলেই বিশেষ ভক্তিমতী। শুনিলাম গতকাল তাহারা বেশ ভজনাদি করিয়াছিল এবং পরে আমাদের সংক্ষিপ্ত রামনাম শুনিয়া বড় আনন্দ করিয়াছে।" বালগোপালের উপাসক মহিলাবৃন্দ অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া মহারাজকে একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের ঘটনা। মহারাজের কয়েকজন শিষ্যসেবক তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট নিম্নলিখিত ঘটনা শোনা যায়।

মহারাজ মধ্যখানে বসিয়াছিলেন একটি ইজিচেয়ারে, মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণে ও রামলালদাদা বামে। মহারাজের সম্মুখে একটি গামলায় সুগন্ধি জল ও যাবতীয় পূজোপকরণ। মারাঠী রমণীগণ মহারাজকে প্রণাম করিয়া গুরুবন্দনা করিলেন। গোপালের পূজা সমাপনান্তে তাঁহারা মহারাজের পূজা আরম্ভ করিলেন। জলচৌকীর উপর একটি রূপার পাত্রে মহারাজের শ্রীচরণযুগল স্থাপনপূর্বক সুগন্ধিজলে পা ধৌত করিয়া তাঁহারা মাথার চুল দিয়া পা মুছাইলেন। তারপর একটি ভেলভেটের গদীর উপর পদযুগল রাখিয়া ফুল, চন্দন ও ছোট একগাছি মালা দেওয়া হইল। উপস্থিত প্রত্যেক রমণী এইভাবে পাদপূজা করিলেন। মহারাজ ভাবস্থ হইয়া নীরবে পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন। অনন্তর রমণীগণ প্রত্যেকে একটি দুধের কেঁড়ে কাঁখে তুলিয়া ও হাতে একটি গেলাস লইয়া মহারাজকে বেড়িয়া গানসহযোগে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গাহিতেছিলেন নামদেব রচিত গান,

দুধ পিও মেরে রাজগোপালা, দুধ পিও মেরে নন্দদুলালা।
কালারে বাছোরা কপিলা গাই, দুধ দোহায়ন নাম লাগি॥ ইত্যাদি

১ ২২।১০।২১ তারিখে লিখিত পত্র।

নৃত্যপরা এক একজন রমণী মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দুধপূর্ণ একটি গেলাস ধরিতেছিলেন। ভাবস্থ মহারাজ গেলাসের পর গেলাস দুধ খাইতেছিলেন। এইভাবে জীবন্ত গোপাল-বিগ্রহের পূজা-সেবা চলিতে থাকিল। নৃত্যগীত থামিলে মহিলারা প্রত্যেকে মহারাজকে প্রণাম করিয়া পূজা-সেবা শেষ করিলেন। অনেক সময় পরে মহারাজ সহজাবস্থায় ফিরিলেন। এইভাবে সেইদিন বালগোপাল মহারাজকে লইয়া ভক্তিমতী রমণীগণের উৎসব সমাপ্ত হইল।[১] কথিত আছে এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, "এখানেই মহারাজের স্বরূপ-স্মৃতি উদ্দীপিত হয়ে গিয়েছিল।"

মহারাজের লীলা-সম্বরণের অব্যবহিত প্রায় ষোল মাস পূর্ব হইতে দশ মাসের মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হইল। ইহাদের মধ্যে কোন ঘটনা হইতে তাঁহার স্ব-স্বরূপের উদ্দীপন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি আধিকারিক পুরুষ, নিয়ত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। তাঁহার দৈব স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কোন বাহ্যিক উদ্দীপকের অপেক্ষা রাখে কিনা তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। প্রকৃত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনা বিশেষকে উদ্দীপক অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষদের দৈব প্রকৃতি উন্মোচিত করিবার জন্য এইরূপ কোন উদ্দীপক অবশ্যই প্রয়োজন এই কথা বলা চলে না।

মহারাজ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সাত মাস থাকিয়া মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে অধ্যাত্মচেতনা অধিকতর প্রবুদ্ধ করিলেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে, নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানে তিনি ভক্তগণের ধর্মবোধ গভীরতর হইতে সাহায্য করিলেন। এইস্থলেও লক্ষণীয় বিষয়, মহারাজের এই তৃতীয় ও শেষ দাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় তাঁহার আনন্দময় সত্তার বিবিধ ঐশ্বর্য সর্বাধিক প্রকটিত দেখিয়া সাধু ব্রহ্মচারী গৃহস্থভক্ত সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

তিনি ভুবনেশ্বরমঠে ফিরিয়া আসিলেন ২১শে নভেম্বর (১৯২১)। সেবকগণ লক্ষ্য করিলেন, মহারাজ অধিকতর অন্তর্মুখ হইয়াছেন। সর্বদাই নিজের ভাবে থাকিতেন। মঠের প্রাঙ্গণে পায়চারি করেন। তখনও উন্মনা ভাব। শোনা যায়, এই সময়ে তিনি গুরুভ্রাতা শিবানন্দজীকে দুইবার বলিয়াছিলেন, "তারকদা,

১ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ও স্বামী প্রভবানন্দ হইতে প্রাপ্ত।

এবার আপনারা সব দেখেশুনে নিয়ে আপনারাই চালান। আমি এখন এক জায়গায় পড়ে থাকতে চাই।" ভুবনেশ্বর মহারাজের অতি প্রিয় তীর্থস্থান। পরবর্তী-কালে শিবানন্দজী বলিতেন, "মহারাজ ভুবনেশ্বরমঠে নিত্য বর্তমান আছেন।"

বেলুড়মঠে শ্রীমায়ের সমাধিস্থানের উপর মাতৃমন্দির নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। সারদানন্দজীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা মহারাজ মাতৃমন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন। কিন্তু মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর, বেলুড়মঠে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ভুবনেশ্বরমঠেও বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হইল।

কলিকাতা যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসিতেছিল। মহারাজ ২৩।১২।২১ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেন, 'কলিকাতায় যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ খুব তাড়া দিতেছে।' কয়েকবার কলিকাতা যাত্রার দিন স্থিরও হইল। কিন্তু যাওয়া হইল না। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে লইয়া যাইতে নিজে আসিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি কলিকাতা রওনা হইবার দিন স্থির করিলেন। ভুবনেশ্বর শেষবারের মত ছাড়িয়া মহারাজ স্বামীজীর জন্মতিথির পূর্বে ১২ই জানুয়ারী (১৯২২) সকালবেলা বেলুড়-মঠে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে আসিলেন শিবানন্দজী, রামলালদাদা ও মহারাজের সেবকবৃন্দ।

২০শে জানুয়ারী স্বামীজীর জন্ম-মহোৎসব মহারাজের উপস্থিতিতে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইল। দিবারাত্র উৎসবানন্দের ধারা বহিয়া চলিল। রাত্রে ভজন-কীর্তন ও ৺শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইল, পরদিন ঊষাকালে মহারাজ চৌদ্দজন যুবককে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সকালে সারদানন্দজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। মহারাজ কুশল প্রশ্নাদির পর বলিলেন, "দেখ, একদিন উদ্বোধনে মাদ্রাসী রান্নাভোগ দিতে হবে।" আনন্দিত সারদানন্দজী বলিলেন, "তুমি যেদিন বলবে সেদিনই হবে। তোমায় কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে।" নির্ধারিত দিন ২৯শে জানুয়ারী মহারাজ 'উদ্বোধনে' উপস্থিত হইলেন। শ্রীঠাকুরের নিকট দক্ষিণদেশীয় রান্না-ভোগ নিবেদনের পর দুই গুরুভ্রাতা অন্যান্যদের সহিত আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মহারাজ সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

৩০শে জানুয়ারী মহারাজের জন্মতিথি। বেলুড়মঠে ভক্তগণের সমাবেশ হইল। সকাল হইতেই আনন্দের হাট বসিয়াছে। দোতলায় মহারাজের ঘরখানি পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত। সেবকগণ মহারাজকে নূতন রেশমী বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে সুন্দর ফুল ও পাতার মুকুট, কপালে শ্বেতচন্দন, গলায় শ্বেতবর্ণের মালা; এইরূপ মনোহর সাজে বিভূষিত হইয়া মহারাজ একজন সদানন্দময় বালকের মত বসিয়া রহিয়াছেন ও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছেন। সারদানন্দজী ঠাকুরঘরে প্রণাম সারিয়া মহারাজের ঘরে আসিলেন এবং নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা দুইজনে বারান্দায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন, ভক্তগণ একে একে আসিয়া প্রণাম করিলেন। উপস্থিত ভক্তদের সম্মুখে মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "সাধু হবে নিরৈশ্বর্য, তবুও যদি তাঁহার কিছু ঐশ্বর্য হয় তা ঝরঝরে ত্যাগবৈরাগ্যই হওয়া উচিত।" জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করে, "মহারাজ গৃহীর কোন্ ঐশ্বর্য থাকা উচিত—বিদ্যা, ধন, ভক্তি কোন্‌টা?" মহারাজ তাঁহার স্বভাব-মধুর কণ্ঠে বলেন, "ভক্তি লাভ করা কি সহজ কথা? লোকে বিদ্যা লাভ করতে পারে, ধনবান হ'তে পারে, কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভক্তি কখনও লাভ হতে পারেনা।" প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাপ্রভু যাঁর ভাবের আতিশয্যে জগৎ ভুল হয়ে যেত, এমন কি দেহের পর্যন্ত হুঁস থাকত না, তিনিই প্রকৃত বলতে পারেন 'ন ধনম্ ন জনম্ ন সুন্দরীম্' ইত্যাদি, অন্যের মুখে ওকথা বলা সহজ হতে পারে, কাজে কিন্তু তা হয় না। যেমন লোকে স্বপ্নে এক কাঁদি, দুই কাঁদি, তিন কাঁদি কলা খেতে পারে। কিন্তু তাতে পেট ভরে না।" তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভক্তগণ অন্যত্র গেলেন। শ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও বহুবিধ ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহারাজ নিজেই একবার ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া কেমন হইতেছে দেখিয়া আসিলেন। রাত্রিতে ৺শ্যামাপূজার পর উৎসব সমাপ্ত হইল। পরদিন সন্ধ্যায় মহারাজ বলরামভবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ কয়েকজন সেবক সঙ্গে শাঁখারীটোলার ভক্ত শচীন রায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করেন। পরদিন রামলালদাদাও যোগদান করেন। মহারাজ এই ভক্তগৃহে তিনদিন অবস্থান করেন এবং ঠাকুরঘরে শ্রীঠাকুরের পটস্থাপনা করেন। মহারাজকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া বাড়ীর সকলে আনন্দে আত্মহারা হইল। এই ভক্তগৃহে মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের

নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়।……সেও final (চরম) নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, তবে অনেক দূর উপরে নিয়ে যায়। তখনই বাইরের জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না—অস্তিনাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।”[১] কতভাবেই না মহারাজ অধ্যাত্মরাজ্যের উত্তুঙ্গ অনুভূতি-সকলের ইঙ্গিত দিয়া সাধকগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন! আনন্দের মধ্যে যেন অতি দ্রুত অতিবাহিত হয় তিনটি দিন। ২০শে তারিখ বিকালবেলা মহারাজ যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে বাড়ীর লোকজন বিষণ্ণ মনে কাঁদিতে থাকিল। রসিকচূড়ামণি মহারাজ একটি হাসির গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতাগণ কান্না ভুলিয়া হাসিতে যোগদান করিল। মহারাজ গল্প বলেন এবং ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতে থাকেন। ক্রমে নীচে আসিয়া তিনি যখন মোটর-গাড়িতে উঠিলেন, তখন তাঁহার গল্প বলাও শেষ হইল। কয়েকদিন ভক্ত পরিবারের লোকজনকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া তাঁহাদের জন্য রাখিয়া গেলেন অতুলনীয় এক সুখস্মৃতি।

বলরামভবনে একরাত্রি বাস করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে আহারান্তে মহারাজ প্রায় কুড়িজন সঙ্গী সাধু, ব্রহ্মচারী, ভক্ত লইয়া আঁটপুর গ্রামে গমন করিলেন। প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি এই স্থান। প্রেমানন্দজীর পূর্বাশ্রমের বসতবাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণের বহুবিধ স্মৃতির সহিত জড়িত। আঁটপুর গ্রামে প্রেমানন্দজীর ভ্রাতা শান্তিরামবাবুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য মহারাজ কয়েকদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরদিন সকালবেলা মহারাজ আঁটপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন। তদুপলক্ষে আহূত সভায় মহারাজের আদেশে ভক্ত ডাক্তার বিপিনবাবু একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শিক্ষার অভাবে দেশের কি দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন।

মহারাজের শুভাগমনে শান্তিরামবাবুর বাড়ী উৎসব-মণ্ডপে পরিণত হইল।

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৪৮-৪৯

গ্রামবাসিগণ দলে দলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিল। মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্যের সহিত বৃদ্ধ-যুবা-বালক সকলকেই নানাভাবে আনন্দ পরিবেশন করিলেন। ২৪শে তারিখে ছিল শিবরাত্রি। মহারাজ ও তাঁহার অনুগামিগণও শিবরাত্রিব্রত সেখানেই উদ্‌যাপন করিলেন। মহারাজ সেইদিন ঘোষেদের বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণীর ধারে শিবমন্দিরে চারি প্রহরে চারিবার শিবপূজা করাইয়াছিলেন। ভজনপূজনে মহানন্দে পুণ্য দিনটি অতিবাহিত হইল।

২৭শে বিকালের ট্রেনে তিনি হাওড়া হইয়া মঠে ফিরিয়া গেলেন, আঁটপুর গ্রামবাসীদের জন্য রাখিয়া গেলেন এমন এক মধুর আনন্দস্মৃতি, যাহার বৃত্তান্ত সেখানকার গ্রামবাসী এখনো সাশ্রুনয়নে বলিতে বলিতে আনন্দ লাভ করে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী[১] ঠাকুরের জন্মতিথি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইল। রাত্রিবেলা ৺শ্যামাপূজার পর তিনজন প্রার্থীকে মহারাজ সন্ন্যাস দেন। লীলা-সম্বরণের পূর্বে প্রায় তিনবৎসর তিনি উদারহস্তে প্রার্থীগণকে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য দিয়াছিলেন। ৫ই মার্চ রবিবার শ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবে অগণিত নরনারী কীর্তন-শ্রবণ, ঠাকুর-দর্শন ও প্রসাদ-ধারণ করিয়া আনন্দ লাভ করিল।

বেলুড়মঠে আনন্দের মধ্য দিয়া কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ১৩ই মার্চ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রচারকার্যের জন্য পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংবাদ মাঝে মাঝে আসিতেছিল। অবশেষে ২২শে মার্চ উপস্থিত হইল। মহারাজ কলিকাতায় বলরামভবনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সকালবেলা মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের ডাকিয়া ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মাণের গুরুদায়িত্ব সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্বামীজীর সংকল্পকে রূপদান করা যে সকলেরই দায়, ইহা সকলের মনে গাঁথিয়া দিলেন। ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের জন্য স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের নক্সাটি বাহির করাইয়া মহারাজ উহা কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেদিন সকালবেলায় তিনি বলরামভবনে উপস্থিত হইলেন। কেহ আশঙ্কাও করিল না যে আনন্দের রাজা মহারাজ স্থূলদেহে মঠে আর আসিবেন না।

বলরামভবনে মহারাজ আনন্দের আসর পাতিলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের।

---

১ এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতা পোর্টকমিশনার্স বেলুড়ে ফেরি ষ্টীমার চালু করে।

দুইদিন্ পরে অকস্মাৎ এক বিপদ সংকেত সকলকে সচকিত করিয়া তুলিল, ভক্তগণের মনে আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনীভূত হইল। মহারাজ সকালবেলা যথারীতি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিছুদূর যাইয়া শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় বলরামভবনে ফিরিয়া আসিলেন। মনে হইল তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ আসিয়া ঘোষণা করিলেন—উহা বিসূচিকা।[১] বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর চিকিৎসায় তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আটদিন পরে ১লা এপ্রিল তাঁহাকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। কঠিন রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের সহিত কৌতুক করিয়া, কখনও ধর্ম-প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে যেন ভুলাইয়া রাখিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় উক্তি—'দুঃখ জানে আর শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থেকো' পরিস্ফুট হইয়াছে। পরদিন তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী হলঘরে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার দেহ বহন করিয়া লইবার সময় সেবকদের নিকট উহা ভারী ঠেকিতেছে অনুমান করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে মরা হাতী লাখ টাকা।" সকলে হাসিয়া উঠিল। দুইদিন ভালভাবে কাটিল। অনেকেই উৎকণ্ঠা-মুক্ত হইলেন, তিনি শীঘ্রই নিরাময় হইয়া উঠিবেন ভাবিয়া আশায় উৎফুল্ল হইলেন।

কিন্তু আশার আলো বিষাদের কাল ছায়ায় আবার আবরিত হইল। রামনবমীর দিন, হঠাৎ বহুমূত্ররোগের উপসর্গ প্রবল আকারে দেখা দিল। পূর্বে একবার বহুমূত্রের সামান্য সূচনা হইলেও উহা সারিয়া গিয়াছিল। বহুমূত্রের সহিত নানাবিধ উপসর্গও দেখা দিল; শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। চিকিৎসকগণ প্রমাদ গণিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্‌গণ অনেকেই বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ নিরাময়ের কোনও সম্ভাবনা দেখা

১ এই দিনের একটি ঘটনা বলিয়াছেন 'মাসিক বসুমতীর' সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"গত ২০ই চৈত্র শুক্রবার প্রাতে আমরা এই পত্রিকা প্রচারের আয়োজনের পূর্বে পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ লইতে বাগবাজারের ভক্তচূড়ামণি বলরামবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। মহারাজ তখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্যামবাজারের পথ হইতে ফিরিয়াছেন; কিন্তু রোগের আক্রমণ তখনও প্রকট হয় নাই। চিরস্নেহশীল মহারাজ সেই দুর্বল শরীরেও সদাহাস্য-প্রফুল্ল-মুখে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন ও কল্পনার সকল কথা প্রায় আধঘন্টা ধরিয়া শুনিলেন—হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নবদনে প্রকাশের অনুমতি দিলেন—আশীর্বাদ করিলেন।"

(মাসিক বসুমতী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃঃ ১৩২)

গেল না। এদিকে মহারাজের সদানন্দময় বালকভাবটি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার দেখিতে আসিলে তিনি বালকের মত আব্দার ধরিলেন, "আমায় ভাল করে দিন—আমি ভাল হব।" কখনও সেবকদের বলিতেন, "আমায় ভুবনেশ্বরে নিয়ে চল, সেখানকার কূয়োর জল খেলে ভাল হয়ে যাব।" একটু থামিয়া আবার বায়না ধরিতেন, 'কলকাতার বদ্ধ বাতাস ভাল লাগ্‌ছে না, ভুবনেশ্বর চল, সেখানে মুক্ত বাতাস।' সেবক তাঁহাকে প্রবোধ দেয়, "আপনি এখন যে বড় দুর্বল।" মহারাজ বলেন, "আর তিন-চার দিন পরে বেশ যেতে পারব।"

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিন গড়াইয়া চলিল। ভক্তগণ হতাশায় নিমজ্জিত হইতে থাকিল। অবস্থার কোন উন্নতি না দেখিয়া সারদানন্দজী কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব করিলেন। ইহা শুনিয়া মহারাজ সকৌতুকে বলিলেন, "হেকিমিটা আর বাকী থাকে কেন?"

খ্যাতনামা কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। একদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া দেখিলেন মহারাজ নিমীলিত চক্ষে শুইয়া আছেন। কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বানে তিনি তাকাইলেন; কবিরাজ মহাশয়ের কপালে বিভূতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য আর সব মিথ্যা।" কবিরাজী চিকিৎসাতেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না, বরঞ্চ গাত্রদাহ, জলতৃষ্ণা ইত্যাদি উপসর্গ বৃদ্ধি পাইল। একবার 'মাষ্টারমশাই' আসিয়া মহারাজের নিকট বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কষ্ট হচ্ছে কি?" মহারাজ প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে যে পরমানন্দে প্রতিটি দিন কেটেছে তা স্মরণ করলে কোথায় কষ্ট কোথায় দুঃখ?"[১]

৮ই এপ্রিল, শনিবার, দুপুরবেলা বলরামবাবুর বাড়ীর মেয়েদের অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন, "তোমাদের ভয় কি? আমি আশীর্বাদ করছি।" সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাপদবাবু দেখিতে আসিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্' —আমার অবস্থা এখন এইরকম, তোমরা এইটি ধারণা কর।" হঠাৎ তাঁহার মুখ-

১ স্বামী ওঁকারানন্দজী হইতে প্রাপ্ত।

মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দিব্যভাবে অভিভূত হইয়া যেন গভীর-ধ্যান-মগ্ন হইলেন।

রাত্রি নয়টার সময় তিনি পার্শ্বস্থিত সেবকের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "কেরে?" সেবক নাম বলিলেন। মহারাজ স্নেহমাখা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গণেশ, আমার সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের পূজা করবি। ভয় কি বাবা? আমার সেবা করছিস্—আমি আশীর্বাদ করছি—ভগবানে ডুবে যা। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে। আমি বলছি তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" কণ্ঠস্বর ক্রমেই যেন রোধ হইয়া আসিল। একটু পরে সমীপাগত শিষ্যসেবকদের অনুরূপ আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সকলকে বলিলেন, "তোরা ভগবানকে ভুলিস্‌নে। তোদের কল্যাণ হবে।" একবার তিনি শরৎ মহারাজের খোঁজ করিলেন। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য 'উদ্বোধনে' লোক ছুটিল।

নীরব নিস্তব্ধ ঘর, সকলে গভীর উৎকণ্ঠা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ঘরের নীরবতা ভাঙ্গিয়া মহারাজের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। বিস্ফারিত নয়নে সকলে শুনিতে থাকিল মহারাজের মধুর স্বর, "ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে ভেসে যাচ্ছি। বিবেক—আমার বিবেক! বিবেকানন্দ! বাবুরামদা, বাবুরামদা, যোগেন—যোগেন!" কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল তিনি বলিতেছেন, "আহা-হা! ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।" মহারাজ হয়ত পিপাসার্ত হইয়াছেন অনুমান করিয়া একজন সেবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু লেমনেড দিই?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "রোস্, আগেই বস্তু ঠিক করেনি। মন যে ব্রহ্মলোক থেকে নামতে চায় না। দে ব্রহ্মে লেমনেড ঢেলে দে।" একটু লেমনেড পান করিয়া পরক্ষণেই আবার বলেন "একি হল, ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলছি, আবার লেমনেড লেমনেড করছি।"

ভক্ত ও সাধুবৃন্দ, গুরুভ্রাতা শিবানন্দজী, অভেদানন্দজী এই অলৌকিক ঘটনা ও দৈববাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল, সকলের অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি নামিয়া আসিল। রাত্রি গভীর। শরৎ মহারাজ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "ভাই শরৎ, আমার যে ব্রহ্মবেদান্ত গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "তোমার আবার গোল কি মহারাজ! ঠাকুর ত তোমায় সব করে দিয়েছেন।" তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রায় গিইছি; কেবল

একটু পাচ্ছিনে। ব্রহ্ম তিমির।" মহারাজের চিত্ত এখন নীড়মুখী; অনেকেরই মনে হইতেছিল শ্রান্ত পথিক দিনশেষে যেন খুঁজিতেছেন বিশ্রান্তির স্নিগ্ধতা।

ইহার পর তিনি কিছু সময় স্থিরভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার দিব্য আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল ও অপলক দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল তিনি ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে তিনি আধ-আধ ভাষায় মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল, দে দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে, —আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছে, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! তোরা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? তোদের চোখ নেই! আহা হা, কি সুন্দর! আমার কৃষ্ণ কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়।"

"দেখ দেখ একটি কাঁচ ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বল্‌ছে, আয় চলে আয়। এবারের খেলা শেষ হল। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।"

মহারাজ নীরব হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে তাঁহার স্ব-স্বরূপের সুস্পষ্ট বিবৃতি শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। এদিকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ বিষণ্ণবদনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাবধান বাণী স্মরণ করিয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজকে আর ধরে রাখা যাবে না।" কমলে কৃষ্ণ, সেই বালক কৃষ্ণের হাত ধরিয়া নূপুর পায়ে নৃত্যরত রাখাল বালক! শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবদর্শন পুনরায় মহারাজের নিজমুখে শুনিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন; এক দিব্যভাবের আবেশ সকলকে মোহিত করিল। কিন্তু আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু মহারাজের মর্ত্যলীলায় ছেদ পড়িবার সময় আগতপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের হৃদয় আশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

পরদিন রবিবার। ধীর স্থির গম্ভীর পরিবেশ, মহাযোগী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শায়িত। মাঝে মাঝে তাঁহার দিব্য আশীর্বাণী শোনা গেল; আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া রবিবার গত হইল। সোমবার দিবাভাগও উত্তীর্ণ হইল। সন্ধ্যার পর অকস্মাৎ তাঁহার দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল, অর্ধ-নিমীলিত আঁখিদ্বয় উন্মুক্ত হইল; সুদূরে দৃষ্টি স্থির, বদনমণ্ডলে অপার্থিব দ্যুতি। সন্ধ্যা ৮-৪৫ মিনিটে মানসপুত্র 'রাখালরাজ' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিরসামীপ্য লাভ করিলেন; 'রাখালরাজে'র নিত্যলীলায় প্রবেশ গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণের উপস্থিতিতেই সংঘটিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের একটি মধুর অঙ্কের যবনিকা পড়িল।

মহারাজের মর্ত্যলীলার সমাপ্তি বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ আর্তনাদ করিয়া উঠে। চক্ষের সম্মুখ হইতে প্রেমিক পুরুষের অন্তর্ধানে ভক্তগণের প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। আবেগ ক্রমে প্রশমিত হইলে প্রশান্ত চিত্তে অন্তর্মুখীন ভক্ত হৃদয়রূপ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যক্ষ করেন রাখালরাজের নিত্যলীলা। শুনিতে পান কৃষ্ণসখার মধুর নূপুর-ধ্বনি ; তাঁহার আশ্রিতজনেরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন আশ্রিতবৎসল মহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন ; কৃপাপ্রাপ্তগণের কেহ কেহ অনুভব করেন, মহারাজের পঞ্চভূতের দেহ অপসৃত হওয়াতে তিনি তাহাদের জীবনের সবক্ষেত্রেই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন।

মর্ত্যলীলা সম্বরণের দিন শুক্লা চতুর্দশী ২৭শে চৈত্র, ইংরাজী ১০ এপ্রিল, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ।[১] রাখালরাজের নিত্যলীলা সন্দর্শন-অভিলাষী ভক্ত-সাধক কৃষ্ণসখার পদকমলে নিত্য নিবেদন করেন হৃদয়ের প্রণতি ঃ

কালিন্দী ফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দং নমস্তুভ্যং সদ্‌গুরো লোকনায়ক ॥[২]

১ ১১ই এপ্রিল বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে গঙ্গাতীরে মহারাজের মরদেহ পূত হোমাগ্নিতে সমর্পিত হয়। সমাধিস্থানে রচিত হয় স্মৃতি মন্দির। দুই বৎসর পর মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে 'ব্রহ্মানন্দ মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ মহারাজের মহাসমাধিলাভের বারদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগ-রাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহারের জন্য স্বামী সারদানন্দ শ্লোকটি রচনা করেন।

দশম অধ্যায়

ঘটনালহরী

দশম অধ্যায়

ঘটনালহরী

১৮৬৩, ২১ জানুয়ারী : বসিরহাটের অন্তর্গত শিকরা গ্রামে রাখালচন্দ্রের জন্ম সেদিন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, মঙ্গলবার, বাংলা সন ১২৬৯, ৮ই মাঘ।

১৮৬৮ : মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে বালকের মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা দ্বিতীয়দার পরিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পত্নী হেমাঙ্গিনী স্নেহযত্ন দ্বারা বালকের মায়ের অভাব মিটাইতে সচেষ্ট হন।

১৮৭৫ : রাখালের কলিকাতায় আগমন ও ট্রেনিং একাডেমীতে পড়াশুনা আরম্ভ। বাড়ীর নিকটবর্তী এক ব্যায়ামাগারে নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় হয় এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে।

১৮৮১ প্রারম্ভ : নরেন্দ্র ও তাঁহার প্রেরণায় রাখাল ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।

১৮৮১ মধ্যভাগ : আঠার বৎসরের রাখালচন্দ্রের সাহিত এগার বৎসরের বিশ্বেশ্বরীর পরিণয় ঘটে। এই সংসারবন্ধন চিরকালের জন্য সংসারসম্বন্ধ-ছেদনের পরোক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

জুন/জুলাই : ভক্ত মনোমোহনের সহিত রাখালচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে আগমন ও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন।

শেষভাগ : দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ভাগবতের পণ্ডিতের কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের পদসংবাহনে রত রাখালের প্রথম ভাব হয়। এই সময় হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত যুবক রাখালের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব দৈব বালকত্ব প্রকটিত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে মাতা যশোদারাণীর ন্যায় লালন-পালন করিতেন।

১৮৮২ প্রথম ভাগ : শ্যামপুকুরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুলে রাখাল কিছুকালের জন্য অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সহপাঠী বাবুরাম

ঘোষের সহিত রাখালের বন্ধুত্ব হয়। রাখাল তাঁহাকে একদিন বিদ্যালয়ের পরে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

১৮৮৩, ১১ মার্চ : ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া ও সংসারকর্মে অবহেলা করিয়া ধর্ম-জীবনে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া পিতা রুষ্ট হন। পুত্রকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এইদিন রাখালের পিতা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন।

শেষ ভাগ : দক্ষিণেশ্বরে রাখালের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় ঠাকুরের নির্দেশে তিনি কলিকাতায় ভক্ত অধর সেন ও বলরাম বসুর গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন।

১৮৮৪, ২ ফেব্রুয়ারী : কয়েকদিন পূর্বে ভাবস্থ ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বামহস্তের একখানি হাড় সরিয়া যায়। এইদিন ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের মধ্যে একটি লীলাবিলাস ঘটিয়াছিল।

আগস্টের মধ্যভাগ : রাখাল প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে রাখাল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ভক্ত বলরাম বসুর সহিত বৃন্দাবনধামে গমন করেন। প্রথমে 'বৃন্দাবনের জ্বরে' অসুস্থ হইয়া পড়িলেও পরে স্বাস্থ্যের উন্নতিলাভ করেন। তাঁহার মনোজগতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

১৮৮৫, ৯ আগস্ট : দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে মহিমাচরণ ব্রহ্মচক্র রচনা করেন। অন্যতম যোগদানকারী রাখাল অল্প সময়ের মধ্যে গভীরভাবে আবিষ্ট হইলেন।

১১ আগস্ট : দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত অকস্মাৎ মৌন অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শ্রীমা, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তগণ কান্নাকাটি করেন।

২ অক্টোবর : শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি পাইলে তিনি কলিকাতায় ৫৫ শ্যামাপুকুর ষ্ট্রীটের ভাড়াবাড়ীতে নীত হইলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।[১]

৬ নভেম্বর : ৺শ্যামাপূজার রাত্রে অন্যান্য ভক্তদের সহিত রাখালও শ্রীরামকৃষ্ণদেহে আবির্ভূত শ্রীজগন্মাতার পূজা করেন।

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫, শনিবার প্রাতঃকালে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। বলরাম বসুর বাড়ীতে এক সপ্তাহ বাস করিয়া শ্যামপুকুরের ভাড়া-বাড়ীতে উঠিয়া যান। সেইদিনটি ছিল ২রা অক্টোবর।

১১ ডিসেম্বর : চিকিৎসকের পরামর্শে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরের এক উদ্যান-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের বাছাই করিয়া বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা দিতে থাকেন। এই স্থানেই তিনি ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন।

১৮৮৬, ৭ মার্চ : রবিবার, ঠাকুরের জন্মতিথি-দিবস। তাঁহার পীড়ার জন্য সামান্য আয়োজন হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

১৬ আগস্ট : শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি, রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, সন ১২৯৩।

২১ আগস্ট : শ্রীমা ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদিদিকে বলরাম বসু তাঁহার গৃহে লইয়া আসেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কাশীপুর বাগানবাটী হইতে বলরামভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

২৩ আগস্ট : শ্রীরামকৃষ্ণের পূত দেহাস্থির কিয়দংশ রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদের উদ্যোগে কাঁকুড়গাছি উদ্যানবাটীতে সমাহিত করা হয়। সেদিন জন্মাষ্টমী, ৭ই ভাদ্র, ১২৯৩।

৩০ আগস্ট : শ্রীমা বৃন্দাবনধামের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেন। সঙ্গে যান যোগীন, কালী ও লাটু।

১৯ অক্টোবর (৩রা কার্তিক, ১২৯৩)[১] : শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে ভক্ত 'সুরেন্দর' অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র প্রমুখ ত্যাগী ভক্তবৃন্দ মিলিত হন। গঙ্গার সন্নিকটে মুন্সীবাবুদের একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আনা হয় ও পরে 'শ্রীজী' স্থাপনপূর্বক যথারীতি পূজা-সেবাদি আরম্ভ হয়। বরাহনগর মঠ শুরু হয়।

২৬ অক্টোবর : ১০ই কার্তিক কালীপূজা-দিবসে সারারাত্র ব্যাপিয়া ৺শ্যামাপূজা মঠে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর শেষভাগ : নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণ আঁটপুরে গমন করিয়া বাবুরামের জননীর আতিথ্যগ্রহণ করেন। একদিন সন্ধ্যাকালে ধুনীর চতুষ্পার্শে বসিয়া তাঁহারা ঈশার জীবন ও বাণী অনুধ্যান করেন। তাঁহারা গৃহত্যাগ

১ স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন : "১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠের গোড়াপত্তন হয়।" (আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৩৫) কথামৃতকার ২১।২।১৮৮৭ তাং লিখিয়াছেন : "বরাহনগর-মঠ সবে পাঁচমাস স্থাপিত হইয়াছে।" এই তথ্যের সূত্র স্বামী শঙ্করানন্দের ডায়েরী।

করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। ঐ শুভক্ষণটি ছিল খৃষ্টসন্ধ্যা। রাখাল উপস্থিত ছিলেন না।

বাবুরামের মাতার অনুরোধে রাখাল, নরেন্দ্র, বাবুরাম ও বুড়োগোপাল কয়েকদিন পর সেখানে আসিয়া বাস করেন।

১৮৮৭, জানুয়ারী ৩য় সপ্তাহ: বরাহনগর মঠে শ্রীঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজা-হোম অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নাম হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

১৮৮৮, নভেম্বর: শ্রীমায়ের সহিত ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ পুরীধামে যাইয়া তপস্যাদি করিতে থাকেন। সন্তানদের কঠোরতা দেখিয়া শ্রীমা কষ্ট পাইতেছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা দুই মাস পরে বরাহনগরমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৮৯, ৪ ফেব্রুয়ারী: শ্রীমা ও অন্যান্যদের সহিত ব্রহ্মানন্দজী আঁটপুর, তারকেশ্বর, কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যান। আনুমানিক মাসখানেক পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

ডিসেম্বর প্রথম ভাগ: ব্রহ্মানন্দজী কোন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীমায়ের অনুমতিও লাভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দকে সঙ্গী করিলেন। তাঁহারা দুইজনে ঠাকুরের নাম স্মরণপূর্বক তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বৈদ্যনাথধামে পূর্ণ মুখার্জীর বাটীতে দুইদিন বাস করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল বাস করেন। পূর্বের ইচ্ছা অনুযায়ী হরিদ্বারে যাইবার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিলেন।

ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ: এক বাঙালী পরিব্রাজককে সঙ্গী করিয়া ব্রহ্মানন্দজী ও সুবোধানন্দজী প্রথমে নর্মদাতটে ওঁকারনাথে গমন করিলেন। তথা হইতে গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে যাইয়া তিনদিন অবস্থান করেন। সেস্থান হইতে বোম্বাই যান ও ৺মুম্বাদেবীর মন্দির পার্শ্বে নির্জনে আটদিন বাস করেন; ইহার পর ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। পরদিন সাতক্রোশ দূরে বেটদ্বারকায় পদব্রজে গমন করেন। দ্বারকা হইতে জাহাজে সুদামাপুরী বা পোরবন্দর যান; তথা হইতে পদব্রজে জুনাগড় হইয়া গির্নার পর্বত—সেখান হইতে পদব্রজে গুজরাট হইয়া আমেদাবাদ যান, এইস্থানে দুইদিন অবস্থান করেন; পুষ্করতীর্থে যাইয়া আট/নয় দিন বাস করেন।

১৮৯০, ফেব্রুয়ারী প্রথম সপ্তাহ : স্বামী সুবোধানন্দকে লইয়া ব্রহ্মানন্দজী বৃন্দাবন আসিয়া পৌঁছাইলেন। কিছুকাল ফৌজদার-কুঞ্জে ও অবশিষ্ট সময় কালাবাবুর কুঞ্জে ব্রহ্মানন্দজী বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন।

এপ্রিলের মধ্যভাগ : স্বামী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে মহারাজ নিঃসঙ্গভাবে সাধন-সাগরে দক্ষ ডুবুরীর মত ডুব দিলেন।

১৩ মে : ব্রহ্মানন্দজী ভাবচক্ষে দর্শন করিলেন ভক্ত বলরামের জ্যোতির্ময় মূর্তি স্বর্গে আরোহণ করিতেছে। পরদিন তারযোগে সংবাদ আসিল ভক্ত বলরাম মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

২৫ মে : ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের দেহত্যাগ সংবাদে ব্যথিত হইলেন।

সেপ্টেম্বর শেষভাগ : ব্রহ্মানন্দজী পদব্রজে হরিদ্বার গমন করিলেন এবং কনখলে একটি ঝুপড়িতে তপস্যায় রত হইলেন।

নভেম্বর প্রথম ভাগ : স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্গী গুরুভ্রাতাগণ কনখলে ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলিত হন। মীরাটে গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ অসুস্থ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য সকলে সাহারাণপুর হইয়া মীরাটে উপস্থিত হন ৫ই ডিসেম্বরের অব্যবহিত পরে এবং অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন।

মীরাটে সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে তথাকার শেঠজীর বাগান দ্বিতীয় বরাহনগর মঠে পরিণত হয়। এখানে তাঁহারা মাসাধিককাল অবস্থান করেন।

১৮৯১, জানুয়ারী ১/২ : স্বামীজী একদিন সকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দিল্লী চলিয়া যান। তাঁহার অনুসন্ধানে ব্রহ্মানন্দজী প্রমুখ গুরুভ্রাতারা দিল্লী যাইয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হন।

ফেব্রুয়ারী প্রথমভাগ : স্বামীজী আলোয়ারে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী দিল্লী ও নিকটবর্তী তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানাদি দর্শন করেন।

মার্চ শেষভাগ : ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইলেন। দিল্লী হইতে গোপীনাথপুরে জ্বালামুখীতে যাইয়া কয়েকমাস অবস্থান করেন। সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে কাংড়া, বৈজনাথ, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগুমরী, মুলতান ও সক্করের নিকট সাধুবেলায় যান। তথা হইতে করাচী হইয়া জাহাজে করিয়া বোম্বাই উপস্থিত হন।

১৮৯২, ফেব্রুয়ারী প্রথমভাগ : মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত

হয়। শিবানন্দজী আলমবাজার মঠ হইতে ৬/৫/১৮৯২ তারিখের একটি পত্রে লিখেন, "আমি গুরুদেবের জন্মতিথির দিন এখানে পৌছাই, পরে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পবিত্র জন্মস্থান দর্শন করিতে যাই।" ঐ বৎসর ঠাকুরের জন্মতিথির তারিখ ছিল ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২, সোমবার।

১৮৯৩, এপ্রিল ৩য় সপ্তাহ: বোম্বাইয়ে ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ মিলিত হন। তাঁহারা একত্রে যাত্রা করেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতাদ্বয়ের আবু পাহাড়ে তপস্যার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া খেতড়ি যাত্রা করেন।

মে ১৬/১৭ ঃ আবু রোড স্টেশনে স্বামীজীর সহিত মহারাজ ও হরি মহারাজের সাক্ষাৎ হয়।

জুলাই প্রথম সপ্তাহ ঃ ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী একত্রে আজমীর গমন করেন। তাঁহারা জয়পুরে সর্দার হরি সিং এর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন।

জুলাই ৩য় সপ্তাহ: ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনধামে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন এবং কুসুমসরোবরের নিকটে বাস করিতে থাকেন।

১৮৯৪, জুন মধ্যভাগ: অযোধ্যার পথে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী লক্ষ্ণৌ আসেন এবং জনৈক ভক্তের গৃহে তাঁহারা শিবানন্দজীর সাক্ষাৎ পান।

জুন শেষভাগ: ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী অযোধ্যাধামে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। আগষ্টমাসের শেষভাগে ব্রহ্মানন্দজী একাকী বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং অজগরবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন।

নভেম্বর শেষ সপ্তাহ ঃ উত্তরকাশীতে চাতুর্মাস্য সমাপনান্তে শিবানন্দজী ফৈজাবাদে আসিয়া তুরীয়ানন্দজীর সহিত মিলিত হইলেন। আনুমানিক ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা আলমবাজারমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৫, জানুয়ারী প্রথমভাগ: তৃপ্তহৃদয়ে ব্রহ্মানন্দজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার জীবনে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হইল।

১৪ই সেপ্টেম্বর ঃ ইংরাজী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়।

ডিসেম্বর ঃ ব্রহ্মানন্দজী কয়েকদিনের জন্য বাহিয়াতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করেন এবং বিপিনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। (সেখান হইতে ২২শে

ডিসেম্বর মহারাজ লিখিয়াছেন বোধ হয় কোন কারণবশতঃ আমাকে কলিকাতা সত্বর যাইতে হইবে)।

১৮৯৬, ১ এপ্রিল : প্রচারকার্যের জন্য স্বামী সারদানন্দ লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন।

জুলাই : ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭, ২০ ফেব্রুয়ারী : স্বামী বিবেকানন্দকে কলিকাতা নগরী বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাইল। মার্চ মাসের মধ্যভাগে স্বামীজীকে লইয়া মহারাজ দার্জিলিং-এ যান ; এখানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করা হয়। মাঝে ২২শে হইতে ২৬শে মার্চ স্বামীজী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন খেতরিরাজের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। অবশেষে স্বামীজী ও মহারাজ ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মার্চ : স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজে যাইয়া একটি মঠ সংগঠন করিলেন।

১ মে : বলরামভবনে আহুত ভক্তমণ্ডলীর সভায় রামকৃষ্ণ প্রচার বা মিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মিশনের সাধারণ সভাপতি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

১৫ মে : রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সংঘবদ্ধ আর্তত্রাণসেবা মুর্শিদাবাদে আরম্ভ হয় স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে। ক্রমে সারগাছিতে আশ্রম স্থাপিত হয়।

১৮৯৮, ২৮ জানুয়ারী : মার্গারেট নোবল (পরে ভগিনী নিবেদিতা) কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

৩ ফেব্রুয়ারী : বেলুড়গ্রামে জমি কিনিবার বায়না করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারী : ১৩০৪ সনের মাঘী পূর্ণিমা। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ রামকৃষ্ণপুরে ভক্ত নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে যান। স্বামীজী ঐ বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেইদিনই তিনি মুখে মুখে "স্থাপকায় চ" প্রণাম-মন্ত্রটি রচনা করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী : বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়িতে মঠ সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারী : স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছান. কিছুদিন পরেই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মে সাহায্য করিতে থাকেন।

২২ ফেব্রুয়ারী : মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা অনুষ্ঠিত হয় নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়িতে।

২৭ ফেব্রুয়ারী : রবিবার। দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ জন্ম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই স্বামী বিবেকানন্দ কাঁধে করিয়া "শ্রীজাকে" লইয়া নূতন জমিতে স্থাপনপূর্বক পূজা ও হোম সুসম্পন্ন করেন।

৫ মার্চ : মঠের জন্য বেলুড়ে জমি রেজেষ্ট্রি করা হয়।

২৫ মার্চ : স্বামীজী মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন। তাঁহার নাম হয় নিবেদিতা।

৩০ মার্চ : স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিং রওয়ানা হন। কলিকাতায় প্লেগের সংবাদ পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন ৩রা মে। পুনরায় ১১ই মে আলমোড়া যাত্রা করেন।

৭ এপ্রিল : শ্রীমা মঠের নূতন জমিতে প্রথম পদার্পন করেন।

মে প্রথম ভাগ : প্লেগে পীড়িত ও ভয়ার্ত কলিকাতাবাসীদের সেবা করিতে থাকেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুকর্মিগণ।

২১ জুন : 'রথযাত্রার দিন শ্রীমাতাঠাকুরাণী বাগবাজার হইতে জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বর্দ্ধমানে গরুর গাড়ী ও পাল্কী না পাওয়াতে মা সদলবলে ২৩শে জুন কলিকাতায় ফিরেন।' (ব্রহ্মানন্দজীর ডায়েরী)

১৮ অক্টোবর : স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য সদানন্দকে লইয়া অকস্মাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত নূতন জমি ও মঠবাড়ীর নির্মাণকার্য দেখিতে যান। মঠে সন্ধ্যার ক্লাশে স্বামীজী তাঁহার তিনটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি "Mother Kali".

২৮ অক্টোবর : নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি' দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২ নভেম্বর : শ্রীমা তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের ছবি লইয়া মঠের জমি দেখিতে আসেন, শ্রীমা নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সম্পন্ন করেন।

১৩ নভেম্বর : সেদিন ৺শ্যামাপূজা। শ্রীমা আসিয়া নিজহস্তে পূজা করেন প্রস্তাবিত নিবেদিতার বিদ্যালয়ভবনে। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করেন।

৯ ডিসেম্বর : বেলুড়ে মঠবাড়ীতে নবনির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা

হইয়াছিল।[১] সেদিন অগ্রহায়ণ, ১৩০৫, একাদশী, শুক্রবার। ইহার দুইদিন পরে ১১ই ডিসেম্বর স্বামী প্রেমানন্দ বৃন্দাবন হইতে এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বেনারস হইতে মঠে আসেন।

২০ ডিসেম্বর : শ্রীমা নূতন মঠ-বাড়ী পুনরায় দেখিতে আসেন।

১৮৯৯, ২ জানুয়ারী : নিজস্ব জমিতে নবনির্মিত মঠগৃহে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল।

১৪ জানুয়ারী : রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা পাক্ষিক মুখপত্র উদ্বোধন ১৮, রামচন্দ্র মৈত্র লেন হইতে প্রকাশিত হয়।

৩ ফেব্রুয়ারী : স্বামীজী মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭ ফেব্রুয়ারী : গুজরাট অঞ্চলে ধর্মপ্রচার ও অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড়মঠ হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩ মার্চ : সোমবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিউৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পরবর্তী রবিবার ১৯শে মার্চ সাধারণ উৎসব বেলুড়মঠে প্রথম উদ্‌যাপিত হয়। সেইদিনই হিমালয়ক্রোড়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়।

২৮ মার্চ : স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করেন।

৩১ মার্চ : কলিকাতায় প্লেগরোগের জন্য পুনরায় সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

১৯ জুন : স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার বিদেশ যাইবার প্রাক্কালে মঠে এক অভিনন্দনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বামীজীর প্রস্তাব অনুসারে মঠের ঘরবাড়ী সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের জন্য উপস্থিত সকলে তিনবার করতালি দিয়া ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্নকে অভিনন্দন জানায়।

২০ জুন : বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দ মঠের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে লিখিয়া দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না, পরে স্থির হয় কয়েকজন গুরুভ্রাতা ট্রাস্টীরূপে নিযুক্ত হইবেন।

সেইদিন দুপুরে সকলে মায়ের বাড়ীতে প্রসাদ ধারণ করেন। স্বামী

১ মঠ ডায়েরীতে পাওয়া যায় : 9th Dec, 1898 : Thakoor was taken to new Math and the new Math was consecrated.

বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের প্রায় সকলেই প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলেন।

২৩ জুলাই ঃ মঠবাসীদের নিকট স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

৯ আগষ্ট ঃ শ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে হরিপ্রসন্ন মানস-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহার নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

১৬ নভেম্বর ঃ ভাগলপুর ঘোঘাতে সেবাকার্যের জন্য স্বামী সদানন্দ যাত্রা করেন। পরে সেবাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।

২৭ ডিসেম্বর ঃ সাধু নাগমহাশয় দেহত্যাগ করেন।

১৯০০, ৩ জানুয়ারী ঃ বেলুড়মঠের জমির উপর মিউনিসিপ্যালিটির অন্যায়ভাবে ট্যাক্স ধার্য করার বিরুদ্ধে হাওড়াকোর্টে মামলা রুজু করা হয়। পরে এই মামলা হাইকোর্টেও উঠে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের ভক্ত এটর্নি পল্টুবাবুর সাহায্যে ইহার তদারকি করিতেন।

৩ মার্চ ঃ শনিবার, শ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা। সারদা মহারাজের ভ্রাতা সত্যকাম সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। ১১ই মার্চ সাধারণ উৎসবে প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ত্রিশটি কীর্তন দল সারাদিন কীর্তন করে। বিকালে বসুমতীর সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন।

৯ ডিসেম্বর ঃ কাহাকেও পূর্বে না জানাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অকস্মাৎ রাত্রিবেলা বিদেশ হইতে বেলুড়মঠে উপস্থিত হইলেন। আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

১৯০১, ২৫ জানুয়ারী ঃ ঠাকুরঘরে সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্রাদি সহ স্বামীজী-রচিত "খণ্ডন-ভব-বন্ধন" গীত হয়।

৩০ জানুয়ারী ঃ বেলুড়মঠ ট্রাস্ট গঠিত হয় এবং রেজিষ্ট্রি করা হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী।

১০ ফেব্রুয়ারী ঃ স্বামীজীর উপস্থিতিতে বেলুড়মঠের ট্রাস্টিগণের প্রথম সাধারণ সভা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি ও স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৬৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসব, প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম। সরবৎ, লুচি, হালুয়া, খিচুড়ি, আলুর দম, এমন কি জল ও তামাক সবসাধারণে পরিবেশন করা হয়।

১৮ মার্চ : স্বামীজী সদলবলে পূর্ববঙ্গে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১২ই মে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

জুন : কনখলে স্বামী কল্যাণানন্দ সেবাশ্রমের স্ত্রপাত করেন।

১৯ হইতে ২১ অক্টোবর : মঠে প্রথম ৺দুর্গাপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

১৯০২, ৪ জুলাই : রাত্রি ৯-১০ মিঃ স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিযোগে নরদেহ ত্যাগ করিলেন।

২৯ জুলাই : স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া মঠে আসিয়া পৌছান।

২৩ আগষ্ট : কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি সংগঠিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর : স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

১৯ অক্টোবর : স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ হইতে আসেন এবং সপ্তাহখানেক মঠে বাস করেন।

২ নভেম্বর : ১৭ নং বোসপাড়া লেনে বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য নারীবিদ্যালয় সুরু হয়। নেতৃত্বে ভগিনী নিবেদিতা।

১৯০৩ মধ্যভাগ : ব্রহ্মানন্দজী উত্তরভারতে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। সঙ্গে যান স্বামী সুবোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী জ্ঞান। কাশীধামে মহারাজ একমাস বাস করেন। কাশীধাম হইতে কনখলে যাইয়া মহারাজ তথায় একমাস বাস করেন। অতঃপর বৃন্দাবনে যাইয়া তপস্যারত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত দুইমাস বাস করেন ও সাধনভজন করেন।

নভেম্বর : প্রথম সপ্তাহে[১] বৃন্দাবন হইতে রওয়ানা হইয়া এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট একদিন বাস করেন। সেখান হইতে বিন্ধ্যাচলে যাইয়া প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করেন। বিন্ধ্যাচল হইতে বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ডিসেম্বরে।

১৯০৪, মার্চ : ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরেই মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ একচল্লিশ দিন ভোগেন। কিছু সুস্থ হইয়া উঠিলে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েকদিন শিমুলতলায় বিরজানন্দকে লইয়া বাস করেন।

১ ৬।১১।১৯০৩ তাং প্রেমানন্দজী লিখেন, "রাখাল বৃন্দাবনে আছে শীঘ্র আসিবে।"

পরে স্বামী সারদানন্দকে লইয়া পুরীধামে গমন করেন—আনুমানিক নভেম্বরের শেষে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

৯ মে : কনখলে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দেহত্যাগ করেন।

শেষভাগে : ভাগলপুর সহরে প্লেগ মহামারীতে সেবাকার্য স্বামী সদানন্দের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৫, ১৭ ফেব্রুয়ারী : প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য মান্দ্রাজমঠের পরিচালনায় একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬, ৭ জানুয়ারী : আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে হিন্দুমন্দিরের উদ্বোধন হয়।

১৯০৬ : ঠাকুরের তিথিপূজার দিন শেষরাত্রে মহারাজ অমূল্য, কৃষ্ণলাল ও যোগীন্দ্রকে সন্ন্যাস দান করেন এবং অপর দুইজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। স্বামীজীর মহাসমাধির পর ইহাই প্রথম সন্ন্যাস। এইবারেই রামকৃষ্ণানন্দজী বিরচিত ব্রহ্মচর্যব্রতের মন্ত্রসমূহ প্রথম ব্যবহার করা হয়।

১৫ এপ্রিল : স্বামী বোধানন্দ প্রচারের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন।

১৯০৬, ৫ জুন : মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দকে লইয়া কলিকাতা হইতে ভদ্রক হইয়া পুরী গমন করেন। পরে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে আসিয়া যোগদান করেন।

১৩ জুন : আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সাহায্যের জন্য স্বামী প্রকাশানন্দ যাত্রা করেন।

৮ জুলাই : 'গোপালের মা' ৺গঙ্গালাভ করেন।

১৩ আগষ্ট : আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ ও মান্দ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পুরীতে আসেন মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য।

১৭ আগষ্ট : পূর্ববঙ্গে নোয়াখালিতে ত্রাণকার্য শুরু হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর : মহারাজ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে লইয়া আত্মগুণেশ্বর মন্দির দর্শন করিতে যান। পুরীতে ফিরিয়া আসেন ১৭ই সেপ্টেম্বর।

১০ নভেম্বর : স্বামী অভেদানন্দ বোম্বাই হইতে স্বামী পরমানন্দকে লইয়া আমেরিকার উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করেন।

২৮ নভেম্বর : মহারাজ কোঠারে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

২৬ ডিসেম্বর : কোঠার হইতে যাত্রা করিয়া মায়াবতী-প্রত্যাগত মিসেস সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাতের জন্য মহারাজ বেলুড়মঠ আসিয়া পৌঁছাইলেন পরের দিন।

১৯০৭, ৬ মে : কিছুদিন মঠে ও কলিকাতায় বলরামভবনে বাস করিয়া এইদিন মহারাজ পুরী যাত্রা করেন।

১ ডিসেম্বর : মহারাজ পুরী হইতে ভদ্রকে গমন করেন এবং ৮ই ডিসেম্বর কোঠারে উপস্থিত হন।

১৯০৮, ১২ জানুয়ারী : বছরখানেক পূর্বে বৃন্দাবনে আর্তদেব সেবার জন্য যে কেন্দ্রটি সংগঠিত হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ মিশন উহার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২৫ জানুয়ারী : ২৪শে বেলা দুইটার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মহারাজ ট্রেন ধরিতে পারেন নাই। পরদিন শনিবার রওয়ানা হইয়া মহারাজ রবিবার, ২৬শে জানুয়ারী ভোরে মঠে পৌঁছাইলেন।

২ ফেব্রুয়ারী : অর্ধোদয়যোগ উপলক্ষে মঠে খুব আনন্দোৎসব ও সারাদিন গানবাজনা হয়। তীর্থযাত্রীদের সেবার কার্য পরিচালিত হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারী : রামকৃষ্ণপুরে ভক্ত শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে নূতন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহোৎসব মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দপূর্ণ হয়।

৯ এপ্রিল : মহারাজ বেলুড়মঠ হইতে কাশীধামে যান। ১৬ই এপ্রিল মহারাজ নূতন জমিতে সেবাশ্রমের গৃহের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ২৮শে এপ্রিল কাশী হইতে রওয়ানা হইয়া মহারাজ দানাপুরে উপস্থিত হন, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

২১ জুন : মহারাজ কলিকাতা হইতে পুরীধামে যাত্রা করেন।

২৭ অক্টোবর : স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত মহারাজ পুরী হইতে মান্দ্রাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

ডিসেম্বর মধ্যভাগ : মহারাজ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যান এবং এক সপ্তাহ তথায় অবস্থান করেন। মহারাজ শ্রীরামেশ্বরের আরাধনা এবং শ্রীপর্বতবর্ধিনীর পূজা-অর্চনাদি করেন।

ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ : মহারাজ মাদুরায় অবস্থান করিয়া ৺মীনাক্ষী দেবী ও ৺সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করেন।

১৯০৯, ২০ জানুয়ারী : ব্যাঙ্গালোরে নিজস্ব জমিতে প্রস্তুত আশ্রমগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মহারাজ। মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়।

৪ মে : রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সরকারের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ ধারানুসারে রেজেষ্ট্রি করা হয়।

জুন প্রথম সপ্তাহ : দক্ষিণ ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহারাজ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রেমানন্দজীর ৫।৬।১৯০৯ তাং পত্রে জানা যায় মহারাজ ৬।৬।০৯ তারিখে কলিকাতা হইতে কোঠার যাত্রা করেন। পরবর্তী নয় মাস তিনি পুরী অথবা কোঠারে বাস করিয়াছিলেন। কোঠারে বসুবাটীতে ৺শ্যামচাঁদ বিগ্রহের নিত্য পূজাসেবা হইত।

২৬ ডিসেম্বর : "কোঠার : বেলা সাড়ে নয়টায় কীর্তনসহ বাহির হই। বেরো নদীর তীরে অপেক্ষা করি। একটু পরে মহারাজের পাল্কী দেখা গেছে খবর আসে ও তোপ পড়ে। মহারাজকে দেখে বড় আনন্দ। কীর্তনাদিসহ প্রথম ঠাকুরবাড়ী পরে হরিঘাট ও আনন্দবাজার দেখাইয়া চৌরি ঘরে আনা হয়। বিপিন, ম্যানেজার ও এই দাস তাঞ্জাম কাঁধে করিতে পারিয়াছিল।" (রামকৃষ্ণ বসুর ডায়েরী হইতে)

২৮ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিকাল ৪৷৷০-টায় স্বামী অদ্বৈতানন্দজী স্বধামে গমন করেন।

১৯১০, ১ মার্চ : কোঠার হইতে মহারাজ রওয়ানা হন। পরদিন প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছান।

১৩ মার্চ : "৺ঠাকুরের জন্মতিথি···। গিরিশবাবু, মাষ্টারমশাই, পুলিনবাবু, পূর্ণবাবু, শ্যাম ও আরও অনেকে আসিয়াছে। মহারাজের সহিত রামনাম সংকীর্তনে অনেকে যোগ দেয়।···খুব আনন্দের স্রোত চলে।" (রামকৃষ্ণ বসুর ডায়েরী)

২০ মার্চ : শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব। প্রায় ৩০ হাজার লোকের সমাগম হয়।

২৫ মার্চ : ৺দোলযাত্রা। এইদিনের একটি ফটোতে বেলুড়মঠে আনন্দরত মহারাজকে দেখা যায়।

১৬ মে : শিবানন্দজী, রামলালদাদা ও বহু সাধুভক্ত লইয়া মহারাজ কয়েকদিন পূর্বে কাশীধামে আসিয়াছিলেন। এই শুভদিনে সেবাশ্রমের নবনির্মিত প্রধান গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন হয়। রামপুরা হইতে সম্পূর্ণ উঠিয়া আসিয়া নূতন বাড়ীতে সেবাশ্রমের কার্য চালু হয় ৪ঠা জুলাই হইতে। এইবারে মহারাজ কাশীতে তিন সপ্তাহ থাকিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। মহারাজ ২৩শে মে বেলুড়মঠে উপস্থিত ছিলেন।

৩০ মে : বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ পুরীধামে রওয়ানা হন। এবং পুরীতে কয়েক-মাস অবস্থান করেন।

১২ জুলাই : কাশী সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে মিনার্ভায় বিল্বমঙ্গল ও জনা অভিনীত হয়। গিরিশবাবুও অভিনয় করেন।

২৯ নভেম্বর : পুরী হইতে মহারাজ কলিকাতা যাত্রা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে লইয়া স্বামী প্রেমানন্দ ১৮ই ডিসেম্বর কাশী হইতে যাত্রা করিয়া বেলুড়মঠে আসেন।

১৯১১, ৬ জানুয়ারী : মহারাজ প্রেমানন্দজীকে লইয়া স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরী-দেবীকে দেখিতে যান। তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। মহারাজ অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া মঠে ফিরেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী : রামকৃষ্ণপুরে শ্যামবাবুর বাড়ীতে মহোৎসবে মহারাজ যোগদান করেন, রামনাম হয়। রাত্রে হয় রামায়ণ গান।

১৮ ফেব্রুয়ারী : গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) বেলা ৩-টায় কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

২ মার্চ : শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব মহারাজের মঠে উপস্থিতিতে অধিকতর আনন্দদায়ক হয়।

২২ মে : মহারাজ পুরী যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। "ষ্টেশনে অসংখ্য লোক মহারাজকে দেখিতে আসে। ফুলমালা দিয়া মহারাজকে সাজাইয়া দেয়। অতি সুন্দর দৃশ্য। জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। ৫॥০-টায় ট্রেন ছাড়ে।"

৯ জুন : পীড়িত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৯ই জুন মান্দ্রাজ হইতে রওয়ানা হইয়া কলিকাতায় শ্রীমায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।

২৫ জুলাই : মঙ্গলবার বিকাল ৫-টায় স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরীদেবী দেহত্যাগ করেন।

২১ আগষ্ট : সকল প্রকার প্রচেষ্টা বিফল করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী দেহত্যাগ করেন বেলা ১-১০ মিনিটে।

১৩ অক্টোবর : ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিঙ্ সহরে দেহত্যাগ করেন। পরম-স্নেহাস্পদ নিবেদিতার পরলোকগমনের সংবাদে মহারাজ মর্মাহত হইলেন।

১৪ অক্টোবর : ঠাকুরের গৃহীভক্ত কলিকাতা ইন্টালী পল্লীর শ্রীরামকৃষ্ণ শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দেহত্যাগ করেন। এই কেন্দ্রে মহারাজ কয়েকবার গিয়াছিলেন, তথায় গৃহীত মহারাজের একটি ফটো দেখিতে পাওয়া যায়।

২০ ডিসেম্বর : মহারাজ হরি মহারাজ, কেদার মহারাজ ও অন্যান্যদের লইয়া ৺ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিতে যান। বিকালে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

২১ ডিসেম্বর : পুরী হইতে মহারাজ ও হরি মহারাজ কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

১৯১২, ৯ ফেব্রুয়ারী : ভোর ২-টায় মহাত্মা গিরীশচন্দ্র ঘোষ দেহত্যাগ করেন। মহারাজের আদেশে মঠ হইতে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী তাঁহাকে শেষ দর্শন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতে যান।

২০ মার্চ : মহারাজ হরিমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, কেদার মহারাজ প্রভৃতিকে লইয়া হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। এইবার মহারাজ কয়েকমাস কনখল সেবাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন।

১৬ হইতে ১৯ অক্টোবর : কনখলে প্রথম ৺দুর্গাপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে মহারাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের এক সমষ্টি ভাণ্ডারায় বহুবিধ আহার্য দ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। বেলুড়মঠে শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে ১৬ থেকে ২১শে অক্টোবর ৺দুর্গাপূজায় প্রচুর আনন্দ হয়।

নভেম্বর : ৺কালীপূজার পূর্বে মহারাজ সদলবলে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী ৫ই নভেম্বর কাশীধামে আসিয়াছিলেন; তিনি আশ্রমের নিকটস্থ কিরণ দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই যাত্রায় মহারাজ প্রায় ছয়মাস কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন।

১৯১৩, ২৩ এপ্রিল : মহারাজ বেলুড়মঠের উদ্দেশে যাত্রা করেন।[১]

২ জুন : মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দকে লইয়া আটপুর গমন করেন। সেখানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া ৮ই জুন প্রত্যাবর্তন করেন।

৬ জুলাই : ৪০।৫০ জন ভক্ত লইয়া মহারাজ মাহেশে গমন করেন এবং রথযাত্রা দর্শন করেন। সঙ্গে সংকীর্তন দল থাকায় ও মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয়।

১৫ আগষ্ট : কাঁথিতে বন্যার্তদের সেবার জন্য সাধুকর্মী প্রেরিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সেবার কাজ চলে।

১ কাশী হইতে মহাপুরুষ মহারাজ ২৩।৪।১৩ তারিখে লিখেন, "আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মঠে যাইতেছেন।"

৪ অক্টোবর : নীরদ মহারাজের জননী নিস্তারিনীদেবীর নামে কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমে ৺দুর্গাপূজার আয়োজন হয়। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মহারাজ সদলবলে হাওড়া হইতে কাশীধাম রওয়ানা হন।

১৯১৪, আগষ্ট : শ্রাবণী পূর্ণিমা, ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে কাশী হইতে মহারাজ সদলবলে আযোধ্যায় যান এবং এক রাসমন্দিরে পাঁচরাত্রি বাস করেন এবং ঝুলনযাত্রা উৎসব দেখিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৬ নভেম্বর : কাশী হইতে এলাহাবাদে আসিয়া মহারাজ ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দের সহিত মহারাজ আজ মঠে আসিলেন।

১০ ডিসেম্বর : সানফ্রান্সিসকোতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মরদেহ ত্যাগ করেন।

১৯১৫, মে : বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ পুরীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রথযাত্রার উৎসবে যোগদান করেন।

১৮ অক্টোবর : স্বামী সুবোধানন্দের কোঠার হইতে লিখিত পত্রে জানা যায়, "রাখাল মহারাজ ভদ্রকে শারীরিক ভাল আছেন। অমূল্য ও বিশ্বরঞ্জন মহারাজের কাছে আছেন।"

১০ ডিসেম্বর : স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, "আজ প্রাতেই পূজ্যপাদ মহারাজ মঠে আসিয়াছেন। ভদ্রকে ভালই ছিলেন।"

১৯১৬, ১৬ জানুয়ারী : বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ বাবুরাম মহারাজ ও অন্য সাতজন সাধুব্রহ্মচারীকে লইয়া আসামে ৺কামাখ্যাতীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করেন এবং যথাবিধি ক্ষেত্রকর্মাদি করেন। ২০শে জানুয়ারী মহারাজ পাণ্ডাদের খাতায় সহি করিয়াছিলেন।

২০ জানুয়ারী : মহারাজ মৈমনসিংহ পৌছান এবং শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য জিতেন দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করেন।

২৫ জানুয়ারী : বুধবার সকাল ১০ টায় মহারাজ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঢাকায় তিনি ৯, ট্রেনিং কলেজ রোডে অবস্থিত কাশিমপুরের জমিদার বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ ঢাকা মঠ ও মিশন কেন্দ্রের গৃহের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর একদিন মহারাজ জয়পুর ষ্টেশন হইয়া তিন ক্রোশ পথ হাতীর পিঠে চড়িয়া কাশিমপুরে যান। তাঁহার সম্মানার্থে স্থানে স্থানে বৃহৎ

তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। কয়েকদিন সেস্থানে থাকিয়া মহারাজ ঢাকায় ফিরিয়া আসেন।

ঢাকা হইতে মহারাজ নারায়ণগঞ্জ যান এবং ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। একদিন মহারাজ ভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভিটা দর্শনার্থে দেওভোগ গিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ এবং সেইস্থান হইতে ট্রেনে কলিকাতায় আসেন।

২৬।২৭ ফেব্রুয়ারী: মহারাজ সদলবলে নারায়ণগঞ্জ হইতে বেলুড়মঠে আসিয়া পৌঁছান।

২১ জুলাই: মহারাজ কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন এবং ২৩ জুলাই মান্দ্রাজ পৌঁছান।

৪ আগষ্ট: মহারাজ মান্দ্রাজে নূতন মঠগৃহের ভিত্তিস্থাপন করেন।

১২ আগষ্ট: মহারাজ ব্যাঙ্গালোরে আশ্রমে উপস্থিত হন।

৪ নভেম্বর: বৈকালে মোটরযোগে মহারাজ শিবসমুদ্রম্ গমন করেন এবং তথায় সাতদিন অবস্থান করেন।

১১ নভেম্বর: মহারাজ মহীশূরে যান এবং শ্রীচামুণ্ডাদেবী দর্শন করেন।

১৫ নভেম্বর: মহারাজ মহীশূর হইতে ট্রেনে আসিয়া ব্যাঙ্গালোর উপস্থিত হন।

২৫ নভেম্বর: রাত্রিবেলা ট্রেনে রওয়ানা হইয়া বেলা ২টায় আলওয়াইতে পৌঁছান। সেখান হইতে এরনাকুলাম যান ২৯শে এবং পরদিন সকালবেলা মোটরবোটে কোট্টায়মে উপস্থিত হন। তাঁহারা হরিপাদ পৌঁছাইলেন ২রা ডিসেম্বর। সেখানে আশ্রমে তিনদিন বাস করিয়া মহারাজ ৫ই ডিসেম্বর কুইলানে সদলবলে পৌঁছাইলেন।

৭ ডিসেম্বর: মহারাজ ত্রিবান্দ্রম পৌঁছাইলেন। সেখানে অনন্তশয়ান শ্রীপদ্মনাভ বিগ্রহ দর্শন করিয়া মহারাজ খুব আনন্দলাভ করেন।

৯ ডিসেম্বর: ত্রিবান্দ্রমের নাট্টায়মে নূতন সংগৃহীত জমি খণ্ডের উপর মহারাজ আশ্রমগৃহের "শিলাপ্রতিষ্ঠা" করিলেন।

১০ ডিসেম্বর: ত্রিবান্দ্রম্ হইতে মোটরে রওয়ানা হইয়া মহারাজ সন্ধ্যার কিছুপূর্বে কন্যাকুমারী পৌঁছিলেন। এই যাত্রাপথে প্রত্যেক স্থান হইতেই দুই-চারিজন ভক্ত মহারাজের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কন্যাকুমারী পৌঁছাইয়া দেখা গেল এইভাবে বত্রিশজন ভক্ত একত্রিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজকর্মচারীরা মহারাজের জন্য একটি দ্বিতল গৃহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭ ডিসেম্বর : কন্যাকুমারী হইতে যাত্রা করিয়া নাগেরকৈলে মহারাজ দুই রাত্রি অবস্থান করিলেন। ১৯শে দুপুর ১২ টার সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন।

১৯ ডিসেম্বর : পথে বিখ্যাত সুচীন্দ্রমের মন্দির দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় কুইলনে পৌঁছান।

২৮ ডিসেম্বর : সকাল ৭ টায় যাত্রা করিয়া এরনাকুলামে রাত্রি ৯ টায় পৌঁছাইলেন। পরদিন বেলা ১২-২০ মিঃ ট্রেনে আরোহণ করিয়া ৩০শে ডিসেম্বর ভোরবেলা ব্যাঙ্গালোর উপস্থিত হন।

১৯১৭, ২১ জানুয়ারী : ব্যাঙ্গালোরে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ জানুয়ারী : ব্যাঙ্গালোর হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন সকালে মহারাজ মান্দ্রাজ পৌঁছান।

৬ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ পেরেমবুদুরে শ্রীরামানুজাচার্যের জন্মস্থান দর্শন করেন ও সেখানে পূজা দেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ সদলবলে ত্রিচিনপল্লী হইয়া বালসুব্রহ্মণ্য শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির দর্শন করিলেন। ত্রিচিনপল্লীতে শিবপার্বতী, গণেশ, জম্বুকেশ্বর, আচণ্ডালেশ্বর মন্দিরাদি দর্শন করিবার জন্য তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি মান্দ্রাজমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী : শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে দুইজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দান করেন।

৪ মার্চ : মহারাজ পার্থসারথির মন্দির দর্শন করেন।

৮ মার্চ : মহারাজ মান্দ্রাজ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের একটি ভোজ দেন। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা।

৯ মার্চ : মহারাজ কাঞ্চীপুরম গমন করেন এবং বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরের নিকট একটি গৃহে অবস্থান করেন। পরদিন বিকালে তিনি শিবকাঞ্চীতে যান। ১১ই তারিখ তিনি বরদারাজের মূর্তি দর্শন করেন। মান্দ্রাজ ফিরেন ১২ই মার্চ।

২৪ মার্চ : মহারাজ তিরুপতিতে যান এবং শ্রীবালাজীর বিগ্রহ দর্শন করিয়া খুব আনন্দলাভ করেন। সাতদিন তথায় বাস করিয়া ৩১শে মার্চ মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৪ এপ্রিল : অক্ষয়তৃতীয়া-দিবসে নূতন মঠবাড়ীতে মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

৬ মে : মহারাজ মান্দ্রাজে ছাত্রাবাসের নবপ্রস্তাবিত গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৯ মে : মান্দ্রাজ হইতে রওয়ানা হইয়া মহারাজ ১১ই মে পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। ৪ঠা জুন কলিকাতা হইতে হরিমহারাজ, শরৎমহারাজ ও ডাক্তার কাঞ্জিলাল উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শশী-নিকেতনে বাস করিতে-ছিলেন।

১৫ জুলাই : মহারাজের নির্দেশে স্বামী শঙ্করানন্দ ভুবনেশ্বরে আসিয়া প্রস্তাবিত মঠের জন্য ৪'৪২ একর এক খণ্ড জমি পছন্দ করিলেন। মহারাজ ইহা অনুমোদন করিলে ২৬শে জুলাই জমি রেজেষ্ট্রি করা হইল।

২১ সেপ্টেম্বর : মহারাজ ৺মহাপ্রভু ও ৺বিমলাদেবীকে ভোগ নিবেদন করেন এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

৪ নভেম্বর : মহারাজ ভুবনেশ্বরে যাইয়া 'স্যানাটোরিয়ামে' অবস্থান করেন। স্বামী শঙ্করানন্দের নির্বাচিত জমিখণ্ড দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। ৬ই বিকালে মহারাজ পুরীতে ফিরিয়া আসেন।

৯ নভেম্বর : অসুস্থ হরিমহারাজকে লইয়া মহারাজ ও শরৎমহারাজ ডাক্তারের সঙ্গে পুরী হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন কলিকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে উঠিলেন।

১৯১৭ শেষভাগ হইতে অক্টোবর ১৯১৮ : মহারাজ বেশীর ভাগ সময় বলরাম-ভবনে অতিবাহিত করেন। কিছুদিনের জন্য মঠে, উদ্বোধন-গৃহে এবং রামকৃষ্ণপুরে ৺নবগোপাল ঘোষের বাটীতে অবস্থান করেন।

১৯১৮, ৩০ জুলাই : বলরামভবনে স্বামী প্রেমানন্দজী মহাসমাধি লাভ করেন।

১৯১৯, ৪ জানুয়ারী : মহারাজের আদেশে মহাপুরুষ মহারাজ মঠের কার্য দেখাশুনা করিতেছিলেন। এইদিন একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন "মহারাজ বহুকাল পরে গতকল্য মঠে আসিয়াছিলেন।" এইকালে মহারাজ অধিকাংশ সময় বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন।

২৯ অক্টোবর : মহারাজ সদলবলে ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন। ৩১শে অক্টোবর মহারাজ নবনির্মিত মঠমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পট স্থাপন করিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা করা হয়। মহারাজ এইবার প্রায় এক বৎসর ভুবনেশ্বরে অবস্থান করেন।

১৯২০, ১২ জানুয়ারী : ভুবনেশ্বরমঠে স্বামীজীর তিথিপুজার দিন মহারাজ নয় জনকে সন্ন্যাস ও একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

২৩ জানুয়ারী : মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় রামনাম ও ভজন হয়।

১ মার্চ : রামবাবুর একান্ত অনুরোধে মহারাজ পুরীতে যাইয়া শশী-নিকেতনে ছয়দিনের জন্য বাস করেন। অতঃপর ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

৭ মার্চ : মহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১৩ মার্চ : শনিবার ভক্ত কাঞ্জিলালকে তান্ত্রিকমতে অভিষিক্ত করেন।

২৭ মার্চ : মহারাজ ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসেন, সঙ্গে রামলালদাদাও ছিলেন।

২৪ এপ্রিল : মধ্যাহ্ন ১২টায় কাশীধামে স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহাসমাধি লাভ করেন।

১৪ মে : বেলা ৩-৪৫ মিঃ কলিকাতায় বলরামভবনে ভক্ত রামকৃষ্ণ বসু দেহত্যাগ করেন।

২১ জুলাই : শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটিল ভোর ১-৩০ মিঃ। রাত্রি প্রায় ১টার সময় মহারাজ একখানি চাদর মুড়ি দিয়া ঘরে গম্ভীরবদনে বসিয়া রহিলেন। পরদিন টেলিগ্রামে দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছাইল।

৯ নভেম্বর : স্বামী অম্বিকানন্দ ৺শ্যামাপূজা করিলেন। ভুবনেশ্বরমঠে খুব আনন্দ উৎসব হইল। মহারাজ সারাদিন ভাবে মাতোয়ারা ছিলেন।

৪ ডিসেম্বর : সন্ধ্যাবেলা পুরী হইতে যাত্রা করিয়া মহারাজ পরদিন সকালে বেলুড়-মঠে পৌছান।

১৯ ডিসেম্বর : বিবেকানন্দ সোসাইটির কমিটির সভায় মহারাজ সভাপতিত্ব করিলেন।

২০ ডিসেম্বর : মহারাজ আলিপুরে সৌর্যেনবাবুর আমন্ত্রণে কুচবিহারের মহারাজের বাসভবন 'উড্‌ল্যাণ্ডে' সদলবলে যান। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা সেখানেই খৃষ্টসন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। রামলালদাদা পাদরী সাজিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। বাইবেল পাঠ করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ২৬শে ডিসেম্বর মহারাজ বলরামভবনে চলিয়া আসেন।

২২ ডিসেম্বর : মহারাজ ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে যান এবং পরে উড্‌ল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। এইদিন সন্ধ্যার পর প্রিন্স ভিক্টর জিতেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

২৪ ডিসেম্বর : মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া জানবাজারে অবস্থিত ছাত্রাবাসে (Calcutta Ramakrishna Mission Students' Home) গমন করেন। মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দোৎসবের আয়োজন হয়।

৩০ ডিসেম্বর : সন্ধ্যাবেলা মহারাজ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে যান এবং বলরাম-ভবনে রাত্রিবেলা ফিরিয়া আসেন।

৩১ ডিসেম্বর : শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব। মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য উদ্বোধন বা বেলুড়মঠে যাইতে পারেন নাই।

১৯২১, ১ জানুয়ারী : মহারাজ বলরামভবনে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজের অনুরোধে রামলালদাদা সখী সাজিয়া ঢপনৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে মোহিত করেন। মহারাজের জীবনচিত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

২ জানুয়ারী : মহারাজ সেবকগণসহ রামকৃষ্ণপুরে নিস্তারিণী দেবীর বাড়ীতে যান এবং ১০ই জানুয়ারী তিনি বলরামভবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯ জানুয়ারী : মহারাজ ও শরৎমহারাজ কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরদিন কাশীধামে পৌছাইয়া অদ্বৈতাশ্রমে বাঙ্গালমাই কর্তৃক নবনির্মিত ঘরে মহারাজ বাস করিতে থাকেন। মহারাজের উপস্থিতিতে আশ্রম দুইটিতে নিত্য আনন্দোৎসব চলিতে থাকে।

৩০ জানুয়ারী : স্বামীজীর জন্মতিথি। রাত্রিবেলা ৺শ্যামাপূজান্তে মহারাজ ২০ জন প্রার্থীকে সন্ন্যাস ও ১৫ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

১০ ফেব্রুয়ারী : মহারাজের জন্মতিথি খুব জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিবেলা প্রতিমায় কালীপূজা হয়।

৩ মার্চ : মহারাজ সেবাশ্রমের নবনির্মিত একটি ওয়ার্ডের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

৪ মার্চ : প্রায় সত্তরজন অনুগামীসহ মহারাজ, হরিমহারাজ ও শরৎমহারাজ সঙ্কট-মোচনে উপস্থিত হন। বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে রামনাম-সংকীর্তন এক জমাট পরিবেশ রচনা করিল। ঐ সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে মহাবীরের দর্শনলাভে সকলে ধন্য হয়।

১১ মার্চ : ঠাকুরের তিথিপূজা। মহারাজ নয়জনকে সন্ন্যাস ও পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। দুইদিন পরে সাধারণ-উৎসবে প্রায় চারিশত সাধুসন্তকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে ঠাকুরের পুরাতন ছবি পরিবর্তন করিয়া মহারাজ নূতন পট প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে আনন্দোৎসবের হিল্লোল বহিয়া যায়।

১৫ মার্চ : কাশী হইতে যাত্রা করিয়া মহারাজ পরদিন বেলুড়মঠে পৌছান।

২৩ মার্চ : বেলুড়মঠে দোলপূর্ণিমা উৎসব মহারাজের উপস্থিতিতে মাধুর্যমণ্ডিত হইল। মহারাজ দুইজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস দান করেন।

১ এপ্রিল : মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজ ও কয়েকজন সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া হাওড়া হইতে পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলেন এবং পরদিন প্রাতে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

১৫ এপ্রিল : রথযাত্রা উৎসবে লিঙ্গরাজ মন্দিরপ্রাঙ্গণে সকলে যোগদান করেন।

১৮ এপ্রিল : মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বর হইতে যাত্রা করিলেন। ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র উপকূলে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত বব্বিলি রাজভবনে (Babbili Raj Home) কয়েকদিন বাস করেন।

২৪ এপ্রিল : ওয়ালটেয়ার হইতে যাত্রা করিয়া দলটি পরদিন মাদ্রাজ পৌছাইল। ষ্টেশনে অগণিত ভক্ত মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে অভ্যর্থনা করে।

২৮ এপ্রিল : মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ পার্থসারথির মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে যান।

৬ মে : মহারাজ কপালীশ্বর মন্দিরে দেবদর্শনে যান।

১০ মে : মহারাজ মাদ্রাজ ছাত্রাবাসের নবনির্মিত অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১১ই হইতে ১৩ই পর্যন্ত মহারাজ এইস্থানে অবস্থান করেন। ৩রা জুন মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজসহ সাধুভক্তদের ছাত্রাবাসে একটি ফটো তোলা হয়।

২৯ মে : মহারাজ সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া গৌরাঙ্গ-সমাজে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন।

১৩ জুন : সন্ধ্যাবেলা যাত্রা করিয়া মহারাজ পরদিন সকালে ব্যাঙ্গালোর উপস্থিত হইলেন।

২৬ জুন : রবিবার বিকালে মহারাজ মহীশূর মহারাজের পুষ্পোদ্যান লালবাগ দেখিতে যান। আবার ৬ই জুলাই লালবাগে যাইয়া ভুবনেশ্বরমঠ ও কাশী-আশ্রমের জন্য অনেকগুলি গাছের চারা ও ফুল-ফলের বীজ ক্রয় করেন এবং যথাস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ৬ই আগষ্ট লালবাগে অনুষ্ঠিত পুষ্প-প্রদর্শনীটি দেখেন।

১৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার। মহারাজ একজনকে সন্ন্যাস ও একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন।

৪ঠা অক্টোবর : মহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন মাদ্রাজ পৌছাইলেন।

৮-১০ অক্টোবর : ৺দুর্গাপূজার আয়োজন হইল। দক্ষিণদেশে মাদ্রাজমঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব ভক্তদের মহা আনন্দপূর্ণ এক অভিজ্ঞতা দান করিল।

১৬ অক্টোবর : মহারাজ দুইজনকে সন্ন্যাস এবং তিনজনকে ব্রহ্মচর্যব্রত দান করেন।

১৯ অক্টোবর : ভক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের (কাইজার নামে পরিচিত) মৃত্যু সংবাদ পৌছাইলে মহারাজকে বিমর্ষ দেখা যায়।

৩০ অক্টোবর : কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনাইয়া যথারীতি ৺শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইল।

২১ নভেম্বর : রাত্রি প্রায় ১২-টার সময় মহারাজ মান্দ্রাজ হইতে ভুবনেশ্বরে আসিয়া পৌছান।

২০ ডিসেম্বর : বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে তাঁহার নিত্যপূজার জন্য নবনির্মিত মন্দির উৎসর্গীকৃত হইল।

১৯২২, ১১ জানুয়ারী : মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, রামলালদাদা প্রভৃতি ভুবনেশ্বর হইতে রাত্রিবেলা ট্রেনে চাপিয়া পরদিন বেলুড়মঠে পৌছাইলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ কয়েকজন সেবকসহ কলিকাতা শাঁখারী-টোলায় ভক্ত শচীন রায়ের গৃহে এইদিন যান এবং তিনরাত্রি অবস্থান করেন। এই সময়ে একদিন মহারাজ ঐ বাড়ীতে ঠাকুরের পটস্থাপন করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি বাগবাজারে বলরামভবনে চলিয়া যান।

২১ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ সদলবলে আঁটপুরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন সকালে মহারাজ আঁটপুর বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি উৎসব সেখানেই উদযাপিত হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারী : ঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসব, সেইদিন মহারাজ তিনজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস দান করেন।

৫ মার্চ : ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসবে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। সেইদিন মহারাজ ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ আনন্দ করেন।

২২ মার্চ : মঠ হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্বে স্বামীজীর নির্দেশে অঙ্কিত ঠাকুরের মন্দিরের নক্সাটি মহারাজ দীর্ঘকাল অভিনিবেশ সহকারে দেখেন।

ঐ মন্দিরের নির্মাণ সকলের দায়স্বরূপ, ইহা উপস্থিত সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

২৪ মার্চ : বলরামভবনে মহারাজ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি অনেকাংশে সুস্থ হইয়া ১লা এপ্রিল অন্নপথ্য গ্রহণ করেন। দুই দিন পরে বহুমূত্ররোগ প্রবল আকার ধারণ করে এবং বহুবিধ উপসর্গ দেখা দেয়।

৮ এপ্রিল : রাত্রিবেলা মহারাজ আশ্রিতবর্গকে আশীর্বাদ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে দিব্যবাণী শোনা গেল। সেই সময়ে তিনি স্ব-স্বরূপ সকলকে বলিয়া দেন।

১০ এপ্রিল : সোমবার, রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট সময়ে "ব্রজের রাখাল" মর্ত্যলোকে তাঁহার দিব্যলীলা সমাপন করিলেন।

পরদিন তাঁহার পূতদেহ বেলুড়ে শোভাযাত্রা সহকারে নীত হয় এবং গঙ্গার তীরে পূত হোমাগ্নিতে সমর্পিত হয়।

১৯২৪, ২৮ জানুয়ারী : স্বামীজীর তিথিপূজা। বেলুড়মঠে স্বামীজীর দ্বিতল মন্দির সমাপনান্তে প্রতিষ্ঠা করা হইল।

৭ ফেব্রুয়ারী : মহারাজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠে "ব্রহ্মানন্দ-মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইল।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	অপরাহ্নকাল	অপবাহ্নকাল
১০	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
ঐ	আকর্যণ	আকর্ষণ
১১	গ্রামীন	গ্রামীণ
১৫	স্ফ্রণ	স্ফুরণ
২৫	হ্‌ইতেছে	হইতেছে
২৬	ভাবসমৃদ্রের	ভাবসমুদ্রের
৩৩	করিয়	করিযা
ঐ	সম্মোহন	সম্মোহন
৩৪	মহাপূরুষদের	মহাপুরুষদের
ঐ	কল্যাণাকাঙ্খায়	কল্যাণাকাঙ্ক্ষায
ঐ	রোমা রঁ্যলা	রোমাঁ রোলাঁ
৪৪	বেলুড	বেলুড়
৪৫	o	of
৫০	তিমি	তিনি
৫১	কন্টকস্বরূপ	কণ্টকস্বরূপ
৫২	করিরা	করিয়া
৬৭	আকর্যণে	আকর্ষণে
ঐ	অবতার-পার্যদ	অবতার-পার্ষদ
৭০	য়ুক্তি	যুক্তি
ঐ	য়ুগে	যুগে
৭১	আনন্দস্মৃতি-বিজরিত	আনন্দস্মৃতি-বিজড়িত
ঐ	কলিকতায	কলিকাতায
৭৩	আশ্চর্ম	আশ্চর্য
ঐ	সূক্তির	সুক্তিব
৭৬	আবঁদ্ধ	আবদ্ধ
৮৩	য়ুগের	যুগের
৮৪	উৎসাবিত	উৎসারিত
৮৯	উদ্যানে	উদ্যানে
ঐ	কোটাটি	কৌটাটি
ঐ	ইষ্টকবচ	ইষ্টকবচ
৯১	সমস্ত	সমস্ত
ঐ	দিরা	দিয়া
৯২	ঘোয	ঘোষ
৯৬	ব্রাহ্মর্মুহূর্তে	ব্রাহ্মমুহূর্তে
১০০	স্বাবী অভেদানন্দ	স্বামী অভেদানন্দ
১০৩	আরার	আবার

পৃষ্ঠা সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৪	অমক্তমনের	অসক্তমনের
১০৯	কর্পদকশূন্য	কপর্দকশূন্য
১১৪	ব্রহ্মানন্দী	ব্রহ্মানন্দজী
১১৫	তাঁহার	তাহার
ঐ	সুবেন্দ্রচন্দ্রকে	সুরেশচন্দ্রকে
১১৭	ভট্রাচার্য	ভট্টাচার্য
১২৭	চতুর্মাস্য	চাতুর্মাস্য
ঐ	গলেন	গেলেন
১২৯	মহাপূরুষ	মহাপুরুষ
ঐ	উত্তরাধিকাবী	উত্তরাধিকার
১৩১	লীলা-স্রোতাস্বিনীর	লীলা-স্রোতস্বিনীর
ঐ	উত্তরাধিকাবী	উত্তরাধিকার
ঐ	ফেক্রুয়ারীর	ফেব্রুয়ারীর
১৪৯	স্বামী ষোগানন্দ	স্বামী যোগানন্দ
১৬৮	বাবিবর্যণে	বারিবর্ষণে
১৬৯	সন্ন্যাসীগণ	সন্ন্যাসিগণ
১৭৫	পানিণি	পাণিনি
ঐ	নিদ্রাবেগের	নিদ্রাবেশের
১৭৭	যুগযুগান্ত	যুগযুগান্ত
১৮১	পূর্বকাণ্ড	পূর্বকাণ্ড
১৮৫	brahmahcaris	brahmacharis
১৮৬	renuncation	renunciation
ঐ	Swami Bijnananda	Swami Bijnanananda
২১৭	নবযুগের	নবযুগের
২২০	follow	fellow
২২৭	যুগযুগান্তব্যাপী	যুগযুগান্তব্যাপী
২২৯	বেলুডমঠ	বেলুড়মঠ
২৩৫	এণারকুলম	এরনাকুলম
২৪৫	লইরা	লইয়া
২৫৪	বাকবিতণ্ডার	বাগ্‌বিতণ্ডার
২৫৭	যুগের	যুগের
ঐ	উদঘাপন	উদ্‌যাপন
২৭৩	ঢুকিরা	ঢুকিয়া
২৭৫	Monestery	Monastery
২৭৭	সব-ইন্‌স্‌পেক্টরকে	সাব-ইন্‌সপেক্টরকে
২৭৮	তাহার	তাঁহার
২৮১	বুঝাইয়	বুঝাইয়া
ঐ	মহারাজেরা	মহারাজের
২৮৯	ষে	যে
২৯০	প্রবীন	প্রবীণ
২৯১	কীটদুষ্ট	কীটদষ্ট

পৃষ্ঠা সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৮	পুণ্যপীযুষ	পুণ্যপীযূষ
৩১৩	মৃগ্ধ	মুগ্ধ
৩১৬	নরমৃণ্ড	নরমুণ্ড
৩১৮	ঠাকুরের	ঠাকুরের
৩১৯	পডিতেছে	পড়িতেছে
৩২০	লালিলেন	লাগিলেন
ঐ	সম্পক্ত	সম্পৃক্ত
ঐ	মাইবে	যাইবে
ঐ	পাশেব সিযা	পাশে বসিয়া
৩২২	ভিতয	ভিতর
৩২৩	নৃত্য	নৃত্যে
৩২৬	মৃগ্ধ	মুগ্ধ
৩২৭	স্থুল	স্থূল
ঐ	লিখিয়াছেন	লিখিয়াছেন
৩৩৪	ব্রহ্মচয	ব্রহ্মচর্য
৩৩৫	বাাখ্যা	ব্যাখ্যা
৩৩৬	ষসিযা	বসিয়া
ঐ	উপবিক্তগডানেব	উপর্যুক্ত গানের
ঐ	বঙ্গীয	বঙ্গ
৩৩৮	কতাবার্তা	কথাবার্তা
৩৩৯	দশটায়	দশটার
৩৪১	টঁ্যাবা	টেরা
৩৪২	তিসি	তিনি
৩৪৭	ষেন	যেন
ঐ	উর্মিমালা	ঊর্মিমালা
৩৫২	ব্যাথার	ব্যথার
৩৫৪	সাঙ্গোপাঙ্গো	সাঙ্গোপাঙ্গ
৩৫৫	উর্মিমালার	ঊর্মিমালার
৩৫৯	ষাবে	যাবে
৩৬০	ক্বিন্তু	কিন্তু
ঐ	ষে	যে
ঐ	হযনি	হয়নি
৩৬১	কথাবর্তা	কথাবার্তা
৩৬২	মৃখে	মুখে
৩৬৭	উপস্থিত	উপস্থিত
৩৭১	ays	Days
ঐ	গরিশচন্দ্র	গিরিশচন্দ্র
৩৭৬	ষেরূপ	যেরূপ
৩৭৭	সন্তর্পনে	সন্তর্পণে
৩৮০	পরম্পরের	পরস্পরের
ঐ	গুণাগ্রহিতা	গুণগ্রাহিতা

পৃষ্ঠা সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮১	পরস্পরের	পরস্পরের
৩৮৩	মহাপুরুজী	মহাপুরুষজী
৩৮৪	ক্রমশঃ	ক্রমশঃ
৩৯০	সঙ্ঘাধ্যক্ষের	সজ্ঘাধ্যক্ষের
৪০৬	তাঁর	তার
৪১০	রাগিনীর	রাগিণীর
৪১৪	রাগ-রাগিনী	রাগ-রাগিণী
৪১৬	খূব	খুব
৪১৭	রামালালদাদা	রামলালদাদা
৪২৭	অন্তর্মুখীন	অন্তর্মুখীন
৪৩৩	প্রমূখ	প্রমুখ
ঐ	ধ্বনীব	ধ্বনির
ঐ	চতুস্পার্শে	চতুষ্পার্শ্বে
৪৩৫	করিতেছ	করিতেছে
ঐ	ফেব্রুয়ায়ী	ফেব্রুয়ারী
৪৩৮	পদার্পন	পদার্পণ
৪৩৯	উদ্ষাপিত	উদ্যাপিত
৪৪৩	দ্বারোদ্ঘাটন	দ্বারোদ্ঘাটন
৪৪৭	পুজ্যপাদ	পূজ্যপাদ